রাগ বসন্ত

(যোধপুর চিত্রশিল্প, ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)

[শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে]

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

প্রকাশক : ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৫৯
(ইং ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩)

পরিবর্তিত ও সংবর্ধিত দ্বিতীয় ভাগের বিক্রয়লব্ধ অর্থ
কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের
পুস্তকাবলীর মুদ্রণ ও প্রকাশ ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে।

মূল্য : সাড়ে সাত টাকা

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব-সংরক্ষিত।

(প্রথম সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও
দার্জিলিঙ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের পুস্তক-প্রচার-
বিভাগের জন্য ব্যয়িত হবে।)

প্রিণ্টার : শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
ভারতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘজননী পরমারাধ্যা

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর

শতত্তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে তাঁরই শ্রীচরণে এই

'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'

—প্রথম খণ্ড—

উৎসর্গ করা হোল!

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
পরমহংসদেব।

'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' বইখানি যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন এই বিষয়ের বই ভারতবর্ষে এ' পর্যন্ত বার হয় নাই। আমাদের ঋষি-মুনিদের রহস্যবিদ্যা যা সম্পূর্ণ বিদ্যারূপে পরিচিত ছিল সঙ্গীত। তাই স্বামীজী সহজ সরল ভাবে তা প্রতিপন্ন করেছেন। কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য, মুদ্রা ও আরও কত সঙ্গীতের তথ্যের আবিষ্কার এই বইয়ে করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস এই রকমের বই ঋষি মুনি ছাড়া কেউ লিখতে পারে না। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য সকল দেশের সঙ্গীতজ্ঞানীরই এই বই পরম উপকার সাধন করবে।
এই বই দেখে আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি, আমি অজ্ঞ, তাই কিভাবে এই বইয়ের প্রশংসা করব তা বলতে পারি নি। সর্বান্তঃকরণে এর বহুল প্রচার কামনা করি।----------
বর্তমান ভারতের অতীব সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতপূজারি ---

আলাউদ্দিন
২-১২-৫২

শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভূমিকা

আমাদের অতীতকালের সভ্যতার ও সংস্কৃতির রূপটী কি ছিল—তাহার স্পষ্ট ধারণা না হইলে, আমাদের বর্ত্তমান যুগের সাধনার মূল্য কি তাহা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে না এবং আমাদের ভবিষ্যতের জীবন-আদর্শ কোন্ পথে পরিচালিত করা উচিত তাহার দিক্-নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। ভারতের রাজনৈতিক জীবন, তাহার রাষ্ট্র-গঠন ও রাজ্য-গঠন ও তাহার উত্থান-পতনের যেমন ইতিহাস আছে,—ভারতের নানা-মুখী কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন-সাধনার এক একটি বিশিষ্ট ইতিহাস আছে। ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—মোক্ষমূলার, কীথ্, উন্টারনিজ্, সুশীলকুমার দে প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা লিখে গেছেন। রূপবিস্তার ক্ষেত্রে ফার্গুসন্, হ্যাভেল্ ও পার্সি ব্রাউন্—ভারতের স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাস—নানা তথ্য উদ্ধার করে' চিত্তাকর্ষক ধারায় লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতের ভাস্কর্য ও প্রতিমা-শিল্পের ইতিহাস জার্ম্মাণ পণ্ডিত বাকোফস্ দুইটী সুবৃহৎ সচিত্র গ্রন্থে আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থে—ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপ-তাত্ত্বিক আনন্দ কুমারস্বামী সমগ্র ভারতের রূপ-শিল্পের ইতিহাস লিখে দিয়ে গেছেন।

কিন্তু, রাজা স্যর্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বহুমূল্য গবেষণার ও তথ্য-সংগ্রহের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গীত-সাধনার ইতিহাস এ' পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই।

এই দুরূহ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন বর্ত্তমান বাংলার একজন সঙ্গীত-বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ মনীষী—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি নানা প্রবন্ধে এবং তাঁহার "রাগ ও রূপ" নামের উপাদেয় গ্রন্থে ভারতের সঙ্গীতের ইতিহাসের উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ করে' চলেছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে স্বামিজী সঙ্গীতের ইতিহাসের উদ্ধার-কার্য্যের গবেষণা—অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণার মধ্যে—তিনি একটী মূল্যবান তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—সেটী হ'ল এই—যে বেদের মন্ত্র বা ঋচ্ গুলি কেবলমাত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিন স্বরেই গীত হইত না,—সঙ্গীতবিজ্ঞানের পরিপূর্ণ

সপ্ত স্বরই প্রয়োগ করে' সাম-গান নানা বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত-সাধনাকে নানা বর্ণে উজ্জ্বল করে' তুলেছিল। এই তত্ত্ব নিশ্চিত সিদ্ধান্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যে সকল অকাট্য প্রমাণের আবশ্যক—তাহা বোধ হয় এখনও সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু, স্বামিজীর সংগৃহীত প্রমাণ—এই মত নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পথে অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এই সম্বন্ধে ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন—"ঋক্‌মন্ত্রে প্রথমাদি সাতটী স্বর সংযুক্ত করে' সাম-গান গাওয়া হইত এবং এই বিভিন্ন স্বরের প্রয়োগে সাম-গানের রূপও বিচিত্র আকারে প্রকাশিত হইত"। "শিক্ষাকার" নারদ অবশ্য বৈদিক গ্রন্থে "স্বরমণ্ডল" বা সপ্তস্বরের অস্তিত্বের উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু নারদীয়শিক্ষার রচনা-কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বে নহে—সুতরাং তাহার প্রমাণ সাম-গানের যুগের শেষদিকের বিকাশ ও পরিণতির প্রমাণ—বৈদিক সঙ্গীতের প্রথমযুগে তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না। সপ্তস্বরের উদ্ভবের প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্য হইল এই,—যে যদি বেদ-রচনার প্রারম্ভিক কালে সপ্ত স্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ না হয়—তাহা হইলে ঋক্‌বেদ বা সাম-বেদের যুগে ভারতের সঙ্গীতবিজ্ঞানের ইতিহাস মাত্র তিন স্বরে নিবদ্ধ—প্রিমিটিভ্‌ বা আদীম পর্য্যায়ে অবস্থিত ছিল—সম্যক পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই,—এই অপ্রিয় সত্য আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। অবশ্য, চতুর্দ্দশ শতকে জীবিত সায়ণের উক্তি—চার হাজার বৎসরের পূর্ব্বে বৈদিক কালের সঙ্গীতপদ্ধতির ধারা সম্বন্ধে যদি অকাট্য প্রমাণ বলিয়া আমরা গ্রহণ করি—তাহা হইলে আর উচ্চতর প্রমাণের অনুসন্ধানে আমাদের পণ্ডশ্রম করিতে হয় না।

সায়ণের বহুপূর্ব্বে যে ভারতের সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভূত পরিণতি লাভ করেছিল—তাহার একটী প্রমাণ আমরা পাই—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের একটি উক্তিতে—

"বীণা-বাদন-তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতি-জাতি-বিশারদঃ।
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষ-মার্গং চ গচ্ছতি॥"

যাজ্ঞবল্ক্যের সময় (অর্থাৎ অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব সাত শতকে) যে বীণা-বাদনের পদ্ধতি ছিল—শ্রুতি-জাতির চিন্তা-সজ্জা ছিল এবং তালবিদ্যার প্রভূত অনুশীলন হয়েছিল—উদ্ধৃত শ্লোকে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্ত্তমান রয়েছে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সায়ণের প্রমাণ নিশ্চিত সিদ্ধান্তের প্রমাণ বলে স্বীকার না করে' অন্যান্য মূল্যবান প্রমাণের অনুসন্ধান করেছেন। বৈদিক "শিক্ষা"-গ্রন্থাবলীর "মাণ্ডুকীশিক্ষা" ও "নারদীশিক্ষা" বিশ্লেষণ করে' স্বামীজী প্রমাণ করেছেন—যে সাম-গানে সপ্ত-স্বরের প্রয়োগ হইত। এই তথ্য সম্পূর্ণরূপে নূতন আবিষ্কৃত সত্য,—ইহার আবিষ্কারে ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাসের একটী নূতন বাতায়ন উন্মুক্ত হইল—তাহার জন্য ভাবিকালের ভারত-সঙ্গীতের ঐতিহাসিক স্বামীজীকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করিবেন। ইতিমধ্যে, স্বামীজীর সমসাময়িক ভারতের সঙ্গীত-প্রেমিক ও সঙ্গীত-সাধনা ও সংস্কৃতির সমালোচকরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অর্ঘ্য প্রদান করিয়া নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিবেন—এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থে কেবল যে সঙ্গীতের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অমূল্য উপাদান সংগৃহীত হইল তাহা নহে, বাংলার সাহিত্য-ভারতী—স্বামিজীর সংগৃহীত বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া নূতন ঐশ্বর্য্যে দীপ্যমান হইল। আশা করি বাংলার পাঠকসমাজ, তথা বাংলার সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক সংস্কৃতিবান মানুষ-মাত্রই—স্বামিজীর গবেষণার যথাযথ মর্য্যাদা প্রদান করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। ইতি

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৩
২নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড | অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা-২০

নিবেদন

"সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" বইখানি 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস', কিন্তু সোজাসুজিভাবে বইখানির নাম 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' না রেখে 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' নাম দিয়েছি এজন্তে যে, ঘটনার পারম্পর্য নিয়ে সঙ্গীত-বিকাশের দিনপঞ্জিকা বা রোজনামচার প্রতিফলনকে মাত্র গ্রহণ না ক'রে ভারতবর্ষে বৈদিক, বৈদিকোত্তর, ক্ল্যাসিক্যাল, পৌরাণিক ও পরবর্তীযুগের যে সকল সাহিত্যে, গীতিকাব্যে, নাটকে ও সঙ্গীতশাস্ত্রে সঙ্গীতের বিচিত্র অভিব্যক্তি ও ইতিহাসের কাহিনী আছে সেগুলিকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। ভারতবর্ষই বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি; ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহাসিক আলোচনায় তাই ভারতবর্ষকে আমরা বিশ্বসঙ্গীত-প্রেরণা ও উৎসের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছি।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করা সত্যই অত্যন্ত কঠিন কাজ, কেননা সুবিস্তৃত ও অগণিত তার ঘটনা-পারম্পর্যের কাহিনী, অসংখ্য বিকাশ ও বিবর্তনের উচ্ছল গতি তার বুকে সুপ্রাচীন কাল থেকে এখনো-পর্যন্ত প্রবাহিত। কত শত নূতন রূপায়ণের হয়েছে সৃষ্টি সঙ্গীতের জগতে, কত রকমের হয়েছে মিশ্রণ, পরিবর্জন ও সংস্করণ তার আর ইয়ত্তা নেই। ভারতেতর কত দেশ আছে ঋণী তাদের সঙ্গীত-বিকাশের জন্তে ভারতবর্ষের কাছে, ভারতবর্ষও এনেছে কত-কিছু উপাদান, সমৃদ্ধ করেছে তার শিক্ষা, শিল্প ও সভ্যতার ভাণ্ডার জলে ও স্থলে যোগসূত্র রচনা ক'রে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য শুধু গতানুগতিকভাবে সন-তারিখের হিসাব রেখে ভারতীয় সঙ্গীতের বিবরণ দেওয়াই নয়, পরন্তু সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গীতধারার সাথে ভারতীয় ধারার যোগসূত্রটি খুঁজে বার করা। এই গ্রন্থে অবতরণিকায় তাই সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতায় সঙ্গীতের প্রসঙ্গ, ভারতের বিচিত্র আদিমজাতি যেমন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গান্ধার, শবর, পুলিন্দ, কম্বোজ, নিষাদ, গুর্জর, অন্ধ্র, পুণ্ড্র, মূতিব প্রভৃতির সঙ্গীত-সংস্কৃতির সাথে-সাথে বিভিন্ন যুগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও যেমন—রাশিয়ায়, পারস্তে, আরবে, চীনে, জাপানে, কোরিয়ায়, শ্যামে, বর্মায় এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত কিভাবে প্রসারলাভ করেছিল সে' সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে অনুশীলন করা হয়েছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে বৈদিকযুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ও অখণ্ডকালের বুকে বিকাশের বিচিত্র ধারাকে নিয়ে অনুশীলন করা উচিত। সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বোঝে কখনই তার কোন একটি যুগের

খণ্ডরূপকে বুঝাবে না, বুঝাবে না মাত্র মুসলমানযুগের সঙ্গীতের ইতিহাসকে, বাঙলা-দেশের সঙ্গীতের ইতিহাসকে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের ক্রমবিকাশকে, কিংবা হরিদাস, বৈজুবাওরা, নায়কগোপাল, তানসেন, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ প্রভৃতি সঙ্গীত-মনীষীদের জীবনী ও গানের সংকলনকে, অথবা ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতির বিকাশের ধারাকে, পরন্তু বুঝাবে ভারতবর্ষে সভ্যতার বিকাশ যখন হয়েছে তখন থেকে আজ-পর্যন্ত সঙ্গীতের যত রকম ধারার সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হয়েছে তাদের মাত্র দিনপঞ্জিকাকে নয়, তাদের অখণ্ড রূপ, প্রকৃতি, বিবর্তন ও ক্রমপরিণতির প্রবাহকে। সঙ্গীত ভারতীয় সংস্কৃতির শুধু অপরিহার্য অংশ নয়, পরন্তু অভিন্ন রূপ। তাই সঙ্গীতের আলোচনায় ভারতীয় সংস্কৃতিরই হবে প্রাচীন ঐতিহ্যের মান নির্ণয়, আর সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বের দরবারে তার গৌরবময় জয়যাত্রা হবে সূচিত। সঙ্গীতের আলোচনায় ও সাধনায় তাই সঙ্গীতের ইতিহাস রচনায় ও অনুশীলনের আছে একান্ত প্রয়োজনীয়তা।

"সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' সম্পূর্ণ হবে চারটী বিস্তৃত খণ্ডে। (১) প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বৈদিকযুগ তথা সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্রের যুগ থেকে প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগ পর্যন্ত সঙ্গীতের বিকাশ ও উপাদানগুলি। (২) দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বৌদ্ধজাতকমালা ও বৌদ্ধসাহিত্য, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ প্রভৃতিতে সঙ্গীতের বিচিত্র বিকাশের আলোচনা ও ইতিহাস। (৩) তৃতীয় খণ্ডে থাকবে ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর পর্যন্ত আলোচনা এবং (৪) চতুর্থখণ্ডে থাকবে রত্নাকরোত্তর সমস্ত সঙ্গীতগ্রন্থের আলোচনা এবং বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধচর্যাপদ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রোত্তর সকল রকম সঙ্গীত-বিকাশের ইতিকথা এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দেশীয় গানের অভিব্যক্তির পরিচয়। প্রয়োজন হোলে কেবল বাঙ্গালা দেশের বিরাট বিপুল সঙ্গীত-বিকাশের বিবরণ ও ইতিহাস একটী পৃথক খণ্ডেও রচিত হোতে পারে। দুঃসাধ্য এই ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তৃত ইতিহাস রচনার কাজ, দেশ, দশ ও রাষ্ট্রের সহায়তা ও সহানুভূতিই লাভের আশাই এই বিরাট ইতিহাস রচনা করার পথে আমার একমাত্র সহায় ও সম্বল। সর্বসাধারণের জন্যে সহজ সরলভাবে এক-খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করারও আমার ইচ্ছা আছে।

পরিশেষে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি তাঁদের যাঁরা পুস্তকাদি সংগ্রহ ক'রে দিয়ে নানাভাবে আমায় সহায়তা করেছেন এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থকারদের যাঁরা বহুমূল্য পুস্তক ঋণ দিয়ে আমার উপকার সাধন করেছেন।

এই পুস্তকের বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ ও রচনা করার কাজে আমায় প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছেন শ্রীমীরা মিত্র। প্রুফ দেখা, প্রত্যেকটী বিষয়বস্তু ও আলোচনাকে

সুপরিস্ফুট করতে, নানান্ গ্রন্থ থেকে প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহ এবং গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দসূচী প্রভৃতি প্রস্তুত করা এবং সর্বোপরি বইখানিকে যতদূর সম্ভব সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে তাঁর প্রতিদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার কাছে আমি সত্যই ঋণী। তাঁর একান্ত সহায়তা না পেলে এই দুরূহ গ্রন্থ রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হোত না।

এর পরই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্বামী ভবেশানন্দ মহারাজকে। তাঁর একান্ত উৎসাহ ও আন্তরিক প্রেরণা এবং সহায়তা না পেলে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হোত। এ'ছাড়া ঋণী আমি ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্যের কাছে। বিচিত্রভাবে এই গ্রন্থ-রচনার কাজে তিনি আমায় সহায়তা করেছেন। আর সহায়তা করেছেন সকল রকমে প্রেরণা ও উৎসাহ দান ক'রে সঙ্গীতগুণী শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, বি-এ, বি-এল (অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ), স্বামী বেদানন্দ ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, বার-এ্যাট্-ল। আমি এঁদের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমার এখানেই শেষ হয়নি, কেননা ভারতের সাধকশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু, সঙ্গীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পজ্ঞানী শ্রীঅজিত ঘোষ, সুরশিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্গীত-বিশারদ) প্রভৃতি মনীষী ও গুণীদের অশেষ সহায়তা, উৎসাহ ও প্রেরণা আমার এই গ্রন্থ-রচনার পথকে সচল ও স্বচ্ছল করেছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আমার এই প্রথম খণ্ডের যে সুচিন্তিত 'ভূমিকা' লিখে দিয়েছেন তার জন্যে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সাধকশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত প্রচ্ছদপট আমার গ্রন্থকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করেছে। শিল্পজ্ঞানী শ্রীঅজিত ঘোষের ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য। তিনি আমার 'রাগ ও রূপ' সঙ্গীতগ্রন্থে যেমন বিচিত্র রকমের মূল্যবান রাগ-রাগিণীর ছবি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, এই গ্রন্থেও তেমনি 'বসন্ত', 'গুর্জরী', ও 'বেলাবলী' এই তিনটী রাগ-রূপের চিত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের অবদানের কাছে আমি ঋণী।

সঙ্গীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের শুভেচ্ছা-লিপিটিকে আমার পুস্তকের অঙ্গীভূত করতে পেরেছি বোলে আমি সত্যই আনন্দিত। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সঙ্গীত-জগতের মুকুটমণি। সঙ্গীতের তিনি শুধু শিল্পী নন, তিনি সত্যিকারের রসগ্রাহী ও দ্রষ্টা-সাধক; রাগ-রাগিণীদের চাক্ষুস অনুভূতি তাঁর জীবনে হয়েছে বোলেই আমি বিশ্বাস করি। সঙ্গীত-সাধকের শুভেচ্ছাকে তাই আশীর্বাদরূপে আমি এই গ্রন্থে গ্রহণ করেছি।

এ'ছাড়া কৃতজ্ঞ আমি পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীসোমনাথ

ভট্টাচার্যের কাছে। তিনি তাঁর হস্তকরণ বা মুদ্রার ব্লকগুলি এই গ্রন্থে ব্যবহার করতে দিয়ে আমার যথেষ্ট সহায়তা করেছেন।

পরিশেষে স্বীকার করা আমার পক্ষে গরীয়সী দীনতা নয়, পরন্তু অতীব সত্য যে, ভারতীয় সঙ্গীতের এই ইতিহাস রচনা করার মধ্যে আমার যথেষ্ট ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটী রয়ে গেছে। আমি আসলে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র, ইতিহাসের পথচারী আমি নই, অথচ ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস লেখার আকুল আগ্রহ আমার হৃদয়ে অনেকদিন থেকে ছিল। বৈজ্ঞানিক সাধক নিউটনের ভাষাতে তাই আমি বলি—ভারতীয় সঙ্গীত-সাগরের কয়েকটী উপলখণ্ডের আমি উদ্ধার করেছি মাত্র, তার বিশালতা ও গাম্ভীর্যের পরিমাপ করার শক্তি আমার নাই। সুতরাং সহৃদয় শিল্পী ও পাঠক-পাঠিকাগণ যদি আমার এই ইতিহাসের নূতন চলাপথের দুর্বলতাগুলিকে ক্ষমার চোখে দেখে তাঁদের জ্ঞানের উপযোগী বিষয়বস্তু ও আলোচনাগুলিকে এর মধ্যে থেকে গ্রহণ করেন তবে এই গ্রন্থ-রচনার শ্রমকে আমি সার্থক জ্ঞান করব। চলার পথ আমার শুরু হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-কে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে উপহার দিতে পারলে তবেই এই গ্রন্থ-রচনার সার্থকতা আমার পরিপূর্ণ হবে।

এই পুস্তকখানিকে সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি দিয়ে মুদ্রণ করার জন্যে আমি 'ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'-এর কর্তৃপক্ষকে এবং বিভিন্ন ব্লকগুলি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করার জন্যে 'দি বেঙ্গল অটোটাইপ'-এর সত্ত্বাধিকারী শ্রীঅমূল্যচরণ সেন মহাশয়কে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে তাঁদের যাঁরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের জন্যে অর্থ সাহায্য করেছেন। এই নিঃস্বার্থ অর্থ-সাহায্যের পিছনে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের একান্ত শ্রদ্ধার ভাবই সুপরিস্ফুট।

মাঘ, ১৩৫৯ সাল
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রজ্ঞানানন্দ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট : প্রথম

পরিশিষ্ট : দ্বিতীয়

পরিশিষ্ট : তৃতীয়

পূর্বাভাস

ঋগ্বেদ ভারতের অতি প্রাচীন সাহিত্য। শুধু তাই নয়, ঋক্‌সংহিতাকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মান-নির্ণয়ের একমাত্র উপাদান বোল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারটী বেদ বা সংহিতা। অথর্বসংহিতার প্রামাণ্য ও প্রাচীনতাকে অনেকে স্বীকার করতে রাজী হন না, কারণ বৈদিক সাহিত্যে 'ত্রয়ী' শব্দটাই নাকি তার প্রমাণ; কিন্তু সকল দেশের যুক্তিবাদী মনীষী ও ঐতিহাসিকেরাই চার বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেছেন।

বেদ ও সংহিতার পরেই হোল ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলির স্থান। তারপরই আরণ্যক ও উপনিষদের বিকাশ। তাদের পরে সূত্রসাহিত্য তথা ধর্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র প্রভৃতি সামাজিক ধর্ম, আচারনীতি, ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিধি-নিষেধসূচক সাহিত্যগুলির স্থান। সঙ্গে-সঙ্গে বেদপাঠ ও বেদগানের নিয়ম-শাস্ত্ররূপে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলির আবির্ভাব। সম্প্রদায়ভেদে প্রত্যেকের মধ্যে আবার শাখাভেদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আসলে শাখাভেদের সৃষ্টি হয়েছিল চারটী বেদের ক্ষেত্রে ও সেই অনুসারেই তাদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদগুলিও বিচিত্র রূপ নিয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সংক্ষেপে বেদগুলির শাখা ও শাখানুযায়ী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলির নামোল্লেখ এখানে করা যেতে পারে, কেননা প্রত্যেকটী শাখাকে মাধ্যম ক'রেই বৈদিক গান বা সঙ্গীত ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে এবং সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে বিকাশ লাভ করেছিল। সঙ্গীতসেবীমাত্রেরই একথা জানা উচিত। চারটী বেদ, বেদগুলিরর শাখা ও শাখানুযায়ী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলির নাম হোল :

(১) **ঋগ্বেদের শাখা**—শাকল ও বাস্কল; ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষীতকি (এবং শাঙ্খ্যায়নও); আরণ্যক—ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন এবং উপনিষৎ—ঐতরেয় (আরণ্যক ২।৪—৬), কৌষীতকি (আরণ্যক ৩—৬) ও বাস্কলমাত্রোপনিষৎ।

(২) **সামবেদের শাখা**—কৌথুম, রাণায়নীয় ও জৈমিনীয়; ব্রাহ্মণ—(ক) কৌথুম-শাখার : পঞ্চবিংশ (প্রৌঢ় বা তাণ্ডামহা ব্রা°), ষড়্‌বিংশ (ও অদ্ভুতব্রাহ্মণের শেষ প্রপাঠক), সামবিধান, আর্ষেয় ও মন্ত্র (মন্ত্রোপনিষদ্ ব্রা°), দেবতাধ্যায়, বংশ ও সংহিতোপনিষৎ। এর আরণ্যক নাই। উপনিষৎ—ছান্দোগ্য (ব্রাহ্মণের শেষ আটটী প্রপাঠক); (খ) রাণায়নীয় শাখার :

কতকগুলি সূত্রমাত্র এবং এর আরণ্যক ও উপনিষৎ নাই ; (গ) জৈমিনীয় শাখার : জৈমিনীয় ব্রা°, জৈমিনীয়োপনিষৎ (তলবকার)-ব্রা° ও আর্ষেয় ব্রা°। এর আরণ্যক নাই। জৈমিনীয়োপনিষদের (তলবকার) উপনিষৎ—কেন (ব্রা° ৪।১৮—২১)।

(৩ খ) কৃষ্ণযজুর্বেদের শাখা—তৈত্তিরীয় ও মৈত্রিয়ানী ; কঠ—কাপিষ্ঠল-কঠ ও শ্বেতাশ্বতর। এদের মধ্যে তৈত্তিরীয়শাখার ব্রাহ্মণ—তৈত্তিরীয়সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রা° (সংহিতাংশ ছাড়া), তৈত্তিরীয়শাখার আরণ্যক—তৈত্তিরীয় এবং উপনিষৎ—তৈত্তিরীয় (আরণ্যক ৭—৯) ও মহানারায়ণ (আরণ্যক ১০)। মৈত্রিয়ানীশাখার ব্রাহ্মণ—মৈত্রিয়ানীসংহিতা। এর আরণ্যক নাই এবং উপনিষৎ—মৈত্রিয়ানী। কঠশাখার ব্রাহ্মণ—কাঠকসংহিতা। এর আরণ্যক নাই ও উপনিষৎ—কঠ। কাপিষ্ঠল-কঠশাখার ব্রাহ্মণ—কাপিষ্ঠল-কঠসংহিতা এর আরণ্যক ও উপনিষৎ নাই। শ্বেতাশ্বতরশাখার ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক নাই, তবে উপনিষৎ—শ্বেতাশ্বতর।

(৩ খ) শুক্লযজুর্বেদের শাখা—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। কাণ্বশাখার ব্রাহ্মণ—শতপথ, আরণ্যক—বৃহদারণ্যক (ব্রাহ্মণকাণ্ড ১৭) এবং উপনিষৎ—ঈশাবাস্যোপনিষৎ (সংহিতা অ° ৪০) ও বৃহদারণ্যক (আরণ্যক ৩—৮। মাধ্যন্দিনশাখার ব্রাহ্মণ—শতপথ ; আরণ্যক—বৃহদারণ্যক (ব্রাহ্মণকাণ্ড ১৪) এবং উপনিষৎ—ঈশাবাস্য (আরণ্যক ৩—৮) এবং বৃহদারণ্যক (আরণ্যক ৪—৯)।

(৪) অথর্ববেদের শাখা—পিপ্পলাদ ও শৌনক। পিপ্পলাদশাখার ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক নাই। উপনিষৎ—প্রশ্ন (?)। শৌনকশাখার ব্রাহ্মণ—গোপথ। এর আরণ্যক নাই। উপনিষৎ—মুণ্ডক (?) ও মাণ্ডুক্য (?)।

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিও বেদের শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং সে-সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে আলোচনা করেছি।

বেদ বা সংহিতার ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-কাহিনীতে ভরপুর। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল ব্রাহ্মণগুলি সম্বন্ধে বলেছেন: "They reflect the spirit of an age in which all intellectual activity is concentrated on the sacrifice, describing the ceremonies, discussing its value, speculating on its origin and significance"। ব্রাহ্মণগুলিকে বেদের স্থূল-বিকাশ হিসাবে গ্রহণ করলে আরণ্যক ও উপনিষদ্‌গুলিকে সূক্ষ্ম-বিকাশরূপে গণ্য করা যায়, কারণ আরণ্যক ও ঔপনিষদিক যুগে যাগযজ্ঞগুলির একটি বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হয়েছিল, স্থূল-কর্মানুষ্ঠান থেকে মানুষের মন সূক্ষ্মজ্ঞানের ও বিচারের দিকে ঝুঁকে

পড়েছিল। তাই স্থূলের পাশে সূক্ষ্মকে, কর্মের পাশে জ্ঞানের অগ্রগমনকে অভিনন্দন জানিয়েছিল ব্রাহ্মণযুগেরই মানুষ। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এ'প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে তাই বলেছেন,

"Thus we find that the Aranyaka age was a period during which free thinking tried gradually to shake off the shackles of ritualism which had fettered it for a long time. It was thus that the Aranyakas could have the way for the Upanishads, revive the germs of philosophic speculation in the Vedas * *."

'আরণ্যক ও উপনিষদে সঙ্গীত' অধ্যায়ে আমরা আরণ্যক ও উপনিষদের প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্যভাবে এ'গ্রন্থে আলোচনা করেছি। সাধারণতঃ অনেকে উপনিষদকে আরণ্যকের ও আরণ্যককে ব্রাহ্মণগুলির পরিশিষ্ট হিসাবে মনে করেন, কারণ ঐ তিনটীর অনেক বিষয়বস্তুই প্রত্যেকটীতে অন্তর্নিবিষ্ট আছে। তাই অধ্যাপক পল্ ডয়সন্ ঐ তিনটীর প্রত্যেকের মধ্যে প্রার্থক্য নির্ণয় ক'রে বলেছেন: ব্রাহ্মণগুলি গৃহবাসীদের ও আরণ্যকগুলি অরণ্যবাসী শান্তিকামীদের জন্যে নির্দিষ্ট, আর উপনিষৎ হোল—যাঁরা নির্জনে ও নিভৃতে ধ্যান-ধারণাদি ক'রে মোক্ষ লাভ করতে চান সেই অরণ্যচারী সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে সংকলিত। সুতরাং তিনটীর মধ্যে একটী অখণ্ড যোগসূত্র থাক্‌লেও একটী অপরগুলি থেকে কিছু-না-কিছু পৃথক। তবে সঙ্গীত তিনটীর মধ্যেই রূপায়িত হয়েছিল সামগদের রুচি ও প্রবৃত্তির পথকে অনুসরণ ক'রে।

বৈদিক সাহিত্যে তথা সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, আরণ্যক ও উপনিষদে, ধর্ম, শ্রৌত ও কল্পসূত্রে, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যে আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক প্রয়োগ অনুযায়ী গানের অনুশীলন হোত। গানের সঙ্গে থাকত নৃত্য ও বাদ্য, কাজেই বৈদিকযুগে সঙ্গীতের পরিপূর্ণ বিকাশ ছিল, যদিও 'সঙ্গীত' শব্দটীর পরিবর্তে তখন সর্বত্র গান, গীতি, উদ্‌গান, উদ্‌গীতি, স্তোত্র, গান্ধর্ব প্রভৃতি শব্দ-গুলির ব্যবহার স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে সঙ্গীতের আলোচনায় (৭ম অধ্যায়, পৃঃ ১৪৩—১৫৩) আমরা ১।১০।১, ২।৩৪।১৩, ২।৪৩।৩ প্রভৃতি ঋক্‌গুলি থেকে সামান্যভাবে নৃত্য, গীত, বাদ্য, ক্ষোণী প্রভৃতি বীণা, কর্করি, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করেছি। ঋক্, যজুঃ (শুক্ল ও কৃষ্ণ), সাম,

অথর্ব ও বিভিন্ন ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে বিচিত্র রকমের বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। নৃত্যের প্রসঙ্গে ঋক্‌সংহিতা (৪।২০।২২) বলেছে: "মর্তশ্চিদ্বোনৃতবোরুক্মবক্ষস" প্রভৃতি। আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: "হে নৃতবোনৃত্যন্তঃ হে রুক্মবক্ষসঃ বোচমানাক্ষরণং * *"। পুনরায় ৫।৩৩।৬ ঋকে আছে: "পপৃক্ষেণ্যমিন্দ্রত্বেহোজোনৃম্নানিচনৃতমানো অমর্তঃ।" সায়ণ এর ভাষ্যে বলেছেন: "নৃতমানোনৃত্যন্নমর্তোমরণধর্মা সন্থং বসমানঃ" প্রভৃতি। ১০।১৮।৩ ঋকে পাওয়া যায়: "প্রাঞ্চো অগামনৃতয়েহসায় * *"। সায়ণ এটীর অর্থ প্রকাশ ক'রে বলেছেন: "ততঃ উত্তরং বয়ং প্রাঞ্চ প্রাঙ্‌মুখাঞ্চনাঃ অয়াম * * নৃতয়ে নর্তনায় কর্মণি গাত্রবিক্ষেপায় স্বকর্মানুষ্ঠানয়েতিপ্রাবঃ" প্রভৃতি। সুতরাং সামগানেও যে নৃত্যের সমাবেশ থাকৃত এ' সকল বর্ণনা থেকে বেশ বুঝা যায়। এ'ছাড়া পৃথকভাবেও তখন নৃত্যের অনুশীলন হোত।

দুন্দুভি প্রভৃতি চামড়ার বাদ্য, বিভিন্ন তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বেণু প্রভৃতির উল্লেখ বেদে আছে তা আগেই বলেছি। দুন্দুভি পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী হোত। ভূমিদুন্দুভি তৈরী করা হোত: মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মুখ পশুর চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন (আবৃত) ক'রে। যুদ্ধে, বিপদাশঙ্কায় ও বিভিন্ন উৎসবে ঘোষণা করার জন্যে দুন্দুভি ব্যবহার করা হোত। ঋগ্বেদে (১।২৮।৫) আছে: "যচ্চিদ্ধি ত্বং গৃহে * * ইহদ্যুমত্তমং বদ জয়তামিব দুন্দুভিঃ।" আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে লিখেছেন: "* * উত্তমং অতিশয়েন দীপ্তং প্রভূতধ্বনিযুক্তং শব্দং বদ তত্র দৃষ্টান্তঃ—জয়তামিব দুন্দুভিঃ যথা যুদ্ধে জয় প্রাপ্নুবতাং রাজ্ঞাং দুন্দুভির্মহান্তং ধ্বনিং করোতি।" ৬।৪৭।২৯—৩১ ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে শত্রুকে দলন করার জন্যে দুন্দুভিকে আহ্বান করা হয়েছে। ৬।৪৭।২৯ ঋকে আছে: "স দুন্দুভে সজুরিন্দ্রেণ দেবৈর্দূরাদ্ দবীয়ো অপ সেধ শত্রূন্"। সায়ণাচার্য এর ভাষ্যে বলেছেন: "হে দুন্দুভে, স ত্বং ইন্দ্রেণ অন্যৈর্দেবৈ * * দূরাদপিদূরতরং শত্রূনস্মাদীয়ান্ অপসেধ অপগময় অত্র নিরুক্তং—দুন্দুভিরিতি শব্দানুকরণং দ্রুমোভিন্নমিতি বা দুন্দুভ্যতের্বাস্যাদ্বধকর্মণ ইত্যাদি"। ২৯ থেকে ৩১ পর্যন্ত তিনটী ঋক্‌মন্ত্রেই দুন্দুভির উল্লেখ আছে শত্রুনাশের জন্যে। যেমন, ৬।৪৭।৩০ ঋকে আছে: "অপপ্রোথ দুন্দুভেদুচ্ছুনাইত" প্রভৃতি। আচার্য সায়ণ এ'সম্বন্ধে বলেছেন: "হে দুন্দুভে, দুচ্ছুনাঃ

অস্মদ্দুঃখহেতুভূতং সুখং যাসাং তাদৃশীঃ শত্রুসেনাঃ হতোস্মাৎ স্থানাৎ অপপ্রোথ বাধস্ব স্বং চ"। আবার ৬।৪৭।৩১ ঋকে আছে: "কেতুমদ্দুন্দুভির্বাবদীতি" প্রভৃতি। সায়ণ এ' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "অস্যাঃ পূর্বার্ধোত্তুন্দুভিদেবত্যঃ উত্তরার্ধ শৈন্দ্রঃ যথা" প্রভৃতি।

ঋগ্বেদে 'গর্গর' নামক একটী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। ৮।৬৯।৯ ঋকে পাওয়া যায়: "অব স্বরাতি গর্গরো গোধা পরি-সনিষ্বণৎ পিঙ্গা পরি চ নিষ্কদ্‌দিন্দ্রায় ব্রহ্মোগ্যতম্"। এই মন্ত্রে 'গর্গর' ছাড়াও 'পিঙ্গ' বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। 'গর্গর' সম্বন্ধে সায়ণ বলেছেন: "গর্গরো গর্গরধ্বনিযুক্তো বাদ্যবিশেষঃ"। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই মন্ত্রটীর অর্থ করেছেন: "গর্ গর্ ধ্বনিযুক্ত বাদ্য ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে, গোধা ('হস্তঘ্ন্য') চতুর্দিকে শব্দ করিতেছে। পিঙ্গলবর্ণ ধনুকের জ্যা শব্দ করিতেছে, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎকৃষ্ট স্তুতি কর"। 'পিঙ্গ' বাদ্যযন্ত্রটী 'ধনুর্যন্ত্র', একে রাবণাস্ত্রও বলা হয়। ধনুর্যন্ত্রটী পিঙ্গল বা নীলাভ তাম্রবর্ণের অন্ত্র (নাড়ী) বা পশুদের অন্ত্র দিয়ে তৈরী হোত বোলে 'পিঙ্গ' বলা হয়। এই 'পিঙ্গ'-ধনুর্যন্ত্রই (bow-instrument) পরবর্তীকালে রূপ পরিবর্তন ক'রে 'বাহুলীন' বা 'বেহালা' নামে পরিচিত হয়। "যত্নুৎপন্ বদসি কর্করিঃ যথা" (—ঋক্ ২।৪৩।৩) —এই 'কর্করি' বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থের অনেক স্থানে উল্লেখ করেছি।

বেদে 'আঘাটি' (আঘাতি বা আঘাতী), ঘাটলিকা (ঘাতর্লিকা), কাণ্ডবীণা, নাড়ী, বনস্পতি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১০।১৪৬।২ ঋকে আঘাটির বর্ণনা আছে: "আঘাটিভিরিবধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে।" আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে বলেছেন: "আঘাটিভিরিব আঘাটয়োঘাটলিকাঃ কাণ্ডবীণাস্তাভিঃ ধাবয়ন্ নিষাদাদিনপ্তস্বরান্ শোধয়ন্ গায়ক ইব তদা অরণ্যানিঃ সা অরণ্যানী মহীয়তে পূজ্যতে"। সুতরাং 'আঘাটি' অর্থে 'কাণ্ডবীণা'। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত এই ঋকটীর বঙ্গানুবাদ করেছেন: "এক জন্তু বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে, আর এক জন্তু চী-চী ইত্যাকার শব্দ করিয়া যেন তাহার উত্তর দিতেছে, যেন ইহারা বীণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব্দ নির্গত করিয়া অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে"। "আঘাটয়ো"—

'আঘাট' বল্‌তে এখানে বীণায় ঘাট নয়, পরন্তু বীণার 'পর্দা'—যা দিয়ে বিভিন্ন স্বর নির্গত হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীও একথার উল্লেখ করেছেন—"'Ghat' is that contrivance in 'Vina' which effects tee variation of the notes"। 'নাড়ী' নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ ১০।১৩৫।৭ ঋকে পাওয়া যায়—'ইয়মস্য ধম্যতে নাড়ীরয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ"। সায়ণ এর ভাষ্যে বলেছেন: "ইয়ং নাড়ীঃ বাদ্যবিশেষো বেণুঃ ধম্যতে বাদ্যতে যদ্বা নাড়ীতি বাঙ্‌নাম ইয়ং স্তুতিরূপা বাক্"।

ঋগ্বেদে শততন্ত্রীবীণার উল্লেখ আছে এবং এ' থেকে বুঝ্‌তে হবে যে, সুপ্রাচীন ঋগ্বৈদিক যুগে বিভিন্ন বীণা ও শততন্ত্রীবীণার প্রচলন সামগদের মধ্যে ছিল। ১।৮৫।১০ ঋকে পাওয়া যায়: "ধমন্তো বাণং মরুতঃ সুদানবোমদেসোমস্যরণ্যানি চক্রিরে"। আচার্য সায়ণ এই 'বাণং' অর্থে 'শততন্ত্রীযুক্ত বীণা' বলেছেন—"তে মরুতঃ বাণং শতসংখ্যাভিস্তন্ত্রীভির্যুক্তং বীণাবিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্তঃ"। মনীষী মোক্ষ-মূলার (Max Mueller) 'বাণং' অর্থে গলার স্বর ('voice') বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন—"There is no authority for *Vina* meaning either lyre or flute in the Vedas"। কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষ-মূলারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা গ্রহণ করতে অক্ষম; বরং সায়ণের অর্থকেই আমাদের সমীচীন বোলে মনে হয়, কেননা ১০।৩২।৪ ঋকেও সপ্তধাতুর সঙ্গে 'বাণ'-শব্দটার উল্লেখ থাকায় 'বাণ' অর্থে 'বীণা' ও 'সপ্তধাতু' অর্থে 'সাত স্বর' বুঝাচ্ছে। ১০।৩২।৪ ঋকে আছে: 'মাতা যন্মন্তুর্যূথস্য পূর্ব্যাহভি বাণস্য সপ্তধাতুরিজ্জনঃ"। আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: বাণস্য বাদ্যস্য সপ্তধাতুঃ নিষাদাদিসপ্তস্বরোপেতো জনঃ অভিগচ্ছতি তদ্বৎ তদ্‌গুণোপেতং ভাবঃ"।

অথর্ববেদের নৃসূক্তে 'বাণ' বা বীণাসহ নৃত্যের উল্লেখ আছে—"কো বাণম্ কো নৃত্যো দধৌ" (অথর্ব° ১০।২।১৭)। 'ধাতু' অর্থে 'নাদ' বা 'স্বর'—"তত্র নাদাত্মকো ধাতুঃ" (—সঙ্গীতদামোদর)। ৮।৫৫।৩ ঋকে "শতং বেণুঞ্ছতং শুনঃ শতং চর্মাণি ম্লাতানি" প্রভৃতি মন্ত্রটা ঋগ্বেদের কোন কোন সংস্করণে পাওয়া যায়, কিন্তু এর সঠিক অর্থ গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বঙ্গানুবাদযুক্ত 'ঋগ্বেদসংহিতা'-য় (পৃ° ৯২৫) এই মন্ত্রটী সম্বন্ধে বলেছেন—"এখানে 'বেণু' অর্থে বংশ বা বাঁশী (flute) কিনা বলা কঠিন"। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বীণার

মতন বেণুও (বাঁশী) প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, অথচ এর বিশেষ কোন উল্লেখ ঋগ্বেদাদিতে কেন পাওয়া যায় না তা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

ঋগ্বেদের ১।১১৭।৪ মন্ত্রে বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ ১।১১৭।৪ ঋকে আছে: "যুবংশ্যাবায়রুশতীমদত্তং মহঃ ক্ষোণস্যাশ্বিনাকণ্বায়"। আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: "কণ্বায় ক্ষোণস্য ক্ষোণঃ শব্দকারিবীণাবিশেষঃ মহামহতঃ ক্ষোণস্য শ্রবঃ শব্দং অধাধত্তম্ উষসোবিজ্ঞানার্থং অধিকং কুরুতম্"। পুনরায় ১।১১৮।৭ ঋকে আছে: "যুবমত্রয়েবণীতারতপ্ত * *"। সায়ণ উল্লেখ করেছেন: "ঋষয়ে চক্ষুঃ ব্যুষ্টায়া উষসঃ প্রকাশকং বীণাশব্দং প্রত্যধত্তং কৃতবন্তৌ * * কণ্বায় চক্ষুরিন্দ্রিয়ং প্রত্যবত্তম্ প্রত্যস্থাপয়তম্"। এই মন্ত্রের অর্থ হোল: অসুরগণ কণ্বকে একটী অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ ক'রে বলেছিল: 'এই স্থানে বসে উষা যে উদিত হয়েছেন তা উপলব্ধি করো'। তারা উষার উদয়বার্তা বীণাশব্দের দ্বারা ঘোষণা করেছিলো।

সামবেদ বা সামসংহিতায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সামবেদের ২।১।৪ মন্ত্রে আমরা পাই: "অরমশ্বায় গায়ত শ্রুতকক্ষারং গাব, অরমিন্দ্রস্য ধাম্নে"। আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে লিখেছেন: "অরম্ অলং গায়ত, বচনব্যত্যয়। (৩।১।৮৫) গায়·গীতিং কুরু"। গানের তথা সামগানের কথা এখানে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। সামবেদের ৩।১২।১ মন্ত্রে আছে নৃত্যের ও সঙ্গে-সঙ্গে গানের কথা—"গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ, ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে"। সায়ণ এ'সম্বন্ধে বলেছেন: "তত্র দৃষ্টান্তঃ, বংশমিব যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ় বংশম্ উন্নতং কুর্বন্তি। * * এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে, গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রচয়ন্তি * * "। সামের ৪।৪।৮ মন্ত্রে 'বৃহদ্‌সাম'-এর উল্লেখ আছে—"ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ"। সায়ণ এর ভাষ্যে লিখেছেন: "ইন্দ্রায় বৃহৎ বৃহন্নামকং সাম গায়ত পঠত"। গান ও পাঠ তখন সমপর্যায়ভুক্ত ছিল, অর্থাৎ সাম, স্তোভ বা স্তোত্রপাঠ বোল্লেই তখন বুঝাতো গান করা। গাথারও উল্লেখ আছে—"পুরুহূতং পুরুষ্টুতং গাথান্যাং সনশ্রুতম্"। সায়ণ এ' সম্বন্ধে বলেছেন: "স্তুতমতএব গাথান্যং গানযোগ্যং গাতব্যং সনশ্রুতং সনাতনয়া প্রসিদ্ধম্"।

শুক্লযজুর্বেদকাণ্বসংহিতায় এবং কৃষ্ণযজুর্বেদে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ

আছে। শাখাভেদ সকল বেদের আছে তা আগেই উল্লেখ করেছি। যজুর্বেদের ভাষ্যে আচার্য সায়ণ বলেছেন: "পাদশ্চ গীতিঃ। * * হাউ ইত্যাদিকং সাম যজুর্বেদে গীতম্। * * পাদেনার্দ্ধর্চেনোপেতা বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রাঃ ঋচঃ। গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি"। শুক্লযজুর্বেদকাণ্বসংহিতার ২য় বিবেক ১১শ অধ্যায় ৫ম অনুবাকে রথন্তর, বৃহদ্, বৈরূপ, রৈবত প্রভৃতি সামগুলিকে ভিন্ন-ভিন্ন ঋতুতে গান করার বিবরণ দেওয়া আছে: (ক) "রথন্তরং সাম ত্রিবৃৎস্তোমো বসন্তঋতুঃ", (খ) "বৃহদ্‌সাম পঞ্চদশস্তোমো গ্রীষ্মঋতুঃ", (গ) "বৈরূপং সাম সপ্তদশস্তোমো বর্ষাঋতুঃ", (ঘ) "শাক্বররৈবতে সামনী * * হেমন্তঋতুঃ" প্রভৃতি। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের যুগে (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী) জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভরতোত্তর যুগে রাগগুলিকে যে ভিন্ন-ভিন্ন ঋতুতে ও সময়ে গান করা হোত এই নিয়ম ঐ প্রাচীন বৈদিকযুগের সামগানরীতিকেই অনুসরণ ক'রে এসেছে।

শুক্লযজুর্বেদের ২।১৫ অধ্যায়ে "অন্তরিক্ষং যচ্ছন্তরিক্ষং" প্রভৃতি মন্ত্রগুলির ভাষ্যে আচার্য সায়ণ গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের নামোল্লেখ করেছেন—"গন্ধর্বাপ্সরোগণাং সা ত্বমন্তরিক্ষং যচ্ছ"। অবশ্য ঋক্‌সংহিতায় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের উল্লেখ এবং তাদের পরিচয় আছে। যেমন ৯।৮৩।৪ ঋকে গন্ধর্বকে 'সোমরসের স্থানরক্ষক' বলা হয়েছে; ১।২২।৮৪ ঋকে 'অন্তরিক্ষই গন্ধর্বগণের স্থান' এ'কথার উল্লেখ আছে; ১।১৮৩।২ ঋকে গন্ধর্বকে 'ইন্দ্রের রথের বল্‌গাধারী' বলা হয়েছে। আবার ৭।৭৮।৩ ঋকে 'অপ্সরা'-র প্রসঙ্গে আকাশবিহারিণী কয়েকজন অপ্সরাকে 'সোমরস প্রস্তুতকারিণী-রূপে' পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আচার্য সায়ণ ঋক্‌ভাষ্যে গন্ধর্বের অর্থ করেছেন 'সূর্য' বা 'সূর্যরশ্মি'। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত গন্ধর্বের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "সায়ণের ব্যাখ্যাই ঠিক; গন্ধর্বের আদি-অর্থ সূর্য বা সূর্যরশ্মি। কিন্তু ঋগ্বেদের রচনার সময়ই গন্ধর্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পরে অপ্সরাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এইরূপ উপাখ্যান সৃষ্টি হইল। সূর্যরশ্মি দ্বারা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয় এই কি উপাখ্যানের আদি কারণ?" (—ঋগ্বেদসংহিতা, পৃ: ১০৬২)। এ'ছাড়া ৯।৭৮।৩ ঋকের 'অপ্সরা'-শব্দটী সম্বন্ধে মনীষী গোল্ডষ্টুকার বলেছেন: সূর্য দ্বারা আকৃষ্ট হোয়ে জলীয় বাষ্প যে মেঘের রূপ ধারণ করে তাকেই পরে কাল্পনিকভাবে 'অপ্সরা' বলা হোত—

"Personifications of the vapours which attracted by the sun and formed into mist or clouds"। এ'সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত পুনরায় উল্লেখ করেছেন: "কিন্তু অপ্সরার প্রথম কল্পনা যাহাই হউক, ঋগ্বেদ-রচনার পূর্বেই অপ্সরাগণ সুন্দরী রমণী এরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল" (—ঋগ্বেদসংহিতা, পৃ° ১০৫৮)।

সাধারণতঃ 'গন্ধর্ব' ও 'অপ্সরা' শব্দ দুটির উল্লেখ থেকে আমরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের ধারণা পাই, কারণ বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগে এবং ক্ল্যাসিক্যাল ও পৌরাণিক যুগে তো বটেই, গন্ধর্ব কিন্নর ও অপ্সরাদের সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড়ভাবে সম্পর্ক জড়িত দেখা যায়। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের বিষয়বস্তুতেও আমরা 'গন্ধর্ব' সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং গন্ধর্বেরা যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন একটী স্থানের অধিবাসী ছিল এ'কথা ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়। শোনা যায়, রাজপুতানার কোন একটী স্থানের অধিবাসীদের এখনো গন্ধর্ব নামে অভিহিত করা হয় ও সেই গন্ধর্বজাতির স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু-কন্যারা সকলেই গান্ধর্ব বা সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

'গন্ধর্ব' ও 'অপ্সরা' শব্দদু'টীর মতন 'পঞ্চজন', 'পাঞ্চজন্য', 'পঞ্চকৃষ্টি' বা দেব, মানুষ, অসুর, রাক্ষস ও পিতৃগণের এবং বিশেষ ক'রে 'অসুর' শব্দটী সম্বন্ধে যথেষ্ট মতবাদের প্রচলন আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত যে, ঋগ্বেদে দেবতাদের বিরোধী বা শত্রু হিসাবে 'অসুর' শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি, বরং দেবগণের পরিবর্তেই অসুর শব্দটী ঋগ্বেদাদিতে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলে ১১ বার 'অসুর' শব্দটী ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন দেবতার উদ্দেশে: ৫ম মণ্ডলে ১১ বার, ৭ম মণ্ডলে ৮ বার, ৮ম মণ্ডলে ৮ বার, ৯ম মণ্ডলে ৩ বার 'অসুর' শব্দ সূর্য, বায়ু, রুদ্র, পূষা, মিত্র, বরুণ, পর্জন্য প্রভৃতি দেবতাদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। যজুর্বেদেও 'গন্ধর্ব' অর্থে দেবতাদের লক্ষ্য করা হয়েছে; যেমন (ক) "সূর্যো গন্ধর্বঃ", (খ) "চন্দ্রমা গন্ধর্বঃ", (গ) "বাতো গন্ধর্বঃ", (ঘ) "যজ্ঞো গন্ধর্বঃ প্রভৃতি। তবে ঋগ্বেদের ৯।৭৪।৫ মন্ত্রে গন্ধর্ব অর্থে 'কৃষ্ণবর্ণ চর্ম' শব্দের উল্লেখ আছে এবং তা থেকে 'যজ্ঞবিরোধী কৃষ্ণবর্ণ বর্বর তথা অনার্য' এই অর্থও করা যায়। ঋগ্বেদের এই কৃষ্ণবর্ণ চর্মাচ্ছাদিত অনার্য মানুষদের থেকেই পৌরাণিক যুগে রাক্ষসদের উপাখ্যান সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

তবে ১।১০০।১২ ঋকে 'শবসা পাঞ্চজন্যো' শব্দগুলির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আচার্য সায়ণ বলেছেন : "গন্ধর্বা অপ্সরসো দেবা অসুরা রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ"। ১।৮৯।১০ ঋকের "অদিতি পঞ্চজনাঃ" শব্দগুলির ভাষ্যে সায়ণ পুনরায় উল্লেখ করেছেন : "পঞ্চজনা নিষাদপঞ্চমশ্চত্বারো বর্ণাঃ, যদ্বা গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি"। নিরুক্তকার যাস্ক এই 'পঞ্চজনা' সম্বন্ধে বলেছেন : "গন্ধর্বাঃ পিতরো দেব অসুরা রক্ষাংসীতেতে চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ" (৩।৭)। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র দত্ত সায়ণ অথবা যাস্ক এঁদের কারও অর্থই গ্রহণ করেন নি, তাঁর মতে 'পঞ্চজনাঃ' অর্থে পঞ্জাবপ্রদেশ ও পঞ্চনদকূলবাসী সমস্ত আর্যজাতি। ৪।৩৯।১০ ঋকের 'পঞ্চকৃষ্টিঃ' শব্দের অর্থও সায়ণ ঠিক এই একই ভাবে করেছেন। শুধু তাই নয়, সামবেদসংহিতায় উত্তরার্চিকের অগ্ন-আয়ুংষিতৃচাত্মক ৩য় সূক্তের "অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ, তমীমহেমহা গময়" এই ২য় মন্ত্রটারও সায়ণ অর্থ করেছেন—"পাঞ্চজন্যঃ নিষাদপঞ্চমশ্চত্বারো বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ, যদ্বা গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবাঃ অসুরাঃ রক্ষাংসীত্যেতৎ পঞ্চজনাঃ, অথবা দেব-মনুষ্য-গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্পাঃ পিতরঃ ইতি ব্রাহ্মণাভিহিতাঃ পঞ্চজনাঃ"। এ'থেকে বুঝা যায় যে কিন্নর, অপ্সরা, গন্ধর্ব প্রভৃতি শব্দগুলি ঋগ্বৈদিক যুগে দেবতাভিন্ন বা দেবতাবিরোধী ও সঙ্গীতপ্রিয় জাতি হিসাবে কোন একটী শ্রেণীকে না বুঝালেও পরবর্তীকালে ঐ শব্দগুলি দ্বারা গন্ধর্ব, কিন্নর, অপ্সরা প্রভৃতি সঙ্গীতকলানিপুণ জাতিদের বুঝাতো তা বেশ মনে হয়। তবে একথা সত্য যে, ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগেও সমাজে দেব, মনুষ্য, রাক্ষস বা পিতৃ প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ ছিল এবং সেই সকল শ্রেণী-অনুসারে সঙ্গীতের স্বরগুলিও বিভক্ত ছিল। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও একথা স্বীকার করেছেন।

শুক্লযজুর্বেদে (২।১৭।৫) 'দুন্দুভি' বাদ্যের উল্লেখ আছে—"নমঃ শ্রুতেরপি শ্রুতসেনায় চ নমো দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায় চেতি"। আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে বলেছেন : "দুন্দুভৌ ভের্যাস্তবো দুন্দুভ্যস্তস্মৈ নমঃ। দুন্দুভিস্তু ভের্যাং দিতিতিসুতে বিবে। আহন্যতে তাড্যতেনেনেতাহনং বাদ্যসাধনং দণ্ডাদি তত্র ভব আহনন্যস্তস্মৈ নমঃ" (৮।৪)। কৃষ্ণযজুর্বেদে (৭।৫।৯।২৯) আছে—"দুন্দুভিন্ সমঘ্নৌতি"। কৃষ্ণযজুর্বেদের ৭।৫।৯।৩০ মন্ত্রে ভূমিদুন্দুভির উল্লেখ আছে—

"ভূমিদুন্দুভিন্ অদ্মৌতি"। ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর এই 'ভূমিদুন্দুভি'-সম্বন্ধে বলেছেন—"চর্মনা আচ্ছাদিতমুখম্ ভূগর্তম্"; অর্থাৎ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মুখ পশুচর্ম দিয়ে আচ্ছাদন করলে ভূমিদুন্দুভি হয়। বাজসনেয়ী-সংহিতায় ভূমিদুন্দুভির উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ীতে (৯।১২) 'বনস্পতি' নামক বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়—"বনস্পতয়ো বিমুচ্যদ্ধম্"। 'বনস্পতি' বল্‌তে গাছের গুঁড়িতে গর্ত ক'রে সেই গর্তের মুখ পশুর চর্মে আচ্ছাদন করা বুঝায়। তৈত্তিরীয়সংহিতায়ও (৬।১।২৫) 'বনস্পতি' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—"স বনস্পতিন্ প্রেবতি"। এ'ছাড়া তৈত্তিরীয়সংহিতায় দুন্দুভি, তূণব, বীণা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাক্ বা ধ্বনি বনস্পতি, দুন্দুভি, তূণব, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ভেতর দিয়ে প্রেরিত হয়—"বাগ্ বনস্পতিস্থ বদতি য দুন্দুভৌ য তূণবে য বীণায়াম্" (তৈত্তিরীয় সং ৬।১।২৫)। যজুর্বেদের কাঠকসংহিতায়ও (৩।৪।৫) বনস্পতির উল্লেখ আছে—"য বনস্পতিস্থ বাক্ তন্ * *"। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫।১।৫) ভূমিদুন্দুভি, কাণ্ডবীণা প্রভৃতির বর্ণনা আছে এবং যাজ্ঞিক পুরোহিতদের পুরনারীরা যে কাণ্ডবীণা নিয়ে বাজাতেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়—"রাজপুত্রেণ চর্ম ব্যধয়স্ত্য ঘ্নন্তি ভূমিদুন্দুভিন্ পত্ন্যশ্চ কাণ্ডবীণা"। পুরোনারীদের বাদ্যের সময় সামগরা আবার বিচিত্র সাম বা স্তোত্র গান কর্‌তেন—"সাম্না স্তবন্তে"। শুক্লযজুর বাজসনেয়ীসংহিতায় "নৃত্তায় সূতং গীতয় সৈলূশম্" শব্দগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সূত' গায়ক ও 'সৈলূশ' হোল অভিনেতা। সূত বা গায়ক নৃত্যের সঙ্গে ও সৈলূশ বা অভিনেতা গানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাক্‌তেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে সূতকে গানের সঙ্গে ও শৈলূশ বা অভিনেতাকে নৃত্তের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে—"গীতয় সূতং নৃত্তায় সৈলূশম্"।

বাজসনেয়ীসংহিতায় (৩০।১০।১৯) 'অদম্বর' নামে একটী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—"শব্দায় অদম্বর ঘাতম্"। বাজসনেয়ী ও তৈত্তিরীয়সংহিতার মতন অথর্ববেদেও (১২।৩।১৫) 'বনস্পতি' বাদ্যের উল্লেখ আছে—"বনস্পতিঃ সহ দেবৈর্ন আগম্"। অথর্ববেদের ৫ম কাণ্ড ২০শ সূক্ত ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকগুলিতে 'দুন্দুভি'র উল্লেখ আছে: (ক) "উচ্চৈর্ঘোষে দুন্দুভিঃ",

(খ) "দুন্দুভের্বাচং প্রযতাম্", (গ) "পূর্বে দুন্দুভে প্র-বদাসি"। আচার্য সায়ণ ৬ষ্ঠ কাণ্ডে, ১২৫ সূক্ত, ১৩শ অধ্যায়ে ১২ সূত্রের ভাষ্যে বৈতানসূত্র (৬।৪) থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন: "ভূমিদুন্দুভিম্ ঔক্ষেণাপিনহ্যম্"। এর আগে মহাব্রতযজ্ঞে ভূমিদুন্দুভির উল্লেখ ক'রেও তিনি বলেছেন: "তথা মহাব্রতে অনেন সূচেন ভূমিদুন্দুভিং তাড়য়েৎ। তদ্-উক্ত বৈতানে"। অবশ্য এ'সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থের বিষয়বস্তুতেও আলোচনা করেছি।

নৃত্যের উল্লেখও অথর্ববেদের ১০ম কাণ্ড, ৭ম সূক্ত, ৪ অধ্যায়ে ৪২-৪৩ শ্লোক দু'টীতে পাওয়া যায়: (ক) "তন্ত্রমেকে যুবতী বিরূপে অভ্যাক্রামং বয়তঃ * *"; (খ) "তয়োরহং পরিনৃত্যন্ত্যোরিব ন জানামি যতরা পরস্তাৎ। পুমানেনদ্ বয়ত্যুদ্গৃণত্তি পুমানেনদ্ অভারাধি নাকে"। অধ্যাপক হুইট্নি এই ৪২—৪৩ শ্লোক দুটীর অর্থ করেছেন: "A certain pair of maiden, of diverse form, weave * * (42). Of them; as of two women dancing about (*Vi-jna*) which is beyond, a man (*Puman*) weaves it * *"। এ'ছাড়া অথর্ববেদ ৫।২০।১৩, ৬।১২৬।৩, ১২।১।৪১, ৫।২০।৫, ৫।৩১।৭, ৬।৩৮।৪ শ্লোকগুলিতে 'দুন্দুভি'-বাদ্যের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের ৪র্থ কাণ্ড ৩৭ সূক্ত ৮ম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ঋগ্বেদের মতন 'কর্করি' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে: "যত্র বঃ প্রেঙ্খা হরিতা অর্জুনা উত, যত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি। তৎ পরে তাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতম্॥" আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে বলেছেন: "* * আহন্যমানা বাদ্যমানাঃ কর্কর্যঃ বাদ্যবিশেষাঃ সংবদন্তি যুষ্মন্নৃত্তানুগুণ্যেন সমানং ধ্বনন্তি তৎস্থানং পরেতেত্যাদি পূর্ববদ্ যোজ্যম্"। এ'ছাড়া অথর্বের ৪র্থ কাণ্ড ৬ষ্ঠ সূক্ত ২য় অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে 'বক্র' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—"যস্ত আস্তৎ পঞ্চাঙ্গুরির্বক্রাচ্চিদধিধন্বনঃ"। সায়ণ এর ভাষ্যে লিখেছেন: "ত্বে ত্বাং বক্রাৎ বক্রীভূতাদ্ (অধি) অধিজ্যাদ্ ধন্বনঃ আস্তাৎ ধনুর্যন্ত্রেণ পুরুষশরীরে প্রাক্ষিপৎ"। অনেকের মতে, এই 'বক্র' বাদ্যযন্ত্র নয়, পরন্তু 'ধনু', কিন্তু ধনুর্যন্ত্রেরও উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে এবং এই ধনুর্যন্ত্রই পরে 'বেহালা' বাদ্যযন্ত্রে রূপায়িত হয়েছে তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ধনু যেমন শত্রুনাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হোত ও ধনুর জ্যায়ে শর যোজনা ক'রে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা হোত, তেমনি ধনুর জ্যায়ে শব্দ সৃষ্টি ক'রে (টংকার দিয়ে) শত্রুদলের

মনে ত্রাসের সঞ্চারও করা হোত। এই জ্যা-শব্দই সংস্কৃত রূপ নিয়ে পরবর্তী সময়ে সাঙ্গীতিক স্বরের প্রকাশক হয়েছিল।

তৈত্তিরীয়সংহিতার অন্তর্গত আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের ৫।৮।২ সূত্রে বীণা ও তূণব তথা বেণু বা বংশ-বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে—"বীণাতূণবেনৈনমেতাং রাত্রিং জাগরয়ন্তি"। বীণা ও বেণুর (তূণব) বাদ্যের সঙ্গে ব্রতের উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণের নির্দেশ আছে। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রে (৫।১১।৬) "মন্ত্রণা-মন্তেন রথন্তরে গীয়মানে যজ্ঞাযজ্ঞীয়ে"—রথন্তরসামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য "সামানি গায়তি" (৫।১৬।৬); "রথন্তর সাম্না" (১০।২।৬); "প্রস্তোতঃ সাম গায়েতি" (১৩।২০।৩); "যত্র্যদ্‌গাতা পুরুষসাম ন গায়েদধ্বর্যুরৈবতেন সাম্নোদ্‌গায়েদ্ভূর্ভুবঃ স্ববরিত্যনুবাকেন" (২৫।১৯।১১) প্রভৃতি মন্ত্রে পুরুষ, রথন্তর, রৈবত প্রভৃতি 'সাম' তথা সামগানের উল্লেখ আছে।

আপস্তম্বধর্মসূত্রে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিশেষভাবে আলোচনা না থাকলেও ১।৩।১৯—২৫ সূত্রগুলিতে সামগানের যে নিন্দা করা হয়েছে তা নারদী-শিক্ষায় সঙ্গীতের পর্যায়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি। ধর্মসূত্রে সামাজিক বাঁধনের তীব্রতাই বেশী। তাই "সর্বেষাং চ শিল্পাজীবানাম্‌" (৮।৬।১৮।১৮) সূত্রে চিত্রশিল্পীদের ব্রাহ্মণজাতি থেকে একটু নিকৃষ্টরূপে গণ্য করা হয়েছে, কেননা উজ্জ্বলাব্যাখ্যায় পণ্ডিত হরদত্ত "সর্বেষামপি ব্রাহ্মণানামন্নমভোজ্যম্‌" কথাগুলিতে ঐ ভাবই প্রকাশ করেছেন। অবশ্য শিল্পের আভিজাত্যকে বজায় রেখে বর্ণ-বৈষম্যের নিদর্শন হিসাবে সূত্রটীকে গ্রহণ করা যায়। তারপর "স্তেনোঽভিশস্তো * * রাজন্যো বৈণো বৈশ্যঃ" (২।১।২।৬) সূত্রটীও সামাজিক দোষদর্শনের একটী নিদর্শন। "বৈণো বৈশ্যঃ" শব্দের উজ্জ্বলাব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—"বৈশ্যো বৈণো জায়তে; বেণুনর্তকো বৈণঃ"। বাদক ও নর্তক ধর্মসূত্রকারের দৃষ্টিতে একটু হেয় বোলেই প্রতিপন্ন হয়েছে, তবে এই দোষ-গুণ-বিচারের অন্তরালে ধর্মসূত্রকারের সময়ে সমাজে যে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রচলন ছিল সে'বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মনীষী কাত্যায়ন তাঁর শ্রৌত বা কল্পসূত্রে সামগান ছাড়া বিচিত্র রকমের বীণার ও বীণাবাদনের পরিচয় দিয়েছেন। কাত্যায়ন বলেছেন: "ঋচো যজূংষি সামানি নিগদা মন্ত্রাঃ" (১।৪৫)। আচার্য কর্ক তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ

করেছেন : সাম কাকে বলে—"প্রগীতং মন্ত্রবাক্যং সামেত্যুচ্যতে। * * অতঃ পূর্বপ্রতীতস্বাদগীতিরেব সামশব্দেনাভিলক্ষ্যতে"। মোটকথা ঋকমন্ত্রের ওপর স্বর-সন্নিবেশ ক'রে গান করার নাম 'সাম', অর্থাৎ গীতি বা গানই সাম। কাত্যায়ন পৌর্ণমাস, দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ, সোম, দ্বাদশাহ, বাজপেয়, রাজসূয়, সৌত্রামণী, অশ্বমেধ, পিতৃমেধ, একাহ, অহীন, সত্র প্রভৃতি যাগে সামগান বা গানের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : "রথন্তরং গায়েতি প্রেষ্যতি" (৩।২২৮), "গানমধ্বর্যোঃ" (৩।২২৯), "ব্রহ্মা বা বেদযোগাৎ" (৩।৩৩০), "যুক্তত্বাচ্চাধ্বর্যোঃ" (৩।৩৩১), 'বাণেন শততন্তুনা" (১৩।৩২), "সদঃ স্রুক্তিষু দুন্দুভীন্ বাদয়ন্তি" (১৩।৪৮), "গোধাবীণাকাঃ কাণ্ডবীণাশ্চ পত্ন্যো বাদয়ন্তি" (১৩।৫০), 'উপগায়ন্তি" (১৩।৫৮), "অন্ত্যাংশ্চ শব্দান্ কুর্বন্তি" (১৩।৫২), "সত্যসাম গায়তি" (১৭।৭২), "সাম প্রেষ্যতি" (১৯।১০৯), "ঐন্দ্র্যাং বৃহত্যাং গায়তি" (১৯।১১০), "বীণাগাথিভ্যাং পৃথক্ শতে দদাতি" (২০।৬৮), 'নৃত্তগীতবাদিত্রবচ্চ" (২১।৪২), "তমুদ্গাত্রে দদাতি" (২২।৫৯) প্রভৃতি সূত্রগুলি থেকে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তবে এদের মধ্যে "বাণেন শততন্তুনা" (১৩।৩২), 'গোধবীণাকাঃ কাণ্ডবীণাশ্চ" (১৩।৫০), "নৃত্তগীতবাদিত্রবচ্চ" (২১।৪২) সূত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"নারদীশিক্ষায় সঙ্গীত" পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বৈদিক শততন্ত্রীবীণার প্রচলন বৈদিকোত্তর যুগে লোপ পেলে অথবা মন্থর হোলে আচার্য কাত্যায়ন তার পুনপ্রবর্তন করেন আর সে'জন্যে শততন্ত্রীবীণা সামান্য আকার পরিবর্তন ক'রে কাত্যায়ন- বা 'কাত্যায়নীবীণা' নামে সমাজে প্রচলিত হয়। অবশ্য এ'ধরণের ঐতিহাসিক ঘটনা কতটুকু সত্য, ভবিষ্যৎ সঙ্গীত-অনুশীলনকারীরা তার নিরূপণ করবেন, তবে কাত্যায়নের শ্রৌত তথা কল্পসূত্রের মারফতে আমরা জানতে পারি যে, ঋগ্বেদে (১।৮৫।১০) 'বাণ' শব্দের ("ধমন্তোবাণং") উল্লেখ আছে এবং সায়ণ তার ভাষ্যে "বাণং শতসংখ্যাভিস্তন্ত্রীভির্যুক্তং বীণাবিশেষং" অর্থের প্রকাশ করেছেন। কাত্যায়নও তাঁর কল্পসূত্রে (১৩।৩৩) 'বীণা' অর্থে 'বাণ' শব্দের ব্যবহার করেছেন এবং সেই বীণা একশো'টী তন্ত্রী বা তারযুক্ত ছিল—"বাণেন শততন্তুনা"। ঐ শততন্ত্রী-বীণার তার (তন্ত্রী) মুঞ্জাঘাসে তৈরী হোত—"মৌঞ্জাস্তন্তবো" এবং একটি উচ্চ

আসনপীটে অথবা দোলায় উপবেশন ক'রে অধ্বর্যু বেতস বা বেতখণ্ড দিয়ে বীণার তারে আঘাত দিয়ে বাজাতেন—"বৈতসং বাদনম্। বণীষ্ পবিশন্তি প্রেঙ্খে হোতা ফলকেঽধ্বর্যুঃ প্রতিগৃণাতি" (১৩।৩৩ –৩৪)। আচার্য কর্ক তাঁর ভাষ্যে 'বাণ' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : 'বাণো মহতি বীণা, শতং তন্তবো যস্যাসৌ শততন্তুঃ, তেনোপাকরণম্। অস্মিন্ বাণে মৌঞ্জাস্তন্তবো বেতসবৃক্ষসম্বন্ধি বাদনমিত্যর্থঃ"। যাত্র বা যজ্ঞে দুন্দুভি বাজানো হোত, কোন একটী পুরুষ সেই দুন্দুভি বাজাতেন ("যে কেচন পুরুষাঃ সন্তি তে দুন্দুভীন্ বাদয়ন্তীত্যর্থঃ")। 'গোধাবীণা' গোধা বা গোসাপের চামড়ায় আচ্ছাদিত হোত। 'কাণ্ডবীণা'-র কাণ্ডটী শরে নির্মিত হোত এবং অধ্বর্যুদের পত্নীরা গোধা ও কাণ্ডবীণা-দুটী সত্রে বা যজ্ঞে বাজাতেন, আর অধ্বর্যুদের অনেকে ঐ বীণাশব্দের সঙ্গে গান করতেন। শুধু তাই নয়, কোন কোন পুরোহিত মূর্ছনাদি ব্যবহার ক'রে গান তথা সামগান করতেন—"গোধাবীণাকাঃ কাণ্ডবীণাশ্চ পত্ন্যো বাদয়ন্তি (১০।৫০)। উপগায়ন্তি (১৩।৫১)। অন্যাংশ্চ শব্দান্ কুর্বন্তি" (১৩।৫২)। আচার্য কর্ক এদের উল্লেখ ক'রে তাঁর ভাষ্যে লিখেছেন: "গোধাচর্মণা নদ্ধা বীণা গোধাবীণাকাঃ, কাণ্ডঃ শর ইতুচ্যতে, তন্ময্যো বীণাঃ, তা উভয়বিধা-বীণাঃ সর্বাঃ পত্ন্যো বাদয়ন্তি, স্তুভিঃ সত্ত্বিণস্তা উপয়াগয়ন্তীত্যর্থঃ"। কাত্যায়নের "অন্যাংশ্চ শব্দান্ কুর্বন্তি" (১৩।৫২) সূত্রটীর টীকায় পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্য সকলে মর্দল, ভেরী, পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ করেছিলেন—'মর্দলভেরীপটহাদি-জন্যানন্যানপি শব্দান্ লোকাঃ কুর্বন্তীতি ভাবঃ"।

পুনরায় পিতৃমেধযজ্ঞের প্রসঙ্গে মহর্ষি কাত্যায়নবীণা এবং নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ করেছেন: (ক) "কৃষ্ণাহতপক্ষেণ পরিতত্যায়সেষু বাদ্যমানেষু বীণায়াং বৌদ্ধতায়ামমত্যো * * " (২১।৩৮); (খ) "নৃত্যগীতবাদিত্রাবচ্ছ" (২১।৪২)।

বৈদিক যুগে সামগরা যে বেশীরভাগ সময় ঋক্‌মন্ত্র গান করতেন বিভিন্ন সত্র বা যজ্ঞকে অবলম্বন ক'রে, মহর্ষি আপস্তম্ব 'যজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্' গ্রন্থে ও কাত্যায়ন তাঁর শ্রৌত বা কল্পসূত্রে তার উল্লেখ করেছেন। যজ্ঞপরিভাষাসূত্রে মহর্ষি আপস্তম্ব বলেছেন : যজ্ঞ দু'রকম—শ্রৌত ও গৃহ্য। শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র গ্রন্থদু'টির নামানুসারে যজ্ঞ দু'টীর নাম 'শ্রৌত' ও 'গৃহ্য' হয়েছে। শ্রৌতযজ্ঞ আবার 'সোমসংস্থা' ও 'হবিঃসংস্থা' ভেদে দু'রকম ছিল। গৃহ্যসূত্রকে 'হবিসংস্থা'ও বলা

হোত। আশ্বলায়নীয় ও কাত্যায়নীয় শ্রৌতসূত্রে (৬।১১, ১৯।২৭, ১২।৩।১৯০) সাত রকম 'সোমসংস্থা'-যজ্ঞের বর্ণনা আছে। এ'ছাড়া অথর্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণের পূর্বভাগে (৫ম প্র° ২৩ খ°) এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং মোট ২১ রকম যজ্ঞের নাম যজ্ঞপরিভাষাসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে তিনটী ভাগে সাতটী সাতটী ক'রে সত্রগুলিকে বিভক্ত ক'রে। তাদের প্রত্যেকটীতেই প্রায় সামগান করা হোত। যজ্ঞপরিভাষাসূত্রকার এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

সপ্ত সোমসংস্থা যজ্ঞ		সপ্ত হবিঃসংস্থা যজ্ঞ	সপ্ত পাকসংস্থা যজ্ঞ
১ম	অগ্নিষ্টোম	অগ্ন্যাধেয়	সায়ংহোম
২য়	অত্যগ্নিষ্টোম	অগ্নিহোত্র	প্রাতর্হোম
৩য়	উক্থ্য	দর্শ	স্থালীপাক
৪র্থ	ষোড়শী	পৌর্ণমাস	নবযজ্ঞ
৫ম	বাজপেয়	আগ্রয়ণ	বৈশ্বদেব
৬ষ্ঠ	অতিরাত্র	চাতুর্মাস্য	পিতৃযজ্ঞ
৭ম	আপ্তোর্যাম	পশুবন্ধ	অষ্টকা

লাট্যায়নসূত্রে (৫।৪।১০) দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ-দুটীকে একটীমাত্র যাগ হিসাবে এবং সৌত্রামণিযাগকে হবিঃসংস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সোমসংস্থাকে সোমযজ্ঞ বা সোমযাগ, ক্রতু, জ্যোতিষ্টোম এবং সুত্যাও বলে। হবিঃসংস্থাকে 'হবির্যজ্ঞ' নাম দেওয়া হয়। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সপ্ত সোমসংস্থা 'সোম'; অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র ও সায়ংহোমাদিকে 'হৌত্র' এবং দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতিকে 'ইষ্টি'-যাগও বলে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে সোমযাগগুলিকে একাহ, অহীন, সত্র প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়। 'একাহ' যাগগুলি সোমযজ্ঞ; তাদের একদিনে সম্পন্ন করা হোত, আর কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত হোত 'অহীন'-যাগ, এবং দীর্ঘকাল ধরে যে সব যাগের অনুষ্ঠান করা হোত তাদের নাম ছিল 'সত্র'। বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস ও সাকমেধ যাগ-তিনটীকে চাতুর্মাস্যযাগের অন্তর্ভুক্ত করা হোত। এ'ছাড়া আয়ুষ্কামেষ্টি, পুত্রেষ্টি, পবিত্রেষ্টি,

বর্ষকানেষ্টি, প্রাচ্যাপত্যেষ্টি, বৈশ্বানরেষ্টি, নবশস্যেষ্টি, ঋকেষ্টি, গোষ্পতীষ্টি প্রভৃতি ইষ্টিযাগও ছিল। যজ্ঞপরিভাষাসূত্রে সাম বা সামগান কোন যজ্ঞে গান করার বিধি ছিল তার বিস্তৃতভাবে পরিচয় আছে। তাছাড়া কোন্ কোন্ যাগে মন্ত্রগুলি মন্দ্র, মধ্য ও তার (উচ্চ) স্বরে গীত হবে তার বিবরণও দেওয়া আছে; যেমন—"অগ্নুরা সামিধেনীষমুচ্যম্" (১১ সূ°); "মন্দ্রেন প্রাগাজ্যভাগাভ্যাম্" (১২ সূ°) "প্রাতসবনে চ" (১৩ সূ°); অর্থাৎ প্রাতঃসবনযজ্ঞে মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ মন্দ্র তথা খাদস্বরে গান করা হোত। তেমনি মাধ্যদিনে মধ্যমস্বরে (১৫ সূ°) এবং স্বিষ্টকৃদ্‌যাগের পর মন্ত্রগুলি ক্রুষ্টস্বরে গান করা হোত—"ক্রুষ্টেন শেষে" (১৬ সূ°) প্রভৃতি। অবশ্য এই যাগগুলি ব্রাহ্মণোত্তর যুগের অন্তর্গত, কাজেই সামগানের সুপরিস্ফুট রূপ যজ্ঞপরিভাষসূত্রে দেওয়া না থাক্‌লেও তখন যাগকর্মে যে সাত স্বরযুক্ত গানেরই প্রচলন ছিল একথা বুঝা যায়। তবে শাখাভেদে মন্ত্রোচ্চারণ ও গানভেদ অবশ্যই ছিল, কেননা প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাকারেরা তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সামবেদের 'দৈবতব্রাহ্মণ' বা ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণেও গান বা সামগানের উল্লেখ আছে। গায়ত্রীসাম ও রথন্তরসামগুলি দৈবতব্রাহ্মণের প্রিয়। সামের গায়কদের বলা হোত 'উদ্গাতা', কেননা উদ্‌গানই ছিল তখন সাম-সঙ্গীতের রূপ। তবে উদ্‌গান আবার সামগানের নামান্তর, এজন্যে উদ্গাতাদের সামগও বলা হোত—"তস্মাৎ সামগেভ্যঃ সাম গায়ন্তীতি সামগাঃ" (ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণের সায়ণভাষ্য, ২।৫।৩।২)। তখন স্তুতিগান ছিল যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে গণ্য, যেমন যূপের ও পশু প্রভৃতির স্তুতিগান করা হোত।

সামবেদের 'বংশব্রাহ্মণ'-খানিতে ব্রাহ্মণগুলির গ্রন্থকার ও তাদের বংশের পরিচয় আছে। বংশব্রাহ্মণকে 'অমুব্রাহ্মণ' বা 'অষ্টমব্রাহ্মণ'-ও বলা হয়। তাতে পূর্বাচার্য গর্গগোত্রীয় শর্বদত্ত থেকে পূর্বপূর্ব আচার্যদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। বংশব্রাহ্মণকার শর্বদত্ত থেকে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা পর্যন্ত ৬১ জন গ্রন্থকার ও ৬১টী বংশের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন।[১] এ'ছাড়া তাতে আরো ১৩ জন সামগাচার্যের পরিচয় আছে। সেই পরিচয়েই সামপ্রাতিশাখ্যকার পুষ্পর্ষি বা ঔদব্রজি পুষ্পযশার

১। সামগাচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী-সম্পাদিত 'বংশব্রাহ্মণম্' (কলিকাতা ১৮৯২) অনুবাদ, পৃ° ১-৬।

নাম পাওয়া যায়। বংশব্রাহ্মণকার উল্লেখ করেছেন: "পুষ্পযশসঃ ঔদব্রজেঃ পুষ্পযশা ঔদব্রজিঃ সঙ্কথাদ্ গৌতমাৎ সঙ্করো গৌতমোঽর্যমরাধাচ্চ গৌতমাৎ পুষ্পমিত্রাচ্চ গোভিলাৎ পুষ্পমিত্রোগোভিলোঽশ্বমিত্রাদ্ * *"। সামগাচার্যদের নাম ও বংশাবলী ছাড়া বংশব্রাহ্মণ বা অনুব্রাহ্মণে আর কোন বিষয়ের আলোচনা নাই।

সামবেদীয় 'আর্ষেয়ব্রাহ্মণ' ও অথর্ববেদীয় 'গোপথব্রাহ্মণ' প্রভৃতিতেও যাগযজ্ঞের বর্ণনা আছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন যাগগুলিতে সামগানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আর্ষেয়ব্রাহ্মণকে অনুব্রাহ্মণ এবং চতুর্থব্রাহ্মণও বলে। আর্ষেয়-ব্রাহ্মণে সামগান কি-কি স্বরসংযোগে গান করা হোত তার বিধি নির্দেশ আছে, যেমন—"হাবিতি মন্দ্রস্বরাদিকম্" (ভাষ্য ১।৫), "উত্যেতি ক্রুষ্টদ্বিতীয়াদিকম্" (ভাষ্য ১।৫), "হাউ মন্দ্রাদিকম্" বা "আ নো অগ্নে ইতি তৃতীয়চতুর্থাদিকম্" (ভাষ্য ১।৫) প্রভৃতি। আর্ষেয়ব্রাহ্মণের প্রথম প্রাপাঠক ৬ষ্ঠ খণ্ডে আছে: "অগ্নেরাগ্নেয়ে দ্বে গোতমস্য মনাজ্যে দ্বে দৈবরাজঙ্ক গাথিনশ্চ কৌশিকস্য সাম বার্হদুক্থে দ্বে পৌরুমীঢঙ্ক * * "। গাথাগানগুলি বিভিন্ন স্বরযোগে গান করা হোত। ঋষিদের নামানুসারে গাথাগুলির আবার নামকরণ করা হোত—"মন্দ্রাতিমন্দ্র-মন্দ্রাদিকং কৌশিকস্য কুশিকপুত্রস্য গাথিন এতন্নামকস্য ঋচেঃ স্বভূতং সাম" (ভাষ্য ১।৬)। বিভিন্ন ব্রতে ও যজ্ঞে বিভিন্ন রকমের গান বা সামগান গাওয়ার রীতি ছিল—"দ্বে পুরুষব্রতে পঞ্চানুগানং চৈকানুগানং চ ত্রীণি লোকানাং ব্রতানি * * ঋষ্যস্য সাম ব্রতং বা" (৩।২৫)। দু'টী পুরুষব্রতে পাঁচটী বা একটী 'অনুগান' গাওয়া হোত। ভিন্ন-ভিন্ন ঋক্ নিয়ে এক একটী সাম সৃষ্টি হোত, যেমন—'সহস্রশীর্ষা পুরুষ", এই ছ'টী ঋকের সমবায়ে একটী 'সাম' উৎপন্ন হয়। এইভাবে ব্রাহ্মণের যুগে দিশাব্রত, কাশ্যপব্রত, গবাব্রত, অগ্নেব্রত, মহাবৈশ্বানরব্রত, আদিত্যব্রত প্রভৃতিতে বিভিন্ন অনুগানের প্রচলন ছিল।

মোটকথা ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগে যেভাবে গান বা সামগানের প্রচলন ছিল, আরণ্যক ও উপনিষদ্-যুগে তার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল এবং প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে বিভিন্ন রকমের সামগান সমাজে প্রচলিত হয়েছিল। বিশেষ ক'রে নারদীশিক্ষার যুগে সঙ্গীতের মান যথেষ্টভাবে উন্নত হয়েছিল এবং তখন বৈদিক ও

লৌকিক এই দু'রকম গানেরই সমাজে প্রচলন ছিল। অবশ্য "নারদীশিক্ষায় সঙ্গীত" অধ্যায়ে এ'সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে 'নারদীশিক্ষায় সঙ্গীত' আলোচনায় আর একটী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলমান-রাজত্বের আমলে পারস্য-সঙ্গীতের প্রভাব ভারতীয় হিন্দু তথা আর্য-সঙ্গীতের ওপর পড়ায় প্রসঙ্গে আমরা 'ইমন'-রাগটীকে পারস্যের অবদান হিসাবে গণ্য করলেও একথা উল্লেখ করেছি যে, পারস্যের সঙ্গীতপদ্ধতির মোকাম, শোভা ও গুম্বা কোনটীর মধ্যেই 'ইমন'-রাগটীর নাম পাওয়া যায় না (পৃ° ২৫৮-২৫৯ দ্র°)। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *Ragas and Raginis* (1948) গ্রন্থে (পৃ° ৩৯-৪০) ফিরদোস্ত, বখরার্ সর্ফর্দা প্রভৃতির মতন ইমনকেও কবি ও সঙ্গীতশাস্ত্রী আমীর খস্রু-আবিষ্কৃত পারসীক রাগ বা রাগিণী বোলে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এর প্রমাণ দিয়েছেন 'শিব্‌লি' (*Shibli*) লিখিত 'শির্-উ'ল'-অজম্' (*Shir-u'l-'Ajam*) নামক আমীর খস্রুর জীবনী থেকে। তিনি পারসিক রাগগুলির সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

"*Majir*	Ghar and one Persian rag.
Sazagari	Puravi, Gora, Kangli and one Persian rag.
Iman	Hindol and Nairez.
Usha-Shaq	Sarag, and Basant and Nawa.
Muwafiq	Tori, and Malvi, and Dogah and Hosaini.
Ghanam	A slight modification of Purvi.
Zilf	Shahnaz mixed with Khat rag.
Farghana	Farghana mixed with Kangli and Gora.
Sarparda	Sarang, Patawal and Rast compounded together.

Bakharar	...	One Persian rag mixed with Deskar.
Phirdost	...	Kanrha, Gaudi, Purvi, and one Persian rag.
Manam	...	One Persian rag added to Kalyan".

'রাগদর্পণ' গ্রন্থেও নাকি এ'গুলির উল্লেখ আছে। অবশ্য খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর পরবর্তী বাঙ্গালী সঙ্গীতগুণী পণ্ডিত লোচন-কবির 'রাগতরঙ্গিণী'-তে 'ইমন' প্রধান রাগ হিসাবে স্থান পেয়েছে। 'রাগদর্পণ'-টা সুতরাং আধুনিক সঙ্গীতগ্রন্থ। আমরা 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র পরবর্তী খণ্ডে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

'পাণিনীয়শিক্ষায় সঙ্গীত' পর্যায়ে (পৃ° ১৭০-১৮৯) সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার সময় ১৭৯ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ভাস্কর্য ও মন্দিরশিল্পের উল্লেখ করেছি এবং মাননীয় পার্সি ব্রাউনের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ ক'রে কোণারক সূর্য-মন্দিরের সময় নির্দিষ্ট করেছি—"প্রায় খৃষ্টীয় ১২৫০ শতাব্দীতে"। প্রকৃতপক্ষে কোণারকের নির্মাণকালের সঠিক নির্দ্ধারণ করা কঠিন, কেননা এ'সম্বন্ধে প্রামাণিক ঐতিহাসিক নজির পাওয়া যায় না বোল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কোণারকের মন্দির সম্বন্ধে মোটামুটি প্রমাণযোগ্য তিনটী নজির পাওয়া যায় এবং সেগুলি হোল: (১) পুরীর মন্দিরের রোজনাম্‌চা 'মাদলা-পঞ্জী' (পঞ্জী > পঞ্জিকা > পাঁজি; অনেকে তাই 'মাদলা-পাঁজি'-ও বলেন); (২) গঙ্গারাজাদের 'তাম্রলিপি' ও (৩) 'আইন-ই-আকবরী'। মাদলা-পঞ্জীতে আছে,

সপুচ্ছ-নরসিংহেন শ্বেশ্বরেণাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে শতে॥

শ্রদ্ধেয় মনোমোহন গাঙ্গুলি এই শ্লোকটীর অনুবাদ করেছেন: "The temple for the 'ray-garlanded god' was built at the instance of the tailed King Narasingha in the year 1200 Saka, *i.e.* in the year 1273 A. D." (*—Orissa and Her Remains, Ancient and Mediaeval*, 1912, p. 479)। জেমস্ ফার্গুসন 'আইন-ই-আকবরী'-তে লিখিত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের অনুমানকে মেনে নিয়ে কোণারক-মন্দিরের নির্মাণ-

কালকে মোটামুটি খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী বলেছেন—"the latter half of the 9th century"। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'-তে কোণারক সম্বন্ধে লিখেছেন: "It is said that somewhat over 730 years ago, Raja Narasing Deo completed the stupendous fabric and left this mighty memorial to posterity" (*—Ain-I-Akbari*, translated by Colonel H. S. Jarrett, Vol. II, p. 128)। আবার ফার্গুসন মাদলা-পঞ্জীর বিবরণে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বলেছেন, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে কোণারক-মন্দির নির্মিত হওয়া সম্ভব নয়—"it seems impossible—after the erection of so degraded a specimen of the art as the temple of Puri (A. D. 1174) * *. In all this uncertainty we have really nothing to guide us but the architecture, and its testimony is so distinct that it does not appear to me doubtful that this temple really belongs to the latter half of the 9th century" (*—History of Indian and Eastern Architecture*, 1876, p. 426)। মাননীয় বিষণ-স্বরূপ তাঁর 'কোণারক' গ্রন্থে আবুল ফজল ও ফার্গুসনের অভিমতকে সমর্থন ক'রে মাদলা-পঞ্জীর সিদ্ধান্তকে দোষযুক্ত ("utterly incorrect") বলেছেন (*—Konarak*, 1919, p. 71)।

কিন্তু শ্রদ্ধেয় মনোমোহন গাঙ্গুলি উল্লেখ করেছেন, যদিও মাদলা-পঞ্জীর কতকগুলি ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নাও হোতে পারে কিংবা ঐ ঘটনা অনৈতিহাসিক, তবুও তা কোণারকের নির্মাণকাল-নির্ণয়ের ব্যাপারে আমাদের অনেক সাহায্য করে—"The Madla-Panji has very little historical value, it also contains contradictory statements in many cases, but one of such statements would serve our purpose of fixing the cronology"। তাঁর অভিমত হোল: গঙ্গারাজাদের তাম্রলিপিতে উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে পুরী-মন্দিরের রোজনামচা মাদলা-পঞ্জীর সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য আছে, কাজেই কোণারকের সূর্য-মন্দির রাজা নরসিংহ দেবের ১৮শ বর্ষের রাজত্বের সময়ে নির্মিত হয়েছিল একথা ধরা যেতে পারে—

"whereform we learn that the temple of Konaraka was built in the 18tn year of the regin of Narasingha Deva." অর্থাৎ রাজা নরসিংহ্ দেব ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও তাঁর রাজত্বের ১৮শ বর্ষে বা খৃষ্টীয় ১২৭৬ শতাব্দে কোণারকের মন্দির নির্মিত হয় ("Thus we see that Narasingha Deva ascended the throne in 1258 A. D. and hence the temple was constructed in 1276 A D., thus very year nearly coincides with the date of the Madla-Panji, i. e. 1278 A. D." (—*Orissa and Her Remains, Ancient and Mediaeval,* 1912, p. 480)। অধ্যাপক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের অভিমতও তাই, তিনিও কোণারকের মন্দিরকে খৃষ্টীয় ১২৪০—১২৮০ শতাব্দে নির্মিত বলেছেন। মাননীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *History of Orissa* (Vols I & II) গ্রন্থেও এই মত মোটামুটিভাবে সমর্থন করেছেন।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু তাঁর 'কোণারকের বিবরণ' (সন ১৩৩৩ সাল) গ্রন্থে (পৃ° ৪) লিখেছেন: "আমরা কোণারকের বর্তমান মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তৈরী হইয়াছে জানিয়াই খুসী হইব"। সুতরাং নানান্ দিক থেকে আমাদের অভিমত যে, যদিও কোণারকের মন্দিরে মুসলমান প্রভাবিত স্থাপত্যের কোন চিহ্ন নাই, বরং বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থান-পতনের স্মৃতিই তাতে জড়িত, তথাপি মন্দিরটীর নির্মাণের কাজ খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর কোন এক সময়ে শুরু হয়েছিল একথাই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন। শিল্পনৈপুণ্যে ও স্থাপত্য-সৌন্দর্যে কোণারকের মন্দির আসলে হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী প্রকাশ করেছে। মন্দিরগাত্রে রুচি-বিগর্হিত মূর্তিগুলি দর্শকের অন্তর্দৃষ্টির উদ্বোধক। শিল্পজ্ঞানী পার্সি ব্রাউন সাধারণ দৃষ্টিতে রুচিদুষ্ট মূর্তিগুলিকে তন্ত্রবাদের প্রভাবে উৎপন্ন বলেছেন: "These indicate the emergence of a particular phase of Hinduism known as Tantrism, * * " (—*Indian Architecture*; 2nd ed., p. 131)। তাঁর অনুমান একেবারে অসমীচীন নয়।

কোণারকের স্থাপত্যে সঙ্গীতের উপাদানও প্রচুর পরিমাণে আছে।

পূর্বাভাস

পুরুষ ও স্ত্রী মূর্তিদের বিচিত্র নৃত্যের ভঙ্গী, নৃত্যশীল শিব ও চতুর্মুখ ভৈরব, টিকটিকি-চিহ্নিত নটীরা অন্যান্য নারীদের মতন রাণীর দাসী হোয়ে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাথে নৃত্য-গীতে ভরপুর। কোণারককে সূর্যের গীতিচঞ্চল রথ-রূপে কল্পনা ক'রে যে সুবৃহৎ কারুকার্যখচিত চক্রগুলিকে নির্মিত করা হয়েছিল তাদেরও অক্ষাগ্র, অর ও নেমিতে অসংখ্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যরতা নারী ও নটীদের প্রতিমূর্তি খোদাই করা আছে। দিগন্ত-বিস্তৃত সুবিশাল সমুদ্রকে সাম্‌নে রেখে কালের অসংখ্য ঝঞ্ঝাঘাত সহ্য ক'রছে এখনো ঐতিহ্যবাহী পাষাণমন্দির কোণারক! ভগ্নপ্রায় ও ইতস্তত:-বিক্ষিপ্ত তার কলেবর হোলেও শিল্প-সুষমার জগতে তার তুলনা নাই! 'নারদীশিক্ষায় সঙ্গীত' পর্যায়ে আমরা তার সঙ্গীতের উপাদান-সম্বন্ধেও সামান্যভাবে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

পঞ্চমরাগের রাগিণী গুর্জরী

(বন্দি চিত্রশিল্প, খৃঃ ১৭শ শতাব্দী)

[শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে]

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীযদুনাথ সরকার বলেছেন,

"It is the duty of the historian not to let that past be forgotten. He must trace these gifts back to their sources, give them their due place in the time-scheme, and show how they influenced or prepared the succeeding ages, and what portion of present day Indian life and thought is the distinctive contribution of each race or creed that has lived in this land."১

ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গীই তাই যে, অতীতের সকল-কিছু ভাল-মন্দ ঘটনাকে বর্তমানের দর্পণে প্রতিফলিত করা। ভারতীয় সঙ্গীতেরও আলোচনা হওয়া উচিত পরিপূর্ণভাবে নির্জলা ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিহাসের সম্মান থাক্‌বে অটুট সঙ্গীতের আলোচনায়, তবেই মনে হয়, সঙ্গীত-প্রসঙ্গের অবতারণা হবে সফল ও সম্পূর্ণ।

সিন্ধু-সভ্যতা

সঙ্গীতের সৃষ্টি কখন্ থেকে হোল এর সঠিক নিরূপণ হবে ভারতীয় সভ্যতার সত্যিকারের বয়স নির্ধারিত হবে যেদিন থেকে নিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের দ্বারা। বৈদিক তথা ঋগ্বৈদিক সংস্কৃতির আরম্ভ থেকেই ভারতীয় সভ্যতার হবে বয়স ও প্রাচীনতার নির্ণয়। ঠিক এই ধরণের প্রশ্নের অবতারণা করেছেন ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ আর্য-সমস্যার (*The Aryan Problem*) সমাধান করার প্রসঙ্গে;

"But why consider the Mohenjo-daro civilization to be the oldest traceable civilization of India? What is there to prove that the Aryan culture of Rigvedic India was not older than the culture represented by

১। Cf. *India Through Ages* (1951), p. 2.

the ruins of Mohenjo-daro? Thus arises the great question of the age of the *Rigveda*, * *." ২

ঋগ্বেদ-রচনার অথবা সংকলনের সূচনা থেকেই নিরূপিত হবে ভারতীয় ইতিহাসের বয়স, যদিও সঠিক তারিখ ও প্রমাণপঞ্জীর নজিরে ভারতীয় ইতিহাসের কাঠামো সৃষ্টি হয়েছে গৌতম বুদ্ধের জন্ম-তারিখ থেকে। রচনার ভাষা ও ছন্দের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ঋগ্বেদের বয়স নির্ণয় করেন অনেকে খৃষ্টপূর্ব একহাজার বছর।[৩] আবার যাঁরা সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যে ওতঃপ্রোত দেখেছেন বৈদিক তথা ঋগ্বৈদিক সভ্যতার উপাদান, তাঁরা ঋগ্বেদের বয়স নির্ধারণ করেন খৃষ্টপূর্ব ছ'হাজার বছরেরও বেশী। অবশ্য ঋগ্বেদ-সংকলনের অথবা ঋগ্বৈদিক সভ্যতারও সত্যিকারের বয়স নিরূপিত হবে তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার জন্মভূমি মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতির বয়স নির্ণিত হোলে।

স্যর জন মার্শাল ও তাঁর মতানুবর্তীদের অনেকে সিন্ধু-সভ্যতার বয়স নির্ণয় করেছেন খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ। আবার কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক সিন্ধু-নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটী উপাদানের (relics) প্রমাণ থেকে সিন্ধু-সভ্যতার কাল নির্ণয় করেন খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর। মাননীয় গ্যাড (Mr. Gadd) ও অধ্যাপক ল্যাঙ্‌ডন (Prof. Langdon) মহেঞ্জোদড়ো থেকে প্রাপ্ত দুটী শীলমোহরের (seals) সঙ্গে উর (Ur) ও কিশে (Kish) প্রাপ্ত শীলমোহরের সাদৃশ্য থেকে অনুমান করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতার বয়স খৃষ্টপূর্ব ২৮০০ বছরেরও আগেকার—"Indus civilization must go back to an age before 2800 B. C."। অধ্যাপক ল্যাঙ্‌ডন আরো বলেন—প্রাচীন ব্রাহ্মী-অক্ষর সিন্ধু-উপত্যকা থেকেই প্রথম পাওয়া গেছে এবং তা'থেকে

২। *The History and Culture of the Indian People.* The Vedic Age, Vol. I (General editor Dr. R. C. Majumdar), 1951. p. 203.

৩। ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে *History and Culture of the Indian People*, Vol. 1 (Published by George Allen & Unwin Ltd, 1951), গ্রন্থের মুখবন্ধে (*Preface*) মন্তব্য করেছেন: "The view that dates the *Rik-Samhita, in its present form,* to about 1000 B. C. cannot therefore be regarded as absolutely wide of the mark and altogether without any basis of support in Indian tradition. But it must be remembered that although the *Rik-Samhita* might have received to final shape in about 1000 B. C., some of its contents are much older, and go back certainly to 1500 B. C. and not improbably even to a much earlier date" (p. 28).

অনুমান করা যেতে পারে যে, খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছরের অনেক আগেই ভারতবর্ষে ইন্দো-এরিয়ান লোকদের বসবাস হয়েছিল, কেননা ঠিক ঐ সময়ে ইন্দো-এরিয়ানরা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রবেশ ক'রে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অধ্যাপক ল্যাঙ্‌ডন ইন্দো-এরিয়ান অথবা আর্যেরা যে বাইরে থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে একথা বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপরই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের প্রাসাদ রচনা করেছেন। তাছাড়া সিন্ধু-উপত্যকা থেকে ব্রাহ্মী-অক্ষরের প্রথম আবিষ্কার হয় এই অনুমান সত্য হোলে একথাও আবার মনে করতে হয় যে, ইন্দো-এরিয়ানদের সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতার অধিবাসীদের আগে থেকেই বেশ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা স্যার জন মার্শালের মতের একান্ত অনুবর্তী হোয়ে অধ্যাপক ল্যাঙ্‌ডনের সিদ্ধান্তকে অসমীচীন বলেছেন। ডাঃ লাহা উল্লেখ করেছেন,

"Hence the fact of the derivation of the Brahmi script from the Indus pictographs cannot be made to support the inference that the Indo-Aryans were established in India long before 1500 B. C. making it possible for them to have a contact with the authors of the Indus civilization."[8]

স্যার জন মার্শালের অভিমত অধ্যাপক ল্যাঙ্‌ডনের অনুরূপ না হোলেও তিনি স্বীকার করেন যে, মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রাগ্‌বৈদিক, এবং বৈদিক বা ঋগ্বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার পরে, ইন্দো-এরিয়ান লোকেরাই সৃষ্টি করেছিল মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রায়বাহাদুর দয়ারাম শাহানি, ডাঃ আর্নেষ্ট ম্যাকে, ফাদার হেরাস, রায়বাহাদুর দীক্ষিত, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রভৃতির অভিমতেও প্রাগৈতিহাসিক ইন্দো-এরিয়ানরা ছিল 'পনি' বা বণিক, তারাই গড়েছিল সিন্ধু-উপত্যকার সম্পদ ও সভ্যতা, আর বৈদিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হোল মহেঞ্জোদড়োর পরে, তবে প্রাগ্বৈদিক ও বৈদিকের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল একটী যোগসূত্রের অবিচ্ছিন্ন ধারা। ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপ এ-সকল মতের বিরুদ্ধে করেছিলেন জেহাদ ঘোষণা

৪। Cf. *Indian Historical Quaterly*, Vol. VIII, March 1932, No 1,-তে প্রকাশিত *Mohenjo-daro and the Indus Valley Civilization* প্রবন্ধ, pp. 151—152.

ও তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ঋগ্বৈদিক আর্যেরাই মহেঞ্জোদড়োর তথা সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার ছিলেন অধিবাসী, আর্যেরা ভারতের বাইরে থেকে কোনদিনই এসে বসতি স্থাপন করেন নি ভারতবর্ষে, তাঁরাই সৃষ্টি করেছিলেন সিন্ধু-সভ্যতার সুবিশাল প্রাসাদ।[৫] স্বামী শংকরানন্দের অভিমতও তাই; তিনি উল্লেখ করেছেন—"the Indus civilization was post-Vedic in origin. The civilization being Vedic in origin, the presence of the Vedic people in the Indus Valley is definitely established".[৬] ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তও প্রকারান্তরে সিন্ধু-উপত্যকায় বৈদিক সভ্যতার কথা স্বীকার ক'রে বলেছেন: "Indo-Aryans were not strangers in Indus Valley and the people of that ancient city and the Vedic Aryans belonged to the same ethnic-cultural group."[৭] রায়বাহাদুর দীক্ষিত বৈদিক আর্যদের সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা-হিসাবে খোলাখুলিভাবে স্বীকার না করলেও তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োতে যে বৈদিক লোকেদের অন্তর্নিবেশ হয়েছিল একথা স্বীকার করেছেন—"the survival of copper as the proper material for sacrificial vessels in the Vedic civilization, which idea persists to the present day, is an indication of the fact that the Vedic people arrived in the Valley in the same stage as the Indus civilization".[৮] ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ধারার অনুবর্তন ক'রে বলেছেন, অনার্যেরাই সিন্ধু-সভ্যতার স্রষ্টা, আর এদেরই বলা যায় ঋগ্বৈদিক যুগের

৫। Vide *Indian Culture*, Vol. IV, Octo. 1937, No. 2,-তে প্রকাশিত ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপের প্রবন্ধ *The Rigveda and Mohenjo-daro*, p. 153.

৬। Cf *Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus*, Vol. I. (1946), p. 146.

৭। *Man in India*, Vol. XVII, Nos. 1 & 2, March and June, 1931, p. 27-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ *Vedic Funeral Customs and Indus Valley Culture.*

৮। Cf. (ক) স্বামী শংকরানন্দ-রচিত *Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus*, Vol. I.-এ ডাঃ দত্তের লিখিত 'ভূমিকা' (*Preface*), পৃ: ২৯; (খ) রায় বাহাদুর দীক্ষিত: *Pre-historic Civilization of the Indus Valley* (1939), p.p. 20-21.

অনার্য[৯] এবং এ-দিক থেকে তিনি প্রকারান্তরে সিন্ধু-সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতাই বলেছেন, যদিও "citizens of Mohenjo-daro were thus already not a homogeneons but a mixed population". ডাঃ পুশলকর দোলায়িত মন নিয়ে ('utmost that we can say') তাঁর *The Indus Valley Civilization* আলোচনায় সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতাকে বৈদিক বোলে স্বীকার করেছেন, যদিও বৈদিক সিন্ধু-সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টারা ছিলেন আর্য ও অনার্য উভয়েই।[১০] তাই তিনি স্যার জন মার্শালের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন ক'রে বলেছেন,

"* * but it has to be admitted that there is no conclusive evidence against the view that ascribes the authorship of the Indus Valley civilization to the Rigvedic Aryans, * *. But even then the authorship of the Indus Valley civilization cannot be ascribed to any particular race, * * * It would not, therefore, be correct to ascribe the authorship of the Indus Valley culture to the Aryan or any other particular race. It represents the synthesis of the Aryan and non-Aryan cultures. The utmost that we can say is that the Rigvedic Aryans probably formed an important part of the populace in those days, and contributed their share to the evolution of the Indus Valley civilization."[১১]

আমাদের বিবেচনায় এ-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপ ও স্বামী শংকরানন্দের স্বীকৃতি সুস্পষ্ট, দৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত। ডাঃ পুশলকর প্রাচীন ও নব্য এ-দুটী মতবাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন এই বোলে:

"There was thus a co-mingling of cultures, Vedic and non-Vedic, and for the authorship of the composite Indus Valley civilization, we need not look to any particular race."

মহেঞ্জোদড়োর মধ্যে বৈদিকত্বের সম্মানকে অব্যাহত রাখলেও ডাঃ পুশলকর অবৈদিকতাকেও স্থান দিয়েছেন মৈত্রীভাব আরোপ ক'রে। কাজেই তাঁর

৯। "Thus the non-Aryans of the Rigveda may in a sense be taken to be the non-Aryan responsible for the Indus civilization".—*Hindu Civilization* (2nd Indian edition, 1950) p, 32.

১০। Cf. *History and Culture of the Indian People*: The Vedic Age, Vol. I. (1951), pp. 169—167.

১১। Ibid, pp. 194—195.

সিদ্ধান্তটি মধ্যস্থতার প্রতিধ্বনি ও কতকটা অস্পষ্ট। কিন্তু 'ভারতীয় ইতিহাস সমিতি'-র সম্পাদক ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার আবার ডাঃ পুশলকরের মন্তব্যকে সংকীর্ণ বদ্ধমূল বিশ্বাসের ('dogmatic') কোঠায় ফেলে বলেছেন,

"Similarly there is a divergence of opinion regarding the question whether the Indus Valley civilization was pre-Aryan or post-Vedic. In the present state of our knowledge no dogmatic answer can be given to these questions, * * ." [১২]

অবশ্য স্বাধীন মন্তব্য দেবার অধিকার সকলেরই আছে এবং সে-কথা শ্রদ্ধেয় সম্পাদকও স্বীকার করেছেন। ষ্টুয়ার্ট পিগট (S. Piggott) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতীয় হিসাবে স্বীকার করলেও ("essentially Indian in its origin".[১৩]) তাদের আর্য ও বৈদিক বল্‌তে রাজী নন,[১৪] সুতরাং তিনিও পুরাতন সিদ্ধান্তের অনুবর্তন করেছেন।

আর্যজাতি ভারতের বাইরে থেকে আসেনি

সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টাদের নির্ণয়-প্রসঙ্গে মূল-আলোচনার বিষয় আসে : আর্যেরা ভারতবর্ষেরই আদিম অধিবাসী—না এসেছে তারা ভারতের বাইরে থেকে অনার্যদের বাসভূমিতে প্রসারতা লাভের জন্য। গতানুগতিক ইতিহাস আমাদের একথাই শিখিয়েছে যে, ভারতবর্ষ ছিল অসভ্য অনার্যদের আদিম বাসস্থান, আর্যেরা ভারতবর্ষে এসেছে মধ্যএসিয়া থেকে, ভারতে প্রবেশ করল তারা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে, উপনিবেশ স্থাপন করল কাবুল, পঞ্জাব, গান্ধার (কান্দাহার), সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানে। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের ও পাশ্চাত্য মতাবলম্বী অধিকাংশ প্রাচ্য-পণ্ডিতদের কাছ থেকে আর্যদের ভারতে প্রবেশ করার কাহিনী আমরা দীর্ঘদিন ধরেই শুনেছি এবং চমক ভেঙেছে আমাদের সেদিন যেদিন সুদূরদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ শোনালেন সুদৃঢ় কণ্ঠে তাঁর ঘুম-ভাঙানোর বাণী :

১২। Cf. *History and Culture of the Indian People* : The Vedic Age, Vol. I, Preface, pp. 25—26.

১৩। Cf. *Prehistoric India* (1950), p. 210.

১৪। *Ibid.*, p. 286.

"This (India) is the ancient land where wisdom made its home before it went into any other country. * *, and our archaeologist dreams of India being full of dark-eyed aborigines, and the bright Aryan came from—the Lord knows where. According to some, they came from Central Thibet, others will have it that they came from Central Asia. * * As for the truth of these theories, there is not one word in our Scriptures, not one, to prove that the Aryans ever came from anywhere outside of India".[১৫]

স্বামী অভেদানন্দও একথার প্রতিধ্বনি করেছেন এই বোলে:

"The dawn of Aryan civilisation broke for the first time on the horizon, not of Greece or Rome, not of Arabia or Persia, but of India, which may be called the motherland of metaphysics, philosophy, logic, astronomy, science, art, music, and medicine as well as of truly ethical religion."[১৬]

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, আর্য ও অনার্য উভয়েই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী।[১৭] বিদেশ থেকে আর্যদের ভারতে আমদানী করার প্রসঙ্গের পিছনে রয়েছে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যকে খর্ব করা, অথচ ভারতবর্ষই একমাত্র সুপ্রাচীন দেশ, যার কাছে ঋণী ভারতেতর বিশ্বের সকল দেশই তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করার জন্য। ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ছিল তাদের আদি-বাসভূমি।[১৮] পর্বত ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দেশগুলি। পর্বতে, জঙ্গলে,

১৫। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও ও পাশ্চাত্য' বইখানিতেও (পৃ° ৯৪-৯৫) বলেছেন: "ঐ যে ইউরোপীয় পণ্ডিত বল্‌ছেন, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন, ওসব আহম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতদেরও দেখ্‌ছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ-সব কিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শেখানো হচ্ছে। এ-অতি অন্যায়। * * কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখ্‌ছ যে আর্যেরা কোন্ বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে-কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি?"

১৬। Cf. *India and Her Peaple* (1905-6), p. 216

১৭। এখানে উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না যে, অধ্যাপক কিথ (A. B. Keith) আর্যদের বিদেশী হিসাবেই গণ্য করেছেন এবং বলেছেন আর্যেরা বরং দ্রাবিড়দের দ্বারা সুসভ্য হয়েছিল। —Vide *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, (1925). Vol. I, p. 10.

১৮। Cf. Stuart Piggott: *Prehistoric India* (1950), p. 259.

বড় ও ছোট-ছোট নদীর তীরে থাকত আদিম অধিবাসীদের বাস। ক্রমবিকাশের ধারায় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন ক'রে যারা হয়েছিল সভ্য, তাদের বলা হোত আর্য আর বর্বর আচার-অনুষ্ঠানীরা ছিল অনার্য। কিন্তু আর্য ও অনার্য আবার শ্রেণীগত হিসাবেও দাঁড়িয়েছিল তদানীন্তন সমাজে, নচেৎ অনার্যদের ভেতরেও ছিল সুরুচি ও সংস্কৃতি। ক্রমে আর্য ও অনার্যদের মিশ্রণের ফলে সংস্কৃতির জগতেও দেখা দিয়েছিল মিশ্রণ ও নব-পুরিপুষ্টির রূপ। রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও ছিল আর্য-অনার্যের প্রসঙ্গ, সন্ধি-বিচ্ছেদের অভিনয় হোত তাদের সমাজে। বালি, সুগ্রীব, রাবণ এঁরা পরিগণিত হোতেন অনার্যশ্রেণীর মধ্যে, অথচ রাবণের অধীনে স্বর্ণ-লঙ্কার ঐশ্বর্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল বরং বেশী আর্য-সমাজের চেয়ে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাও ছিল না ক্ষুণ্ণ তথাকথিত অনার্যদের ভেতর। আর্য ও অনার্যদের মধ্যে দৈনন্দিন সংঘর্ষের কারণ ছিল আর্যদের অগ্রগমন ও বিস্তার। লোকসংখ্যা ও সমাজের বিপুলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্যেরা মধ্যভারতের, পূর্বের ও দক্ষিণের দিকে চল্‌তেন উপনিবেশ স্থাপন করতে করতে, নব-আগন্তুকদের সঙ্গে বাঁধ্‌ত নিত্যনূতন যুদ্ধ-বিগ্রহ, বন্দী-ব্যাপার ও সন্ধির পরিবেশের মধ্যে চল্‌ত আর্য ও অনার্য-সমাজের মিশ্রণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানও হোত বিপুলভাবে, সুতরাং বিরাট সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের বুকে। নানান জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার ভেতরেও দেখা দিয়েছিল বিচিত্র-শাখার সমাবেশ, মৈত্রীর ভাবও সুদৃঢ় হয়েছিল সকল-কিছুর মধ্যে।

অধ্যাপক ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ তাঁর *The Aryan Problem* আলোচনায় আর্যদের ভারতের বাইরে থেকে আসার প্রশ্নটিকে 'much-debated problem' বোলে মন্তব্য করেছেন ও বলেছেন,

"This view, though highly favoured at one time, has not many supporters now, though some Indian scholars still tenaciously cling to it".[১৯]

আসলে আর্যদের সত্যিকারের বাসভূমি ভারতবর্ষ একথা সমর্থন না করলেও পরিশিষ্টে (Appendix) ডাঃ ঘোষ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, ডি. এস.

১৯। Cf. *History and Culture of the Indian People*; The Vedic Age, Vol. I. (1951), p. 202.

ত্রিবেদী, এল. ডি. কল্ল প্রভৃতি চিন্তাশীল ভারতীয়দের মতবাদের উল্লেখ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, শ্রদ্ধেয় ত্রিবেদী প্রভৃতির মতে, আর্যেরা বাইরে থেকে ভারতে প্রবেশ করেনি, পরন্তু ভারতবর্ষই ছিল তাদের আদিভূমি। ডাঃ ঘোষ তাঁদের মতবাদের সাতটী যুক্তির উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে দু'একটী হোল :

"There is no evidence to show that the Vedic Aryans were foreigners or that they migrated into India within traditional memory. Sufficient literary materials are available to indicate with some degree of certainty, that the Vedic Aryans themselves regarded Sapta-Sindhu as their original home (*devakrita-yoni* or *devanirmita-desa*). * * * The linguistic affinities are not positive proofs of Aryan immigration. * * The Vedic literature is the earliest extant record of the Aryan mind. * * The geographical data of the *Rigveda*, * * clearly show that the Punjab and the neighbouring regions constituted the home of the people who composed these hymns. There is no good ground for the belief that they or their ancestors lived in any other country."[২০]

কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত যে, নেগ্রিটোজাতিই নাকি ভারতবর্ষের আদিম জাতি। অষ্ট্রিকজাতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিক থেকে পূর্বভারতে প্রবেশ করে। পরে ককেশীয়-জাতিরা নানান দলে বিভক্ত হয়ে ভারতের অধিবাসী হোল উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে এসে। এদের প্রথম শাখার নাম দ্রাবিড ; ভাষাবিদ্‌দের চোখে এরা নাকি তুরাণীয় জাতি। অনেকে বলেন, এরাই আর্যজাতির শাখা, দ্রবদিড়ম্ সামগান করত বোলে এদের বলা হোত দ্রাবিড় ; এরা ছিল দক্ষিণ-ভারতের অধিবাসী। আবার অনেক ভাষাবিদ্‌দের মতে, সামুদ্রিক বা প্রোটো-মেডিটেরেনিয়ান, পাহাড়ী বা আল্‌পাইন ও উত্তরদেশীয় বা নর্ডিক-ককেশীয়দের এই তিন শাখার মধ্যে দ্রাবিড় হোল সামুদ্রিক বা প্রোটো-মেডিটেরেনিয়ান জাতির গোষ্ঠিভুক্ত। এদের আগে অথবা পরে পাহাড়ী বা আল্‌পাইন জাতির লোকেরা (তথা পামিরীয়গণ) উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এদের পরে উত্তরদেশীয় বৈদিক আর্যজাতিরা ভারতে আগমন করে উত্তর-

২০। *Ibid.*, pp. 215—217.

২১। Cf. *Hindu Civilization* (1950), Addenda, pp. 321—322.

পশ্চিম দিক দিয়ে।[১] এদেরই সমকালে বা কিছু আগে মঙ্গোলীয় জাতির কোন কোন শাখা ও বিশেষ ক'রে তিব্বত-ব্রহ্মীশাখা উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে পদার্পণ করে ভারতের মাটীতে। মাননীয় হাইড ক্লার্ক, রিজ্‌লি, এ. সি. হ্যাডন, কায়্‌গুসন, হল্‌, ভিন্সেণ্ট স্মিথ্‌ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই সকল মতের পরিপোষক ও প্রচারক। কিন্তু মনে রাখা উচিত ঐ-সকল পণ্ডিতের সিদ্ধান্তের পিছনে একটী বদ্ধমূল ধারণা নিহিত যে, ভারতেতর জাতিদের ভারতে প্রবেশের আগে ভারতবর্ষ ছিল বর্বর ও অসভ্য জাতির দেশ, এর সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ ছিল অতি-নগণ্য। কিন্তু নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক দৃষ্টির সামনে ওসব মতের অসারতা এখন প্রতিপন্ন হতে চলেছে এবং বিশেষ ক'রে মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৈদিক সিন্ধু-উপত্যকার দেশগুলির ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির বাসভূমি একথা সত্য, কিন্তু তাই বোলে অসভ্য আদিম অধিবাসীদের রাজত্ব ভারতবর্ষকে সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন করেছে বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন জাতিরা একথার যৌক্তিকতা মোটেই স্বীকৃত ও প্রমাণিত হবে না।

আবার অনেকের মতে, সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতাকেও গড়ে তুলেছিল নাকি মেসোপটেমিয়া, উর, চ্যালডিয়া, গ্রীস প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক দেশ থেকে আগত সুসভ্য জাতিরা। এরই আংশিক প্রতিবাদ হিসাবে ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর *Hindu Civilization* বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন সংযোজিত পরিশিষ্টে এইচ্‌. সি. বেকের (Mr. H. C. Beck, F. S A.) অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। বেক হরপ্পা-খননের ওপর তাঁর নূতন বইয়ের ১৫শ অধ্যায়ে আটটী কারণ দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে অপরাপর বিদেশী সভ্যতার বিশেষ কোন নিকট সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না ("There was no very close connection between the Indus civilization and the other foreign civilization"), পরন্তু সিন্ধু-সভ্যতা স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠেছিল, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই ("the Indus civilization may be taken to be more a product of India an indigenous and independent growth, than as an offshoot of the Mesopotemia civilization")।[১১] অবশ্য শ্রদ্ধেয় বেকের সিদ্ধান্ত

বিচারের বিষয়, তবে তাঁর সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে একথাও প্রমাণ করে যে, আর্যেরা ভারতবর্ষেরই লোক—বিদেশ থেকে আগত নয়।

সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার (মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতির) সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টারা যে বৈদিক আর্যজাতি ছিলেন এবং তাঁরা ভারতবর্ষেরই অধিবাসী—একথার প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন: "The evidence of the RV, shows that the Aryans were not foreigners who had come from outside and settled in the valleys of the various rivers."[২২] অবশ্য পাশ্চাত্য ও কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করেন না আমরা জানি, কিন্তু তাহলেও ডাঃ ঘোষ তাঁর *The Aryan Problem* নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

"But while no definite conclusion about this much-debated problem can yet be reached, it may be reasonably urged that had India been the original home of the Aryans, they would have certainly tried fully to Aryanize the whole of this sub-continent before crossing the frontier barriers in quest of adventure".[২৩]

কিন্তু একথাও যুক্তিযুক্ত হয় নি, তাঁর যুক্তিসিদ্ধ অভিমত বরং গতানুগতিক পাশ্চাত্য মতেরই প্রতিধ্বনি। অসংখ্য আলোচনার বিষয়ীভূত সমস্যাটীর সমীচীন সমাধান এখনো পর্যন্ত যদি না হোয়ে থাকে তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতবাদের মতন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, ডি· এস ত্রিবেদী, এ ডি· কল্ল-প্রমুখ প্রতিভাবান প্রাচ্য মনীষীদের অভিমতও গ্রহণীয়। তাছাড়া যুক্তি, ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নজির প্রভৃতি যদি প্রাচ্য মনীষীদের অভিমতগুলিকে সমর্থন করে তাহলে তারা বরণীয় না হবেই বা কেন।

সিন্ধু-সভ্যতায় সঙ্গীতের নিদর্শন

আগেই আমরা বলেছি যে, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, ঝুকর বা চন্হুদড়ো প্রভৃতি সিন্ধু-উপত্যকার সুপ্রাচীন দেশগুলির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গড়ে

২২। Cf. *Indian Culture*, Vol. IV, Octo. 1937, No. 2, p. 153-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ *The Rigveda and Mohenjo-daro.*

২৩। Cf *History and Culture of the Indian People*: the Vedic Age, Vol. I (1951), p. 202.

তুলেছিল ইন্দো-এরিয়ান, ভারতীয় নন্-এরিয়ান বা অনার্য অথবা বিদেশ থেকে আগমনকারী আর্যজাতির নয়, পরন্তু ভারতেরই অধিবাসী বৈদিক তথা ঋগ্বৈদিক সুসভ্য আর্যজাতি এবং তার বিচিত্র প্রমাণ আমরা পেয়েছি ঋগ্বেদাদি ও বৈদিক সাহিত্যগুলি থেকে। সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল যে বৈদিক তার যথেষ্ট নিদর্শন মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে ভারতীয় সঙ্গীতেরও বিচিত্র উপকরণ এবং সে-সব থেকে প্রমাণ হয় যে, বৈদিক যুগের পরে হোল সিন্ধু-সভ্যতার যুগ। বৈদিক যুগের আর্যদের মধ্যে ছিল সাতস্বরের প্রচলন, অরণ্যেগেয়গান ছিল রহস্য-সঙ্গীত হিসাবে প্রচলিত সামগানকারীদের সমাজে। মহেঞ্জোদড়োর খননে পাওয়া গেছে সাতটী ছিদ্রযুক্ত বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বিভিন্ন চামড়ার বাদ্যযন্ত্র, একটি নৃত্যশীলা নারীর ব্রোঞ্জ ও নর্তকের ভগ্ন মূর্তি। বাঁশীর সাতটী ছিদ্র, বীণার গড়ন, বিভিন্ন চামড়ার বাদ্য এবং নর্তক ও নর্তকীর নৃত্যভঙ্গী দেখলে অনুমান করা কঠিন হবে না যে, তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক[২৪] সিন্ধু-সভ্যতায় যে চরম-বিকাশ তাদের হয়েছিল, আরো কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছর লেগেছিল সে-অবস্থায় উপনীত হোতে। ক্রমবিকাশের ধারার সন্ধান আমরা একেবারে বৈদিক যুগের গোড়াকার দিকে পাই, তার নিদর্শন-স্বরূপ আছে আর্চিক, গাথিক, সামিক থেকে সম্পূর্ণশ্রেণীর গান। গান অর্থে এখানে বৈদিক সামগানকে বুঝতে হবে। বৈদিক সামগানে সাতস্বরের প্রচলন ছিল এর প্রমাণ পাই প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগুলির ভেতর এবং এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করব।

সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার সমৃদ্ধ সহরগুলিতে সঙ্গীতের অনুশীলন হোত এবং এর প্রমাণের উল্লেখ করেছেন ষ্টুয়ার্ট পিগট। নৃত্যের সঙ্গে বাঁশী ও বাদ্যযন্ত্র ঢোল ইত্যাদির হোত ব্যবহার। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"There is some interesting evidence for Aryan music. Cymbals were used to accompany dancing, and in addition to this and the drum there were reed flutes or pipes, a stringed instrument of the lute class, and a harp or lyre, which is mentioned as having seven tones or notes".[২৫]

২৪। ঋগ্বেদ-রচনার সময় থেকে ভারতীয় ইতিহাসের কালকে নির্দিষ্ট বোলে ধরে নিলে মহেঞ্জোদড়ো প্রভৃতি সুপ্রাচীন দেশের সভ্যতার সময় হয় ইতিহাস পরবর্তী যুগ।

২৫। Cf. *Prehistoric India* (1950), p. 270.

প্রত্নতাত্ত্বিক পিগট (Stuart Piggott) প্রাচীন-কালের সাঙ্গীতিক তথ্য জানার নিদর্শন হিসাবে সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গীতের উপাদানকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখেছেন। তিনি বলেছেন: "This last piece of information is important for our knowledge of ancient music." তবে শ্রদ্ধেয় গল্‌পিন (Galpin) ও কারওয়েনের (Carwen) নজিরের মাধ্যমে তিনি সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গীতে পাশ্চাত্যের অবদান দেখাবার চেষ্টা করেছেন পরোক্ষভাবে। অবশ্য এ-ধরণের প্রমাণ করার রীতি-সম্বন্ধে আমরা পরিচিত এবং এটা পাশ্চাত্য মনোভাবেরই পরিচায়ক। গল্‌পিন জেম্‌দে নাস্‌রের (Jemdet Nasr) সময়ে আরো উন্নত ধরণের ধনুকের আকারে হার্পের[২৬] পরিচয় পেয়েছেন উরের (Ur) প্রাচীন রাজকীয় বংশের সমাধিভূমির (Early Dynastic Royal Tomb) ভেতর থেকে। তাছাড়া নির্দিষ্ট পর্দাযুক্ত হার্প, বীণা (lyre), বাঁশীর খবর পাওয়া গেছে পশ্চিম এশিয়া থেকে। ওই সমস্ত বাদ্যযন্ত্রে সাতটী স্বরের ব্যবহার ছিল; হিন্দু-সঙ্গীতেও তাই। কারওয়েনও দু'টী পর্দার কথা বলেছেন। ওই পর্দা যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল আর বাদ্য-যন্ত্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন পশ্চিম এসিয়ার আর্বান-সভ্যতার আওতায় (urban civilization); কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিরা খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে ও তার পরে ভারতবর্ষে ও এমনকি চীনদেশে ওইগুলিকে আমদানী করেছিলেন। তারপর আমদানী হয়েছিল পশ্চিমের দিকে কেল্‌টিক অধিবাসীদের

২৬। একে ধনুর্যন্ত্র বলে। এই ধনুর্যন্ত্রের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা'-য় (৮ম সং) উল্লিখিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের লোকেরা আগে বেহালাকে বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বলত ("The primitive voil is a modified form of the lute; and the lute is an adaptation of the small lyre of classical antiquity, the name of which (*fidicula*) survives in both groups of the common names for bowed instruments * *.") বেহালা তথা বীণার আদিরূপ নাকি ধনুর্যন্ত্র। এফ., জে. ফেটিসের মতেও এই ধনুর্যন্ত্রের উৎপত্তি-স্থান ভারতবর্ষ। প্রবাদ যে, রাজা রাবণ এই ধনুর্যন্ত্রের স্রষ্টা, এজন্য একে রাবণাস্ত্রম্‌ও বলে। শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর 'সঙ্গীতসার' (১২৮৬ সাল) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "আরবীয়দের 'কেমান্‌জে জোজ' (Kemangeh a gouz) নামক একপ্রকার ধনুর্যন্ত্র আছে। * * 'কেমান্‌জে জোজ' ভারতবর্ষীয় অমৃতি-যন্ত্রের অনুকরণ মাত্র * *। এফ. জে. ফেটিস সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন: "There is nothing in the West which has not come from the East" (—সঙ্গীতসার, পৃ° ৬৫-৬৭)। মোটকথা ধনুর্যন্ত্র ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র। ভারতবর্ষ থেকে পরে এই যন্ত্র সারা পাশ্চাত্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।—'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকা', ৯ম সংস্করণ, ২৪ খণ্ড, পৃ° ২৪২ দ্রষ্টব্য।

ও খৃষ্টপূর্ব ১ম শতকে ব্রিটেনের ভেতর। হেব্রিডিন (Hebridean) জাতীয় সঙ্গীতের (Folk Song) মধ্যে এখনো ইন্দো-ইউরোপীয়পূর্ব পাঁচস্বরের পর্দার ব্যবহার পাওয়া যায় এবং তার জন্ম আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কেননা ঐ পাঁচস্বরের পর্দা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আমদানী হয়েছিল। পশ্চিম আফ্রিকার জ্যাজ্ (Jazz) সঙ্গীতে আজো-পর্যন্ত পাঁচস্বর ব্যবহৃত হয়।[২৭]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রত্নতাত্ত্বিক পিগটের মধ্যে পাশ্চাত্য মনোভাব প্রবল, কেননা গল্‌পিন ও কারওয়েনের উদ্ধৃতির দ্বারা ("He traces

২৭। "There is some interesting evidence for Aryan music. Cymbals were used to accompany dancing, and in addition to this and the drum there were reed flutes or pipes, a stringed instrument of the lute class, and a harp or lyre, which is mentioned as having seven tones or notes. This last piece of information is important for our knowledge of ancient music. Galpin has shown that instruments possessing fixed scales, such as harps, lyres, and flutes, are known from Western Asia from very early times, (a bow-shaped harp was used in Jemdet Nasr times, and other more elaborate types were, as is well known, found in the Early Dynastic Royal Tombs at Ur). There is good evidence that these instruments were constructed according to the heptatonic scale (seven notes, with the eighth completing the octave, as with all European instrumental music of the present day). This heptatonic scale is the basis of modern Hindu music, where it exists (as in other regions of the world) side by side with another, more primitive, scale, that of five notes, or the pentatonic, based on quintal harmony and primitive vocal traditions. It is our normal musical scale with the third and seventh, the semi-tone intervals, missing. Curwen has recently taken this question of the two musical scales a stage further and related it to our archaeological knowledge, and he makes it clear that the spread of the heptatonic scale is intimately associated with instrumental music originating in the ancient urban civilizations of Western Asia, but dispersed beyond its original home by Indo-European peoples in the second millennium B. C. and later. He traces an early dispersal to India and even to China, and a later diffusion westwards with the Celtic peoples, with Britain as perhaps its last place of arrival in the middle of the first millennium B. C., so that the Hebridean folk-songs still retain the ancient, pre-Indo-European mode of the pentatonic scale today. (Incidentally the pentatonic idiom, derived from West Africa, plays its part in modern jazz music).—Cf. *Prehistoric India*. (1950), pp. 270—271.

an early dispersal to India and even to China") তিনি এটাও প্রচ্ছন্নভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আর্য বা ভারতীয় সঙ্গীত বনাম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদেশের কাছে ঋণী। তবে সুখের বিষয় যে, তিনি সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতাকে আর্য-সভ্যতা ('Aryan') এবং—

"If we are right in thinking that the Harappa civilization, like most of its contemporaries in Western Asia, was largely priest-ruled, the growth in power of the Brahmans over the Ksatriyas, which is a commonplace of Vedic evolution * *".[২৮]

প্রভৃতি কথার দ্বারা প্রকারান্তরে বৈদিকই বলেছেন।

মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে যে-সমস্ত সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া গেছে তাথেকে প্রমাণ করা যায় যে, সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার নগরগুলিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের রীতিমত অনুশীলন হোত এবং সে-অনুশীলন বৈদিক সামগান ও তৎপরবর্তী মার্গ-সঙ্গীতের ধারা অনুযায়ী ছিল। রায় বাহাদুর দীক্ষিত মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার যুগে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের নিদর্শন-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

"Besides dancing, it appears that music was cultivated among the Indus people, and it seems probable that the earliest stringed instruments and drums (with which to keep rhythm accompaniment with the music) are to be traced to the Indus civilization. In one of the terracotta figures a kind of drum is to be seen hanging from the neck, and on two seals we find a precursor of the modern *mridanga* with skins at either end. Some of the pictographs appear to be representations of a crude stringed instrument, a prototype of the modern *vina*; while a pair of castanets, like the modern *Karatala*, have also been found."[২৯]

তন্ত্রীযুক্ত বীণা, উন্নত ধরণের মৃদঙ্গ, করতাল ও ছন্দায়িত নৃত্যের ভঙ্গী ইতিহাসপূর্ব বা প্রাক্‌ঋগ্বৈদিক যুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শন মোটেই নয়, পরন্তু ঐগুলিকে বৈদিক যুগের পরবর্তী সংস্কৃতির অভিব্যক্তিই বলতে হবে। বৈদিক সামগানে[৩০] নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রচলন ছিল এবং তাদেরই অনুবর্তন হয়েছে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে। বৈদিক যুগের আগে তথা প্রাগ্বৈদিক যুগে সিন্ধু-উপত্যকার

২৮। Cf. *Prehistoric India* (1950), p. 286.

২৯। *Cf. Prehistoric Civilization of the Indus Valley* (Madras, 1939), p. 30.

৩০। সামগানের ক্রমবিকাশ বৈদিক সাহিত্যগুলিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

মতন অত বড় সমৃদ্ধি এবং উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বিকাশের কল্পনা করাও যায় না। ক্রমবিকাশের স্তর যাঁরা মানেন, তাঁদের কাছে পরিণতির দৃশ্য সুপরিচিত, সুতরাং অনুন্নত ও উন্নত, অপরিপুষ্ট ও পরিপুষ্ট এই ক্রমধারা অনুযায়ী ঐতিহাসিক বৈদিকযুগের চেয়ে উন্নত রূপেরই পরিচয় পাই আমরা মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি সুপ্রাচীন সভ্য বৈদিক নগরগুলিতে।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে নৃত্যছন্দের নিদর্শন-সম্বন্ধে ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপও প্রত্ন-তাত্ত্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন,

"One seal has presented a dancing scene. One man is beating a drum and others are dancing to the tune. On one seal from Harappa, a man is playing on a drum before a tiger. On another, a woman is dancing. In one case, a male figure has a drum hung round his neck."[৩১]

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় সঙ্গীত ও নৃত্যের সুসঙ্গত রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্যশীলা নারীর ব্রোঞ্জমূর্তিটী রায় বাহাদুর দয়ারাম শাহানী আবিষ্কার করেন। নারী নগ্ন ও হাতে বড় বড় অলংকার থাকায় স্যার জন্ মার্শাল ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নারীকে আদিমবাসী শ্রেণীভুক্ত ('aboriginal type') বলেছেন।[৩২]

ষ্টুয়ার্ট পিগটও দক্ষিণ বেলুচিস্তানের অনুযায়ী কেশবিন্যাস ও অপরাপর সাজসজ্জা থাকায় ওই ধরণের মন্তব্যই করেছেন। তাঁর মতে, মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার পরিশ্রান্ত বণিকেরা শ্রম দূর করার জন্য দক্ষিণ-বেলুচিস্তান থেকে ঐসব নারীদের আমদানী করতেন।[৩৩] ডাঃ পুশলকরও স্যর জন মার্শালের মতের

৩১। Cf. *Indian Culture*, Vol. IV, Octo, 1937, No. 2, p. 153-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ *The Rigveda and Mohenjo-daro.*

৩২। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাও বলেছেন: "A young, aboriginal nautch girl * *." *Mohenjo-daro and the Indus Valley Culture* in Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, March 1932, No 1, p. 143.

৩৩। "But the bronze of the Dancing-Girl from Mohanjo-daro, so closely representing the type of hairdressing and adornment of the Kulli Culture of South Beluchistan, does at least suggest that the merchants returning along the southerly caravan routes may have brought with them girls whose exotic dancing and unsophisiticated charms might be thought to tickle the fancy of the tired business men of Harappa or Mohenjo-daro."—*Prehistoric India* (1950), pp. 177—178, 186—187.

মহেঞ্জোদড়ো

(খৃষ্টপূর্ব ৪০০০—৩৫০০)

[সাধারণের জন্য ব্যবহৃত স্নানাগার]

হরপ্পা
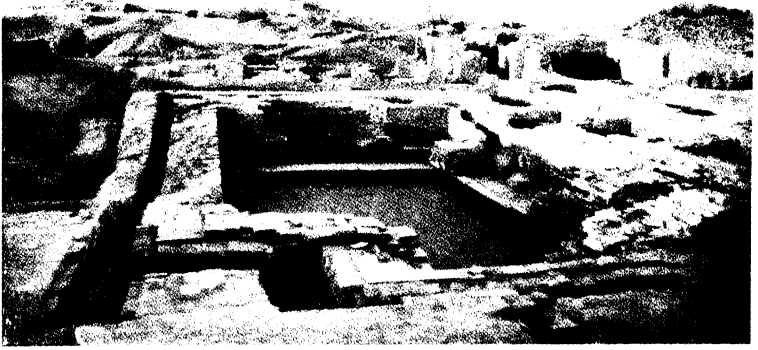
(খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—২০০০)

[উত্তর প্রান্তদেশ থেকে দৃশ্য ও প্রাচীন]
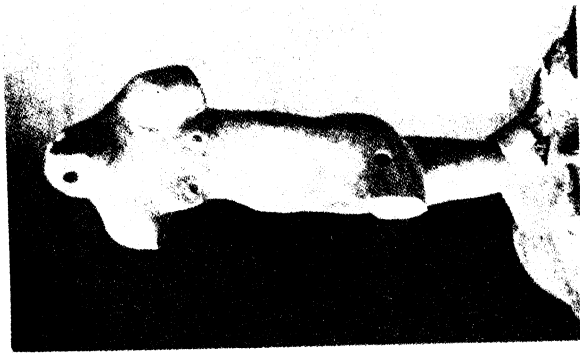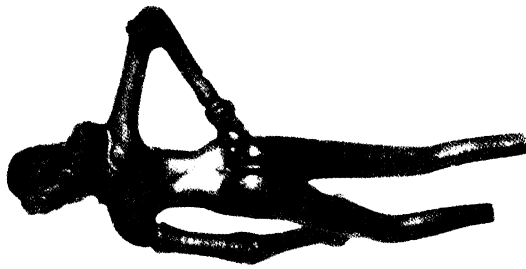
মহেঞ্জোদড়োর
ব্রোঞ্জ নটীমূর্তি
(পার্শ্বদিক)

মহেঞ্জোদড়োর
ব্রোঞ্জ নটীমূর্তি
(পশ্চাৎদিক)

নটরাজ
বা হরপ্পার নটমূর্তি
(খৃষ্টপূর্ব ৩০০০—২০০০)

অনুবর্তী হোয়ে নারীমূর্তিকে অনার্যের কোঠায় ফেলেছেন এবং তাথেকে শুধু ডাঃ পুশলকর নন, শ্রদ্ধেয় মার্শাল, রায় বাহাদুর চন্দ, রায় বাহাদুর দীক্ষিত প্রভৃতি পাশ্চাত্য মতের অনুবর্তীগণও পরোক্ষভাবে (indirectly) প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নৃত্যকলার বংশগত অধিকার ছিল অনুন্নত আদিমবাসীদের। অবশ্য এ-মনোভাবের প্রতিধ্বনি পেয়েছি আমরা বৌদ্ধ ও তৎপরবর্তী সমাজেও। কৌটিল্য ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি নৃত্যশীলা নটীদের চরিত্রে দোষারোপ করেছেন দেখা যায়।[৩৪] ভারতীয় সমাজে এমন একদিন ছিল যখন গায়ক ও বাদক-শ্রেণীকে হেয় চক্ষে দেখা হোত, সঙ্গীতসেবীরা থাকতেন সমাজে অপাঙক্তেয় হোয়ে। অবশ্য বিবর্তমান সমাজের দৃষ্টিতে সুরুচির মান-নির্ণয় করা কঠিন, কেননা আজ যে আচার-ব্যবহার বা সামাজিক রীতিনীতি সর্বসাধারণের কাছে আদরণীয়, কাল বা ভবিষ্যতে হয়তো সে-সবই অনাদরণীয় ও লোকের চোখে হেয় হোয়ে দাঁড়াবে। পরিবর্তনই সমাজের রূপ ; ভাল ও মন্দের ক্রমবিবর্তমান ধারাই সমাজের প্রকৃতি। কিন্তু মহেঞ্জোদড়োর বা হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত একটীমাত্র নৃত্যশীলা নারীর অনার্যোচিত বেশভূষা ও কেশের পারিপাট্য দেখে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যাবে না যে, নটীমাত্রেই হবে সভ্যতা-বিহীন সমাজের অধিবাসী। আধুনিক সমাজেও নৃত্যের অনুশীলন অব্যাহত আছে, অথচ নৃত্যরতা নারীমাত্রেই অরুচিসম্পন্ন সমাজের অধিবাসী নন। মহেঞ্জোদড়োয় নৃত্যছন্দরত নারীমূর্তি বরং তদানীন্তন সমাজে নৃত্যকলা-অনুশীলনের পরিচায়ক এবং এইভাবে দেখা ও বিচার করাই বোধহয় সর্বতোভাবে সমীচীন।

৩৪। 'চর্যাপদে লৌকিকতা' প্রবন্ধে শ্রীঅবন্তী সান্যাল নট-নটীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : "চিরদিনই নট-নটীরা নৈতিক শৈথিল্যের জন্য হেয় ও ধিক্কৃত। "কৌটিল্য ও পতঞ্জলির সময় থেকেই নট-নটীদের চারিত্রিক অখ্যাতি। পতঞ্জলি বলেছেন, নটের স্ত্রী (নটী) যাকেই প্রয়োজন, তাকেই ভজনা করে (মহাভাষ্য, ৩য় অধ্যায়)। এই জন্য নটের প্রতিশব্দ 'জায়াজীব' এবং নটী ব্যাপক অর্থে গণিকার সঙ্গে সমার্থক। * * সে যাই হোক, ছলা-কলায় পারদর্শিনী রঙ্গময়ী নীচজাতীয়া রমণীরা (নটী) প্রাচীন কালে উচ্চবর্ণের পুরুষের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাতে পারত, এ-অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়।"—'মাসিক বসুমতী', মাঘ, ১৩৫৮, পৃ° ৫৪০

প্রবন্ধকার প্রাচীন সমাজে নট-নটীর চিত্র একটু পক্ষপাতভাবেই অঙ্কন করেছেন বলা যায়, কেননা নৃত্যকলা অনুশীলন করলেই যে স্ত্রী বা পুরুষ (নটী বা নট) হীন স্বভাবসম্পন্ন হোতেন বা হবেন এমন কোন নিয়ম নাই। 'অভিনয়দর্পণ', 'নাট্যশাস্ত্র', 'নর্তন-নির্ণয়' ও 'সঙ্গীত-রত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে শিক্ষা ও সংস্কৃতি হিসাবে নৃত্যকলার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা সুরুচীসম্পন্ন সকল শ্রেণীর সভ্য পুরুষ ও নারীদের জন্যই নির্ধারিত।

তবে নৃত্যরতা নারীর ব্রোঞ্জমূর্তিটীতে শিল্পচাতুর্যের কথা সকলেই উল্লেখ করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ষ্টুয়ার্ট পিগট হরপ্পা-ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছেন —"with a sensitive modelling of the body and limbs.[৩৫] ডাঃ পুশলকর ও কার্লেটন বলেছেন—"astonishes one by the ease and naturalness of its posture."[৩৬] ডাঃ পুশলকরও সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এই নারীমূর্তির বর্ণনায় বলেছেন,

"The exquisite bronze figure of an aboriginal dancing girl (PL. V. 4-6) with her hand on the hip, in an almost impudent posture, is a noteworthy object. Her hands and legs are disproportionately long and she wears bracelets right up to the shoulder. The legs are put slightly forward with the feet beating time to the music."[৩৭]

নারীমূর্তি ছাড়া অপরাপর নটমূর্তির পরিচয়ও ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপ দিয়েছেন।[৩৮] শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও একজন নটের প্রস্তরমূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

"There are two remarkable *statuettes* found at Harappa, * * and the other of dark grey slate, the figure of a male dancer, standing on his right leg, with the left leg raised high, the ancestor of Siva Nataraja".[৩৯]

৩৫। Cf. *Prehistoric India* (1950), pp 186-187.

৩৬। Cf (a) Carleton : *Burried Empires*, p 154 ; (b) *History and Culture of the Indian People* : The Vedic Age, Vol. I (1951), p. 180.

৩৭। Cf. (a) *History and Culture of the Indian People* : The Vedic Age, Vol. I (1951), p. 180 ; (b) *Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, March, 1932, No. 1, p. 143.

৩৮। Cf. *Indian Culture*, Vol. IV, Octo. 1937, No 2, p. 153-তে প্রকাশিত *The Rigveda and Mohenjo-daro.*

৩৯। Cf. (a) *Hindu Civilization* (2nd Indian ed., 1950), p. 19.

(b) ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা তাঁর *Mohenjo daro and the Indus Valley Civilization*-প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : "The other statuette (Pl. XI) represents a dancer standing on the right leg with the left leg raised in front, the body from the waist upwards bent round to the left and both arms stretched in the same direction. The pose is full of movement. It is inferred * * that the figure was three-headed or three-faced and in that case it represented the youthful Siva Nataraja, or the head might have been that of an animal., * * there is no parallel to this figure among the Indian sculptures of the historic period."—*Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, March, 1932, No-2. p. 143.

এই নৃত্যরত নটমূর্তিটী ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মতে গ্রীকশিল্প ("Greek artistry by their striking anatomical truth") এবং তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের সৃষ্টি

এখন ওই সকল প্রসঙ্গ হোল বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ের। তবে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বৈদিক ধারাই অব্যাহত ছিল। কিন্তু সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল বৈদিক তথা ভারতীয় সভ্যতার গোড়াকার দিকে। ভারতীয় সভ্যতার আদিম যুগে সঙ্গীত ছিল মানুষের মনের অন্তরতম দেশে লুকোনো। প্রকৃতির প্রজা পশুপক্ষীদের কলকণ্ঠে ছিল গানের রূপ অভিব্যক্ত। মানুষ চিরদিনই অনুকরণপ্রিয়। শান্তি ও স্বচ্ছতার পরিবেশ পেলে শ্রম-শ্রান্তির মাঝখানেও সে জানাতো তার অন্তরের আবেদন প্রকৃতিদেবীকে অথবা স্রষ্টা ভগবানকে; বিশ্ব-নিয়ন্তার ধারণা রূপায়িত হয়েছিল সুপ্রাচীন যুগেরও সামাজিক মানুষের কাছে। নিজের চেয়ে বড় বা শক্তিমানের সার্থকতা সে বুঝ্‌ত, কাজেই দুঃখ-বেদনার মধ্যে শান্তির আশায় জানাতো ভগবানকে তার প্রাণের গোপন-কথা। সুর থাক্‌ত সেই কথায়, বিচিত্র স্বরের সমাবেশ না থাকলেও সাধারণ একটীমাত্র স্বরে ও সরল ছন্দে গানের নৈবেদ্য সাজাতো সুপ্রাচীন কালের লোকেরা। পাখীর, জন্তু-জানোয়ারের যে ডাকগুলিকে (ধ্বনিকে) মনে করত তারা সুমিষ্ট ও শান্তিদায়ক বোলে, সেগুলির করত অনুকরণ, নিজেদের সুর ও কথার মাধ্যমে সাজাতো সঙ্গীতের নৈবেদ্য। নিরর্থক তথা অর্থহীন গানের ভাষা তাদের ছিল না। পার্থিব প্রয়োজনের তাগিদেই তারা গাইত গান। পরে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে গানের রূপে এলো পরিবর্তন, ভাবসম্পদে সঙ্গীত হোল পরিপূর্ণ, অপার্থিব আদর্শকেও করল গ্রহণ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির মান ও রূপ হয় যেমন উন্নত, সঙ্গীতের পক্ষেও ঠিক তাই। ভারতীয় সঙ্গীত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটী অপরিহার্য উপাদান। সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের কথা আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্য, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচনায় উল্লেখ করব। তবে ব্রাহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক-সাহিত্যগুলি আলোচনা করলে দেখা যায়, সঙ্গীতের রূপ ছিল একেবারে প্রথমের দিকে সহজ ও সরল, প্রার্থনা ও আন্তর আবেদনের আকারে তা হোত রূপায়িত।

স্তোত্র, গান তথা উদ্‌গান, গাথা প্রভৃতিই ছিল গোড়াকার দিকে সঙ্গীতের রূপ। ক্রমে সভ্যতার আলোক হোল উজ্জ্বলতর, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিবেশ হোল দিব্য-মহিমায় উদ্ভাসিত। দেবতাদের বিচিত্র রূপের করা হোল কল্পনা, তাদের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা জানালো মানুষ। দেবতাদের রূপ অগ্নির মাধ্যমে হোত প্রকাশিত, সুতরাং অগ্নির পূজা, যাগ-যজ্ঞে আহুতি-দানই ছিল তখন দেবতাদের আহ্বানের রূপ। সূর্যের পূজা তখন অগ্নি-পূজায় হয়েছে রূপায়িত, তাহলেও সংস্কারের বশে মানুষ উপাসনা করত সূর্যরূপী অদিতির। পৃথিবীস্থ সূর্য-রূপী যজ্ঞাগ্নির লিহায় আহুতি দেওয়া হোত নৈবেদ্য-রূপ হবিঃ, অগ্নিমুখে দেবতারা করতেন যজ্ঞভাগ গ্রহণ। আহুতি-দানের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দায়িত গান বা গাথার হোত অনুরণন্, যজ্ঞ ও উপাসনার সঙ্গে সঙ্গীতের হয়েছিল এ-রকম ক'রেই মিতালী। সঙ্গীতের সঙ্গে থাকৃত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যছন্দও সাজিয়ে তুলত সামগানের মহিমময় রূপ।

সাত স্বরের সৃষ্টি বৈদিক যুগেই হয়েছিল

সঙ্গীতে সাত স্বরেব উৎপত্তি বৈদিক যুগেই হয়েছিল এবং তার নিদর্শনও পেয়েছি আমরা সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায়। অবশ্য শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচনার সময় আমরা সাত স্বরের বিকাশ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। তবে মোটামুটি এখানে বলা দরকার যে—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্বরগুলি বৈদিক। ষড্‌জাদি সাত স্বর বৈদিক স্বরের পাশাপাশিই প্রচলন ছিল, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুব কম। স্বরসংখ্যার প্রয়োগকে অপেক্ষা ক'রে সৃষ্টি হোল সাতটী শ্রেণীর গানের, যেমন আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ। সাম-প্রাতিশাখ্যে ও নারদীশিক্ষায় শাখাভেদে বিভিন্ন স্বরের প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হয়েছে। মতঙ্গ (নবম শতাব্দীর কিছু পরে) তাঁর বৃহদ্দেশীতে লিখেছেন: এক স্বর থেকে চার স্বরযুক্ত গানগুলি মার্গশ্রেণীভুক্ত নয়, পরন্তু দেশী, শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে চার স্বরযুক্ত গানের তথা দেশী গানের ছিল প্রচলন—"চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ শবরপুলিন্দকাম্বোজবঙ্গকিরাতবাহ্লীকান্ধ্রদ্রবিডবনাদিষু প্রযুজ্যতে"।[৪০]

৪০। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ), পৃ: ৫৯

মতঙ্গ দেশী ও মার্গ-সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য-নির্ণয় করেছেন গানে স্বরসংখ্যা-ব্যবহারের নজির দেখিয়ে। কিন্তু বৈদিক আর্চিকাদি গানের বেলায় আমরা দেখেছি যে, এক স্বর থেকে চার স্বরের গানগুলি বৈদিক ও বিশুদ্ধ হিসাবেই গৃহীত হোত। যেমন সামিকযুগে গানে তিন স্বর থেকে সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। অবশ্য মার্গ-দেশী গানে বিভাগের মতন প্রশ্ন তখন বৈদিক গানের বেলায় ওঠেনি। মার্গ ও দেশী-সঙ্গীত বৈদিকভিন্ন লৌকিক সঙ্গীতশ্রেণীর অন্তর্গত, কাজেই লৌকিকের বেলায় বৈদিক নিয়মকানুনের প্রয়োগ বিশেষ ছিল না।

আর্য ও অনার্য সঙ্গীতের মিশ্রণ

মতঙ্গের অভিপ্রায়-অনুসারে জানা যায়, পঞ্চস্বরযুক্ত ঔড়ব থেকে সপ্তস্বরযুক্ত সম্পূর্ণ জাতির গানগুলি মার্গ ও অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এজন্য বোধহয় আর্চিক থেকে স্বরান্তর পর্যন্ত জাতিগুলির প্রচলন ও উল্লেখ বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতির ভেতর পাওয়া যায় না, কেবল ঔড়ব থেকে সম্পূর্ণ জাতির ব্যবহারই আছে। শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিদের সঙ্গীতে চার অথবা তার কম সংখ্যার স্বরেরই নিশ্চয় প্রচলন ছিল, সেজন্য তাদের মার্গশ্রেণীভুক্ত না ক'রে দেশী ও ইতর শ্রেণীর অন্তর্গত বলা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেখা যায়, মতঙ্গ একদিকে যেমন শবর-কাম্বোজাদি জাতির গানকে কৌলিন্য দিতে অস্বীকার করেছেন, অপর দিকে তেমনি মার্গশ্রেণীর মধ্যে আভীরী, চ্ছেবাটী, গুর্জরী, কাম্বোজী, পুলিন্দিকা, শবরী, দ্রাবিড়ী, সৈন্ধবী, পৌরালী, বঙ্গালী, ঠক্ক, কৈশিকী প্রভৃতি রাগগুলিকে অভিজাত বোলে গণ্য করেছেন। শুধু মতঙ্গই নন, সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে প্রামাণিক যাষ্টিক, কাশ্যপ, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি গুণীরাও এই অন্তর্ভুক্তিকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।[৪১] মতঙ্গ নিজেই ঠক্ক, সৌবীর, বোট্ট, বেসর প্রভৃতি রাগদের মধ্যমগ্রাম থেকে উৎপন্ন বলেছেন

৪১। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ) পৃঃ ৯৮—১১৮

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৫৭ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের সীমানা, সমস্ত দেশ ও জাতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে "পূর্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা" প্রভৃতি শ্লোকগুলি থেকে বুঝা যায় সকলে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বাণিজ্যাদি করত, সুতরাং তারা সুসভ্য জাতি ছিল—'ইজ্যাধ্যায়-বাণিজ্যাদ্যৈঃ কর্মভিঃ কৃতপাবনাঃ।"

এবং মার্গশ্রেণীভুক্ত অভিজাত ও প্রাচীন রাগ মালবকৈশিক, হিন্দোলাদির মতন সমান মর্যাদা দান করেছেন,

"ঠক্করাগশ্চ সৌবীরস্তথা বৈ ঠক্কৈশিকঃ।
বোট্টরাগশ্চ ষড়্জাখ্যো ভবেদ্ বেসরষাড়বঃ॥
হিন্দোলকস্তু বিজ্ঞেয়ো মধ্যমগ্রামসম্ভবঃ।
মালকপঞ্চমশ্চৈব মালবকৈশিকস্তথা॥"

অঙ্গ, বঙ্গ, গান্ধার, শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, নিষাদ, গুর্জর প্রভৃতি জাতিরা সকলেই অনার্য-সংস্কৃতিসম্পন্ন ছিল কিনা এ-নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জীর নজিরে জানা যায়, তারা সকলেই অনার্যগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতিসেবীও অনেকে ছিল।

অঙ্গদেশটি মগধের পূর্বদিকে অবস্থিত ও চম্পানদীর দ্বারা মগধের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ছিল। ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, 'বিধূরপণ্ডিতজাতক' গ্রন্থে রাজগৃহকে (বর্তমান রাজগীর) অঙ্গদেশের নগর হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে একজন অঙ্গরাজের উল্লেখ আছে, তিনি গয়ায় বিষ্ণুপাদপর্বতে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। মহাভারতের সভাপর্বে অঙ্গ ও বঙ্গদেশকে একটী রাজ্য বোলে উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম চম্পা, গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মাননীয় কানিঙ্হাম ভাগলপুরের কাছে এখনো চম্পনগর ও চম্পপুর নামে দুটী গ্রামের অবস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে, হরিবংশে ও কতকগুলি পুরাণে চম্পাকে 'মালিনী' নামেও অভিহিত করা হয়েছে (মৎস্যপুরাণ ৪৮।৯৭ ; বায়ুপুরাণ ৯৯।১০৫—১০৬ ; হরিবংশ ৩১।৪৯ ; মহাভারত ১২।৫।৬—৭ ; ১৩।৪২।১৬)।[৪২]

ডাঃ পুশলকর বলেছেন, অঙ্গজাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না, কিন্তু অথর্ববেদে (৫।২২) বর্ণনা আছে।[৪৩] মাননীয় পার্জিটার অঙ্গজাতি তথা অঙ্গদেশের অধিবাসীদের অনার্য বলেছেন। ওল্ডেনবার্গের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাঁর মতে, অঙ্গেরাই সুপ্রাচীন আর্যজাতি। তবে আর্যজাতি যে বাইরে

৪২। Cf. *History and Culture of the Indian People* : The Vedic Age, Vol. I (1951), p. 256.

৪৩। Ibid., p. 256.

থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল একথা তিনি বিশ্বাস করেন। 'বঙ্গ' শব্দটার উল্লেখ ঐতরেয়-আরণ্যকে (২।১।১) নাকি বগধ, চের প্রভৃতি পক্ষীদের নামের সঙ্গে পাওয়া যায়। বগধ শব্দটা মগধের নামান্তর। পক্ষীনামটার প্রসঙ্গে ডাঃ পুশলকর বলেছেন—"which probably means that they were non-Aryans' speaking languages not intelligible to the Aryans" বৌধায়ণধর্মসূত্রে বঙ্গদেশের সঙ্গে অঙ্গের নামোল্লেখ আছে।

শতপথব্রাহ্মণে (৩।৩।২।১-২) নিষাদ শব্দটা 'নদ' নামে একজন দক্ষিণদেশীয় রাজার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। 'নদ' থেকে পরবর্তীকালে নিষাদ শব্দের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। নিষাদ-দেশের অধিবাসীদের নিষাদ বলে। নিষাদজাতি কিন্তু আর্যগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত, এরা অরণ্যচারী অনার্যজাতি নিষাদ থেকে ভিন্ন। সুতরাং নিষাদ জাতি হিসাবে আর্য ও অনার্য এই দু'রকমের উল্লেখই পাওয়া। নিষাদরাজ নলের নাম মহাভারতে ও বিভিন্ন পুরাণে উল্লেখ আছে। নিষাদ-দেশ সম্ভবত বিদর্ভের পাশাপাশি ছিল।[৪৪]

কাম্বোজের নাম বিভিন্ন সাহিত্যে ও শিলালিপি প্রভৃতিতে গান্ধারের সঙ্গে উল্লেখ দেখা যায়। সঙ্গীতে কাম্বোজী, খাম্বাজ বা খামাচী রাগ নাকি কাম্বোজদেশ থেকে আমদানী-করা, অথচ এই রাগে চারটার বেশী স্বরের প্রয়োগ আছে—অন্তত বর্তমানে। কিন্তু বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ কাম্বোজকে অনার্য-শ্রেণীভুক্ত বোলে এদের গানে মাত্র চারস্বরের প্রযোগের কথা বলেছেন, অথচ কাম্বোজকে ঠিক অনার্যদের দেশ বলা যায় না। গান্ধারের মতন কাম্বোজ উত্তরাপথে তথা ভারতের উত্তরসীমান্ত-প্রদেশে অবস্থিত।[৪৫] কাম্বোজকে কম্বুজ বা কম্বোডিয়াও বলে। এই কম্বুজ বা কাম্বোডিয়ায় হিন্দুদের বসবাস ছিল। জর্জ ইলিয়ট তাঁর *Hinduism and Buddhism*, বি. আর. চট্টোপাধ্যায় তাঁর *Indian Cultural Influence in Cambodia*, শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর *Champa* পুস্তকগুলিতে কম্বোজ বা কম্বোজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ডাঃ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন,

৪৪। Ibid., p. 261.

৪৫। (ক) কাম্বোজের নাম পাওয়া যায় মহাভারতে ১২।২০৭।৪৩ এবং রাজতরঙ্গিণীতে ৪।১৬৩-১৬৫; (খ) Cf ডাঃ বড়ুয়া: *Asoka and His Inscriptions* (1946), pt. I, pp. 92-93.

"Kamboja may have been a home of Brahmanic learning in the later Vedic period. * * The presence of Aryas (*Ayyo*) in Kamboja is recognised in the *Majjhima-Nikaya* (11. 149)." ৪৬

কিন্তু চীনা-পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ (Hiuen Tsang) রাজপুরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

"From Lampa to Rajapura the inhabitants are coarse and plain in personal appearance, of rude violent dispositions * *. They do not belong to India proper, but are inferior peoples of frontier, (*i. e.*, barbarian) stocks." ৪৭

হুয়েন সাঙ্-বর্ণিত রাজপুর ও কাম্বোজ একার্থক। যদিও মহাভারতে (২।২৭) অভিসার তথা রাজপুর ও কাম্বোজকে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তথাপি সকল সময়েই তারা ভিন্ন ছিল না। ডাঃ রায়চৌধুরী তাই বলেছেন :

"We learn from a passage of the *Mahabharata* (VII. 4. 5) that a place called Rajapura was the home of the Kambojas."

হুয়েন সাঙ্ কাম্বোজীদের অনার্য বলেছেন, ভূরিদত্তজাতকের (৬।২০৮) বর্ণনাও ঠিক তাই। নিরুক্তকার যাস্ক কাম্বোজীদের ভাষাকে আর্যভাষা থেকে ভিন্ন বলেছেন। সামবেদের বংশব্রাহ্মণে নাকি প্রাচীন কাম্বোজীদের উল্লেখ আছে। শ্রদ্ধেয় জিমারের মতে, কাম্বোজী ও মদ্ররা নিকট গোত্রীয় ছিল ও তারা ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। অধ্যাপক গ্রিয়ারসন কাম্বোজীদের ভেতর ইরাণীদের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন পারস্য-প্রস্তরলিপিতে কাম্বোজী বা কাম্বুজিয়াদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন, নিরুক্তকার যাস্ক কথ্য-সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ভিত্তিতে আর্য ও অনার্য জাতিদের বিভাগ নির্ণয় করেছেন। আচার্য যাস্ক বলেছেন, কাম্বোজ ও প্রাচ্যবাসীরা প্রাথমিক সংস্কৃত ও আর্য এবং উত্তরাঞ্চলবাসীরা প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করত। এ-থেকে বুঝা যায় যে, কাম্বোজীরা সংস্কৃত ভাষাভাষী হোলেও আর্যগোষ্ঠীভুক্ত ছিল না। উত্তরাঞ্চলবাসীরাও পূর্বাঞ্চলবাসীদের থেকে ভিন্ন ছিল। এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন :

৪৬। Cf. *Political History of Ancient India* (1938), p. 126.

৪৭। Ibid, p. 127.

"He (Yaska) divides people into those who employ primary forms and those who employ secondary forms. According to this distinction the Kambojas and the Easterners use primary and the Aryas and the Northerners derivative secondary forms. Yaska differentiates the Aryas and the Easterners and the Northerners. This shows that the Easterners and the Northerners were not Aryas—atleast, were not regarded as such by Yaska—although they must have been brought under the influence of the Aryas to such an extent as even to adopt their language."[৪৮]

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি (১।১।১) নাকি এই সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী ছিলেন।

অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিবেরা কতক আর্যভাবাপন্ন ও অনেকে অনার্য ছিল। ব্রাহ্মণসাহিত্যে এদের দস্যু নামেও অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতে (১২।২০৭।৪২) অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতিকে দক্ষিণদেশের অধিবাসী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্ধ্রেরা আসলে কৃষ্ণা ও গোদাবরী এই দুটী নদীর মাঝামাঝি স্থানে বাস করত। পুণ্ড্রদের বাঙ্গালা ও বিহারবাসী বলা হয়েছে। পৌণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ছিল উত্তর-বাঙ্গালায়। ডাঃ পুশলকর মনে করেন যে, পুণ্ড্রা বাঙ্গালাদেশের আদিবাসী: "The Pundras are probably the anscestors of the Puros, and aboriginal caste in Bengal." ডাঃ রায়চৌধুরী বলেছেন, শবর ও পুলিন্দদের বর্ণনা মৎস্য ও বায়ুপুরাণে 'দক্ষিণাপথবাসীনঃ' হিসাবে পাওয়া যায়। শবরেরা ছিল অনার্য। ঐতিহাসিক প্লিনি শবরজাতিকে 'স্থয়েরি' (Suari) ও টলেমী 'শবরী' (Sabarae) নামে উল্লেখ করেছেন। ডাঃ পুশলকর ও ডাঃ রায়চৌধুরী মনে করেন, শবরেরা সম্ভবত ভিজাগাপট্টমের পার্বত্য অঞ্চলে শবলু বা শৌরজাতিরই একটী শাখাবিশেষ। গোয়ালিয়র রাজ্যে ও উড়িষ্যার প্রান্তসীমায়ও শবরজাতির বাস ছিল।

পুলিন্দদের নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। অশোকের সময়ে অন্ধ্রদের নামের সঙ্গে পুলিন্দদেরও নামোল্লেখ করা হয়েছে। পুলিন্দদের রাজধানীর নাম পুলিন্দনগর। পুলিন্দনগর সম্ভবত দশার্না (মহাভারত ২।৫-১০) তথা বিদিশা বা ভিলসা-প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল।[৪৯] অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার

৪৮। Cf. *The Nighantu and the Nirukta* (1921), pp. 223-224.

৪৯। Cf. ডাঃ রায়চৌধুরী: *Political History of Ancient India* (1938), p. 79.

গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, মালবদের মতন পুলিন্দেরাও সুসংবদ্ধ সুসংশ্লিষ্ট জাতি ছিল। অশোকস্তম্ভের প্রাপ্তিস্থান রূপনাথের[৫০] পূর্বনাম ছিল দশার্না, এই দশার্না ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল প্রাচীন পুলিন্দজাতির কৃষ্টিকেন্দ্র।[৫১]

আমরা আগেই বলেছি যে, বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ এ-সকল জাতিকে অনার্য হিসাবে গণ্য করেছেন, অথচ এদের অনেকের ভেতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপ সুপরিস্ফুট ছিল। আবার বৃহদ্দেশী, রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থেই দেখা যায়, অনেক অনার্য-রাগে স্বরসংখ্যা সংযুক্ত ক'রে তাদের আর্যগোষ্ঠী তথা মার্গশ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। মিশ্রণ সকল কালেই স্বাভাবিক ও সম্ভব, বরং মিশ্রণের দ্বারা জাতির ও সংস্কৃতির পরিপুষ্টি ঘটে। আদি-অধিবাসী তথাকথিত আদিম অনার্যদের সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে স্বর-সংখ্যার প্রয়োগ অত্যন্ত কম ছিল এবং তাদের দেশী বা দেশীয় মার্গভিন্ন সঙ্গীত বলা হো'ত। মতঙ্গ "চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি ন মার্গঃ" কথাগুলি দ্বারা এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

আর্যজাতির সঙ্গীতে তথা রাগগোষ্ঠির মধ্যে যে অনার্যদের বিচিত্র রাগ স্থানলাভ করেছে তার বিস্তৃত বিবরণ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর "রাগ-রাগিণীর নাম-রহস্য" নামক সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে[৫২] ও "রাগ ও রূপ" বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সুবিশাল ভারতবর্ষে আর্যজাতি ছাড়া মালব, শক, হূণ, পুলিন্দ, যবন, পহ্লব, শক বাহ্লিক, গুর্জর প্রভৃতি অনার্য (?) জাতিদের বাস ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আদানপ্রদান-ব্যাপারে উভয় জাতির মধ্যে ক্রমশ সৌখ্যভাব গড়ে ওঠে এবং তারই ফলে উভয়ের মধ্যে রক্তমিশ্রণও সম্ভব হয়েছিল। সেই মিশ্রণের জন্য বৈদিকোত্তর লৌকিক সঙ্গীত মার্গ ও দেশীর মধ্যে বেশ একটী যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল এবং

৫০। ডাঃ বড়ুয়া রূপনাথ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "The three copies that lie * *, one 'on the Rupanath rock (Jabalpur District, Central Provinces), lying at the foot of the Kaimur range of hills' * * "—*Asoka and His Inscriptions* (1946) pt. II, p 5

৫১। প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত "রাগ ও রূপ" বইয়ের "ভূমিকা", পৃঃ ৯-১০

৫২। 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা' (প্রকাশক আর বি দাস, কলকাতা), ১১শ বর্ষ, ১৩৪১, বৈশাখ—চৈত্র, পৃঃ ১৯, ১৪৮, ২০৪, ২৬৭, ৪৬৭, ৫২৬, ৬৫৮, ৭১৫

ক্রমসংস্কৃতি-সাধনের ফলে অনেক দেশীগান তথা দেশীরাগ মার্গশ্রেণীর-মর্যাদা লাভ ক'রে অভিজাত সঙ্গীত-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতেতর দেশের যোগাযোগ

ভারতবর্ষে যেমন নানান্ ঘাত-প্রতিঘাত ও অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশের ভেতর দিয়ে সঙ্গীতের অগ্রগতি অপ্রতিহত ছিল, ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশেরও তেমনি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, তাতে ভারতবর্ষ করেছিল মহিমোজ্জ্বল অন্যান্য সকল দেশকে তার সঙ্গীত-সমৃদ্ধি দান ক'রে। প্লিনি, ষ্ট্রাবো, মেগাস্থিনিস, হেরোদোতাস, প্রোফাইরি প্রভৃতি প্রাচীন বিদেশী ঐতিহাসিকেরা ভারতের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে হয়েছিল একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া ভারতের প্রাচীনত্বকে তাঁরা প্রথম প্রণতি জানিয়েছিলেন শ্রদ্ধার ভাব নিয়েই। স্বামী অভেদানন্দ তাই উল্লেখ করেছেন,

"If we read the writings and historical accounts left by Pliny, Strabo, Magasthenes, Herodotus, Prophyry and a host of other ancient authors of different countries, we shall see how highly the civilization of India was regarded by them. In fact, between the years 1500 and 500 B. C., the Hindus were so far advanced in religion, metaphysics, philosophy, science, art, music, and medicine that no other nation could stand as their rival, or compete with them in any of these branches of knowledge."[৫৩]

আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিশাল গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কথা বিশ্বের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাও ভস্মীভূত হয়েছিল বিধর্মীদের অত্যাচার ও উপদ্রবের জন্য। গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের ফলে প্রাচীন গ্রীসদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ভারতবর্ষের। আলেকজান্দ্রিয়া যে কেবল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-রূপেই পরিচিত হয়েছিল তা নয়, ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করারও একটী প্রধান মধ্যম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দ সুস্পষ্টভাবে তাই বলেছেন :।

৫৩। (ক) Cf. *India and Her People* (1905-6), p. 217; (খ) Prof. S. Radhakrishnan: *Eastern Religion and Western Thought* (2nd ed. 1940).

"At that time Alexandria became the centre of trade and commerce between India and Greece, and there was great oppertunity for interchange of ideas between the Hindus and Western nations."

খৃষ্টপূর্ব ২৬০ শতকে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সাইবেরিয়া থেকে সিলোন, চীন থেকে ইজিপ্ট, সিরিয়া, পালেস্তাইন, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের বাণী ও আদর্শ প্রচার করেছিলেন। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সকল রকম শিক্ষাও বিস্তার লাভ করেছিল ভারতেতর দেশে। তাছাড়া ঐতিহাসিকেরা একথা স্বীকার করেন যে, বৌদ্ধযুগে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের কাহিনী ও প্রমাণপঞ্জী তো অতি আধুনিক যুগের কথা, সুপ্রাচীন বৈদিক সিন্ধু-সভ্যতার সময়েও ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বের সকল প্রধান প্রধান দেশের। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিহিরচাঁদ উল্লেখ করেছেন, এটা খুব বেশী সম্ভাবনা যে, বিশেষ ক'রে বাণিজ্যিক ব্যাপারে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের অধিবাসীদের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার লোকদের বেশ ঘনিষ্ট-সম্পর্ক ছিল, কেননা এই উভয় দেশের লোকেরা সমুদ্র ও প্রাচীন পথ বোলান পাশের ভেতর দিয়ে পারস্পরিক মেলামেশার ভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল:

"It is highly probable that the people of Sind and the Punjab were in close touch with the people of Mesopotemia and traded with them both by sea and the old land route running through the Bolan Pass."[৫৪]

ডা: শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর *Hindu Civilization* বইয়ে ভারতের সঙ্গে বিশ্বের অপরাপর দেশের কিভাবে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল (*Intercourse*-প্রসঙ্গে) তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[৫৫] এছাড়া আর্নেষ্ট ম্যাকে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

"Imports to the Indus Valley from other parts of India make it clear that the people of the Indus cities traded with, if they did not control, much of the country."[৫৬]

৫৪। Cf. *Mohenjo-daro* (1933), p 24.
৫৫। Cf. *Hindu Civilization* (1950), pp. 44-50.
৫৬। Cf. *Indus Civilization*, p. 199.

স্তার লিওনার্ড উলির অভিমতও তাই। ডাঃ ফ্রাঙ্কফোর্ট স্বীকার করেছেন যে, সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার সঙ্গে বাবিলোনের সভ্যতার চাক্ষুষ যোগাযোগ ছিল। এছাড়া সুমের ও ইউফ্রেটিস উপত্যকা-দুটীর সহরগুলি, মায়া, মেক্সিকো, ইণ্ডিয়ান্-আর্কিপেলেগো, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের সকল-কিছুরই আদানপ্রদান হোত সুপ্রাচীন যুগের ভারতবর্ষে।[৫৭]

সুতরাং এক সময়ে ভারতবর্ষের ভেতর ও বাইরের সকল দেশগুলির মধ্যে যে বেশ একটা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম ও সাহিত্যের মতন সঙ্গীতের অনুশীলনও অনেক দেশের জাতিদের মধ্যে সচঞ্চল ছিল। শ্রদ্ধেয় ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি তার 'ভারত ও ইন্দোচীন' এবং 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া' বই দুটীতে চীনা ও বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের ভ্রমণকাহিনীর প্রসঙ্গে ভারত ও ভারতের এলাকার বাইরের এমন কতকগুলি দেশের ও জাতির নামোল্লেখ করেছেন যারা অনার্য হিসাবে উপেক্ষিত নয়, বরং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ও আর্যই ছিল। উদাহরণের জন্য আমরা তাঁর উপাদানপূর্ণ বইখানি থেকে কতক কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম। তিনি উল্লেখ করেছেন: সমুদ্রপথে ভারতীয় সভ্যতার ধারা ইন্দোচীন, কম্বুজ, চম্পা, শ্যাম, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। স্থলপথেও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ থেকে শুরু ক'রে মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন জাতির ভেতর ভারতীয় সংস্কৃতির বীজ রোপিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনদেশের ও মধ্য-এশিয়ার নানান্ জাতির যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। "জিনগুপ্ত ৫২২ খৃষ্টাব্দে গান্ধার দেশের রাজধানী পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। * * তাঁর পিতা বজ্রসার ছিলেন গান্ধার দেশের একজন প্রধান মন্ত্রী। * * কাপশা রাজ্য এ'সময়ে ছিল গান্ধার অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী, তার কারণ ভারতবর্ষ থেকে উত্তরবাহিনী প্রধান পথ কপিশা হ'য়ে বাহ্লীক ও অন্যান্য দেশে পৌঁচেছে।" কপিশার আর একটী নাম কাফিরস্থান। ধর্মগুপ্ত নামে একজন ভারতীয় শ্রমণ

৫৭। প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত ইংরেজী *A Forgotton Chapter of Indian Music* প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য (১৯৫০ খৃষ্টাব্দে Puja Annual, *Hindustan Standard*, pp. 132-138)।

তাঁর আচার্যের সঙ্গে কান্যকুব্জ থেকে প্রথমে টক্কদেশে গমন করেন। টক্কদেশ পাঞ্জাবের উত্তর-অঞ্চলের একটী প্রাচীন নাম। পামিরের দুর্লঙ্ঘ্য স্থান অতিক্রম ক'রে তাঁরা কাশনগরে উপস্থিত হন। কাশনগর ত্যাগ ক'রে থিয়েন-শান্‌ পর্বতের পাদদেশ দিয়ে প্রথমে তাঁরা কুচার (প্রাচীন কুচা বা কুচী) দেশে ও কুচার থেকে চীনদেশে উপনীত হন।[৫৮]

"সেকালে ভারতবর্ষ হ'তে মধ্য-এশিয়া যাবার সব চাইতে প্রশস্ত পথ ছিল —ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) থেকে কুভা (বর্তমান কাবুল) নদীর তীর বেয়ে।" এ-পথে পড়ত আফগানিস্থান এবং তখন এদেশ ছিল ভারতের অন্তর্ভুক্ত। গান্ধার, নগরহার, লন্‌পাক, উড্ডিয়ান প্রভৃতি রাজ্যগুলির মধ্যে কপিশা ছিল শীর্ষস্থানীয়। কপিশা তখন ছিল ভারতবর্ষের গণ্ডীর ভেতর। "সে-সব দেশের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষাও যে ভারতীয় ছিল তার প্রমাণ সে-দেশের মাটি খুঁড়েই পাওয়া গিয়েছে।" * * কপিশা থেকে তিনটী গিরিপথের যে-কোনটী দিয়ে বাহ্লীকে (Bactria) যাওয়া যেত। "কাবুল হতে ঘোরবান্দ নদীর ধার বেয়ে বামিয়েন পৌছানো যায়। * * কপিশার মত বামিয়েন ছিল নানাদেশীয় বণিকদের কেন্দ্রস্থান, কারণ হিন্দুকুশের উত্তরে যে সব রাজ্য ছিল, বিশেষতঃ সুগদ, পারস্য, সমরকন্দ, বাহ্লীক—সে-সব দেশের বণিকেরা ভারতবর্ষের পথে, হয় বামিয়েন—না হয় কপিশাতে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বসবাস করত"।[৫৯]

"খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে আরব সৈন্য নবসংঘারাম আক্রমণ করে। * * সেই বিহারের প্রধান পুরোহিতেরা মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আরব ঐতিহাসিকগণ এই পুরোহিতদের 'বরমক' (সংস্কৃত—পরমক) নামে উল্লেখ করেছেন। * * তাঁদের প্রভাবে কালিফ ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ ও দর্শনশাস্ত্রে আকৃষ্ট হন ও লোক প্রেরণ ক'রে সিন্ধুদেশ হ'তে ঐ সব শাস্ত্রের পুঁথি সংগ্রহ করান। এই সব গ্রন্থ শীঘ্রই আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং সে দেশের পণ্ডিতদিগকে নূতন আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করে"।[৬০] "খোটানে যে জাতি বাস করত, খুব সম্ভব তারা ছিল একটা মিশ্রজাতি। তাদের মধ্যে প্রাচ্য-ইরাণীয়, শক, শূলিক,

৫৮। ডাঃ বাগচি: 'ভারত ও মধ্য-এসিয়া' (১৯৩৭), পৃ: ১-১২

৫৯। ঐ, পৃ: ১৫-১৮

৬০। ঐ, পৃ: ২৫

(বা সুগ্দীয়), চীনা, ভারতীয় সকল জাতিরই স্থান ছিল। সেখানে যে ভারতীয়দের খুব প্রাচীন উপনিবেশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। * * খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে খোটানের যে বর্ণনা পাই তা থেকে বুঝতে পারি যে, সে-দেশের অধিবাসীরা ছিল সুসভ্য, * * তাদের মধ্যে নৃত্য-গীতের প্রচলন খুব বেশী ছিল।"[৬১] "প্রাচীন ইরাণীয়ও ভারতীয়দের মত একটি আর্য জাতি। সে-জাতি ছিল সুদর্শন, গৌরবর্ণ ও নীলচক্ষু। সে-জাতি মধ্য-এশিয়ার অন্যান্য জাতি হতে অনেক বেশী সভ্য ছিল এবং তাদের হাতে ভারতীয় সভ্যতা নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। * * উপরন্তু, সে-জাতি ছিল সঙ্গীতপ্রিয়।"[৬২]

শ্রদ্ধেয় ডাঃ বাগ্‌চি আরো উল্লেখ করেছেন : "প্রাচীন কুচীয় জাতি ভারতবর্ষ হতে যে শুধু ধর্ম, লিপি, ভাষা ও সাহিত্য নিয়েছিল তা নয়। মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাদের মধ্যে নানা প্রকারের যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। সঙ্গীতে তাদের অদ্ভুত পারদর্শিতা সম্বন্ধে চীনা-সাহিত্যে নানা উল্লেখ আছে। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টিপাত শুরু হোতো তখন কুচী-সহরের সন্নিহিত পর্বতমালা নানা জল-প্রপাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত, আর কুচীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা সেই জলপ্রপাতের শব্দকে অতি নিপুণভাবে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে চীনা-সম্রাট নানা দেশের সঙ্গীত শোনবার জন্য এক বিরাট 'জলসা'-র আয়োজন করেন। এই জলসায় জাপান, কম্বুজ, কাশগর, সুগ্ধ প্রভৃতি দেশ হতে শিল্পীরা আসেন এবং তৎসঙ্গে কুচীর শিল্পীরাও আসেন। সে-জলসায় কুচীয় শিল্পী এমন দক্ষতার সঙ্গে নানা যন্ত্র-সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত করেন যে, পরিশেষে তাঁরাই সভার শ্রেষ্ঠ আসন পান। কুচীয় সঙ্গীতের অন্ততঃ ২০টী বিভিন্ন সুরের উল্লেখ চীনা-সাহিত্যে রয়েছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে সুজীব নামক এক কুচীয় শিল্পী চীনদেশে যান। চীনসম্রাজ্ঞী কুচীয়-সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করেন এবং সুজীব তাঁকে বলেন যে, কুচীয় সঙ্গীতে সাতটী সুর-গ্রাম[৬৩] আছে। এই সুরগ্রামগুলির যে নাম চীনা-সাহিত্যে

৬১। ঐ, পৃঃ ৪৪ ৬২। ঐ, পৃঃ ৬৮

৬৩। 'সুর-গ্রাম' বল্‌তে গ্রাম (scale) নয়, পরন্তু সুর তথা রাগ অথবা স্বরই এখানে বুঝতে হবে।

উল্লিখিত হয়েছে, তন্মধ্যে ষষ্ঠ স্বরের নাম হচ্ছে পন্‌-চেন্‌ (= পঞ্চম), তৃতীয়ের নাম স-লি-ছ (= ষড্‌জ), সপ্তম বৃষ এবং চতুর্থ সহগ্রাম। এ-সব নাম যে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র হতে গৃহীত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই, হয়ত তাদের প্রয়োগ ছিল কিছু পৃথক।"[৩৪]

এই সুচিন্তিত প্রমাণগুলি দেখানোর উদ্দেশ্য এই যে, মধ্য-এশিয়ায় বিভিন্ন দেশ ও জাতিগুলির মধ্যে ভারতীয় ভাবধারার যে অনুপ্রবেশ ছিল তারে নজির দেখানো। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, বাহ্লীক, অন্ধ্র, দ্রবিড বা দ্রাবিডদের অনার্য হিসাবে গণ্য ক'রে তাদের তিন বা চার স্বর-যুক্ত গানকে মার্গ তথা অভিজাত শ্রেণী হিসাবে গ্রহণ করার অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, মতঙ্গের সিদ্ধান্ত আপাতত যুক্তিসিদ্ধ বোলে মনে হোলেও অনুসন্ধানী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখ্‌লে তারা কৌলিন্য পাবার পথে উপেক্ষণীয় হয়তো নাও হোতে পারে, কেননা ঐসব দেশ ও জাতিও সংস্কৃতির আলোক দিয়ে ওদের সঙ্গীতকে যথেষ্ট-পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছিল।

বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র সঙ্গীতের বিস্তৃতি

ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র ক'রেই সঙ্গীত সর্বত্র প্রসারতা লাভ করেছিল। যজ্ঞবেদীর পাশে সামগরা অগ্নিতে আহুতি দেবার সময় নানান স্বরে ও ছন্দে সামগান করতেন। সেই সামগানই বিশ্বসঙ্গীতের মূল-উৎস। প্রধানত বাণিজ্যিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গীত অন্যান্য দেশে আমদানী হয়, তাই ভারতেতর সকল দেশ ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতধারার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মপ্রচার ও পারস্পরিক বিবাহের আদান-প্রদানও অবশ্য সকল জাতির ভেতর সঙ্গীতকলার বিস্তারের অন্যতম কারণ, পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌ কার্ট সাচস্‌ অন্তত যন্ত্র-সঙ্গীতের বিস্তৃতির বেলায় এ-কথাই স্বীকার করেছেন ('but on a cultural assimilation through age-long intercourse in warfare, trade and intermarriage")। ইস্‌রায়েল ও ঈজিপ্টের সঙ্গীত-প্রসারের প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন: "Like Israel, Egypt had experienced a sudden importation

৩৪। ডাঃ বাগচি: 'ভারত ও মধ্য-এশিয়া', পৃঃ ৭৩-৭৪

of foreign instruments and musicians"।[৬৫] খৃষ্টপূর্ব ১৮শ শতকে ইজিপ্ট যখন এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করেছিল তখন সেখানকার অধীনস্থ রাজারা নানান্ রকমের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নর্তকী ও সঙ্গীতজ্ঞা নারীদের উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ে ইজিপ্টের সঙ্গীত-সমাজে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং এশিয়া থেকে বিচিত্র রকমের এবং নূতন ধরণের বাদ্যযন্ত্রেরও আমদানী হয়েছিল—"several new types of harps were introduced; shrill oboes replaced the softer flutes; lyres, lutes, and crackling drums were introduced from Asia"। ভারতবর্ষের হিন্দু-সন্ন্যাসী ও বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মতন ইজিপ্ট, গ্রীস, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ধর্মযাজকেরাও চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও সঙ্গীতের প্রসারতা ও উন্নতির জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। পণ্ডিত কার্ট সাচ্‌স এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

"Historians of medieval and modern music would have to stress the creative role of monastic monks from Ireland in Carlovingian Germany; of Burgundian masters in the Italian Renaissance; of Italian composers all over Europe in the seventeenth century, of the Florentine Lully as creator of the French national opera; of Handel's music in England; and of German music all over the world in the nineteenth century."[৬৬]

শিল্পকলার জগতে জাতিভেদ নাই, তার অনুশীলনে ও উন্নতিসাধনে গৃহবাসী ও বনবাসী উভয়েরই সমান অধিকার। তাছাড়া বনবাসীরা স্বজন-পরিজনঘেরা ক্ষুদ্র সংসারগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও বিশ্ব-সংসারের বন্ধন থেকে একেবারে নির্মুক্ত নন, বিশ্বের কল্যাণের জন্যে তাঁরা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-যাপন ও নিজস্ব অবদানে সমৃদ্ধ করতে সকল যুগে সকল সময়েই পারেন। সুতরাং কি প্রাচ্যে ও কি পাশ্চাত্যে সমষ্টিকল্যাণকামী সন্ন্যাসী, শ্রমণ বা ভিক্ষু ও ধর্মযাজকেরা শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে ও সঙ্গীতে অমূল্য আবিষ্কার ও নব-উদ্ভাবনের পন্থা সমগ্র বিশ্বকে দিয়ে গেছেন ও এখনো দিচ্ছেন।

সকল দেশের সঙ্গীতকলার পিছনে একটী ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে,

৬৫। Cf. *The Rise of Music in the Ancient World* (1944), p. 62.
৬৬। Ibid., p. 62.

আলোক ও অন্ধকারের বিচিত্র বিবর্তনকে নিয়ে সেই ঐতিহাসিক কাহিনী রচিত। ভারতবর্ষের সঙ্গীত-বিকাশের ইতিহাস আমরা এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। কিন্তু তাহলেও ভারতীয় সঙ্গীতের সুবিস্তৃত ইতিহাসের অবতারণা করার আগে আমরা ভারতেতর কয়েকটী দেশের সঙ্গীতাভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। ইজিপ্ট, গ্রীস, এসিরীয়া, রোম, ইংলণ্ড, রাশিয়া, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশগুলির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মজীবনের ভেতর দিয়ে সঙ্গীত বিচিত্রভাবে ক্রমবিকশিত হয়েছিল। ইজিপ্টের কবরস্থানে রক্ষিত পাতায় লেখা প্রমাণপঞ্জী (hieroglyphics) ও পাথর, মাটী প্রভৃতিতে নির্মিত লেখমালা, হেরোদোতাস, ষ্ট্রাবো ও গ্রীসের অন্যান্য দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় যে, ইজিপ্টের অধিবাসীরা বিশেষ ক'রে ধর্মানুষ্ঠানে, উৎসবে ও বিভিন্ন শোভাযাত্রায় সঙ্গীতের অনুশীলন করতেন। ফ্রেডারিক ক্রোয়েষ্ট উল্লেখ করেছেন, হেরোদোতাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সঙ্গীতের প্রথম প্রবর্তন-ব্যাপারে ফ্রিজিয়ার নাগরিকদের সঙ্গে গ্রীসের অধিবাসীদের বেশ একটু মতদ্বৈতের সৃষ্টি হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগে দ্বিতীয় রামেসিসের (Rameses II) সময়ে গ্রীস যখন পিরামিডের দেশে পরিণত হয়েছিল, কর্মক্লান্ত দাস-শ্রমজীবীদের ভেতর কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের বেশ প্রচার ছিল, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই যোগদান করতেন স্বাধীনভাবে সঙ্গীতের মেলায়। তখন কি কি যন্ত্রের প্রচলন ছিল ও কিভাবে সঙ্গীতের অনুশীলন হোত তার নজির পাথরের গায়ে খোদাই-করা ভাস্কর্য ও চিত্র থেকে জানা যায়। ক্রোয়েষ্ট সে-সবের ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়েছেন এই বোলে যে, দাস-সঙ্গীত-শিল্পীরা (slave-musicians) বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তথা সঙ্গীতের যথেষ্ট অনুশীলন করত :

"We find them constantly represented in the sculptures, in groups of from two to eight persons—some women and some men—playing on various instruments as the harp, pipe, flute ; the harp, lyre, lute ; double pipe, tambourine ; the harp, double pipe, lute and flute (apparently the favourite collocation), the harp, double pipe, lute, lyre and tambourine, and other similar collocations "[৬৭]

৬৭। Cf (ক) *The Story of Music* (1902), pp. 15-16, (খ) রোবোথম : *History of Music*, p. 84.

গ্রীসের ধর্মযাজকেরা শিল্প-হিসাবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ধর্ম ও বিশেষ বিশেষ রাজকীয় অনুষ্ঠানেও সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন, ফলে গ্রীসীয় সমাজের সর্বসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সঙ্গীত

ইজিপ্টের সঙ্গীতে রাগ ও স্বর-সঙ্গতি (melody and harmony) উভয়ই পাশাপাশিভাবে ছিল। গ্রীকদের কাছ থেকে ইজিপ্টবাসীরা সঙ্গীতের উপাদান পেয়েছিল এ-কথা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ শতকে পীথাগোরাস গ্রীসীয় সঙ্গীতপদ্ধতির উন্নতি-বিধান করেন। আলিম্পস্-দি-ফ্রিজিয়ান্ গ্রীক-সঙ্গীতে বাঁশী বা বেণুর প্রচলন করেন। অবশ্য সৈনিক গীতশিল্পী তায়রৃতেয়সের (Tyrtaeus) অবদানও বড় কম ছিল না। ইজিপ্টের অধিবাসীদের মতন গ্রীকেরা বিভিন্ন ক্রীড়ায়, ধর্মে ও উৎসব-অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের বিশেষভাবে অনুশীলন করতেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দেল্‌ফির (Delphi) ধ্বংসস্তূপের খনন থেকে সঙ্গীতের ও বিশেষ ক'রে এপোলোর উদ্দেশ্যে একটী গাথাগানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

রোমের কথা অবশ্য ভিন্ন। গ্রীকেরা রোমনগরী আক্রমণ করার পর থেকে রোমের অধিবাসীদের ভেতর সঙ্গীতশিক্ষার লিপ্সা জেগেছিল এবং সেই জাগৃতি-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতেরা ছিল গ্রীসের সৈনিক ও দাসগণ।

পাশ্চাত্যদেশে সঙ্গীতের প্রথম সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল তার চমকপ্রদ একটী কাহিনীর উল্লেখ করেছেন মাননীয় চ্যাপেল তাঁর সঙ্গীতের ইতিহাসে। তিনি লিখেছেন, হার্মিসের (Hermes) গাথায় বর্ণিত আছে : জন্মের পর হোমার কিল্লেনি পর্বতের (Mount Kyllene) ওপর তাঁর গুহার পাশে একটী কচ্ছপ দেখ্‌তে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ কচ্ছপটীকে মেরে তার খোলাটী (shell) গ্রহণ করেন ও তাতে গরুর চামড়া ও ভেড়ার অন্ত্রে তৈরী সাতটী পর্দা (তাঁত) দিয়ে বাদ্যযন্ত্র (lyre) সৃষ্টি করেন। সেটী কোণের (plectrum) সাহায্যে তিনি বাজাতেন।[৬৮] অনেকে বলেন, হোমার কচ্ছপের খোলাটী পেয়েছিলেন নীল (Nile)-নদের তীরে। রোবোথমের অভিমত যে, মৃদঙ্গের (drum) সৃষ্টিই প্রথমে হয়েছিল, কেননা তার গঠন ও বাজানোর রীতি

৬৮। Cf. (ক) চ্যাপেল : *History of Music*, p. 29

সহজ ও সরল, বেণু ও বীণার (pipe and lyre) সৃষ্টি হয় তার (মৃদঙ্গের) পরে।[৬৯] কিন্তু কার্ট সাচ্‌স বলেছেন : "Music began with singing."[৭০] অনেকে আবার পাশ্চাত্যে সঙ্গীত-স্রষ্টার গৌরব দিতে চান মার্কারী, অর্‌ফিউস, তারপেণ্ডার প্রভৃতি মনীষীকে। কারো কারো মতে খৃষ্টপূর্ব ২৩৪৮ অব্দে মহাপ্লাবন (মহাপ্রলয়—Deluge) আসার আগেই জুবল্ (Jubal) যন্ত্র-সঙ্গীত তথা সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছিলেন,—"the father of all such as handle the harp and organ".[৭১]

ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসীরা ছিলেন ব্রিটন। ব্রিটনেরা কণ্ঠ ও যন্ত্র এই উভয় সঙ্গীত অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁরা কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞদের বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। তাঁরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর উৎসব ও বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে গ্যালেসিয়ান-চার্চ অনুযায়ী সঙ্গীতধারার প্রবর্তন করেন। গ্রেগোরিয়ান্-গাথাগান প্রবর্তিত হয় তারো অনেক পরে। স্যাক্সনেরা ইংলণ্ড আক্রমণ কবলে ব্রিটনেরা সুপ্রাচীন কেল্টিক সঙ্গীতের উপাদানকে সঙ্গে নিয়েই ওয়েলস্-পর্বতের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হার্পকে তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তেন। দাস-শিল্পীরা হার্প বাজাবার অধিকার পেত না। হার্প সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : (১) রাজাদের জন্যে নির্বাচিত, (২) সঙ্গীত-শিক্ষক তথা পেনসার্ডদের জন্যে এবং (৩) গণ্যমান্য লোকেদের জন্যে নির্বাচিত হার্প।

স্যাক্সনেরা যখন ইংলণ্ডে প্রবেশ করেন তখন সঙ্গে এনেছিলেন তাঁদের সঙ্গীত। তাঁরা সমাজে তখন ব্রাত্য হিসাবে পরিগণিত ছিলেন। পোপ গ্রেগরী ধর্মযাজকদের পাঠিয়ে তাঁদের খৃষ্টানধর্মে অভিষিক্ত করেন। তখন থেকেই খৃষ্টান-চার্চ ও মঠগুলিতে গ্রেগোরিয়ান্-উপাসনার প্রবর্তন হয়। সেই উপাসনায় প্রধানভাবে থাকত সঙ্গীত। ৬৭২-৭৩৫ খৃষ্টাব্দের ভেতর ইংরেজ সন্ন্যাসী ও ঐতিহাসিক বিডি (Bede) একজন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। ক্যান্টারবারির ধর্মযাজক সেন্ট ডান্‌ষ্টানও (St. Dunstan—৯২৫-৯৭৫) সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কতকগুলি চার্চে তিনি এবং

৬৯। Cf. রোবোথম : *History of Music*, p. 2

৭০। Cf. সাচ্‌স : *The Rise of Music in the Ancient World* (1944), pp. 21-22.

৭১। Cf. ক্রোরেষ্ট : *The Story of Music* (1902), p. 11.

উইন্‌চেষ্টারের বিশপ এল্‌হে (৯৩৫-৯৫১ খৃ°) অর্গ্যান ও সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন। তখনকার সময়ে চার্চ ও মঠের সন্ন্যাসীরা সঙ্গীতজ্ঞানকুশলী ছিলেন—"The monks of the time were musicians themselves and it is to them that the suppression of the romantic and erotic songs of the Saxons is ascribed."[১২]

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে নরম্যানদের অভিযানের পরও ইংলণ্ডে সঙ্গীতের অনুশীলনে কোন দৈন্য দেখা দেয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রেও সৈনিকেরা সঙ্গীতকে তাদের জীবন-মরণের সঙ্গী করেছিল। নরম্যানদের যুদ্ধাভিযানের পর সঙ্গীত-শিক্ষকদের বলা হোত মিন্‌স্‌ট্রেলস্‌ (minstrels)। প্রথম রিচার্ড (১১৫৭-১১৯৯ খৃষ্টাব্দ) সঙ্গীত ও কাব্যের পরম-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও তিনি বীণা (lyre) বাজাতে পারতেন। প্যালেষ্টাইন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি যখন কারারুদ্ধ হন তখন কারাগৃহে তাঁকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন শ্রদ্ধেয় ব্লণ্ডেল (Blondel)। শোনা যায় ১১৩৩-১১৪৯ খৃষ্টাব্দের ভেতর দ্বিতীয় হেন্‌রীই 'ডক্টর অব মিউজিক' এই পদবী-দানের প্রথম প্রবর্তন করেন। অনেকের মতে, ঐ পদবী প্রবর্তিত হয় আনুমানিক ১২০৭ খৃষ্টাব্দে রাজা জনের রাজত্বকালে। তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১১৮০-১২৫০ শতাব্দীতে ইভ্‌স্‌হামে ওয়াল্টার ওডিংটনের (Walter Odington) অভ্যুদয় হয়। তিনিই প্রথমে সঙ্গীতের স্বরগুলিকে ছোট, বড় ও দ্বিগুণ ইত্যাদি ক'রে সাতটী অক্ষরের দ্বারা স্বর-লিখনের প্রবর্তন করেন। মোটকথা স্বরলিপির প্রচার হয় তাঁর সময় থেকেই। ১৩৪০-১৪০০ খৃষ্টাব্দে চসারের সময়ে সর্বসাধারণের শিক্ষণীয় হিসাবে সঙ্গীত গৃহীত হয়। খৃষ্টান-চার্চের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সকলেই সঙ্গীতের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।[১৩]

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, সঙ্গীতে স্বরলিপিপ্রথার ক্রমবিকাশ ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতেরও বিস্তৃতি হোতে থাকে। ১২৮০-১৩২০ খৃষ্টাব্দে পাডুয়ার মার্চেট্টাস (Marchettus of Padua), ১৩৩০-১৪০০ খৃষ্টাব্দে প্যারির জন্‌ ডি মুরিস, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে রিডিঙের ধর্মযাজক জন্‌ অব ফর্ণসেট্‌ প্রভৃতি শিল্পীরা সঙ্গীতধারার উন্নতিসাধন করেন।

১২। স্যার এস. এম. ঠাকুর : *Universal History of Music* (1896), p. 158.
১৩। Ibid., p. 258.

অবশ্য ১৪শ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণ ইত্যাদি দেশে সঙ্গীত-রচনার কাজ বিশেষভাবে প্রসার লাভ করেছিল।

১৪শ—১৬শ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুইলাম্ ডাফে (১৩৫০-১৪৩২ খৃ°), জোহান ওকেন্‌হেম্ (১৪৩০-১৫১৩ খৃ°), জোকুইন-ডি-প্রেস (১৪৪৫-১৫২১ খৃ°), উইলার্ট (১৪৯০-১৫৬৩ খৃ°), ওর্ল্যাণ্ডো লাসাস্ (১৫২০-১৫৯৪ খৃ°) প্রভৃতি মনীষীরা পাশ্চাত্যে সঙ্গীতের প্রচারকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া ১৫০৩-১৫১৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জুলিয়াস বেলজিয়ামের সঙ্গীতশিল্পীদের রোমে আহ্বান করেন ও তাঁদের ওপর চার্চীয় সঙ্গীতের (Church-music) ভার অর্পণ করেন। সেই সময়ে অর্গ্যানযন্ত্রের আবির্ভাব হয়; তার আগে প্রাচীন হাইড্রোলিক বা জল-অর্গ্যানের প্রচলন ছিল। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ফসেম্‌বোর্ণের মুদ্রাকর অট্টেভিও পেট্রুসি চলমান ধাতুনির্মিত অক্ষরের সাহায্যে সাঙ্গীতিক স্বরগুলিকে মুদ্রিত করেন। ইনি ইতালীয় অধিবাসী ছিলেন, তাই সেই সময়কার সঙ্গীতে উন্নতির জন্যে ইতালীর নিকট পাশ্চাত্য শিল্পীরা ঋণী। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গানে ইতালীয় পদ্ধতির (Italian School) প্রচলন হয়। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় শিল্পী ফেষ্টার পরিচালনায় সেই পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। অবশ্য ১৫২৪-১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্যালেষ্ট্রিন নামে আর একজন সঙ্গীত-মনীষীর নাম শোনা যায়। ইনি ভ্যাটিকান-উপাসনার জন্যে সঙ্গীত (Masses) রচনা করেন, তাই রোমীয় চার্চেও সঙ্গীতের অনুশীলন তখন থেকে প্রচলিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৫৪০-১৬১২ অব্দে গেব্রিএলি নামে একজন ইতালীয় সঙ্গীত-শিল্পী পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। তিনিই বলতে গেলে—প্রথমে সমবেতভাবে অর্কেষ্ট্রা-সঙ্গীতের প্রচলন করেন। সেই অর্কেষ্ট্রা গঠিত হোত: একটি ভাওলিন (বেহালা), তিনটি কর্ণেট ও দুটী ট্রোম্‌বোন্‌সের সমবায়ে। তবে একথা ঠিক যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যে যন্ত্র-সঙ্গীতের নির্দিষ্ট কোন রূপ ও প্রচলন না থাকায় বর্তমান আকারের অর্কেষ্ট্রার প্রবর্তন ঠিক কোন্ সময় থেকে হয় তার নির্ণয় করা কঠিন।[৭৪]

এরপর অপেরার সৃষ্টি হয়। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে পেরি, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর

৭৪। (ক) ফ্রোরেষ্ট: *The Story of Music* (1902), p. 63; (খ) Cf. *The Musical Companion* (1949) edited by A. L. Bacharach, pp. 95-648.

মাঝামাঝি ফিলিপ-ডি-নেরি, এমিলিও-ভিল্-ক্যভালিয়ে প্রভৃতি অপেরা-সঙ্গীতের উন্নতিসাধন করেন। খৃষ্টীয় ১৪৮৩-১৫৪৬ অব্দে লুথারের সময়ে সঙ্গীতের আবার নূতন ক'রে সংস্কার সাধিত হয় এবং সেই সংস্কার-যজ্ঞের হোতা কেবল লুথারই ছিলেন না, সঙ্গীতজ্ঞানী শাজ্, কাইজার, গ্রান্ প্রভৃতিও ছিলেন। সে-সময়ে রোম্যান্ প্লেন-সঙ্গীতের পরিবর্তে কোরাল্-সঙ্গীতের (*Choral*) প্রচলন হয়।

খৃষ্টীয় ১৫৩৫-১৫৩৭ অব্দের মধ্যে অষ্টম হেনরীর সময় ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি নানান্ কারণে পরিত্যক্ত হয় এবং নূতন চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের জগতেও এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ঐতিহাসিকেরা সেটাকে এলিজাবেথের স্বর্ণযুগ বলেন। তখন থেকেই নূতন ভাব ও প্রেরণা নিয়ে মার্বেকে (১৫২৩-১৫৮৫ খৃ°), ট্যালিস্ (১৫২৯-১৫৮৫ খৃ°), বার্ডে (১৫৪৩-১৬২৩ খৃ°), ফ্যারাণ্ট্ (১৫৩৮-১৫৮০ খৃ°) ও বুল্ (১৫৬৩-১৬২২ খৃ°) প্রভৃতি মনীষীরা চার্চীয় সঙ্গীত রচনা করতে আরম্ভ করেন।

তারপর নানান্ পরিবর্তনের পর খৃষ্টীয় ১৬৮৫-১৭৫৯ অব্দের মধ্যে জোহান্ সেবাষ্টিয়ান্ বাক্ (১৬৮৫-১৭৫০ খৃ°) ও জর্জ ফ্রেডারিক হ্যাণ্ডেল (১৬৮৫-১৭৫৯ খৃ°) প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। বাক্ ও হ্যাণ্ডেল পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভেতর নবপ্রেরণা সৃষ্টি করেন। ১৭৩২-১৮০৯ খৃষ্টাব্দে হাইডেন সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি-বিধান করেন। তিনি রচনা করেন ১১৮টী সিম্পনী, ৮৩টী কোয়ার্ট্রেট, ২৪টী কন্সার্টো, ২৪টী ট্রায়ো, ৪৪টী সোনাটা, ১৯টী অপেরা, ১৫টী মাস্, ৪০০টী অড্-ডান্স্, এবং ১৬৩টী ব্যারিটোন্-পিস্। সিম্পনী-সঙ্গীতে হাইডেনের অশেষ কৃতিত্ব থাক্লেও 'চেম্বার-মিউজিক' রচনায়ই তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ১৭৫৬-১৭৯১ খৃষ্টাব্দ মোজার্টের (Mozart) যুগ। তিনি জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৫ বছর এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে অপেরা-সঙ্গীতের জগতে তিনি এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলেন। তবে মোজার্টের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ছিল মাস্ (Masses)। তিনি ৪৯টী সিম্পনী রচনা করেছিলেন। যন্ত্র-সঙ্গীতকে একক ও সমবেত এই দু'রকমভাবেই তিনি পরিচালনা করতে পারতেন। বল্‌তে গেলে প্রাচীন ইতালীয় অপেরায় তিনি নূতন প্রাণসঞ্চার করেন। ১৭৭০-১৮২৭ খৃষ্টাব্দ বেটোভেনের (Beethoven) যুগ। দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তিনি জীবনে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন। পিয়ানোফোর্ট-সঙ্গীতের রচয়িতা হিসাবে তিনি সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

বেটোভেনের আগে কোরেলি (১৬৫৩-১৭১২ খৃ°), টরেলি (১৬৮৩-১৭০৮) বেণ্ডা (১৭২২-১৭৯৫ খৃ°), ষ্ট্যামিজ (১৭১৯-১৮০১ খৃ°), গোসেক্ (১৭৩৩-১৮২৯ খৃ°), ভ্যান্‌হল্ (১৭৩৯-১৮১৩ খৃ°), প্রভৃতির অভ্যুদয় হয়। ওয়েবার (১৭৮৬-১৮২৬ খৃ°), শুবার্ট (Schubert—১৭৯৭-১৮২৮ খৃ°), মেণ্ডেল্‌শন্ (১৮০৯-১৮৪৭ খৃ°), শুম্যান্ (১৮১০-১৮৫৬ খৃ°), বার্‌লিওর্ড (১৮০৩-১৮৯৬ খৃ°), রোমিয় শিল্পী ভার্ডি (১৮১৪-১৯০১ খৃ°) প্রভৃতি মনীষীরাও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করেছিলেন। এ-ছাড়া বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অসংখ্য সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অগ্রগতিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন ও করছেন।

ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশে গোড়াকার দিকে সঙ্গীত ছিল ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত; মন্দির ও চার্চের উপাসনার মাধ্যমে হোত সঙ্গীতের অনুশীলন। ইতালীয় সঙ্গীতের প্রাচীন বিকাশের কথা ছেড়ে দিলে মধ্যযুগে নেরোর (Nero) মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতকলা গোঁড়াপন্থী খৃষ্টানদের হাতে গিয়ে পড়েছিল। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এর পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন:

"In the first ages of the church, music formed an important item of divine worship, and it is supposed that it was the solemn music of the Temple, derived from the ancient Jews, and communicated with the psalms, to the Christians, by the first teachers of the religion."[৭৫]

কনষ্টান্‌টাইন-দি-গ্রেটের পুত্র সম্রাট কনষ্টান্‌টিয়সের রাজত্বের সময়ে সঙ্গীত খৃষ্টান-চার্চের উপাসনার একটী অপরিহার্য অংশ-রূপে পরিগণিত হয়েছিল। থিওডোসিয়াসের রাজত্বকালে সেণ্ট এ্যাম্ব্রোস 'ক্যান্‌টাস্ এ্যাম্ব্রোসিয়ানাস্' (*Cantus Ambrosianus*) নামে সঙ্গীতের একটী নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। সেই পদ্ধতিতে চারটী প্রামাণিক বা প্রধান গ্রামের (authentic or principal modes) প্রচলন ছিল: ডোরিয়ান (Dorian, from D to d), ফ্রিজিয়ান (Phrygian, from E to e), ইয়োলিয়ান (Æolian, from F to f) ও মিক্সোলিডিয়ান (Mixolydian, from G to g)। গ্রীকেরা এই চারটী ধারার নামকরণ করেছিলেন: প্রোতোস্

৭৫। Cf. স্যার ঠাকুর: *Universal History of Music* (1896), pp 230—231.

বা প্রথম, দ্যুতারস্ বা দ্বিতীয়, ত্রিতোস্ বা তৃতীয় ও তেতারতোস্ বা চতুর্থ (*protos, deuteros, tritos, tetartos*)। পোপ সেন্ট্ গ্রেগরী সেন্ট এ্যাম্ব্রোসের চারটী গ্রামের গ্রীসিয় স্বরনামকে রোমক অক্ষরে প্রকাশ করেন। পোপ ভিটালিয়ান চার্চে সেই সময় অর্গ্যানের প্রবর্তন করেন। গ্রেগোরিয়ান্-প্লেন-সঙ্ (Plain-song)-এর প্রচলনও সেই সময়ে হয়। গার্বার্ট স্কোলাস্টিকাস্ অর্গ্যান-যন্ত্রটীর আরো সংস্কার-সাধন করেন। আরেজু-র (Arezoo) বেনেডিক্টাইন খৃষ্টান-মন্দিরে (চার্চে) শিল্পী গুইডো আবার নূতন সঙ্গীতধারার প্রবর্তন করেন। তার ফলে রোম ও ইতালীর কোন কোন অংশে সঙ্গীতে নূতন পরিবর্তন দেখা দেয়। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বোকাসিয়ো এবং ১৫শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ অর্গ্যান-বাদক ফ্লোরেন্সের এ্যান্টোনিয়ো সঙ্গীতের গতিকে পুনরায় উন্নততর আকারে প্রবর্তিত করেন। খৃষ্টীয় ১৪৫০-১৪৯০ শতাব্দীর মধ্যে ব্র্যাবান্টের জন্ টিক্টোর সঙ্গীতে নেপোলিটান্-ধারার (Neapolitan School) প্রবর্তন করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে কাউন্ট গিয়াকোমো কর্সি অপেরার অভিনয় শুরু করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ইতালীতে বহু প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞের অভ্যুদয় হয়েছিল; তাঁদের মধ্যে দ্বিতীয় বারানেলো (১৭০৩-১৮০৫ খৃ°), নিক্কোলা পিক্কিনি (১৭২৮-১৮০০ খৃ°), গিওভান্নি-বাট্টিস্তা-বোনোন্সিনি; সেবাস্তিয়ানো নাজোলিনি (১৭৬৮-১৭৯৯ খৃ°), মার্টিনি (১৭০৬-১৭৮৪ খৃ°), গাইসেপ্পে-টার্টিনি (১৬৯২-১৭৭০ খৃ°) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অপেরা, ট্যারান্টুলা-নৃত্য (দক্ষিণ ইতালীর নৃত্য), কনসার্ট ও বিভিন্ন সঙ্গীত বিস্তার লাভ করে। ইতালী যথার্থই সঙ্গীতের দেশ; শিল্পীরা সেখানকার বেশ সৌখীন, মেজাজী ও ভাবপ্রবণ।

ভারতেতর অন্যান্য দেশকে ভারতই সঙ্গীতের উপাদান জুগিয়েছিল

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বিদেশ থেকে সঙ্গীতের আমদানীতে প্রত্যেক দেশের সঙ্গীত-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং সেই বিদেশের পরিচয় দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকারেরা ব্যবহার করেছেন 'from abroad', 'from the East', 'from the middle east' প্রভৃতি শব্দগুলি; অথবা উল্লেখ করেছেন—পাশ্চাত্য প্রাচ্যের তথা 'Eastern music'-এর কাছে

ঙ্গী।[১৬] এম. ডি. কাল্‌ভোকোরেশী রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের বিকাশের প্রসঙ্গে লিখেছেন: "Russian national music owes much to the influence of native folk-music, and also of Eastern music"।[১৭] একথা ঠিক যে, লোকসঙ্গীত থেকেই বিচিত্র রকমের অভিজাত ও উন্নত সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাহলেও বিদেশী সঙ্গীতের ছোঁয়াচ অনেক দেশের সঙ্গীতের পিছনে থাকা স্বাভাবিক। বিশ্ব-সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করলে প্রমাণ হয়, ভারতবর্ষ এমন একটী আদিম ও সুপ্রাচীন দেশ যেখানে সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, দর্শন ও সঙ্গীতের হয়েছিল প্রথম সৃষ্টি ও সে-সমস্তই বাণিজ্যিক অভিযান ও ধর্ম-প্রচারের মাধ্যমে ভারতের বাইরে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যদেশের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রোম, আরব অথবা পারস্তদেশ ভারতবর্ষকে সঙ্গীতের উপাদান জোগায় নি, বরং আরব ও পারস্যই এবং বিশেষ ক'রে গ্রীস ভারতের কাছ থেকে সঙ্গীতের মালমশলা গ্রহণ করেছিল। স্বামী অভেদানন্দ তাই সঙ্গীতের গ্রাম ও স্বর-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন:

"And the scale with seven notes and three octaves was known in India centuries before the Greeks had it. Probably the Greeks learnt it from the Hindus."

মাননীয় ডানিয়েলুও অনুমান করেছেন:

"Greek music, like Egyptian music, most probably had its roots in Hindu music, or, atleast, in that universal system of music much of which the tradition has been fully kept only by the Hindus."[১৮]

ডাঃ বার্ণেট (Dr. Burnet) গ্রীসে পীথাগোরাসের সময়ে একটী বীণার (lyre) পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সাতটী তার সংযুক্ত ছিল। সাতটী তার বা তন্ত্রীযুক্ত লায়ার (lyre) সম্ভবত আমাদের সাতটী তার-বিশিষ্ট চিত্রাবীণার মতন এবং চিত্রাবীণাই পরে সেতারযন্ত্রে নব-রূপায়িত হয়। গ্রীক-দার্শনিক পীথাগোরাস ভারতবর্ষে এসেছিলেন ও সঙ্গে নিয়ে গিছলেন ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের মতন হিন্দু-সঙ্গীতেরও অনেক উপাদান,

১৬। প্রজ্ঞানানন্দ: 'রাগ ও রূপ' (১৩৫৬), পৃ° ৪৪
১৭। Cf. *A Survey of Russian Music* (1944), p. 11.
১৮। Cf. *Introduction to the Study of Musical Scales* (1943), pp. 159-160.

সুতরাং সেদিক থেকে গ্রীস যে ভারতবর্ষের অনেক-কিছু বিষয়ের জ্ঞানলাভ ক'রে তার সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করেছিল একথা ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করেন। ডাঃ বার্ণেট উল্লেখ করেছেন: "In the time of Pythagoras the lyre had seven strings and it is not probable that the eighth was added later as the result of his discoveries."[৭৯] পণ্ডিত লেসী ও'লিয়ারীও বলেছেন: "The Pythagorean elements probably can be traced ultimately to an Indian source."[৮০]

রাশিয়ায় সঙ্গীতের বিকাশ

রাশিয়ার সঙ্গীতও গড়ে উঠেছিল সেখানকার জাতীয় ও লোকসঙ্গীতকে ভিত্তি ক'রে। রোম, গ্রীস, ইতালী, ইংলণ্ড, জার্মাণীও পরিপুষ্ট করেছিল রাশিয়ার সঙ্গীত-বিকাশকে। একঘেয়ে ভাবকে কোন দেশ কোনদিনই ভালবাসে না, সুতরাং প্রত্যেক জিনিসের ক্রমপরিবর্তন অপরিহার্য। রাশিয়ার সঙ্গীত পরিপুষ্টি লাভ করেছিল খৃষ্টীয় ১৮শ-১৯শ শতাব্দীতে অপেরা-সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে। রোম্যাণ্টিসিজিমের অনুপ্রবেশ রাশিয়ার সঙ্গীতে এক নবযুগের সূচনা করেছিল। কোন কোন গ্রীক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রীকেরা যখন গ্রীসের উত্তরদেশীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছিলেন তখন তিনজন বন্দীকে তাঁরা শৃঙ্খলিত ক'রে নিয়ে আসেন। বন্দীদের হাতে অস্ত্রের পরিবর্তে ছিল সিথার (Cithers ; শ্লাভনিক ভাষায় *Gusil*)। বন্দীরা জাতিতে ছিল শ্লাভ, পশ্চিম সাগরের সীমান্ত তথা বাল্টিক থেকে আগত, তারা ছিল সত্যিকারের সঙ্গীতশিল্পী, সৈনিক নয়।[৮১] খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে সম্রাট কন্‌ষ্টান্‌টাইন পোফাইরোজেনিটাসও বাইজান্‌টিয়ামে তাঁর উপাসনা শ্লাভ-সঙ্গীতের মাধ্যমে করতেন।

সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ কাল্‌ভোকোরেশী উল্লেখ করেছেন: "ভাস্কর্য, ফ্রেস্কোচিত্র, ঐ ধরণের স্মৃতিপ্রস্তর ও অন্যান্য যুগের গ্রন্থকারদের প্রমাণপঞ্জী থেকে খৃষ্টীয়

৭৯। Cf *Greek Philosophy, Thales to Ploto* (1943), pp. 45—46.
৮০। Cf. *Arabic Thought and Its Place in History*, p. 10.
৮১। Cf. *A Survey of Russian Music* (1944), p. 17.

১০ম শতাব্দীর সঙ্গীতের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেছে। ১০ম শতাব্দীতে আকমেট্-ইব্‌ন্-ফাড্‌লান নামে একজন আরববাসী ভল্গানদীর তীরবর্তী বুলগেরিয়ানদের বাসভূমি পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার উচ্চপদস্থ একজন বুলগেরিয়াবাসীর অন্ত্যেষ্টি-অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শবানুষ্ঠানে যে-উপাসনা হয়েছিল তাতে রীতিমত সঙ্গীত ছিল এবং মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শবভূমিতে একটী বাদ্যযন্ত্রও রাখা হয়েছিল। ঠিক ঐ সময়ের আর একজন লেখক ওমর্-ইব্‌ন্-দষ্টা-ও উল্লেখ ক'রেছেন, কুয়ফ্ বা কিয়েফের (Kooyaf or Kief) শ্লাভেরা বিচিত্ররকমের তন্ত্রীযুক্ত যন্ত্র ও বাঁশীর ব্যবহার জান্‌ত।"[৮২]

উপরিউক্ত প্রমাণ থেকে একথা পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, রাশিয়ার আদিম সঙ্গীত ছিল লোকসঙ্গীত। তারপর সঙ্গীত-সংস্কৃতির জাগরণ আসে দক্ষিণ ও পূর্বদেশ থেকে: প্রথমে গ্রীস ও রোম ও পরে বাইজান্‌টিয়াম্ ও আরববাসীদের কাছ থেকে। ক্রমে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বুলগেরিয়াবাসী ও ভল্গানদীর তীরবাসী সমস্ত দক্ষিণ-শ্লাভদের ভেতর সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়ে রাশিয়ার জাতীয় বা দেশী বাদ্যযন্ত্রগুলির বিশেষ প্রচলন ছিল—"At that time, there existed typically national Russian instruments, different from those in use elsewhere that came to be imported.[৮৩] ভারতে প্রাচীন যুগে যেমন বেণু ও বীণার প্রচলন সকল শিল্পীর মধ্যে ছিল, কেবল রাশিয়া কেন, জার্মাণী ইংলণ্ড রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলিতেও ঐ দুটী যন্ত্রের অনুশীলন হোত। ভারতবর্ষে নানান্ বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাদের পূজায় ও উপাসনায় যেমন বিচিত্র লোকসঙ্গীতের প্রচলন ছিল, রাশিয়াতেও ঠিক তাই। কাল্‌ভোকোরেশী তাই উল্লেখ করেছেন,

"No actual example of primitive Russian music is known, * *, Countless references to the old mythological deities occur, and also much

৮২। "Other evidence is provided by sculptures, frescoes, and similar monuments, as well as by writers of different periods. In the tenth century * * * used by the Slavs of Kooyaf, or Kief."—*A Survey of Russian Music* (1944), p. 18.

৮৩। Ibid., p. 18.

that would be meaningless except in connection with sun-worship, tree-worship, and so on."৮৪

কেবল রাশিয়া কেন, সকল দেশের প্রাচীন সমাজের দিকে তাকালে আমরা দেখ্‌ব, সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ধারা প্রায় এক রকমই ছিল। সকল ধারার মূল বা সৃষ্টিকেন্দ্রও নিশ্চয় একটি ছিল এবং প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করলে ভারতবর্ষকেই সেই মূল সৃষ্টিকেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা সঙ্গত হবে।

প্রাচীন রাশিয়ার গান বা সঙ্গীতের অবস্থার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের গানের বিকাশের যথেষ্ট মিল এবং এই মিল বা ঐক্য সকল প্রাচীন সভ্যদেশের সঙ্গীত-বিকাশের সঙ্গেই পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে বৈদিক গানের প্রচলন ছিল এবং কি রকম সহজ সরলভাবে তার অনুশীলন হোত আমরা 'আরণ্যক ও উপনিষদে সঙ্গীত' অধ্যায়ে সে-বিষয়ে আলোচনা করেছি। একটি দু'টী অথবা তিনটীমাত্র স্বরে লীলায়িত ছিল সকল দেশেরই প্রাচীন সঙ্গীত, পরবর্তী যুগে সুরুচি, গ্রহনীশক্তি ও বুদ্ধির ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ও বিশেষ ক'রে শিল্পীদের কাছে সেগুলি প্রতীত হোত সহজ সরল ও বৈচিত্র্যহীন সঙ্গীত হিসাবে। শিল্পীদের মাঝে হয় অসন্তোষের সৃষ্টি ও সেই অসন্তোষ এনে দিয়েছিল নব-সৃজনের প্রেরণা তাঁদের মনে এবং তার জন্যেই পরবর্তী বিকাশের পথ হয়েছিল উন্মুক্ত। লেখক কাল্‌ভোকোরেশী রাশিয়ার প্রাচীন সঙ্গীত-সম্বন্ধে বলেছেন,

"As to the music, all that could be said would be merely conjectural. It is clear enough, however, that archaic features are present in many of those folk-tunes. * * But, durning all these centuries and long after, no art-forms, even rudimentary, seem to have been evolved from that folk-music."

রাশিয়ার সঙ্গীতে মাধুর্য ও কৌলিন্যের রূপ সৃষ্টি হয়েছিল অনেক পরের যুগে এবং কাল্‌ভোকোরেশী বলেছেন, সে-সৃষ্টির পিছনে ছিল বিদেশের প্রেরণা— "were importations from abroad." গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড এবং এমন কি আরব ও পরস্যের ইতিহাসেও ঐ সকল দেশের অভিজাত শিল্প ও সঙ্গীতের বেলায় বিদেশী প্রভাবকে স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু বিদেশী প্রভাবের মূল-উৎসটী

৮৪। Ibid., p. 18.

সত্যিকারের কোন্ দেশ, কোন ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকারই তার বিবরণ সুপরিস্ফুটভাবে দিতে পারেন নি। অথচ ভারতের ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বকে সকল দেশের মনীষীরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে প্রথমে সঙ্গীতের স্বরলিপি ও সঙ্গে সঙ্গে বাইজান্টাইন চার্চ-সঙ্গীতের প্রবর্তন হয়। ঠিক সেই সময়ে নৃত্য, গীত ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রেরও প্রচলন হয়। খৃষ্টীয় ১১৬৯ অব্দে কিয়েফ নগরী বিধ্বস্ত হয় ও তার পরিবর্তে নভ্‌গোরোড সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। আবার খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে মস্কো রাশিয়ান সভ্যতার কেন্দ্ররূপে নির্বাচিত হয়। ঐ সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে ইতালী, জার্মাণী, তুরস্ক ও এশিয়ার অন্তর্গত বোখারার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল, ফলে ঐ সকল দেশের সঙ্গীতের ধারা রাশিয়ার সঙ্গীতকেও পরিপুষ্ট করেছিল। তৃতীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক আইভান খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে শোফিয়া পালিওলোগোস্ নাম্নী গ্রীক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহ-বাসরে সঙ্গীতের এক বিরাট জলসার আয়োজন হয়েছিল। খৃষ্টীয় ১৪৯০ শতাব্দীতে জোহান সাল্‌ভেটার নামে একজন অর্গ্যান-বাদক তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে মস্কো-নগরীতে আসেন। সে-সময়ে একটী কোর্ট-চ্যাপেল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে ৩৫জন গায়ক নিযুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬০৫-১৬০৬ অব্দে ডিমিট্রি-দি-ইম্‌পোস্‌ষ্টার-এর রাজত্বকালে আবার পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় ১৬৪৫-১৬৭৬ অব্দে মিখালোভিচের রাজত্ব-সময়ে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক আরো নিবিড়তর হোয়ে উঠেছিল। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে কোর্ট-থিয়েটার গড়ে ওঠে। শ্লাভ ও ককেশিয়ান সঙ্গীতের সঙ্গে পোলিশ-নৃত্যেরও তখন প্রচলন হয়েছিল। ১৬৮৬-১৭২৫ খৃষ্টাব্দে পিটার-দি-গ্রেটের সময়ে বিদেশ থেকে অনেক অভিনেতা ও সঙ্গীতশিল্পীকে রাশিয়ায় আমদানী করা হয়। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে মস্কোতে জনসাধারণের জন্যে একটী প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে পিটার্সবার্গ সঙ্গীতশিক্ষার একটী সচল কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭৩০-১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী এ্যান-এর (Anna) রাজত্বকালে সঙ্গীত বেশ প্রসার লাভ করে। ১৭৪১-১৭৬১ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় ইতালীয় সঙ্গীতও রাশিয়ায় সমাদৃত হয়। তাছাড়া ক্যাথেরিন্ দি-গ্রেটের সময়ে (১৭৬২-১৭৯৬ খৃ°) ইতালীয় সঙ্গীতের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশী শিল্পকলার প্রসার ও দেশী-সঙ্গীতের জাগরণের

সন্ধিক্ষণে পাশ্‌কেভিচ্‌ (Pashkevitch), খাণ্ডোস্কিন্‌ (Khandoshkin) প্রভৃতি সঙ্গীত-রচয়িতাদের অভ্যুদয় হয়। তবুও রাশিয়ার সঙ্গীতানুষ্ঠানে তখনো ইতালীয়, ইংলিশ, জার্মাণ, ডানিশ প্রভৃতি সঙ্গীতধারার অনুশীলন হোত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার শিল্পী খাণ্ডোস্কিন্‌ কন্‌সার্টের বহুলপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তখন প্রকাশ্যভাবে অপেরা-সঙ্গীতেরও অনুষ্ঠান চল্‌তে থাকে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্র্যাণ্ড-কন্‌ষ্ট্যান্‌টাইন সক্সে-কোবার্গ-গোথার ডিউককে ৩০০ যন্ত্রশিল্পী উপহার-রূপে প্রেরণ করেন। সেই সময়ে আবার চেম্বার-মিউজিকও বেশ প্রসার লাভ করে; কিন্তু তাহলেও তখন লোকসঙ্গীতের আদর রাশিয়ার সর্বসাধারণের সমাজে মোটেই শিথিল হয়নি। ঐতিহাসিক কাল্‌ভোকোরেশী তাই উল্লেখ করেছেন,

"The most important point is that while foreign music and musicians were beginning to spread musical culture and fashions, native folk-music, instead of receding into the background, was holding its own in all classes of society, * * *."[৮৫]

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সঙ্গীতের রূপায়ণ আরো নূতন আকারে দেখা দিয়েছিল স্বাবলম্বী শ্রমপরায়ণ রাশিয়ার অধিবাসীদের ভেতর। সভ্য রাশিয়ার সঙ্গীত বর্তমানে দ্রুত উন্নতির পথে ছুটে চলেছে, তবে তার প্রকৃতি, রূপ ও পদ্ধতি বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য ধরণকেই অনুসরণ ক'রে চলে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গীতও একদিনে গড়ে ওঠেনি। তুরস্ক, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, বেলজিয়াম, জার্মাণী, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং আমেরিকার বিভিন্নদেশে সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ হয়েছে এক-রকমভাবেই এবং বর্তমানে বিচিত্র ছন্দে ও সুরে তারা পরস্পরের প্রতি যোগ-সূত্র রক্ষা ক'রে অগ্রগতির পথে ছুটে চলেছে।

পারস্যদেশে সঙ্গীত

এশিয়ার অপরাপর দেশগুলির মধ্যেও তাই। পারস্য, আরব, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গীত প্রাচীনকাল থেকে নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা ক'রে গড়ে উঠেছে তাদের মহিমময় রূপ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আগে-পর্যন্ত পারস্যের সঙ্গীতে দৈন্য ছিল। সুসা ও পার্‌সিপোলিশের দরবারে সঙ্গীতের অনুশীলন হোত।

৮৫। Cf. *A Survey of Russian Music* (1944), p. 23

ডারিয়ুসের (Darius) দরবারে ৩২৯ জন নারী-সঙ্গীতশিল্পী ছিল। জেনোফোনও একথা স্বীকার করেছেন। স্যাসানাইড্‌সদের (Sassanides) সময়ে পারস্যের দরবারে উৎসব-উপলক্ষ্যে সঙ্গীতের অধিবেশন বসত।[৮৬] ফেটিসের (Fe'tis) মতে, প্রাচীন পারস্য-সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের হুবহু মিল ছিল এবং মিল থাকাই স্বাভাবিক। পারস্য ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাপারে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ ছিল এবং ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গীতের উপাদান পারস্যে পৌঁচেছিল সেই যোগাযোগের মাধ্যমে।

পারস্যে মুসলমানদের অভিযানের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের অনেক পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ নষ্ট হয়েছিল, মুষ্টিমেয় কয়েকখানিমাত্র সঙ্গীতগ্রন্থ রক্ষা পেয়েছিল। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এ-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

"** it would appear that, when the Mussulmans conquered Persia, Saad, the son of Abu-wakhas, wrote to Omar (who was the second Caliph after Muhammed), to be allowed to send a number of books to him, ** that the only musical work now known to exist in the Persian language is one entitled *Heela Imaeli*, mentioned in a catalogue of MSS. appended to Mr. Fraser's History of Nadir Shah."[৮৭]

প্রবাদ যে, জেম্‌শিদ্‌ বা জীয়াম্‌শিদ (Gjemshid or Giamschid) পারস্যে সঙ্গীতের প্রবর্তন করেন। পারস্য লেখক নিজামী পারস্যের বিচিত্র সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দুস্থানের শিল্পী অনিম (Anim) বলেছেন, খস্রু পার্ভিজের রাজত্বের আগে পারস্য-সঙ্গীতে সাতটী প্রধান মোকামের প্রচলন ছিল। স্যার উইলিয়াম জোন্স ৮৪টী মোকাম বা ঠাটের (modes) কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই ৮৪টী মোকাম পারসিক শিল্পীরা "distribute, according to an idea of locality, into twelve rooms, twenty-four recesses, and forty-eight angels or corners." গ্রীকদের প্রধান প্রধান মোকামগুলির নামকরণ করা হয়েছিল বিভিন্ন দেশ ও সহরের নামানুসারে, যেমন ইস্পাহান, ইরাক, হিজাজ্‌ প্রভৃতি। অবশ্য ভারতীয় সঙ্গীতেও এ-ধরণের নামকরণ-রীতির অভাব নেই, তবে তা রাগের বেলায়; যেমন সৌরাষ্ট্রদেশের নামানুসারে রাগের

৮৬। স্যার এস. এম. ঠাকুর: *Universal History of Music* (1896), p. 93.
৮৭। Ibid., p. 93.

নাম সুরট, মালবদেশের নামানুসারে মালব বা ম্যলবীরাগ, বাঙ্গালাদেশের নামানুযায়ী রাগের নাম বাঙ্গালী, প্রভৃতি। স্যার উইলিয়াম জোন্সের মতে, পারসিকেরা প্রাণস্পর্শী সুরে গান করত, কিন্তু সঙ্গীতের ঔপপত্তিক-জ্ঞানে তাদের যথেষ্ট দৈন্য ছিল। কিন্তু স্যার জন্‌ ম্যালকম্‌ তাঁর পারস্যের ইতিহাসে (History of Persia) উল্লেখ করেছেন, পারস্য-সঙ্গীত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তবে সেখানকার শিল্পীরা সঙ্গীতকে শিল্প-হিসাবে ততবেশী উন্নত করতে পারেনি। তিনি বলেছেন,

"They have a gamut and notes, and a different description of melody, that is adapted to various strains, such as the pathetic, voluptuous, joyous, and war-like. The voice is accompanied by instruments of which they have a number; but they cannot be said to be further advanced in this science than the Indians, from whom they are supposed to have borrowed it."[৭৮]

আরব-শিল্পীরাই নাকি পারস্য-সঙ্গীতকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অনুশীলন করার পন্থা দেখিয়েছিলেন এবং যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রচলন তাঁরাই পারস্যে করেছিলেন। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, পারস্য-সঙ্গীতের সপ্তক ১৭টী ভাগে বিভক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় ক্রোমাটিক পর্দার শ্রুতি-অনুযায়ী পারস্য-সপ্তককে ১২টী অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল।[৭৯]

প্রাচীন পারস্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা তাজিয়ার সময় সঙ্গীত ছিল একটি অপরিহার্য অংশ। সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হোত ইমাম হাসান ও হোসেনের উদ্দেশ্যে। মোল্লারা বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে করুণ সুরে পবিত্র কোরাণ পাঠ ও শোকপ্রকাশ করতেন। বিবাহ-উৎসবেও সঙ্গীতের অনুশীলন হোত। মরমী দরবেশেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মৌলবীরা (*Mewlewi*) ছিলেন সঙ্গীতের

৭৮। Ibid., p. 94.

৭৯। "* * that the compass of the octave was divided into 17 intervals, there being consequently two intervals between each whole tone; in other words, the octave was divided into 17 one-third tones. Towards the end of the thirteenth century, however, some theorists adopted a system in which the octave was divided into twelve intervals, like the semi-tones of the chromatic scale or Europe."—*Universal History of Music*, (1896), p. 95.

পরমভক্ত। তাঁরা চক্রাকারে নৃত্য করতে করতে গান করতেন; ছন্দায়িত গান তাঁদের সাধনার বিশেষ উপযোগী ছিল। আরবের সুফী-সম্প্রদায়ের দরবেশরা বাঙ্গালাদেশের বাউলদের মতন। তুরস্কেও দরবেশদের ভেতরে এই ধরণের নৃত্যের প্রচলন ছিল। তুরস্কে দরবেশদের কণ্ঠ, যন্ত্র-সঙ্গীত ও নৃত্যের উল্লেখ ক'রে মাননীয় গার্নেট (Lucy. M. J. Garnet) বলেছেন,

"The use of vocal and instrumental music by this Order is said to have been adopted by its founder ** The orchestra of their chief *Tekkh* at Konich in composed of six—the reedflute and zither, the rebeck, a kind of violincello, drums, and tambourines. In the generality of their *Tekkehs*, however, only zithers, reedflutes, and small hemispherical drums are used. The music of these flutes appears to have a singularly entrancing effect on the Darvishes whose exercises it accompanies."[১০]

জালালুদ্দীন রুমীর 'মসনবী' গ্রন্থে রিড্ফ্লুটের চমকপ্রদ কাহিনীর বর্ণনা আছে এবং তা' থেকে অর্ফিউস্ ও তাঁর লায়ারের (lyer) কথাই মনে করিয়ে দেয়।

প্রাচীন পারস্যে হার্পের বিশেষ আদর ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ অব্দে পারস্য কবি আমির খস্রু তাঁর 'মীরা-ই-ইস্কিন্দির' (*Mirah i Iskhindir*) কবিতায় উল্লেখ করেছেন—হার্পের সুর-ঝঙ্কার স্বর্গের সৃষ্টি, স্বর্গ থেকে এসেছে। পারস্যভাষায় হার্পের নাম 'চাঙ্' (*Chang*), আর্বীতে বলে 'জাঙ্' (*Junk*)। অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ভেতর 'উদ্' (*Oud*—lute), 'স্তারে' (*Schtareh*—guitar), তম্বুরার শ্রেণীভুক্ত তর্ (*Tar*), রেবাব (রবাব) প্রভৃতি। পারস্যে কণ্ঠ-সঙ্গীতের সঙ্গে তম্বুরার ব্যবহার ছিল। পারস্যবাসীরা প্রেম-সঙ্গীতের পরমভক্ত; গজলের সৃষ্টি তাদেরই সুন্দর রুচির অবদান। পারস্য-সঙ্গীতে মোকাম, শোভা ও গুস্বার বিভাগ ভারতীয় সঙ্গীতে ঠাট, রাগ ও রাগিণীদের অনুকরণে করা হয়েছিল বোলে মনে হয়। ডাঃ ফার্মারের মতে, পারস্যদেশ আরবীয় সঙ্গীতকে অনেক উপাদান দিয়ে সাহায্য করেছিল। তিনি এর কতকগুলি সাধারণ প্রমাণ দিয়েছেন, যেমন—

(ক) "The prisoners captured in the Persian wars were toiling as slaves on the public works at Al-Medina, and their national melodies began to attract considerable attention."[১১]

১০। Cf. *Mysticism and Magic in Turkey* (1912), pp. 109-110

১১। Cf. ডাঃ ফার্মার: *A History of Arabian Music* (1929), p. 48.

(খ) "At any rate it was scarcely borrowed from the Persians, who have been claimed as the inventors of *iqa* or 'rhythm' by Ibn Khurdadhbih, * *."[১২]

(গ) "In 684, Abdallah ibn al-Zubair brought Persian workers to help in the construction of the Kaba. From these slaves Ibn-Suraij borrowed the Persian lute (*ud-farisi*) * *."[১৩]

(ঘ) "That the Arabs adapted Persian and Byzantine melodies is generally admitted. * *[১৪]

এছাড়া আরব ও পারস্য এই উভয়দেশের মধ্যে আদান-প্রদানের কথায় তিনি উল্লেখ করেছেন; যেমন—"The Persians adopted the rhythmic modes of the Arabs, although it was not until the time of Harun (786-809) that they took the ***ramal*** mode, * * ."[১৫] তবে ডাঃ ফার্মার অনুমান করেন যে, আরবীয় সঙ্গীতে বাইজান্টিয়াম্ ও পারস্য-প্রভাব থাক্‌লেও আসলে সকলেই গ্রীকদের কাছে ঋণী। তিনি বলেছেন: "What the Arabs got from Byzantium were the ancient treatises on Greek theory of music, * * ."[১৬] "This system, the scale of which appears to have been Pythagorean, obtained until the fall of Baghdad (1258)."[১৭] কিন্তু ডাঃ ফার্মার নিশ্চিতভাবে জানেন যে, গ্রীসিয় সঙ্গীত ভারতবর্ষের কাছে পুরোপুরিভাবে ঋণী, কাজেই ভারতের কাছে আরবের ঋণও অপরিশোধ্য। পীথাগোরাসই ভারতবর্ষের সাঙ্গীতিক উপাদান নিয়ে গ্রীসিয় সঙ্গীতকে পরিপুষ্ট করেছিলেন। সুতরাং বাইজান্টিয়াম্, আরব বা পারস্য যদি গ্রীসের কাছে সঙ্গীতের জন্যে উপকৃত থাকে তবে তাদের সেই উপকৃতি ও ঋণ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের কাছেই থাকা উচিত।

আরবদেশে সঙ্গীতের বিকাশ

পারস্যের মতন আরবীয় সঙ্গীতের বিকাশ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করা উচিত, কেননা মুসলমান যুগে ভারতীয় সঙ্গীতে পারস্য

১২। Ibid., p. 49. ১৩। Ibid., p. 73. ১৪। Ibid., p. 76.
১৫। Ibid., p. 106. ১৬। Ibid., p. 105.
১৭। *The Legacy of Islam* (Edited by Dr. Sir Thomas Arnold, 1931), p. 357.

ও আরবীয় সঙ্গীতের ছোঁয়াচ বেশী পরিমাণেই লেগেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ইস্‌লামধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের আগেও আরবদেশে সঙ্গীতের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। রাজা মেনাণ্ডারের সময় গ্রীসে আরবীয় বাঁশীর (Arabian flute) বিশেষ সমাদর ছিল। গ্রীস ও পারস্য থেকে সঙ্গীতজ্ঞ ও যন্ত্রশিল্পীরা মক্কায় যাত্রা করেন ও আরবদের অধীনে বিভিন্ন রকমের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৯৮] ভারতে বৈদিকযুগে যেমন বিভিন্ন স্বরে লীলায়িত গাথা ও গানের প্রচলন ছিল, প্রাচীন আরবেও তেমনি সঙ্গীতশিল্পীরা গাথাগান ও সুরের মাধ্যমে আবৃত্তি করতেন। বাগদাদ তখন সঙ্গীতানুশীলনের একটী কেন্দ্রস্থান ছিল। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের জন্যে নানান্ রকম পোষাকেরও ব্যবহার ছিল। খৃষ্টীয় ৭৮৬—৮০৯ শতাব্দীতে হারুন্-অল্-রসিদ নিজে আরবীয় সঙ্গীতের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

আরবীয় সঙ্গীতের স্বরনাম ছিল বৈদিক ভারতবর্ষের মতন। সামগানে যে সাত স্বরের প্রচলন ছিল তাদের নাম প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম। আরবীয় সঙ্গীতের স্বরনামও ঠিক এই ধরণের : "*Jek* (C), *Du* (D), *Si* (E), *Tschar* (F), *Peni* (G), *Schesch* (A), *Helf* (B-flat)।"[৯৯] ১৭টী সূক্ষ্মস্বরে (শ্রুতিতে) ঐ সাতটী স্বর বিভক্ত ছিল, যেমন—

C		D			E	F		G				A	B-flat (C)			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭

ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরে ২২-টীর বেশী সূক্ষ্মস্বর অন্তর্নিহিত থাকলেও ২২-টীই মাত্র শোনা যায় বোলে তাদের বলা হয় শ্রুতি। ভারতীয় সাতটী স্বরে ২২-টী সূক্ষ্মস্বর বা শ্রুতি, যেমন—

C				D			E		F				G				A				B-flat
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

৯৮। স্যার এস. এম. ঠাকুর : *Universal History of Music* (1896), p. 100.

৯৯। Ibid., p 101.

আরবীয় ও ভারতীয় সাত স্বরের প্রত্যেকটীতে শ্রুতি-সংখ্যার পার্থক্য :

আরব	ভারতবর্ষ
C — ৩ — এক	C — ৪ — স
D — ৩ — দু'	D — ৩ — রি
E — ১ — তিন	E — ২ — গ
F — ৩ — চার	F — ৪ — ম
G — ৩ — পাঁচ	G — ৪ — প
A — ১ — ছ'	A — ৩ — ধ
B-flat — ৩ — সাত	B flat — ২ — নি
১৭	২২

সাত স্বর, সাত স্বরের নাম ও শ্রুতির পরিকল্পনায় আরবের সঙ্গে ভারতবর্ষের যথেষ্ট যোগসূত্র পাওয়া যায়। আরবীয় শিল্পীরা সঙ্গীতকে দু'টী ভাগে বিভক্ত করেছেন : কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত, অথবা সুরের অনুযায়ী কথা (*telif*) ও যন্ত্র-সঙ্গীতে ধ্বনির সম-ব্যবধান (*ikaa*)। আরবেরা ৪টী প্রধান ও তাদের থেকে উৎপন্ন আরো ৮টী, মোট বারটী ঠাট বা মোকাম (mode) স্বীকার করেন। এ' ছাড়া ১২টী মোকামের পারস্পরিক মিশ্রণে আরো ৬টী ঠাটের (modes) অস্তিত্ব আরবীয় সঙ্গীতে আছে। কাজেই ঠাট বা মোকামের সংখ্যা তাঁদের সঙ্গীতে সর্বশুদ্ধ ১৮টী।

ডাঃ ফার্মার উল্লেখ করেছেন, গোঁড়া খিলাফতদের সময়ে ৬টী ঠাট বা মোকামের (mode—*iqaat*) সৃষ্টি হয় ও তাদের নাম "the *thaqil awwal, thaqil thani, khafif thaqil, hazaj, ramal*, and *ramal tunburi*."[১০০] এই ৬টীর মধ্যে ২টী মোকামের সৃষ্টি হয়েছিল উমায়দের (Umayyad) সময়ে এবং রমল (ramal) মোকামটী প্রবর্তন করেন ইবন্-মুরিজ্ (Ibn-Muhriz)। আরবীয় সঙ্গীতে সুরমূলক (melodic mode—*asba*) ও সঙ্গতিমূলক (rhythmic mode—*iqa*) এই দুরকম ঠাটের প্রচলন আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যে ভাবে স্বর-সঙ্গতির (harmony) ব্যবহার

১০০। Cf. *A History of Arabian Music* (1929), p. 71.

পাওয়া যায়, আরবীয় সঙ্গীতের সে-ধরণের সঙ্গতি নাই। সঙ্গতি (harmony) আরবীয় সঙ্গীতে সুর তথা স্বরপ্রবাহ নামে পরিচিত।

ঠাটের (সুরের কাঠামো) প্রচলন প্রায় সকল দেশেই আছে যদিও নামে ও রূপে তারা ভিন্ন ভিন্ন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ডোরিয়ান, ফ্রিজিয়ান, লিডিয়ান, মিক্সোলিডিয়ান ঠাটগুলির নামোল্লেখ আমরা আগেই করেছি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতকলাবিদ্ ডাঃ পারি (Dr. C. Hubert H. Parry) উল্লেখ করেছেন,

"Ambrose authorised four modes the (1) Dorian, (2) Phrygian, (3) Lydian, and (4) Mixolydian—corresponding more or less to the ancient Greek. (1) Phrygian, (2) Doric, (3) Syntono-Lydian, and (4) Ionic. These were called the authentic modes ; Gregory nominally added four more, which were not really new modes, but a shifting of the component notes of the modes of Ambrose ; * *"[১০১]

এ'ছাড়া খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে ইওলিয়ান (Æolian) ও আইওনিয়ান (Ionian) ঠাট (modes) দুটির সৃষ্টি এবং প্রচলন হয়েছিল। ইংরেজী 'mode' শব্দের অর্থ ঠাট ; অনেকে রাগও করেন, কিন্তু রাগ ঠাট থেকে সৃষ্টি হয়, সুতরাং mode-এর বাঙ্গালা অনুবাদ 'ঠাট' হওয়াই স্বাভাবিক।

এ্যালেন ডানিয়েলু ডোরিয়ান, ফ্রিজিয়ান প্রভৃতি ঠাটগুলির বিশ্লেষণ ক'রে ভারতীয় সঙ্গীতের ঠাটের সঙ্গে তাদের ঐক্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন।[১০২] এখানে তাঁর বিশ্লেষণের জন্যে কিছু-কিছু অংশ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করি। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"In Greek music, the general tonic was in the middle of the scale, * *. This led to the division of the Dorian mode, which corresponds, in the great perfect system (white keys of piano and organ), to the octave E to E (ga to upper ga), into two distinct modes, * *."

তিনি ডোরিয়ান ঠাটের দু'টী রূপ উল্লেখ করেছেন। প্রথম ডোরিয়ান-ঠাটের রূপটী E বা গান্ধার থেকে আরম্ভ হয়েছে। তিনি বলেছেন: "It corresponds to what the Hindus call Sa-grama, the scale having

১০১। (ক) Cf. *The Evolution of the Art of Music* (1923), p. 41 ; (খ) প্রজ্ঞানানন্দ: 'রাগ ও রূপ' (১৩৫৫), পৃ° ৪০

১০২। Cf. ডানিয়েলু: *Introduction to the Study of Musical Scales* (1943), pp. 187-223.

the Madhyma (mesa), the modern tonic as its fourth note". দ্বিতীয় ডোরিয়ানটী মধ্যমগ্রামের ঠাটের সঙ্গে সমান। তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছেন—"then transpose the second Dorian into Phrygian tone (mesa C—Sa)"। এ-থেকে আমরা জৌনপুরী-তোড়ী ঠাটের রূপ পাই—যা ইংরেজীতে 'ইওলিয়ান মোড্' (Eolian mode) নামে পরিচিত। 'ফ্রিজিয়ান মোড্'-এর (D to D—Re to upper Re) পঞ্চমকে (fifth) যদি সপ্তকের তার (উচ্চ) অংশে স্থাপন করা যায় তবে তাঁর রূপ ষড়্জগ্রামের ঠাটের মতন হয়।[১০৩]

ইকিউদ্-অল্-ফরিদ্ (*Iqd al-Farid*) বইখানিতে দেখা যায়, য়্যালাইয়াকে (Alluyah) নিন্দা করা হয়েছে, কেননা আরবীয় সঙ্গীতে তিনি পারসিক স্বরের প্রবর্তন করেছিলেন ও তার জন্যে উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর আরবীয় সঙ্গীতে অনেক দৈন্য দেখা দিয়েছিল। আরবীয় সঙ্গীতে প্রধান ঠাট বা মোকাম মোট ১২-টী, শোভা ২৪-টী ও শুবা ৪৮-টী। এগুলি ভারতীয় সঙ্গীতে ঠাট, রাগ, রাগিণী, শাখা-রাগ ও শাখা-রাগিণীদের মতন। ডাঃ ফার্মার মোকাম বা ঠাটের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন,

"By the time of Safi al-Din 'Abd al-Mu'min (d. 1294) these principal modes were called the *maqamat* (Sing. *maqama*). There were also six secondary modes called *awazat* (sing. *awaz*), which are stated to be of later origin than the principal modes. How far the branch modes named *shu'ab* (sing. *shu'ba*) or *furu* (sing. *far'*), which later became so popular, were practised by the Arabs at this period, * *. Here are the names of the *maqamat* and *awazat* according to *Kitab-al-adwar* of Safi al-Din 'Abd al-Mu'min :

MAQAMAT—*'Ushshaq*, *Nawa*, *Abu Satik*, *Rast*, *'Iraq*, *Zirafkand*, *Buzurk*, *Zankula*, *Rahawi*, *Husaini*, and *Hejazi*.

AWAZAT—*Kuwasht*, *Kardaniyya*, *Nauruz*, *Salmak*, *Maya*, and *Shahnaz*."[১০৪]

১০৩। বিস্তৃত বিশ্লেষণ *Introduction to the Study of Musical Scales* বইয়ের sixth part, *Confusion of the Systems* আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

১০৪। Cf. (ক) *A History of Arabian Music* (1929), pp. 203-204 (খ) প্রজ্ঞানানন্দ : 'রাগ ও রূপ', (১৩৫৫), পৃঃ ৪৮

ডাঃ ফার্মার মোকামগুলি সম্বন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন :

"In Al-Andalus and North Africa, the modal system appears to have been different from that practised in the East. * * According to the *Ma'rifat al-naghamat al-thaman* treatise, there were four principal modes (*usul*), viz., *Dil*, *Zaidan*, *Masmum* and *Maya*. From these were derived a number of branch modes (*furu*) as follows :

DIL – *Ramal al-dil*, *'Iraq al-'arab*, *Mujaunab al-dil*, *Rasd al-dil*, and *Istihlal al-dil.*

ZAIDAN – *Hijaz al kabir*, *Hejaz-al-mashriqi*, *'Ushshaq*, *Hisar*, *Isbahan*, and *Zaurankand* (*sic*).

MAZMUM—*Gharibat al-husain*, *Mashriqi* and *Hamdan.*

MAYA—*Ramal al-maya*, *Inqilab al-ramal*, *Husain*, and *Rasd.*

There was also another principal mode called the *Gharibat al-muharra*, but this had no branch modes. In all there were twenty-four modes."[১০৫]

পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ কার্ট সাচ্‌স তাঁর *The Rise of Music in the Ancient World* গ্রন্থেও The Greek Heritage in the Music in Islam অধ্যায়ে আরবীয় সঙ্গীতে মোকাম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অবশ্য তিনি মোকামকে বলেছেন ভারতীয় রাগেরই অভিন্ন রূপ— "the exact counterpart of the Indian *raga* : a pattern of melody." তিনি আরো বলেছেন :

"Maquam is, like *raga* in India, the essential quality of a melody. * * *. On the other hand, the Arabs—like the Hindus —have connected certain maqamat with the hours of the day and the signs of the Zodiac :

১০৫। (ক) Ibid. pp. 204-205 ; (খ) তবে একথা সত্য যে, বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়েছে। ডাঃ ফার্মার তাই বলেছেন : "On the contrary we know from the Ikhwan al-Safa that different types of music were to be found in the two countries. * * the music of the Dailamites, the Turks, the Arabs, the Kurds, the Armenians, the Æthiopians, the Persians, the Byzantines and other nations who differ in language, nature, morals and customs".—*A History of Arabian Music* (1929), p. 205, and *Ikhwan al-Safa*, Vol. I, pp. 92—93.

Maqam	Sign of the Zodiac	Time of the day
Rast	Ram	sunrise
Isfahan	Bull	—
'Iraq	Twins	nine o'clock
Kucek	—	—
(Zir-efkend)	Crab	—
Buzurk	Lion	—
Higaz	Virgin	midnight
Bu-silik	Balance	afternoon
'Ussaq	Scorpion	sunset
Huseini	Archer	night-end
Zangula	Capricorn	—
Nawa	Water-carrier	before night-prayer
Rahawi	Fishes	morning

কিন্তু রাগ মোকাম বা ঠাটের অন্তর্গত হোলেও ঠিক নাম বা বস্তু হিসাবে মোকাম বা ঠাট এবং রাগ এক ও অভিন্ন নয়।

আরবেরা যন্ত্র-সঙ্গীতের চেয়ে কণ্ঠ-সঙ্গীতের বেশী পক্ষপাতী; কিন্তু তাঁদের গানের সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীত অনুসরণ করা হয়। আরবদের গানের সহগামী যন্ত্রের মধ্যে বেশীর ভাগ থাকে অল্-উদ্ (*al-ud*—lute), তান্‌বুর্ (*Tanbur*—pandore), কোয়ানুন (*qanun*—plastery), কিউসব বা নে (*qusaba, nay*—flute), তবল্ (*tabl*—drum), ডাফ্ (*duff*—tambourine), কোয়াদিব্ (*qadib*—wand) প্রভৃতি। আরবেরা হাল্কা ধরণের গান ও গৎ বাজাতে বেশী ভালবাসেন। কোন শোভাযাত্রা বা সাময়িক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আরববাসীরা সঙ্গীতের আয়োজন ক'রে থাকেন। সে-সময়ে জমর (*zamr*—reed pipe), বুক্ (*buq*—horn or clarion), নফির্ (*nafir*—trumphet), তবল্ (*tabl*—drum), নাক্কারা, (*naqqara*—kettledrum), কসা (*Kasa*—cymbal) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সঙ্গীতকে অনুসরণ করে।[১০৬]

ডাঃ ফার্মার আরব-সঙ্গীত সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

"That Arabian music was influenced by Persian and Byzantine practice is openly admitted by the Arabs. In turn, the Persians and Byzantines also borrowed from the Arabian art."[১০৭]

১০৬। Cf. *The Legacy of Islam* (1931), p. 359.

১০৭। Cf. Ibid., p. 357.

আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে, পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশই ঋণী একে অন্যের কাছে।[১০৮] পশ্চিম ইউরোপ আরবদের সংস্কৃতির কাছে ঋণী। ডাঃ ফার্মার পুনরায় বলেছেন, 'স্পেনিয়ার্ডরা তাঁদের গানের সুরে ও ছন্দে আরব-পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছিল খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে। ১০ম শতাব্দীতে ইহুদীরা আরব-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র লিউট বা লুট, রেবেক্, গিটার, নকের্ প্রভৃতির নাম খুব সম্ভবত আরবীয় বাদ্যযন্ত্র অল্-উদ্ (*al-ud*), রবাব (*rabab*), কুইটার (*qitara*), নক্কারা (*naqqara*) প্রভৃতির নামানুসারে হয়েছিল।[১০৯] আরবের সংস্পর্শে আসার আগে ইউরোপে নাকি কেবল তারযন্ত্র হিসাবে সিথারা (cithara—সেতার) ও হার্প (harp—বীণা) ছিল। আরবেরা লিউট, প্যান্ডোর্, গিটার প্রভৃতি যন্ত্র ইউরোপে আমদানী করেন। অবশ্য এ-নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে, কেননা কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত যে, ঐ-সমস্ত বাদ্যযন্ত্র গ্রীসবাসীরাই ইউরোপকে দান করেছিল। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে, বিভিন্ন সময়ে আরবের সঙ্গে সংস্কৃতিক আদানপ্রদান পৃথিবীর অনেক দেশেরই হয়েছিল।

চীনদেশে সঙ্গীতের বিকাশ

চীনে খৃষ্টপূর্ব ১৪শ-১২শ শতকে সাঙ্ বংশের রাজত্বের সময় সঙ্গীতের অনুশীলন অব্যাহত ছিল। পাশ্চাত্য সঙ্গীতশাস্ত্রী কার্ট সাচ্স-এর অভিমতও তাই। তিনি বলেছেন,

১০৮। কার্ট সাচ্স যন্ত্র-সঙ্গীতের উল্লেখ করতে গিয়ে সেই ঋণ-সম্বন্ধে বলেছেন : "The Egyptians borrowed from Mesopotamia and Syria; the Jews from the Phoenicians; the Greeks from Crete and Asia Minor and again Phœnicia; the harp, the lyre, the double oboe, the hand-beaten frame drum were played in Egypt, Palestine, Phoenicia, Syria, Babylonia; Asia Minor, Greece, and Italy. The Egyptians called lyres and drums by their Semitic names, the harp by a term related to the Sumerian word for bow; the Greeks used the same Sumerian noun to designate the long-necked lute and adopted a Phoenician word for the harp; they gave the epithets Lydian, Phrygian, Phoenician to the various types of pipes; indeed, they had not a single Hellenic term for their instruments and repeatedly attributed them to either Crete or Asia."—*The Rise of Music in the Ancient World, East and West* (1944), p. 63.

১০৯। *The Legacy of Islam* (1931), p. 373.

"Chinese music can be traced back to the Shang Dynasty between the fourteenth and twelfth centuries B. C. Japanese music began only in the fifth century A. D. when Korean court music was adopted."[১১০]

পণ্ডিত গুলিকের (Gulik) অভিমত যে, চীনদেশে সঙ্গীত লোকসঙ্গীতকে (folk-music) কেন্দ্র ক'রেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সেই লোকসঙ্গীত সর্বসাধারণের সঙ্গীত (popular music) ছিল এবং তার মধ্যে কলা-সৌন্দর্যের কোন বিকাশ না থাকায় অভিজাত সম্প্রদায়ে আদরণীয় হোতে পারেনি।[১১১]

চীনদেশের লোকে সঙ্গীতকে মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবের বহিরাভিব্যক্তি বলেন। ভারতবর্ষেও তাই, ভারতবাসীরাও স্বীকার করেন যে, কেবল কতকগুলি স্বরের গাঁথুনি বা স্বরসমষ্টির আরোহণ-অবরোহণকেই সঙ্গীত বলে না, সঙ্গীত মানুষের অন্তরের জিনিস, আন্তর ভাবধারাই রসে, ভাবে, সুরে ও কথায় বিজড়িত হোয়ে সঙ্গীতের আকারে বাইরের জগতে প্রকাশ পায়। কার্ট সাচ্‌স উল্লেখ করেছেন: "Music to the Chinese, is born in man's heart. Whatever moves the soul pours fourth in tones; and again, whatever sounds affect man's soul". সঙ্গীত যে অধ্যাত্ম সম্পদ ও সুদীর্ঘ কাল ধরে সাধনার জিনিস এ'সম্বন্ধে বিচিত্র কাহিনীর উল্লেখ আছে চীনবাসীদের সমাজে এবং সে-সবের হুবহু সামঞ্জস্য পাওয়া যায় ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ও আধুনিক কাহিনীর সঙ্গে। এজন্যেই স্থির সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে, চীনের প্রত্যেকটী সাংস্কৃতিক বিকাশের পিছনে ভারতীয় ভাবধারার প্রেরণা আছে।

চীন নামটীর সৃষ্টি হয়েছে 'সিন' বা 'সিনাই' শব্দ থেকে—"The word of *China* in probably derived from *Ts'in* the name of a dynasty, which ruled over China from B. C. 249 to A. D. 220."[১১২] অবশ্য নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও পল্ পলিয়ট প্রভৃতি মনীষীরা একথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। চীনাভাষায় ভারতবর্ষকে বলা হোত 'তায়েন-চু', 'সিন্-টু' বা 'সিন'। আসলে চীনার প্রাচীন নামও 'সিন'। তাই ডা: প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি *India and China* পুস্তকে উল্লেখ করেছেন:

১১০। Cf. *The Rise of Music in the Ancient World* (1944), p. 135.
১১১। Cf. Gulik: *The Lore of the Chinese Lute*, p. 39
১১২। Cf. শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: *Indian Literature in China and the Far East* (1931), p. 2.

"It is not mere accident that China is still known to the outside world by a name by which India was the first to know her (*China* Sanskrit *Cina*-চিন) and the Chinese nobility is called by a name derived from Sanskrit (*Mandarin-Mantrin*)."

ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও আগে থেকে এবং এই নিবিড় সম্বন্ধের সাক্ষ্য দান করে আজো-পর্যন্ত অসংখ্য প্রাচীন চীনাগ্রন্থ। অধ্যাপক তান-উন-সান উল্লেখ করেছেন,

"As for the interchange of cultures between India and China, it has taken place for more than two thousand years. * * The early facts concerning India and Chinese relationship of culture are found in various Chinese books, such as *Lieh-Tsu*, *Chou-Shu-chi-yi*, or the Book of Wonders of Chou, *Lie-Sien-chusu* or the Biography of Fairies, *Shiho-Lso-chih* or Sketches of Buddha and Laotza, *T'si-Lu* or the Seven Records, *Ching-Lu* or the Classical Records, *Fu-Tsu-Tung-chi* or the Account of Buddha etc. * *."[১১৩]

এ-ছাড়া কাউণ্ট ওকাকুরা তাঁর *Heart of Heaven*[১১৪], অধ্যাপক লিয়াঙ্-চি-চাও (Prof. Liang Chi-Chao) তাঁর *The Kinship between China and Indian Cultures* প্রবন্ধে, শ্রদ্ধেয় চিয়াঙ্-ঈ (Chiang Yee) তাঁর *Chinese Eye* গ্রন্থে[১১৫], স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর *India and China* গ্রন্থে[১১৬], ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ তাঁর *Chinese Sculptural and Pictorial Traditions* প্রবন্ধে[১১৭], ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর *Entry of Buddhism in China* প্রবন্ধে[১১৮], পণ্ডিত হ্বিলহেল্ম্ তাঁর *A Short History of Chinese Civilization* গ্রন্থে[১১৯], শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর

১১৩। Cf. Prof Tan Yuh-Snan: *Cultural Interchange between India and China*, pp. 6-7.

১১৪। Vide. p. 155.

১১৫। "* * Communications began to open up between China and other countries of the Far East, India and Persia especially".—p. 24.

১১৬। Ibid., p. 29.

১১৭। "It seems now within the range of historical probability that China came to have cultural relations with far off Scandinevia through Siberia and South Russia."—Cf. *Mohabodhi Journal*, October 1938, pp. 421-422.

১১৮। Cf. *Mohabodhi Journal*, April-June, 1842.

১১৯। Cf. p. 197.

Indian Literature in China and the Far East গ্রন্থে[১২০], ভারত ও চীনের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য এবং চীনের সকল-কিছুর ওপর ভারতবর্ষের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

মধ্যএশিয়া, ইরান, পার্থিয়া বা প্রাচীন পারস্ত (চীনা—*An-si*), রোম, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গে চীনের যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ ও উত্তর এই উভয় চীনেই সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মিশ্রণ হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে গঙ্গানদীর উপকূল ও সী-চোয়াঙের (*Sse-Chuang*) মধ্যে দক্ষিণ চীনার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয় বৌদ্ধধর্মের সংক্রমণ-ব্যাপারে। মধ্য-এশিয়ার ভেতর দিয়েও ভারতে আসার পথ ছিল। শ্রদ্ধেয় চিয়াঙ্-ঈ উল্লেখ করেছেন, হান-উ-টি বা হান-বংশের সম্রাট উ-কংসু-র বাইরে পাশ্চাত্য জাতিদের তাড়িয়ে দিয়ে খৃষ্টপূর্ব ১২৬ শতকে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটা রাজপথ নির্মাণ করেছিলেন :

"Han Wu-Ti or Emperor Wu of Han Dynasty of glorious name, who drove the Western tribes out of Kansu and found a route to India, instituted a kind of Royal Academy."[১২১]

খৃষ্টপূর্ব ১৩৮ শতকে সম্রাট হান্-উ-টী হূনদের আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর রাজদূত চাঙ্-কিয়েনকে পাশাপাশি রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী-স্থাপন করতে পাঠান। চাঙ্-কিয়েন সেই সময়ে আফগানিস্থানের পার্বত্য পথ দিয়ে একদল বণিককে ব্যবসার জন্যে চীনে আসতে দেখেন ও জানতে পারেন যে, তাঁরা 'সেনণ্টু' বা সিন্ধুদেশ (সিন্ধু-উপত্যকা') তথা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন। পঞ্জাব, বেলুচিস্থান, গান্ধার, সিন্ধু-উপত্যকা, বোলানপাস্, তিব্বত, খোটান প্রভৃতির ভেতর দিয়ে চীন এবং অন্যান্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল। জলপথেরও সম্পর্ক ছিল বাণিজ্যিক ব্যাপারে। প্রশান্ত-মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর প্রভৃতি জলপথে চীনদেশের বণিকেরা বাণিজ্য আরম্ভ করেছিল ভারতবর্ষ ছাড়াও শ্যাম, জাভা, মালয় প্রভৃতি দেশের সঙ্গে খৃষ্টপূর্ব ১ম শতক থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে। ডাঃ বুকে (Dr. A. C. Bouquet) বলেছেন :

১২০। Cf. pp. 25, 27, 33, 34, 52, 60-61.
১২১। Cf. *The Chinese Eye*, p. 26.

"* * but only trading intercourse, either by caravan routes (which are of great antiquity) or by sea-borne traffic from a port called Eridu at the head of the Persian Gulf, which was a centre of commerce some four or five thousand years ago."[১২২]

ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের কথা উল্লেখ না করলেও ডাঃ বুকে অপরাপর সুপ্রাচীন দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি একটী সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উল্লেখ করেছেন যেটী চীন, ইরাণ, সিরিয়া, ইজিপ্ট প্রভৃতির মধ্যেও অখণ্ডভাবে বর্তমান ছিল এবং সেই সভ্যতার বয়স হবে অন্তত খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর। তিনি আরো লিখেছেন:

"A considerable Neolithic culture datable at about 2000 to 1500 B. C., has been found in the north-east and north-west, and in the north-west has been found pottery resembling early specimens unearthed in Babylonia, and dating from before 3500 B. C. This culture is regarded as the eastern expansion of a great prehistoric culture-province extending from Central Asia to Iran, Syria and Egypt, long before 4000 B. C."[১২৩]

অধ্যাপক রিস্ ডেভিস্ (Rhys Davids) বলেছেন, হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম কোণ ও পূর্ব-তুর্কিস্থানের ভেতর দিয়ে বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে চীনদেশে যায়। মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা প্রায়ই চীনদেশে যেতেন।[১২৪] স্যার ওয়ালিস্ বাজ্‌ও (Sir E. A. Wallis Budge) একথা

১২২। Cf. *Comparative Religion* (1945), p. 135.

১২৩। Cf. Ibid., pp. 135-136.

১২৪। * * it penetrated to China "along the fixed route from India to that country, round the north-west corner of the Himalayas and accross Eastern Turkestan. Already in the second year B. C. an embassy, perhaps sent by Huvishka, took Buddhist books to the then Emperor of China, A-ili; and the Emperor Ming-Ti, 62 A. D., guided by a dream, is said to have sent to Tartary and Central India and brought Buddhist books to China. From this time Buddhism rapidly spread there. Monks from Central and North-Western India frequently travelled to China; and the Chinese themselves made many journeys to the older Buddhist countries to collect the sacred writings, which they diligently translated into Chinese. In the fourth century Buddhism became the State religion".—Cf. *Buddhism*, p. 241.

স্বীকার করেছেন।[১২৫] তারপর একথা সত্য যে, খৃষ্টপূর্ব ১ম শতক থেকে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মাঝামাঝি অনেকগুলি ভারতীয় পরিবার চীনদেশের বাসিন্দা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

"In the third century A. D. we hear of Indian families settled down in Touen-hoang. It had already become a great centre of Buddhist missionaries at that time."[১২৬]

যে সকল বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী পরিভ্রমণ ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি দিয়ে চীনকে সমুন্নত করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম: ধর্মরক্ষ (খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগ), সঙ্ঘভূতি (৩৮১ খৃষ্টাব্দ), গৌতম-সঙ্ঘদেব (৩৮৪ খৃষ্টাব্দ), পুণ্যত্রাত ও তাঁর শিষ্য ধর্মযশস (৩৯৭ খৃষ্টাব্দ), বুদ্ধযশস (খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী), কুমারজীব (৪০১ খৃ°), বিমলাক্ষ (৪০৬ খৃ°), ধর্মক্ষেম (৪১৪ খৃ°), বুদ্ধভদ্র (৪২১ খৃ°), বুদ্ধজীব (৪২৩ খৃ°), গুণবর্মন (৪৩১ খৃ°), গুণভদ্র (৪৩৫ খৃ°), বোধিধর্ম (৫২০ খৃ°), বিমোক্ষসেনা (৫৪৬ খৃ°), জিনগুপ্ত ও তাঁর দুই শিক্ষাগুরু জ্ঞানভদ্র ও জিনযশস (৫৫৯ খৃ°), ধর্মগুপ্ত (৫৯০ খৃ°), প্রভাকর মিত্র (৬২৭ খৃ°) প্রভৃতি।[১২৭]

ভারতবর্ষই চীনকে সঙ্গীত ও সংস্কৃতির প্রেরণা দিয়েছিল

চীন ভারতবর্ষের কাছে শিক্ষা-বিষয়ে কতটুকু ঋণী সে-সম্বন্ধে অধ্যাপক লিয়াং-চি-চাও তাঁর *The Kinship between Chinese and Indian Cultures*-নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষ চীনকে যে-সকল বিদ্যা শিখিতে বা তাহাতে উন্নতি লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিল, * * তাহা সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও তক্ষণ, নাটক-

১২৫। "Buddhism was carried into Syria and Egypt by the envoys of Chandragupta and his grandson Asoka in the third century B. C., and there is no doubt that it made its way into China before the Christian Era."—Cf. *Baralam and Yewasef* (1923), p. liii. Cf. also Swami Abhedananda: *Science of Psychic Phenomena* (1946), pp. 48-49; *India and Her People* (1905-6), p. 226.

১২৬। Cf. *India and China*, p. 9.

১২৭। বেদানন্দ: "ভারত ও চীনের সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ"—'বিশ্ববাণী'-পত্রিকা ১৩৫৬, পৃ° ৮০—৮১

রচনা ও অভিনয়, কবিতা ও উপন্যাস-কাহিনী-আদি রচনা, জ্যোতিষ ও মাসবর্ষাদি গণনা, চিকিৎসা, বর্ণমালা ও লিপি-উদ্ভাবন, গদ্য লিখিবার উৎকৃষ্ট রীতি, হেতুবিদ্যা, শিক্ষাদানপদ্ধতি, সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠান-রচনা ইত্যাদি"।[১২৮] তবে একথা ঠিক যে, ভারতের কাছে সকল বিষয়ে চীন ঋণী থাকলেও তাঁর নিজস্ব একটী দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য ছিল এবং শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "China developed indigeneous forms and styles long before the Indian or the Graeco-Buddhist art". অবশ্য একথা কেবল স্থাপত্য ও চিত্রকলার উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে, সঙ্গীতশিল্প সম্বন্ধে নয়। বেশীর ভাগ পণ্ডিতই ভারতবর্ষ ও চীনের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিগত ঐক্য দেখ্‌তে গিয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্র, ভাস্কর্য ও মন্দিরশিল্প নিয়েই বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, উভয় দেশের সঙ্গীত-সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলেন নি। অথচ এ-কথা সত্য যে, "চীনের রাজধানী পেকিঙের সাম্রাজিক গ্রন্থাগারে এখনো ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও মূল উভয় মিলাইয়া ৭০,০০০ সত্তর হাজার পুঁথি আছে"! এই পুঁথি শুধুই কি বৌদ্ধশাস্ত্রের, না—সঙ্গীতাদি অপরাপর শিক্ষাগ্রন্থেরও। আমাদের মনে হয়, অনুসন্ধান করলে সে-সবের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতগ্রন্থের চীনা-অনুবাদও পাওয়া যাবে।

চীনদেশ বা চীনাজাতির সঙ্গীতকলার প্রসঙ্গে ভারত ও চীনের মধ্যে ঐক্যগত সাংস্কৃতিক বিবরণের সুদীর্ঘ আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, চীনে সঙ্গীতকলা স্বাধীনভাবে গড়ে উঠ্‌লেও সেই গঠনের মূলে একান্তভাবে ভারতীয় ভাবধারা ও প্রেরণা যে অন্তর্নিহিত ছিল সেটাই প্রমাণ করা। তবে ভারতবর্ষ নিজের উদারতা ও বিস্তৃতিমূলক প্রকৃতির গুণে সঙ্গীতকে যেভাবে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে পেরেছে, চীন ততটুকু পারেনি। ভারতবর্ষ বৈদিক যুগেই যেখানে তার স্বরকে সাতটী সংখ্যায় বিকশিত করতে পেরেছে, চীন তাতে অক্ষমতা জানিয়েছে এবং এখনো পাঁচটী মাত্র স্বরেই সে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে। এর প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ তাই উল্লেখ করেছেন:

১২৮। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (১৩৩২ সাল, ১ম সংখ্যা, পৃ° ১১২) প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'বৃহত্তর ভারত' প্রবন্ধ।

"The *Rishis* used to sing those hymns with seven notes of an octave. I may mention here that the seven notes of an octave in music were first discovered in India centuries before other nations had them; and that the world owes its first lesson in music to India. The Chinese had only five notes. Before the Greeks and other Europeans had seven notes the Hindus used them, and the Sama Veda bears testimony to this fact."[১২৯]

চীনা পাঁচটী স্বরের নাম কুঙ্ (*kung*) সাঙ্ (*shang*), চি (*chi* or *chih*), য়ু (*yu*) ও কিয়ো বা শিয়ো (*kyo* or *chiao*)। পাঁচটী স্বর বিভিন্ন দিক, গ্রহ, তত্ত্ব ও বর্ণ অনুযায়ী কল্পিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় কার্ট-সাচ্‌স (Curt Sachs) তার উদাহরণ দিয়েছেন,[১৩০]

Notes	Kung	Shang	Chiao	Chih	Yu
Cardinal points	North	East	Center	West	South
Planets	Mercury	Jupiter	Saturn	Venus	Mars
Elements	wood	water	earth	metal	fire
Colours	black	violet	yellow	white	red

কার্ট সাচ্‌স এই পাঁচটী স্বরে সৃষ্ট পাঁচটী পর্দারও (scale) উল্লেখ করেছেন: "The scale is usually presented in the form *kung* (do), *shang* (re), *chiao* (mi), *chih* (sol) *yu* (la), *kung* (do)"। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাঁচটী চীনা-স্বরের যে পরিচয় দিয়েছেন তার নামকরণে মনে হয় কিছু-কিছু ভুল আছে। তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরের সঙ্গে তুলনা ক'রে চীনা-সঙ্গীতের স্বর ও পর্দা সম্বন্ধে বলেছেন:

"* * it would appear that the ancient Chinese divided the octave into twelve equal parts. The scale, as commonly used, consisted, however, of only five notes, which were called *koung*, *chang kio tche*, *yu*, corresponding with the European F, G, A, C, D. The intervals corresponding with the European B and E were called *Pien-tche* and *Pien-koung*, respectively. F was considered the principal or normal key, just as C is regarded, in European music. Converted into the 'C'

১২৯। Cf. *Mystery of Death* (1952), pp. 10—11.
১৩০। *The Rise of Music in the Ancient Worlds* (1944), p. 121.

scale, the Chinese scale would stand C, D, E, G, A, i.e, the notes F and B would be avoided."[১৩১]

অ্যালেন ডানিয়েলু (শ্রীশিবশরণ) পাঁচটী চীনা-স্বরের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় স্বরের তুলনা দেখিয়ে উল্লেখ করেছেন,[১৩২]

I	Kung	(C)	—	(Sa)	—	1	=81/81
II	Chi	(G)	—	(Pa)	—	3/2	=81/54
III	Shang	(D)	—	(Re)	—	9/8	=81/72
IV	Yu	(A+)		(Dha+)	—	27/16	=81/48
V	Kyo	(E+)	—	(Ga)+			=81/64

ডানিয়েলু বলেছেন, সিউ-ম-থিন (Seu-ma-Thien)-এর অভিমতে ঐ পাঁচটী স্বরের নাম যথাক্রমে পঞ্চ-লিউ (five lyu বা notes): হোয়াঙ্-চঙ্, থাই-চিউ, কু-সেন্, লিন্-চঙ্, নান্-লিউ (hwang-chong, thai-cheu, ku-syen, lin-chong, and nan-lyu)।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী যেমন ষড়্জকে কেন্দ্র অথবা আশ্রয় ক'রে লীলায়িত হয়, চীনা-সঙ্গীতেও তাই এবং তাতে স্বর-সঙ্গতির (harmony) দিকে তত লক্ষ্য দেওয়া হয় না। ভারতীয় সঙ্গীত যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটী মতবাদকে নিয়ে পরিপুষ্ট এবং এতে ভাব, রস, বর্ণ প্রভৃতির স্থান আছে, চীনা-সঙ্গীতেও ঠিক তাই। কিন্তু তাহলেও এ'দুটী দেশের সঙ্গীতের প্রকাশভঙ্গী ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাননীয় ডানিয়েলু এই ভিন্নতার জন্যে দুটী দেশের পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কহীনতাকে কারণ বলেছেন—"Contacts between the two countries became very rare and that the two cultures took very different directions"। কথাটী অবশ্য আংশিক সত্য, কিন্তু পুরোপুরি নয়, কেননা যে কোন দুটী দেশের মধ্যে বিশেষ মেলামিশা থাকুলেই যে তাদের সংস্কৃতি বা শিক্ষা হুবহু সমান হবে এমন কোন নিয়ম নেই। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রদ্ধেয় ডাঃ নাগ উল্লেখ করেছেন: "China developed indigeneous forms and styles long before the Indian or the Graeco-Buddhist art"। শিল্প বা চিত্রকলা-সম্বন্ধে একথা স্বীকৃত হোলেও এটী অতীব সত্য যে, সকল বিষয়েই চীন তার একটী নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

১৩১। Cf. *Universal History of Music* (1896), p. 27.
১৩২। Cf. *Introduction to the Study of Musical Scales* (1943), p. 74.

সৃষ্টি করেছিল এবং সেই বৈশিষ্ট্যের জন্তে কালে তার সংস্কৃতির জগতে যে ভারত থেকে কিছুটা ভিন্ন হয়েছিল এবং তা হওয়াও স্বাভাবিক। তবে ডানিয়েলু চীন ও ভারতের সঙ্গীতের মধ্যে যে-পার্থক্য অপর দিক থেকে দেখিয়েছেন, তা আমরাও কিছুটা স্বীকার করি। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"While India's theorists were restricting themselves to the system of relations to a tonic, almost completely ignoring polyphony, the Chinese, on the contrary, were pursuing only the cyclic system which necessarily leads to transposition. Thus, the two countries became musically isolated and unintelligible to each other."[১৩৩]

তিনি খৃষ্টীয় পনের বা কুড়ি শতাব্দীর পূর্বে এই প্রার্থক্যের সময় নির্দেশ করেছেন। আমাদের মনে হয়, এই মন্তব্য তিনি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করেছেন।

চীনা-সঙ্গীতবিদ্‌গণ সাঙ্গীতিক স্বরের আট রকম প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন: (১) চামড়ার শব্দ, (২) পাথরের শব্দ, (৩) ধাতুদ্রব্যের শব্দ, (৪) পশমীসুতার শব্দ, (৫) কাঠের শব্দ, (৬) বাঁশের শব্দ, (৭) লাউ কুমড়া-ফলের (guord) শব্দ ও (৮) পোড়ামাটির শব্দ। (১) চামড়ার শব্দ ঢোল (drum —*kou*) জাতীয় বাদ্য: য়িঙ্‌-কাউ, কিন্‌-কাউ, সি-কাউ, তাও-কাউ, প্যাঙ্‌-কাউ, থাই-প্যাঙ্‌-কাউ, চি-সিন্‌ (*Ying kou, Kin kou, Tse kou, Tao kou. Pang kou, Thai-pang-kou* and the *Tse-king*)। (২) কিঙ্‌ (*king*) জাতীয় বাদ্য: পিন্‌-কিঙ্‌, সি-কিঙ্‌, য়ু-টি, য়ু-সিও বা বাঁশী, হৈ-টো বা শঙ্খ (*Pien-king, Tse-king, Yu-ty, Yu-hsiao, Hai-to*)। (৩) চাঙ্‌ বা ঘণ্টা, লো বা গঙ্‌, পো বা করতাল, লা-পা বা বড় শিঙ্গা, হো-টুঙ (*Chung, Lo, Po, La-pa, Hao-tung*)। (৪) পিপ্‌ বা বেলুন-গিটার, সান্‌-হিন্‌, য়ু-কিন্‌, হু-কিন্‌, উর-হিন্‌ বা দুতারযুক্ত বেহালা, যান্‌-কিন্‌ (*San-heen, Yue-kin, Hue-kin Ur-heen, Yang-kin*)। (৫) চু, য়ু, মু-য়ু, সোন্‌-পান্‌ (*Chu, Yu, Mu-yu, Shon-pan*)। (৬) পাই-হাও বা পাইপ, টি বা বাঁশী, সোন বা ক্লারিওয়েনেট (*Pai-hao, Ty, Sona*)। (৭) চেঙ্‌ (*Cheng*—mouth-organ), (৮) হুয়ান্‌ (*Hsuan*) প্রভৃতি।[১৩৪]

১৩৩। Ibid., p. 55.
১৩৪। Cf. *Universal History of Music* (1896), pp. 24-25.

ভারতীয় সঙ্গীতে যেমন বাদী (রাজা), সংবাদী (মন্ত্রী), অনুবাদী (অনুচর), বিবাদী (শত্রু) প্রভৃতি স্বরের ব্যবহার আছে এবং সেই ব্যবহার সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, চীনা-সঙ্গীতেও তেমনি F বা মধ্যমকে রাজা, G বা পঞ্চমকে প্রধানমন্ত্রী, A বা ধৈবতকে রাজভক্ত প্রজা, C বা ষড়্‌জকে রাজকার্যের অবস্থা ও D বা ঋষভকে পৃথিবী-রূপী দর্পণ নামে অভিহিত করা হয়।[১৩৫] রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, পেকিনের গ্রন্থাগারে ৪৮২ খানি সঙ্গীতের পুস্তক রক্ষিত আছে।[১৩৬]

জাপানে সঙ্গীতের রূপ

সকল-কিছু সৃষ্টি-রহস্যের পিছনে বিজ্ঞান ফল্গুধারার মতন অন্তর্নিহিত থাকলেও পৌরাণিকী আখ্যায়িকারও (Mythology) একটা স্থান আছে। ভারতীয় সঙ্গীতে প্রধান রাগ-রাগিণীগুলির সৃষ্টিকথা জড়িত রয়েছে মহাদেবের পঞ্চমুখ ও পার্বতীর মুখ-কমলের সঙ্গে। মোটকথা কোথাও শিব-শক্তির, কোথাও নারায়ণের কাহিনী রয়েছে সঙ্গীতের জন্মকথার পিছনে। জাপানী-সঙ্গীতের সঙ্গেও একটা পৌরাণিকী কাহিনীর যোগাযোগ আছে। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন, জাপানে প্রবাদ যে, সূর্য-পত্নী অমতারসু (Amaterasu) অন্যান্য দেবতাদের কাছে অপমানিতা হোয়ে একটা পর্বতগুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে অনুরোধ করলে তিনি অস্বীকার করেন। তখন দেবতারা সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন অমতারসুকে মোহিত করার জন্যে। জাপানে সঙ্গীত-সৃষ্টির মূলে আছে এই পৌরাণিকী কাহিনী।[১৩৭] এই কাহিনীর পিছনে সত্যিকারের তত্ত্বকথা: জাপানী-সঙ্গীতও ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনমূলক। আসলে জাপানে সঙ্গীত-সৃষ্টির ইতিহাস হোল: জাপান তাঁর সঙ্গীতের উপাদান ও প্রেরণা পেয়েছিল চীন ও কোরিয়ার মাধ্যমে ভারতবর্ষ থেকে—"Japan derived its music from India through China and Corea"। ডাঃ

১৩৫। Ibid. p. 29.

১৩৬। ইংরেজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে *Universal History of Music* বইখানি সংকলিত হয়। তখন পেকিঙের গ্রন্থাগারে যদি ৪৮২ খানি সঙ্গীতগ্রন্থ রক্ষিত থাকে, তবে তারপর থেকে আজ-পর্যন্ত চীন-সরকার নিশ্চয়ই ঐ গ্রন্থাগারে আরো অনেক গ্রন্থের সমাবেশ করেছেন।

১৩৭। Cf. *Universal History of Music* (1896), pp. 35-36.

বুকে (Dr. A. C. Bouquet) উল্লেখ করেছেন, গ্রীকজাতি যেমন রোমনগরীকে নিজেদের সভ্যতার আলোকে সমুজ্জল করেছিল, চীনারাও তেমনি জাপানকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিল, তবে ভারতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের প্রেরণা ছিল সেই চীন ও জাপানের সভ্যতার পিছনে :

"Just as the Greeks civilized Rome, so the Chinese have civilized the Japanese, and Buddhism has done for both much of what Christianity did for the Greek and Roman world".[১৩৮]

কোরিয়ার সঙ্গেও জাপানের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণ যে, খৃষ্টীয় ৪৫৩ শতাব্দীতে কোরিয়ায় শিরেগীর রাজা জাপান-সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদে মুহ্যমান হোয়ে বহুমূল্য বিচিত্র সামগ্রীর সঙ্গে নানান্ বিষয়ে পারদর্শী ৮০জন সঙ্গীতশিল্পীকেও ৮০টী জাহাজে ক'রে জাপানে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রথম সম্পর্ক।[১৩৯] পাশ্চাত্য সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ কার্ট সাচ্স্ জাপানের সঙ্গীত-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

"Japanese music began only in the fifth century A. D., when Korean court music was adopted. In the sixth century, Japan became familiar with both Buddhism and the ceremonial music of China, though once more through Korea, * *. China also passed on to Japan the:ceremonial dances of India with their music, which were Japanized as the solemn and colourful *Bugaku*. A strong wave from Manchuria, in the eighth century, ended foreign influences on the classical music of Japan."[১৪০]

মোটকথা জাপানের সঙ্গীতে চীন, কোরিয়া ও কিছুটা মাঞ্চুরিয়ার প্রভাব থাকলেও ভারতবর্ষের অবদান মোটেই অস্বীকার করা যাবে না। শ্রদ্ধেয় জাপানী শিল্পী কাকাসু ওকাকুরা 'বুগকু'-সঙ্গীতের প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে, এর সৃষ্টি ভারতীয় ও প্রাচীন হাঙ্-সঙ্গীতপদ্ধতি দুটীর সংমিশ্রণে হয়েছে—"It was formed of combined elements of Indian and old Hang music". 'বুগকু'-সঙ্গীতের উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছেন,

"*Bugaku Music*—This means dance music—from *bu*, to dance, and *gaku*, music, or to play. This Bugaku music in Japan was developed

১৩৮। Cf. *Comparative Religion* (1945), p. 147.
১৩৯। Cf. *Universal History of Music* (1896), p. 36.
১৪০। Cf. *The Rise of Music in the Ancient World* (1944), p. 105.

in the Nara-Heian period, under the influence of the Chinese culture of the Six Dynasties."[১৪১]

এই সঙ্গীত জাপানের বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে উদ্‌যাপিত হোত। এছাড়া গ্রন্থে ওকাকুরা উল্লেখ করেছেন: প্রাচীন খা, ইন্ ও শু-বংশ তিনটীর রীতিনীতির বর্ণনায় অনেক কাব্যগান সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলি সুর-সংযোগে গান করা হোত রাজ্যের কুশাসনের সংস্কার-সাধন করার জন্যে ("Ancient ballads were collected by the Sage by way of illustrating the manners of the Chinese Gold Age, of the three early dynasties of Kha, In, and Shu, * *"[১৪২]

বৃহত্তর ভারতের কাছেও জাপান সাঙ্গীতিক উপাদানের জন্যে ঋণী। চম্পা তথা কম্বোডিয়া, যবদ্বীপ বা যাভা, বালিদ্বীপ বা বালি প্রভৃতির কাছ থেকে জাপান ও এমন কি চীন সঙ্গীতের ঠাট এবং রাগ-সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে কার্ট সাচ্‌স উল্লেখ করেছেন,

"Indeed, even Japan has known a major scale, *Champa* In 773, music from Champa, that is Cambodia, is first mentioned as played at a banquet of the Imperial Court. But the Combodian style in Japan was assimilated four hundred years later into the Chinese style, and it is not possible to tell whether the original Champa music had or had not the major scale that the modern Japanese designate by this name." [১৪৩]

খৃষ্টীয় ৫৫২ অব্দে জাপানে যখন বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হয় তখন তার সঙ্গে সঙ্গীতকলারও অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজকুমার শোটোকু (Prince Shotoku) যখন মোরিগনোদৈজিন্-কে (Moriganodaijin) পরাজিত করেন তখন তিনি তাঁর সৈন্যদের উৎসাহিত করেছিলেন 'বৈরো' বা বায়্‌রো (*Bairo*) সুর দিয়ে।[১৪৪] এই বৈরো অথবা বায়রো সুর ('tune of *Bairo*') ভৈরোঁ বা ভৈরবরাগ কিনা বলা কঠিন। সত্যই 'বৈরো' যদি ভৈরোঁ বা ভৈরব-রাগের নামান্তর হয় তবে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এর সন্ধান পাওয়া যায় জাপানে, অথচ বৃহদ্দেশী কিংবা সঙ্গীত-মকরন্দের আগেকার

১৪১। ওকাকুরা: *The Ideals of the East* (1903), p. 13.
১৪২। Ibid., p. 30.
১৪৩। Cf. *The Rise of Music in the Ancient World* (1944), p. 135.
১৪৪। Cf. *Universal History of Music* (1896), p. 36.

কোন বইয়ে ভৈরবরাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী' রচনা করেন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বা তার কিছু পরে এবং নারদ 'সঙ্গীত-মকরন্দ' রচনা করেন খৃষ্টীয় ৭ম-১১শ শতাব্দীর মধ্যে। বৃহদ্দেশীর "ভৈরবঃ ক্রামযশ্চৈব আকুষ্টোহজশ্চ পালকঃ"[১৫৫] ইত্যাদি শ্লোকে ভৈরবকে মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা-রূপে পাওয়া যায়, রাগ হিসাবে নয়। সঙ্গীতমকরন্দে ভৈরবকে রাগ হিসাবে পাওয়া যায়—"ভূপালো ভৈরবশ্চৈব শ্রীরাগঃ" ইত্যাদি।[১৫৬] জাপানে সঙ্গীতের গোড়াপত্তন হয় খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে অথবা তার কিছু আগে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় জাপানের এবং খৃষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন-সাম্রাজ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপার আকারে আজ-পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া গেছে তাতে প্রাচীন গ্রন্থকারদের উদ্ধৃতি মারফত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর আগে ভৈরব এবং ভৈরবীকেও আর্য-সঙ্গীত হিসাবে পাওয়া না গেলেও ভীরবা প্রভৃতি আদিম জাতিদের মধ্যে তার প্রচলন ছিল বহুপূর্বে। এই ভীরবাজাতির সন্ধান পাওয়া যায় মহাভারত ও পুরাণাদিতে উল্লিখিত শবর, পুলিন্দ প্রভৃতিদের সঙ্গে। মহাভারতের কাল সাধারণত খৃষ্টপূর্ব ৩য়-১ম শতক। সারদাতনয়ও তাঁর 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে ভীরবাজাতির উল্লেখ করেছেন। সারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশন' রচনা করেন খৃষ্টীয় ১১৭৫-১২৫০ শতাব্দীর ভেতর। বাণিজ্যিক ব্যাপারে সঙ্গীতের বিচিত্র উপাদান যদি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অনেক আগেই চীনে হাজির হয় তবে চীন থেকে তাদের আমদানী জাপানে হওয়াও কিছু বিচিত্র নয় এবং সেদিক থেকে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে ভৈরব > ভৈরোঁ > বায়্রো-রাগের প্রচলন হওয়া সম্ভব। অবশ্য বৈরো, বায়্রো (*Bairo*) ও ভৈরোঁ (*Bhairo* তথা ভৈরব—*Bhairav*) শব্দ দুটীর সাদৃশ্য দেখে আমাদের পক্ষে এ-অনুমান করা অসম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের মারফৎ জানা যায়, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকেই জাপান ও চীনের মধ্যে আসে সকল যোগাযোগের সুযোগ এবং সে-সময়েই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীতেরও হয় জাপানে প্রবর্তন। জাপানী-সঙ্গীতশিল্পীরা চারটী শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) গক্কুনাইন, (২) গুইনিন,

১৫৫। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ২৮
১৫৬। সঙ্গীত-মকরন্দ (বরোদা সংস্করণ), পৃঃ ১৯

(৩) ফেকি-ব্লাইণ্ড ও (৪) ঘেকোস্।[১৪৭] গকুনাইন-সঙ্গীতজ্ঞেরা কেবল ধর্ম ও প্রার্থনা-সম্বন্ধীয় সঙ্গীত গান করে, মিকাডো-অর্কেষ্ট্রা তাদের থেকে সৃষ্টি হয়েছে। গুইনিন-সঙ্গীতজ্ঞেরা পেশাদার গায়ক, সকল রকমের সঙ্গীত তারা গান করে। ফেকি-ব্লাইণ্ড গায়কেরা একসঙ্গে অনেকে ধর্ম ও সামাজিক এই উভয় রকমের গানই করে এবং ঘেকোস্ বলে নারী-শিল্পীদের। নারী-সঙ্গীতশিল্পীরা কেবল জাপানের আধুনিক গান পরিবেশন করে, তারা ধর্ম বা কোন পবিত্র উৎসব-সঙ্গীত গান করতে পায় না।

জাপানীরা ভারতবাসীদের মতন অত্যন্ত অনুকরণদক্ষ শিল্পী, সঙ্গীতানুশীলন তাঁদের জীবনে একটী অপরিহার্য জিনিস। তবে চীনাদের তুলনায় জাপানীদের সঙ্গীত তত সমৃদ্ধ নয়, বরং জাপানী-সঙ্গীত সহজ-সরল ও একটু প্রাচীনপন্থী। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ কার্ট সাচ্‌স তাই উল্লেখ করেছেন,

"In many respects, therefore, the music of the ancient East may be better studied in Japan than in China."[১৪৮]

খৃষ্টীয় ১৮৭৮ অব্দে জাপান-সরকার একটী অনুসন্ধান-সমিতি নিয়োগ করেন। সেই সমিতির কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়েছিল: সমিতির সভ্যরা দেখবেন যে, ইউরোপীয় সঙ্গীতের প্রকৃতির সঙ্গে জাপানী-সঙ্গীতের ঐক্য থাকে কিনা। সেই মর্মে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জাপান-সরকার টোকিওতে একটী জাতীয় সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন এবং সমগ্র জাপানে সঙ্গীতের অনুশীলন ও বিস্তার-সম্বন্ধে তিনি সচেষ্ট হন।

জাপানী-সঙ্গীতেও মাত্র পাঁচটী স্বরের প্রয়োগ হয় এবং বর্তমানে চীনা-সঙ্গীতের মতন তার মধ্যে ইউরোপীয় সঙ্গীতের কিছুটা মিশ্রণ ঘটলেও বিশেষ একটী ধারা ও মাধুর্য নিয়ে সে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের সামনে আদরণীয়।

জাপানে সঙ্গীতের যন্ত্রগুলিকে সম্পূর্ণ (perfect) বা পরিণত এবং অসম্পূর্ণ (imperfect) বা অপরিণত এই দুটী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

১৪৭। "* * the first being called Gakkunine * * the second, Guenin, * * the third, * * what are called *Feki-blind* musicians, * * and the fourth being designated Ghekos or singing-girls * *"—*Universal History of Music* (1894), p. 36.

১৪৮। Cf. *The Rise of Music in Ancient World*, (1944), p. 105.

সম্পূর্ণ যন্ত্র কেবল ধর্ম ও উৎসব-সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, আর অসম্পূর্ণ যন্ত্রগুলি সকল শ্রেণীর সঙ্গীতেই প্রযুক্ত হয়। সাঙ্গীতিক যন্ত্রগুলির ভেতর কোটো (Koto), সামিসেন (Samisen), কোকিউ (Kokiu) ও বিওয়া (Biwa) প্রধান। কোটোযন্ত্রের আবার বিচিত্র রূপ আছে: সুম্মা-কোটো (*Summa-koto*) একটী তন্ত্রীবিশিষ্ট, লোনো-কোটো (*Lono-koto*) তেরটী তন্ত্রীযুক্ত। চীনাদের কিন্‌যন্ত্রেও (Kin) তেরটী তারের সমাবেশ আছে। সামিসেন যন্ত্রটী (Samisen) তিনটী তারবিশিষ্ট। ঘেকো (Gheko) বা নারী-শিল্পীদের সামিসেন-যন্ত্রটী বিশেষ প্রিয়। কোকিউ (*Kokiu*) যন্ত্রটীতে চারটী তারের সমাবেশ থাকে, দেখ্‌তে বহ্লিন (Violin) বা বেহালার মতন। বিওয়া-যন্ত্রটী চীনদেশের পেপা-র (pepa) মতন দেখতে; জাপানে বিওয়া-হ্রদের নামানুসারে এই যন্ত্রটীর নামকরণ করা হয়েছে। জাপানের মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতে এই বিওয়া-যন্ত্রটীর প্রচলন বেশী। এছাড়া ফুয়ি বা টেকি (Fuye or Teki), রিয়ুটেকি (Riyuteki), সাকুহচি (Shakuhachi) প্রভৃতি বেণু বা বাঁশীর এবং ও-জুড্‌জুমি, কো-জুড্‌জুমি, কগুর-তৈকো (*O-Tzudzumi, Ko-Tzudzumi, Kagura-Taiko*) প্রভৃতি চামড়ার বাদ্যের প্রচলন আছে। খৃষ্টীয় ১৬১১ শতাব্দী থেকে জাপানে স্বরলেখা বা স্বরলিপির প্রচলন হয়। চীনাদের মতন জাপানীরা ডান দিক থেকে বামে সোজাসোজা দাঁড়ানো রেখা দিয়ে গানের স্বরগুলি লিপিবদ্ধ করেন। কণ্ঠ-সঙ্গীতের স্বরলিপিতে কথাগুলি ঐ দাঁড়ানো রেখার বামদিকে লেখা হয়।[১৪৯]

কোরিয়ার সঙ্গীতশিল্প

কোরিয়ার লোকেরাও চীনবাসীদের মতন অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। কণ্ঠ ও যন্ত্র এই উভয় সঙ্গীতের অনুশীলন কোরিয়াবাসীদের ভেতর থাকলেও নারীরা যন্ত্র-সঙ্গীতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন না। স্ত্রীলোক ও পুরুষের একত্র নৃত্যের প্রচলন কোরিয়ায় বিশেষ নেই বল্লেই চলে। কোরিয়া-বাসীরা অত্যন্ত রক্ষণশীল (conservative) জাতি; তাদের সঙ্গীতেও পাঁচটী মাত্র স্বরের বিকাশ (pentatonic) আছে। কোরিয়ার বেণীর

১৪৯। Cf. *Universal History of Music* (1896), pp. 38-39.

আগ বাত্তযন্ত্র চীনা ও জাপানীদের সঙ্গে মেলে। যেমন, কোরিয়ার সাইওয়াঙ্ (Saihwang) চীনাদের চেঙ্ (Cheng) ও জাপানীদের শো (Sho)-এর সমান। য়্যাঙ্-কুম (Yang-kum) যন্ত্রটী চীনাদের য়্যাঙ্-কিন্ (Yang-kin) এবং হাগুম্ (Haggum) বা বেহালা-যন্ত্রটী চীনের উর্-হীনের (Ur-heen) মতন। অবশ্য কোমোউন্কো (Komo-unko) কোরিয়াবাসীর অত্যন্ত প্রিয় যন্ত্র।[১৫০]

শ্যামদেশে সঙ্গীতের অভিব্যক্তি

প্রাচ্য দেশগুলির ভেতর শ্যামে সঙ্গীতের বিকাশ বিশেষভাবে হয়েছিল এবং এখনো এর অনুশীলন সে-দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। শ্যামদেশ তার সঙ্গীতের জন্যে বর্মা, পেগু, চীন ও অশেষপ্রকারে ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। শ্যামের সঙ্গীত সরল ও স্নিগ্ধ। বিভিন্ন রাগে লীলায়িত ছোট ছোট গানই সেখানের সঙ্গীত-সম্পদ। পাঁচটী মাত্র স্বরের বিকাশ শ্যামের সঙ্গীতেও পাওয়া যায়। হার্মোনিকা-জাতীয় রেনট্ (*Ranat*) শ্যামের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। এই শ্রেণীর চার রকম বাত্তযন্ত্র ওখানে পাওয়া যায়: রেনট্-এক্, রেনট্-থুম্, রেনট্-থোঙ্ ও রেনট্-লেক্ (*Ranat-Ek, Ranat-Thoom, Ranat-Thong, Ranat-Lek*)। রেনট্-থোঙ্ ও রেনট্-লেক্ ধাতুনির্মিত এবং রেনট্-এক্ ও রেনট্-লেক্ কাঠের তৈরী। গঙ্ বাত্ত (Gong) শ্যাম-বাসীদের অত্যন্ত প্রিয়। খঙ্-য়ই (*Khang-yai*) গোলাকার বাত্তযন্ত্র বিশেষ, তাতে ১৬টী গঙ্ সংযুক্ত থাকে। খঙ্-লেক (*Khong-Lek*) খঙ্-য়ইয়ের মতন বাত্ত, তবে তাতে ২১টী গঙের সমাবেশ থাকে। এ-ছাড়া চামড়ার বাত্ত (drum), যেমন—টালোট্-পোটে (*Talot-Pote*), তাফোন্ (*Taphone*), সঙ্-না (*Song-nah*), থোন্ (*Thone*) প্রভৃতি এবং স-টই (*Saw-Tai*) ও স-সাম্সই (*Saw-Samsai*) বহুলিন (Violin) বা বেহালা জাতীয় যন্ত্র; এদের প্রত্যেকটীতে তিনটী ক'রে তার থাকে। এই দু'টী বাত্তযন্ত্র ভারতীয় ত্রিতার-যন্ত্রের মতন। স-ডুয়াঙ্ ও স-উ (*Saw-Duang, Saw-Oo*) দু'তার-বিশিষ্ট বেহালার মতন যন্ত্র। পী (*Pee*) শ্যামবাসীদের একটী প্রিয় যন্ত্র, এটী আইভরি বা মার্বেল-পাথরে তৈরী হয়।[১৫১]

১৫০। Ibid, pp. 40-41.

১৫১। Ibid., pp. 31-33.

বর্মায় সঙ্গীতের রূপ

বর্মাদেশের সঙ্গীতও ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রচলন বর্মায় অভিনয়ে যথেষ্টভাবে আছে। হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে বর্মীরা নাট্যাভিনয় করেন। সোউম্ (*Soung* or *Soum*), থ্রো (*Thro*), গঙ্ প্রভৃতি বর্মাদেশের সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র। কী-বেন বা কী-ওয়েন (*Kyee-wain*) অসংখ্য গঙ্-এর সমাবেশে অর্কেষ্ট্রা-বিশেষ। ক্যাট্ (Cat) যন্ত্রটীতে সাধারণত ১২ অথবা ১৩টী তার সংযুক্ত থাকে। ক্যাটযন্ত্রটীর পরিচয় দিতে গিয়ে স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন :

"It has usualy 12 or 13 strings, and supposing the lowest to be D, the scale does not rise by tones and half tones, D, E, F, G, but thus,—1st string D, 2nd F, 3rd A. The 4th then begins with G, and the two following are B, and D. The 7th string, again begins with C. The 8th and 9th are F and G, and so on with the remainder."[১৫২]

সঙ্গীতশাস্ত্রী কার্ট সাচ্‌স সমগ্র প্রাচ্য এশিয়ার পর্দার (scale) বিকাশ-রহস্যের পরিচয় দিতে গিয়ে চীন, জাপান, শ্যাম, কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া, বর্মা প্রভৃতি দেশের স্বরগ্রাম সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন :

"The evolution of East Asiatic scales now begins to stand out. It starts from strictly pentatonic scales with thirds of any size. In a second stage, heptatonics appear in the form of seven loci for strictly pentatonic scales. * * * In China and Japan, on the contrary, scales have been rather well tempered to whole and semitones and to major thirds. * * In Siam, Cambodia, and Burma, on the other hand, seven loci have been assimilated to form almost equal seven-eighths of which are actually used in melodies."[১৫৩]

পরিশেষে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, সঙ্গীতের তুলনামূলক (comparative) অনুশীলন ও গবেষণার বিশেষভাবে প্রয়োজন, এজন্যে চাই অসঙ্কীর্ণ ও উদার মনোবৃত্তি এবং প্রাণপাত পরিশ্রম। কেবলই ওস্তাদ বা আচার্যদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে গান বা গৎ শিক্ষার দ্বারা সমগ্র সঙ্গীতকলার উন্নতি-বিধান কোন দেশেই হয় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শাস্ত্র ও সাধনা দুটীকে পাশাপাশি রেখে আমাদের সঙ্গীতের অনুশীলন করা উচিত, তাহলেই সঙ্গীতের ক্ষেত্র হবে প্রসারিত ও সমুন্নত।

১৫২। Cf. *Universal History of Music* (1866), p. 47.

১৫৩। Cf. *The Rise of Music in the Ancient World* (1944), p. 135.

ঋগ্বেদ ও তার রচনাকাল

ভারতবর্ষ যে সুপ্রাচীন দেশ এবং সকল দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি এ-কথায় আর নূতন ক'রে পরিচয় না দেওয়াই ভাল। ঋক্‌বেদ হিন্দুদের প্রাচীন সাহিত্য। ভাষা ও রচনার দিক থেকে বিচার ক'রে অনেকে এর সংকলনের কাল-নির্ণয় করেছেন খৃষ্টপূর্ব ১০০০ বছর। জার্মাণ-মনীষী পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার নির্ণয় করেছেন খৃষ্টপূর্ব ১২০০-১০০০ বছর। তিনি তাঁর গিফোর্ড বক্তৃতায় (*Gifford Lectures, 1889*) উল্লেখ করেছেন :

"* * that we cannot hope to fix a *terminus a quo.* Whether the Vedic hymns were composed 1000, or 1500, or 2000, or 3000 B. C., no power on earth will ever determine."[১৫৪] তিনি অন্যত্র আবার বলেছেন : "It may be very brave to postulate 2000 B. C. or even 5000 B. C. as a minimum date for the Vedic hymns, but what is gained by such bravery ? * * Whatever may be the date of the Vedic hymns, whether 1500 or 15000 B. C., they have their own unique place and stand by themselves in the literature of the world."[১৫৫]

ডাঃ উইণ্টারনিজ্‌ ঋগ্বেদ-সংকলনের বয়স খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বছরের বেশী বলেন নি। তিনি বলেছেন :

"We cannot, however, explain the development of the whole of this great literature, if we assume as late a date as round about 1200 or 1500 B. C. as its starting point. We shall probably have to date the beginning of this development about 2000 or 2500 B. C., and the end of it between 750 and 500 B. C."[১৫৬]

ডাঃ উণ্টারনিজ্‌ অধ্যাপক ব্লুমফিল্ডের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে আবার বলেছেন, শ্রদ্ধেয় ব্লুমফিল্ড প্রমাণ করেছেন যে, ঋগ্বেদের ৪০,০০০টী পদের মধ্যে ৫০০০ পদের পুনরুক্তি দেখা যায়, সুতরাং সংকলনের আগেও ঋগ্বেদের মন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল এ-কথা ধরে নেওয়া যায় এবং সেদিক থেকে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির বয়স আরো প্রাচীন।[১৫৭] শ্রদ্ধেয় বালগঙ্গাধর তিলক ঋগ্বেদের সংকলন-কাল নির্ধারণ

১৫৪। Cf. also (ক) উইণ্টারনিজ্‌ : *A History of Indian Literature*, Vol. I (1927), p. 293 ; (খ) জিমারম্যান *Second Selection of Hymns from the Rigveda*, Appendix V, p. cxxxi.

১৫৫। Cf. *Indian Philosophy* (1912), pp. 34-55.

১৫৬। Cf. *A History of Indian Literature*, Vol. I (1927), p. 310.

১৫৭। (ক) Ibid., p. 301 ; (খ) Vide also অধ্যাপক ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস : *Rigvedic India.* (1927), Chpls. V & XXVI.

করেছেন খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ বছর এবং অধ্যাপক হার্ম্যান জেকবির মতে খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ বছর। ডাঃ বুলার (Dr. Buhler) শ্রদ্ধেয় তিলক এবং কতকাংশে অধ্যাপক জেকবির মতবাদ সমর্থন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন :

"* * it is natural that I find Prof, Jacobi's and Prof. Tilak's views not *Prima facie* incredible, and that I value the indications for the former existence of a *mrigasiras series* of the *naksatras* very highly."[১৫৮]

কিন্তু এ-কথা অতীব সত্য যে, যতদিন না সিন্ধু-সভ্যতার যথাযথ বয়স (কাল) নির্ধারিত হয় ততদিন ঋগ্বেদের সংকলন-কাল নির্ণয় করা দুষ্কর এবং করলেও তা হবে সম্পূর্ণ আনুমানিক। মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি সুপ্রাচীন দেশের সভ্যতা বৈদিক, সুতরাং ঋগ্বেদ-সংকলন তারও অনেক আগে হয়েছিল। সিন্ধু-উপত্যকার নগরগুলিতে যে বৈদিক সভ্যতাসম্পন্ন লোকেরা প্রবেশ করেছিল (?) তার উল্লেখ ক'রে রায়বাহাদুর দীক্ষিত বলেছেন :

"The survival of copper as the proper material for sacrificial vessels in the Vedic civilization, which idea persists to the present day, is an indication of the fact that the Vedic people arrived in the Indus valley in the same stage as the Indus civilization."

রায়বাহাদুর দীক্ষিতও প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন—সিন্ধু-সভ্যতা বৈদিক লোকেরাই গড়ে তুলেছিল। সুতরাং এ-কথা ঠিক যে, বৈদিক যুগ বা বেদের সংকলন-কাল সিন্ধু-সভ্যতারও অনেক আগে এবং এ-কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। স্যার জন. মার্শাল সিন্ধু-সভ্যতার সময় নির্দিষ্ট করেছেন খৃষ্টপূর্ব ৫,০০০ থেকে ৩,০০০ বছর। কাজেই বেদের তথা ঋগ্বেদ-রচনার কাল কখনই খৃষ্টপূর্ব ১০০০, ১৫০০, অথবা ১৫০০-২০০০ বছর হওয়া সমীচীন নয়। তা ছাড়া ঋগ্বেদের বয়স নির্ণয় যদি সঠিকভাবে না হয়, তবে অপরাপর বেদ, ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র, প্রাতিশাখ্য, শিক্ষা প্রভৃতির যথাযথ বয়স নিরূপণ করাও অসম্ভব হবে,

১৫৮। Cf. (ক) *Indian Antiquary* (1894), p. 248 ; (খ) *Indian Historical Quaterly*, Vol. VIII, March 1932, No. 1. pp. 154—155.

(গ) স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের মতের উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "Some Indian scholars assign the Vedic hymns to 3000 B. C., others to 6000 B. C. The late Mr. Tilak dates the hymns about 4500 B. C., the Brahmanas 2500 B. C., The early Upanishads 1600 B. C., Jacobi puts the hymns at 4500 B. C. We assign them to the fifteenth century B. C. and trust that our date will not be challenged as being too early."—*Indian Philosophy*, Vol. I (1940), p. 67.

আর-সম্ভব হোলেও সে-নিরূপণ হবে আনুমানিকভাবেই।[১২৯] সেজন্তে বেদ, ব্রাহ্মণ, সূত্র, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার রচনা-কালের পুংখানুপুংখরূপে নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা থেকে আমরা বিরত হলাম। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য, শিক্ষা, রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ও পুরাণগুলিতে সঙ্গীতের আলোচনার সময় আমরা গতানুগতিক কাল-নির্ধারণেরই অনুসরণ করেছি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ঐ-নির্ধারণ মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা সমস্ত বৈদিক ও বৈদিকোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যগুলির রচনা-কাল নির্ণয় করা হয়েছে ঋগ্বেদ-সংকলনের ও সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার কাল-নির্ণয়কে অবলম্বন ক'রে, অথচ বেদের সঠিক কাল এখনো-পর্যন্ত অমীমাংসিত হয়েই আছে। কাজেই অমীমাংসিতকে অবলম্বন বা অপেক্ষা ক'রে অন্যান্য সাহিত্যগুলির কাল-নির্ধারণ করলে তাদের নির্ধারণ বা নিরূপণ যে অমীমাংসিতের দলেই পড়বে একথা বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে একথাই আমরা স্বীকার করি যে, ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি সুপ্রাচীন কাল থেকেই হয়েছিল ভারতবর্ষের সমুন্নত ক্ষেত্রে, সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়েছে ততদিন যতদিন মানুষ বেঁধেছে বাসা এই পৃথিবীর বুকে। সঙ্গীতাভিব্যক্তির কাহিনী ও যথাযথ ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জীর অভাব আমাদের দেশে নেই, আছে মাত্র দৈন্য তাদের একত্রীকরণের ঐকান্তিক চেষ্টায়, তাদের এক ও অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত ক'রে মাল্য রচনা করায়। বৈদিক যুগ থেকে আজ-পর্যন্ত বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গীতের অপার্থিব রূপ, কত বিবর্তন, কত পরিবর্তন ও কত শত নূতন রূপায়ণের ভেতর দিয়ে।

১২৯। অধ্যাপক কিথও (A. B. Keith) ঋগ্বেদ-রচনার কাল নিয়ে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষীদের মতবাদ উল্লেখ ক'রে পরিশেষে বলেছেন: "If we seek to ascribe a higher date than this, we must recognize that we are dealing with conjectures for which no very substantial evidence can be adduced" (p. 7). লুডউইগ, হিলব্রাণ্ড, জেকবী, হুইট্‌নী, ব্লুমফিল্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতবাদের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন: "Ludwig in an elaborate examination * * could he deduced a date of the eleventh century B. C. * * but this has been totaly disproved by Whitney. * * Much more substantial are the arguments adduced by Prof. Jacobi who sees traces of evidence that the Rigveda goes back as far as the third millennium B. C. * * In the second place, if the Rigveda is put as far back as 1500 B. C. * *,"—Cf. *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, Vol. I (1925), pp. 3-7.

সুদূর অতীতের ঘূর্ণিস্রোত কাটিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বর্তমানের বুকে, ভবিষ্যৎ চলার পথে অক্ষুণ্ণ থাকবে তার বিজয়-অভিযান, উদ্দেশ্য—বিকাশের অবিশ্রান্ত অফুরন্ত ধারাকে করবে সে সার্থক ও সুষমায়িত। অনন্তপ্রসারী তার কল্যাণ-দৃষ্টি, মহিমময় তার সৌন্দর্য ও রূপ, স্বর্গীয় ও সুনির্মল তার আদর্শ। আমরা এই গ্রন্থে সেই দৃষ্টি, রূপ ও আদর্শেরই দেব পরিচয় চাক্ষুষ ঐতিহাসিক প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ'কথাও প্রমাণিত হবে—ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিরাবরণ রূপ কত সুমহান্, মহিমোজ্জ্বল ও মাধুর্যপূর্ণ!

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামবেদ-ভাষ্যভূমিকায় সঙ্গীত

সূক্ষ্মদর্শী শিল্পী শ্রদ্ধেয় ই. বি. হ্যাভেল (E B. Havell) সত্যই বলেছেন :

"The Vedic period is all-important for the historian, because, except for a very brief period of its history, the Vedic impulse is behind all Indian art." ১

বৈদিক কালকে অনেকে বুদ্ধি, শিল্প, সৌন্দর্য প্রভৃতির প্রাথমিক বিকাশের যুগ বোলে মনে করেন, কিন্তু সে-ধারণা তাঁদের নিতান্ত ভুল। বৈদিক যুগকে বরং সকল-কিছু শিল্প, সৌন্দর্য, সাহিত্য ও দর্শনের মূল-উৎস বলা উচিত। শিল্পী হ্যাভেলও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন :

"Though the Vedic period may seem to Europeans so barren in artistic creation, it is of supreme consequence for the understanding of Indian art. For throughout all the many and varied aspects of Indian art—Buddhist, Jain, Hindu, 'Sikh and even Saracenic—there runs a golden thread of Vedic thought, binding them together in spite of all their ritualistic and dogmatic differences". ২

বৈদিক কালকে শ্রদ্ধেয় হ্যাভেল শিল্প-বিকাশের সমৃদ্ধ ও সুমহান যুগ বলেছেন: "The Vedic period in India, * * must nevertheless be regarded as an age of wonderful artistic richness". শুধু তাই নয়, ভারতীয় শিল্প ও ললিতকলার মাধুর্য-বিকাশের পিছনে আছে সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ্-সাহিত্যের প্রেরণা—"It (Indian art) took upon itself organic expression in the Vedas and Upanishads". ভারতে বৈদিক আর্য-সভ্যতার যুগ বিশ্বের ইতিহাসে একটী স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। ভারতে আর্যজাতির ছিল নিজস্ব একটি প্রতিভা, সে দিয়েছে তার আধ্যাত্মিকতার অবদান-রূপ 'দর্শন' (Philosophy) এবং সেই প্রত্যক্ষানুভূতিদীপ্ত দর্শনই ভারতের শুধু নয়, বিশ্বের সকল-কিছুকে

১। Cf. *The Ideals of Indian Art* (1920), p. 14.
২। Ibid., p. 11.

দিয়েছে দীপ্তি, জাগরণ ও শান্তি। সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, দর্শন, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা সকলেরই চরমবিকাশ-সাধন করেছে ভারতের আর্যজাতি এবং বিশ্বের সকল দেশের জাতিকে শিখিয়েছে মিলন-মৈত্রীর মন্ত্র। এই গরিমাময় আর্যজাতি ও তাঁর অপার্থিব অবদান দর্শনের জয়গান ক'রে সাধক-শিল্পী হ্যাভেলও উল্লেখ করেছেন :

"It is a profound mistake to regard the Indian Aryans as an uncreative or inartistic race; for it was Aryan philosophy, which makes all India one today, that synthesised all the foreign influences which every invader brought from outside and moulded them to its own ideals."

সামবেদেই বিশ্ব-সঙ্গীতের বীজ নিহিত। ঋগ্বেদের সুসম্বদ্ধ ছন্দগুলিতে সুর-সংযোগ ক'রে দেবতাদের উদ্দেশ্যে গান করা হোত। আচার্য সায়ণ সামবেদের ভাষ্যোপক্রমণিকায় সঙ্গীতের যতটুকু উপাদান দিয়েছেন সে-সম্বন্ধেই প্রথমে আমরা আলোচনা করব।

সামবেদ-ভাষ্যভূমিকায় আচার্য সায়ণ বৈদিক গান ও তার নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। সামভাষ্য-ভূমিকাটীর সময় সামবেদ-রচনাকালের চেয়ে অত্যন্ত আধুনিক, কিন্তু সামবেদ প্রাচীন এবং সামবেদের সাঙ্গীতিক রূপের সংক্ষেপ পরিচয় এতে আছে। সামভাষ্যে সায়ণ সামবেদের গীতিপদ্ধতিরই উল্লেখ করেছেন। তবে সায়ণ-লিখিত সামভাষ্য-ভূমিকার আসল উদ্দেশ্য হোল : জৈমিনি-রচিত পূর্বমীমাংসাদর্শনের ৬২-টী পারিভাষিক প্রসঙ্গের আলোচনা ও তার অবতারণা করা সামগানের প্রয়োগ-প্রণালীর সার্থকতাকে বিস্তৃতভাবে যজ্ঞব্যাপারে প্রয়োগ বা প্রমাণ করার জন্যে। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায় গ্রন্থ-সূচনায় তাই উল্লেখ করেছেন :

"Thus the whole of the elaborate Introduction to the *Sama-samhita* contains a detailed exposition of 62 technical topics of *Purvamimansa* which have got their bearings upon the various complex problems of the singing of Samans and their utility and application for the purpose of sacrifice." ৩

মাধবাচার্য-প্রণীত 'জৈমিনীয়ন্যায়মালাবিস্তর' পুস্তকের সারাংশের প্রসঙ্গও এতে আছে।

৩। (ক) 'বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ' (পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়-সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সং), ইংরেজী ভূমিকা, p. XXVIII.

(খ) 'সামবেদসংহিতা' (সত্যব্রত সামশ্রমী-সম্পাদিত, কলিকাতা), ভূমিকা।

আচার্য সায়ণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক জড়িত রয়েছে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর-রাজ্যের চারজন শাসনকর্তার : কম্পন (Kampana), দ্বিতীয় সঙ্গম (Sangama II), প্রথম বুক্ক (Bukka I) এবং দ্বিতীয় হরিহর (Harihara II)। এই চারজন নৃপতিরই তিনি পর পর মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। সায়ণ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন; খৃষ্টীয় ১৩৮৭ শতাব্দীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।[৪] তিনি ভাষ্যরচনা করেছেন চারটী বেদের, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয়-আরণ্যকের, পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সামবিধান, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, উপনিষদ্, সংহিতোপনিষদ্, বংশ এবং শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের। সায়ণের তিন'শো বছর আগে উবটও কতকগুলি সংহিতা ও প্রাতিশাখ্যের ওপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ভাষ্য-রচনায় সায়ণের অসামান্য চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত তৈত্তিরীয়সংহিতা, ঋগ্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা, কাণ্বসংহিতা, অথর্ববেদসংহিতা এই কয়টীর ওপর ভাষ্যের মধ্যে একমাত্র সামবেদসংহিতার ভাষ্যে বা সামবেদ-ভাষ্যোপক্রমণিকায় বৈদিক সঙ্গীতের কিছু-কিছু আলোচনা আছে। তাঁর সামবিধানব্রাহ্মণের-ভাষ্যেও সাঙ্গীতিক উপাদান আছে।

সামবেদ-ভাষ্যভূমিকায় আচার্য সায়ণ ঋক্‌কে সামগানের কারণ ও আশ্রয় বলেছেন—"তথা গীয়মানস্য সাম্ন আশ্রয়ভূতা ঋচঃ সামবেদে সমাম্নায়ন্তে। * * গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি"। আসলে ঋক্‌মন্ত্রের ওপর প্রথমাদি বৈদিক সাতস্বরকে লীলায়িত ক'রে বিভিন্ন ছন্দে বাদ্যের সঙ্গে সামগান করা হোত। আচার্য সায়ণ রথন্তরসামের উল্লেখ করেছেন। রথন্তরসামে কেবল একটীমাত্র স্বরস্তোভ গান করা হয় না, তিনটী ঋকেরই গান করা হয়—

৪। Cf. (ক) স্বামী অভেদানন্দ: *An Introduction to the Philosophy of Panchadasi* (1948), Preface, pp. XI—XVIII ; (খ) ডাঃ এস. এন. দাসগুপ্ত: *A History of Indian Philosophy*, Vol. II., pp. 214-215 ; (গ) স্যার রাধাকৃষ্ণন্: *Indian Philosophy*, Vol. II, p. 551 ; (ঘ) পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ: 'অদ্বৈতসিদ্ধি', ১ম খণ্ড; (ঙ) ডাঃ টি. এম. মহাদেবন্: *The Philosophy of Advaita* (1938), pp. 2-4 ; (চ) এম. এ. ডোরিস্বামী আয়াঙ্গার: *The Madhava-Vidyaranya-Theory* (Vide *Indian Historical Quarterly*, Vol. XII) ; (ছ) এন. বেঙ্কটরমণায়: *Vijayanagar, Origin of the City and the Empire*, Ch. II., p. 48 ff ; (জ) আর. রাম রাও: *Vidyaranya and Madhavacharya* (Vide *Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, p. 701)।

"রথন্তরং গীয়তামিতি কেনচিদুক্তাঃ অধ্যেতারঃ স্বরস্তোভবিশেষযুক্তামভিব্যেত্থ্যচং পঠন্তি, ন তু স্বরস্তোভমাত্রম্"। সুতরাং রথন্তর বা রথন্তরসাম বল্লেই বুঝ্‌তে হবে গানবিশিষ্ট ঋক্। এছাড়া 'বৃহৎ'-সামও আছে। রথন্তর ও বৃহদ্‌সাম দুটীর মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে, তবে শব্দপ্রয়োগ বা উচ্চারণে উভয়ের মধ্যে প্রার্থক্য দেখা যায়। যেমন, বৃহদ্‌সামে যেখানে 'ইরা' উচ্চারিত হয়, রথন্তর-সামে সেখানে বলা হয় 'ইড়া'। বৃহৎ যখন মন, রথন্তর তখন স্বর বা ধ্বনি; বৃহৎ যেখানে স্বর, রথন্তর সেখানে পদ; বৃহদ্‌সামকে যেখানে বাইরে (শ্বাসের সাহায্যে) প্রকাশ করা হয়, রথন্তরের বিকাশ সেখানে মধ্যে; বৃহদ্‌কে যেখানে আকাশ-রূপে কল্পনা করা হয়, রথন্তর সেখানে পৃথিবীরূপে কল্পিত। তবে গায়ক বা সামগ বৃহৎ অথবা রথন্তর যেকোন একটী সাম গান করতে পারেন।[৫]

'সাম' শব্দে সর্বদাই গান বুঝায়। সায়ণ এর সমর্থনে প্রমাণবাক্য উল্লেখ করেছেন,

সামোক্তিবৃহদাদ্যুক্তী গীতায়ামৃচি কেবলে।
গানে বা গান এবেতি স্মার্যতে সপ্তমোদিতম্॥

ভাষ্যকার সায়ণ বলেছেন: "সামশব্দবাচ্যস্ত গানস্ত স্বরূপমৃগক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরবিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাত্ততে। ক্রুষ্টঃ প্রথমো দ্বিতীয়স্তৃতীয়চতুর্থঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠশ্চেত্যেতে সপ্তস্বরাঃ। তে চাবান্তর-ভেদৈর্বহুধা ভিন্নাঃ।" ঋক্‌মন্ত্রে প্রথমাদি সাতটী স্বর সংযুক্ত ক'রে সামগান গাওয়া হোত। প্রথমাদি স্বর আবার অবান্তরভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বিভিন্ন স্বরের প্রয়োগে সামগানের রূপও বিচিত্র আকারে প্রকাশ পেত। গানের রীতিও বিভিন্ন ছিল, কেননা সামবেদে গান করার পদ্ধতি অসংখ্য রকমের ছিল—"সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ"। অবশ্য উপায়ভেদে অনেক সময় বেদের শাখাভেদও হয়েছে। মীমাংসাদর্শনে (১।২।২৬) যে "গীত্যুপায়াঃ" শব্দটী উল্লিখিত হয়েছে তার অর্থ সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে আচার্য জৈমিনি লিখেছেন: "গীতির্নাম ক্রিয়া হ্যাভ্যান্তরপ্রযত্নজনিতস্বরবিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা, সামশব্দাভিলপ্যা। সা নিয়ত প্রমাণা, ঋচি গীয়তে। তৎসম্পাদনার্থোহয়মৃগক্ষরবিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভ ইত্যেবমাদয়ঃ সর্বে সামবেদে

৫। রথন্তর ও বৃহৎ সামদুটীর বিস্তৃত বিবরণ—Vide ডাঃ কালাণ্ড: *Panchavimsa-Brahmana* (Eng. Trans. 1931), pp. 145-152.

সম্প্রায়য়ন্তে"। গান কর্মবিশেষ এবং সেই কর্ম বা কার্য আভ্যন্তরিক, কেননা প্রাণবায়ু নাভি থেকে কণ্ঠে প্রবাহিত ও আহত হোয়ে শব্দের সৃষ্টি করে। স্বর অভিব্যক্ত হয় কণ্ঠ দিয়ে; কণ্ঠ মাধ্যম, কিন্তু প্রাণবায়ু কারণ। বৈদিক সমাজে বিভিন্ন ঋগক্ষরবিশিষ্ট স্তোভসমূহ স্বরযোগে গান করা হোত।

"সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ" কথাগুলির পিছনে বৈদিক সঙ্গীতশাস্ত্রীদের উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের রুচি যখন বিভিন্ন, উদ্ভাবনী-শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ যখন বিচিত্র তখন আবিষ্কারের ধারা ও উপায় বহুমুখী হওয়া স্বাভাবিক, নচেৎ স্বাধীন ও গতিরুচ্ছল প্রবাহকে রোধ করার অর্থই প্রকৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। বিভিন্ন ধরণের গানের উপায় বৈদিক সমাজেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতের বুকেও অব্যাহত থাকবে। আধুনিক শিল্প-জগতেও বিচিত্র শ্রেণীর সঙ্গীতের প্রচলন আছে, সুতরাং কোন্‌টী বড় বা ভাল, কোন্‌টী ছোট বা খারাপ, সে-সব বিচারের অবসর থাকা উচিত নয়, নিজের নিজের আসনে সকলেই প্রধান; কাজেই সকলের গতি থাকবে উন্মুক্ত, তবে উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেকেরই সমান। বর্তমানে আধুনিক (modern) এবং ক্ল্যাসিকাল শ্রেণী নিয়েও মতবিরোধ বড় কম নেই, কিন্তু বিরোধের পরিবর্তে ঐক্য ও মৈত্রীর ভাব পোষণ করাই ভাল। দেশী-সঙ্গীতের পাশে মার্গ-সঙ্গীতের ধারা চিরদিনই প্রবাহিত ছিল ও থাকবে। বৈদিক সমাজেও গ্রামেগেয়গানের পাশে অরণ্যেগেয়গানের প্রচলন ছিল, বৈরীভাব ছিল না, বরং পরস্পরের ভেতর মৈত্রীভাবেরই প্রাধান্য ছিল। বাংলায় যেমন কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী, সহজিয়া, গম্ভীরা, রবীন্দ্রসঙ্গীত; অন্যান্য দেশেও তেমনি কাজ্‌রী, চৈতী, ভজন এবং গ্রাম্য অনেক গানের প্রচলন আছে। নূতন নূতন শ্রেণী এবং পদ্ধতিরও সৃষ্টি হবে, তবে বিশুদ্ধতাকে সবার মাঝখানেই স্থান দিতে হবে। মার্গ ও ক্ল্যাসিকালের ছ'রাগ ও ছত্রিশ বা ত্রিশ রাগিণীই চিরদিন সমাজে প্রাধান্য স্থাপন ক'রে থাকতে পারেনি, আরো অনেক রাগের সৃষ্টি হয়েছে, ভবিষ্যতে আরো অসংখ্য রকমের হবে, কাজেই সকলকেই সঙ্গীতের দরবারে স্থান দিতে হবে সম্মানের সাথে। বারটী স্বরের (শুদ্ধ ও বিকৃত) আরোহণ ও আরোহণক্রমে সহস্র সহস্র রাগের সৃষ্টি হয়েছে ও হোতে পারে, চিরসম্ভাবনার আশাকে চিরদিনই সমাজ বরণ করছে ও করবে। কাজেই সঙ্গীতের সাধনক্ষেত্রে অনুদারতার ও কার্পণ্যের স্থান কোথা? মীমাংসাকার জৈমিনির "সহস্রং গীত্যুপায়াঃ" ইঙ্গিতটী

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সত্যই এক নবচেতনার সৃষ্টি করেছে এবং আমরাও সেই চেতনাময় স্পর্শকে সর্বদা মাথায় পেতে নিতে প্রস্তুত আছি।

এই ঔদার্যের সমর্থন ক'রে আচার্য সায়ণ 'ন্যায়বিস্তরমালা' থেকে প্রমাণ-বাক্যের উদ্ধৃতি দেখিয়ে বলেছেন, বিচিত্র গান অথবা বিভিন্ন গীতিপদ্ধতি সৃষ্টি হবার দু'টী প্রধান কারণ হোল: তাদের মধ্যে একটী 'সমুচ্ছেয়' ও অপরটী 'বিকল্প'। যেমন,

সমুচ্ছেয়া বিকল্প্যা বা বিভিন্না গীতিহেতবঃ।
আন্তঃ প্রয়োগগ্রহণাদর্থৈকত্বাদ্ বিকল্পনম্॥

সমুচ্ছেয়-পদ্ধতিটী প্রয়োগ ও বিকল্পটী অর্থ বা ভাবের অনুযায়ী ব্যবহৃত হোত। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে তবল্কার প্রভৃতি শাখাভেদে গানে অক্ষর-বিকারের প্রয়োগ ছিল।

গান হিসাবে স্তোভের প্রচলন ছিল। স্তোভ তিনশ্রেণীর: বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। স্তোভে বর্ণ-বিকারের পরিবর্তে বরং বিপরীত বর্ণের প্রয়োগ হোত; যেমন 'অগ্ন আয়াহী' শব্দের জায়গায় স্তোভে গান করা হোত 'ওগ্নায়ি' (গেয়গান, প্রপা° ১, সাম° ১)। এজন্যে স্তোভের লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে: "অধিকত্বে সত্যাগ্বিলক্ষণবর্ণঃ স্তোভঃ"। বৈদিকগানে বর্ণলোপেরও নিয়ম ছিল, তাই সায়ণ বলেছেন: "অক্ষরবিকারস্তোভাদিবৎ বর্ণলোপাঽপি কচিদ্ গীতিহেতুর্ভবতি"। গেয়গান, বেয়গান, যোনিগান প্রভৃতিতে[৬] এই নিয়ম মানা হোত। মোটকথা বিচিত্রভাবে ও বিভিন্ন রীতিতে সামগান গাওয়া হোত—"বহুভিঃ প্রকারৈর্গানাত্মকং যৎ সামস্বরূপং নিরূপিতম্"।

যজ্ঞকালে বেদগান বা সামগানের রীতি ছিল। তবে যাগানুষ্ঠানের মধ্যে যেমন সামগান করা হোত তেমনি যজ্ঞশালার বাইরেও গান করার নিয়ম ছিল। ভাষ্যে তাই বলা হয়েছে, গুণকর্মের জন্যে ব্রীহি যব প্রভৃতি প্রোক্ষণের মতন যাগানুষ্ঠানের মধ্যে গান করার বিধি ছিল, আর বিশ্বজিৎযাগের মতন যজ্ঞের বাইরেও সামগান করা হোত—"যাগপ্রয়োগাদ্ বহিরধ্যয়নকালেঽপি পঠ্যমানত্বাৎ, গুণকর্মত্বে তু ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবদ্ যাগমধ্যে এব গানমনুষ্ঠীয়েত,

৬। (ক) বেদসাম, বেয়গান, গেয়গান সমস্তই যোনিগানের রূপভেদমাত্র। (খ) Cf. ডাঃ ডব্লিউ কালাণ্ড: *Panchavimsa-Brahmana* (Eng. Trans. 1931), Introduction,

ততো বহির্গানস্ত বিশ্বজিদাদিবৎ ফলং কল্পনীয়ম্।" দেবতাদের স্তুতিবাচক সামও গান করা হোত এবং তাদের বলা হোত 'স্তোত্রিয়' (স্তুতিনিষ্পাদক)। এই স্তোত্রিয়গান একটী মাত্র ঋকের দ্বারা সম্পন্ন হোত। দু'তিনটী ঋকেও সাম রচিত হোত। তিনটী ঋকে রচিত সামের নাম 'স্তাত্রিয়'। অবশ্য স্তাত্রিয়গান গাওয়া হোত তিনভাগে বিভক্ত ঋকৃগুলির এক একটীকে নিয়ে—"একৈকস্তামৃচি গাতব্যঃ"। স্তাত্রিয়সাম সম ও বিসম এই উভয় ছন্দেই গান করা হোত।

সামগানের মাধ্যমে ঋক্ পাঠ করার দুটী গ্রন্থ আছে—ছন্দ ও উত্তরা। 'ছন্দ' নামক গ্রন্থে নানাবিধ সামের কারণস্বরূপ ('যোনিভূতা') ঋক্ পাঠ বা গান করা হোত, আর 'উত্তরা' নামক গ্রন্থে তিনটী ঋক্‌সমন্বিত সূক্ত পাঠ করার নিয়ম ছিল: তিনটী ঋকের মধ্যে প্রথমে একটী ও পরে দুইটী—এইভাবে। ছন্দগ্রন্থকে অনেকে 'যোনিগ্রন্থ' বলেন। 'উত্তরা' কর্মাঙ্গ-প্রকরণের গ্রন্থ, এ' থেকে পঞ্চদশ, সপ্তদশ প্রভৃতি স্তোমের সৃষ্টি হয়। এই 'উত্তরা'-গ্রন্থেই ত্রৈশোক, বামদেব্য, রথন্তর প্রভৃতি সামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈরাজ, রৌরব, যৌধাজয়, পবমান, রৈবত, গায়ত্র্য, ব্রহ্ম প্রভৃতি সামেরও উল্লেখ আছে। এই সকল সাম ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে গীত হোত। পঁচিশটী স্তোমযুক্ত বামদেব্যসাম মহাব্রতযাগে গান করা হোত।[৭] 'সৌভরণস্তোত্র' গান করা হোত বৃষ্টি, অন্ন, স্বর্গ ইত্যাদি কামনা ক'রে। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে (৮।৮।১৮) আছে: "যো বৃষ্টিকামো যোঽন্নাদ্যকামো যঃ স্বর্গকামঃ স সৌভরেণ স্তুবীত, সর্বে বৈ কামাঃ সৌভরম্"। মাধ্যন্দিনযাগে যৌধাজয় ও রৌরবসাম গীত হোত। সকল স্তোত্রগান তথা সামই কামনা-পূরণের জন্যে ব্যবহৃত হোত। গাথারও প্রচলন ছিল। গাথা অর্থে বিহিত মন্ত্রবিশেষ—"বিহিতা মন্ত্রবিশেষা গাথাঃ"। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।১।৮।২) আছে: "যমগাথাভিঃ পরিগায়তি।" স্তোত্রগানে ও সামগানে মাত্রা ও লয়ের ব্যবহার ছিল—"নোচ্চৈর্গেয়ং ন বলবদ্ গেয়মিতি রথন্তরধর্মঃ। তস্মাদুভয়োর্ধর্মা ব্যবতিষ্ঠন্তে ইতি।"

ব্রাহ্মণ ও সংহিতার যুগে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল। কর্মকাণ্ড নিয়ে মানুষ তখন বিব্রত, অথচ ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, ভগবান, স্রষ্টা, সৃষ্টি, ভাল-মন্দ, ইহলোক-পরলোক, কার্য-কারণ প্রভৃতির ধারণা মানুষের মধ্যে জাগ্রত ছিল। যাগযজ্ঞ-রূপ কর্মানুষ্ঠানের পিছনে ছিল স্বর্গলাভের কামনা এবং পার্থিব সুখেরও আকাঙ্ক্ষা।

৭। 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ' (কলকাতা, ১৮৭০), ৫।১

তখন সঙ্গীত গাথা, স্তোত্র, স্তোভ, স্তোম্ প্রভৃতির আকারে বিকাশ লাভ করেছে, অথচ স্তোত্রে, বেদপাঠে, গানে প্রথমাদি সাতস্বরের মিতালী ছিল। স্বরোচ্চারণের রীতি ও প্রণালীর মতন গানেরও পদ্ধতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাও ছিল শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। সঙ্গীতের তখন শৈশবকাল বলা যেতে পারে। অভিজাত গানের প্রসারতা গোড়াকার দিকে ছিল কেবল হোতা, অধ্বর্যু, উদ্‌গাতা ও ব্রাহ্মণের ভেতর, নচেৎ লোকসঙ্গীত বা দেশীগানের প্রচলন তো সর্বসাধারণের ভেতর ছিলই। ক্রমে সঙ্গীত সমষ্টির ও সমাজের মধ্যে স্থান পেল, তার উপাদান এবং রূপেরও হোল বিচিত্র বিকাশ, ক্রমবিবর্তনের পথে সে নিজেকে করল সমৃদ্ধ, অফুরন্ত অবিশ্রান্ত হোল তার গতি ও প্রেরণা।

তৃতীয় অধ্যায়

সামবিধানব্রাহ্মণে সঙ্গীত

ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব এই চার বেদ। অথর্ববেদকে অনেকে পরবর্তী বিকাশের গ্রন্থ বলেন, প্রথমে ত্রয়ী তথা ঋক্ সাম ও যজুর উল্লেখই পাওয়া যায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যগুলিতে।[১] প্রত্যেক বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই তিনটী অংশ আছে। মন্ত্রসমুচ্চয়ের নাম 'সংহিতা'। উপনিষদ্ ও আরণ্যক ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের শেষাংশ হিসাবে গণ্য। ব্রাহ্মণে স্বর্গ তথা ফলকামীদের জন্যে যাগযজ্ঞাদির বিধান পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের পরে আরণ্যক-সাহিত্যগুলির উপযোগিতা। ব্রাহ্মণসাহিত্যের সঙ্গে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ তথা পুরোহিতদের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। শ্রদ্ধেয় বাল-গঙ্গাধর তিলক ব্রাহ্মণগুলির বয়স খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর বলেছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত এ-থেকে ভিন্ন।

অধ্যাপক কিথ বলেছেন, একেবারে শেষদিকের ব্রাহ্মণগুলির বয়স প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতক এবং সংহিতাগুলির বয়স তাদের তুলনায় খৃষ্টপূর্ব ৮০০—৭০০ শতক। ভাষার দিক থেকে বিচার ক'রে দেখ্‌লেও এ-সিদ্ধান্তই সমীচীন বোলে মনে হয়। পাণিনির কাল খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতকেরও পরবর্তী; পাণিনি যে-ভাষার ব্যবহার করেছেন, ব্রাহ্মণের ভাষার তুলনায় তা আধুনিক হিসাবে গণ্য। পাণিনির চেয়ে নিরুক্তকার যাস্ক প্রাচীন। যাস্ক যে ভাষার ব্যবহার করেছেন তাঁর নিরুক্তে বৈদিক অংশগুলির আলোচনায়, ঋগ্বেদের নিজস্ব পদপাঠগুলির ভাষা তা থেকে অনেক ভিন্ন ও প্রাচীন। শাকল্য আবার যাস্কের চেয়ে প্রাচীন। শাকল্য ঋগ্বেদের পদপাঠগুলির পুনরুদ্ধার করেছেন। শাকল্যের চেয়ে প্রাচীন সংহিতার পাঠগুলি। ব্রাহ্মণ কিন্তু সংহিতার পাঠগুলিকে অনাদর-দৃষ্টি দিয়েছে বলা যায়, কেননা ব্রাহ্মণে

১। ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "The invariable mention of the three Vedas shows that the study of the Atharva Veda was not included in the curriculam for general education at the time of the Jatakas."—*Buddhistic Studies* (edited by Dr. B. C. Laha, 1931), p. 249.

পাওয়া যায় পরবর্তীকালের বাঁধাধরা সন্ধিবিহীন আদিম ভাষার নিদর্শন এবং তা থেকে ব্রাহ্মণগুলির বয়স খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতকের বেশী নির্ধারণ করা যায় না।

সামবিধানব্রাহ্মণ সামবেদের অন্তর্গত এবং ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হিসাবে একে 'অণুব্রাহ্মণ' বলা হয়। সামবেদের অনেকগুলি ব্রাহ্মণ। এক কৌথুমীশাখায় সাতটী ব্রাহ্মণের নাম পাওয়া যায় এবং সেগুলি হোল: পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ় অথবা তাণ্ড্যব্রাহ্মণ, ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণ (এই ষড়্‌বিংশের শেষ প্রপাঠকের নাম অদ্ভুতব্রাহ্মণ), সামবিধানব্রাহ্মণ, আর্ষেয়ব্রাহ্মণ, মন্ত্রব্রাহ্মণ বা উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ অথবা ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণ ও বংশব্রাহ্মণ। কখনো কখনো পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ ও ছান্দোগ্যব্রাহ্মণ তিনটীকে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া অন্যান্যগুলিকে অণুব্রাহ্মণ বলে। জৈমিনীয়শাখায় জৈমিনীয় ও জৈমিনীয়োপনিষদ্ এই দু'টী ব্রাহ্মণ। রাণায়নীয়শাখার কতকগুলি মাত্র সূত্র আছে।

আমরা আগেই বলেছি যে, তাণ্ড্য বা প্রৌঢ়ব্রাহ্মণ সকলের চেয়ে প্রধান ও বিস্তৃত; এর পঁচিশটী প্রপাঠক বা অধ্যায় থাকার জন্যে একে পঞ্চবিংশব্রাহ্মণও বলা হয়। এতে সোমযাগের বিচিত্র বিবরণ দেওয়া আছে। এছাড়া সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদুটীর তীরে যে সকল যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হোত তাদের পরিচয়ও এতে আছে। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে ব্রাত্যষ্টোমের উল্লেখ আছে।

ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণখানিকে পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট বলা যায়। ষড়্‌বিংশে এমন কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে যা থেকে প্রতিমাপূজার প্রচলন যে ব্রাহ্মণের যুগে ছিল তা প্রমাণ হয়। আর্ষেয়ব্রাহ্মণকে মোটামুটি সামবেদের সূচীপত্র বলা যায়। দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণে (দেবতাদের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণে) সামগানের উল্লেখ আছে। বংশব্রাহ্মণে সামবেদের ঋষিদের নামের পরিচয় পাওয়া যায়। জৈমিনীয়-উপনিষদ্-ব্রাহ্মণে কেনোপনিষদের প্রসঙ্গ থাকায় এটীও আমাদের কাছে আদরণীয়। মন্ত্রব্রাহ্মণকে ছান্দোগ্যব্রাহ্মণও বলে, কেননা ছন্দগানকারীরা এই ব্রাহ্মণটীকে প্রমাণিক বোলে মনে করেন। "ছন্দোগানাং ধর্মঃ আম্নায়ো বা" কথাগুলি থেকে 'ছান্দোগ্য' শব্দটীর সৃষ্টি। 'ছন্দোগ' শব্দটীর অর্থ ছন্দ অথবা সামগানকারী—"ছন্দো সামগায়তি ইতি ছন্দোগঃ"; সুতরাং ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অর্থ: ছন্দগানকারী সামগদের অথবা সামবেদপন্থীদের ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণটীতে দশটী অধ্যায় আছে এবং দশটীর মধ্যে আটটী

অধ্যায় নিয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের সৃষ্টি, সুতরাং ছান্দোগ্যব্রাহ্মণটীর সার্থকতা দুটী মাত্র অধ্যায় নিয়ে। এই ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ে আরম্ভ হয়েছে সাবিত্রীদেবতার যজ্ঞপ্রসঙ্গ নিয়ে—"ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়"। এতে আটটী সূক্ত আছে বিবাহ ও পুত্রজন্ম-সম্বন্ধীয় যাগকর্মের অবতারণায়। তৃতীয় সূক্তে পতির প্রতি পত্নীর হৃদয়-আনুকুল্যের কথা আছে—"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব" প্রভৃতি। এই ব্রাহ্মণটী প্রধাণতঃ গৃহবাসীদের উদ্দেশ্যে রচিত।

বৈদিকগান বল্‌তে সামগান বুঝায়। সামগান যজ্ঞানুষ্ঠানে গাওয়া হোত ও সেগুলির পিছনে উদ্দেশ্য থাকত বিচিত্র রকমের। গানগ্রন্থ ছিল চারটী: গ্রামেগেয়গান, অরণ্যেগেয়গান, উহগান এবং উহ্যগান বা রহস্যগান। এদের মধ্যে গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয়গান দুটীই প্রধান ছিল। গ্রামেগেয়গানকে যোনিগান, প্রকৃতিগান এবং বেদসামও বলে। অধ্যাপক বার্ণেল সাম বা 'Samans' বল্‌তে স্বর বা 'tunes' বলেছেন এবং উল্লেখ করেছেন:

"The 'Saman' is originally a sentence (for many suktas, especially in the Aranyakaganas, are in prose) sung or chanted in a peculiar manner ; and the ganas are collections of such verses arranged according to the purposes for which they were supposed to be intended."[২]

গানগ্রন্থে কেবল যদি ঋক্ থাকে তবে তাকে আর্চিক বলে। এই আর্চিকের 'ছন্দস্' ও 'উত্তরা' নামে দুটী অংশ আছে। সামগরা স্বর সংযোগ ক'রে আর্চিক তথা ঋক্‌মন্ত্র গান করতেন। আচার্য সায়ণও বলেছেন—"সামগানাং ঋক্‌পাঠায় দ্বৌ গ্রন্থৌ বিদ্যেতে, ছন্দঃ উত্তরা চেতি"। ছন্দ-আর্চিককেই পূর্বার্চিক বলে। পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিকের মধ্যে উত্তরার্চিকের উপয়োগিতাই যজ্ঞানুষ্ঠানে বেশী। যজ্ঞে যত স্তোত্র স্বর ক'রে গাওয়া হোত সবগুলিই উত্তরার্চিকের সূক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকৃত। এই সূক্তগুলি ত্রিঋচ্ বা তিনটী ঋক্‌সম্পন্ন হোত, অর্থাৎ প্রত্যেকটী ত্রিঋচে থাকৃত ঋগ্বেদের তিনটী ক'রে পদ। অবশ্য কতকগুলি ত্রিঋচে যে দুটী ক'রে পদও থাকত না, তা নয়। কতকগুলিতে আবার তিনটীরও বেশী পদ থাকৃত এবং সামান্য কয়েকটীতে বারটী পর্যন্ত পদের সমাবেশ থাকৃত। প্রত্যেকটী ত্রিঋচের প্রথম পদকে বলা হোত 'যোনি' এবং অপরগুলিকে 'উত্তরা'। পূর্বার্চিকে যোনিমন্ত্রগুলিকে পৃথকভাবে সংগ্রহ করা হোত, আর সেজন্যেই

২। Cf. *Notes on Samavidhana-Brahmana*, (1873), p. XXXI.

পূর্বার্চিককে ছন্দোগ্রন্থ বা যোনিগ্রন্থও বলা হোত। বিবরণকার মাধবচার্যের মতে, এক একটা আর্চিকে তিনটা ক'রে ভাগ থাকে, কারণ তাঁর মতে আরণ্যকগুলি ছিল পৃথক হিসাবে গণ্য। কিন্তু সায়ণের অভিমত ছিল ভিন্ন; তিনি আরণ্যককে বলতেন 'ছন্দোগ্রন্থ'। আসলে ছন্দ-আর্চিক ও উত্তরার্চিক বেদসাম-গান ও উহগান গ্রন্থদুটীর ভিত্তি বা আশ্রয়স্বরূপ ছিল। বেদসাম ও উহগানের মধ্যে কোন্‌টী অপৌরুষেয় অথবা পৌরুষেয় এ-নিয়েও বৈদিক আচার্যদের ভেতর যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে।

সামবেদ বিচিত্র ভাবে ও রূপে বিকশিত হয়েছে একথা মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে "সহস্রবর্ত্মা সামবেদে" কথাগুলিতে স্বীকার করেছেন। এজন্যে অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন কালে সামবেদের একসহস্র শাখা ছিল। কতকগুলি পুরাণেও এ-ধরণের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকে মহর্ষি পতঞ্জলির প্রমাণবাক্যটীর অর্থ করেন অন্যভাবে। তাঁরা বলেন, সামবেদের সহস্রশাখা ছিল না, বরং ছিল গানের বিচিত্র গায়কী-ভঙ্গী ও ধারা; বিভিন্নভাবে ঋকে স্বর-যোজনা ক'রে সামগরা অসংখ্য প্রণালীতে গান করতেন। মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরাচার্যও এ-কথাই বলেছেন: "সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ"। শেষোক্ত লোকদের বিশ্বাস যে, সামবেদের মাত্র তেরটী শাখা ছিল, তেরজন ঋষির নামানুসারে সেই তেরটী শাখার নামকরণ করা হয়েছিল। 'সামতর্পণবিধি'-তে তেরজন ঋষির নামোল্লেখ আছে এবং সেই তেরজন ঋষির নাম যথা, রাণায়ন, সত্যামুগ্র্য, ব্যাস, ভগুরী, ঔলুণ্ডী, গৌলগুলভি, ভানুমনৌপমন্যব, করাতি, মশক-গর্গ্য, বর্ষগব্য, কৌথুম, শালিহোত্র ও জৈমিনি। কতকগুলি পুরাণে অন্যান্য শাখারও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু যতগুলি শাখাই বৈদিক সমাজে থাক না কেন, রাণায়নীয়, কৌথুমী ও জৈমিনীয় এই তিনটী শাখারই মাত্র প্রচলন পাওয়া যায়। প্রথম দুটীর মধ্যে মন্ত্রপাঠের বিশেষ কোন প্রার্থক্য দেখা যায় না, সাজানোর মধ্যে মাত্র সামান্য ভেদ আছে। যেমন, একটীতে আছে প্রপাঠক, অর্ধ-প্রপাঠক ও দশতি এবং অপরটীতে আছে অধ্যায় ও কাণ্ডের সমাবেশ। এদের স্বরে ও উচ্চারণে অথবা গানের মধ্যে মাত্র ভেদ থাকতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত জৈমিনীয়শাখার সঙ্গে রাণায়নীয় ও কৌথুমীশাখা-দুটীর পার্থক্য ছিল অনেক বিষয়ে।

পূর্বার্চিকে ছ'টি-মাত্র প্রপাঠক ও সেই প্রপাঠকগুলি দুটি অর্ধে

বিভক্ত ছিল। সেই অর্ধগুলি আবার দশতিতে ভাগ করা থাকৃত এবং প্রত্যেকটী দশতিতে থাকৃত দশটীর বেশী অথবা কম পদ। সুতরাং সাধারণতঃ পদসংখ্যা হোত প্রায় ৫৮৫টী। সেই ৫৮৫-টী পদপাঠ আবার তিনটী কাণ্ডে বিভক্ত ছিল। প্রথম কাণ্ডে থাকৃত একটী অধ্যায় ১১৪-টী পাদের সমাবেশকে নিয়ে। ১১৪-টী পাঠ বা পদপাঠ অগ্নির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত থাকৃত, এজন্যে সেই কাণ্ডের নাম দেওয়া হোত 'আগ্নেয়কাণ্ড'। দ্বিতীয় কাণ্ডে পদ থাকৃত ৩৫২-টী; সেগুলি তিনটী অধ্যায়ে বিভক্ত থাকত ও পদগুলি উৎসৃষ্ট হোত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে, তাই সে-কাণ্ডের নাম ছিল 'ঐন্দ্রকাণ্ড'। তৃতীয় কাণ্ডে থাকৃত একটী মাত্র অধ্যায় ও ১১৯-টী পদ; সোম-পবমাণের উদ্দেশ্যে সেগুলি উৎসর্গীকৃত হোত, সেজন্যে সেই কাণ্ডকে বলা হোত 'পবমাণকাণ্ড'। তিনটী কাণ্ডের তিনটী দেবতা ওঙ্কার তথা অ+উ+ম-এর প্রকাশক বা প্রতীক ছিল। এছাড়া ৫৫-টী পদযুক্ত একটী আরণ্য বা অরণ্যকাণ্ড এবং ১০-টী পদযুক্ত 'মহানম্ন্যার্চিক' নামে একটী পরিশিষ্টও ছিল। সুতরাং এই সকল কাণ্ড ও পরিশিষ্টের সর্বশুদ্ধ পদসংখ্যা ছিল ৬৫০-টী।

উত্তরার্চিকে ১১-টী প্রপাঠক ছিল এবং সেগুলি বিভক্ত ছিল ২২-টী অর্ধে। সেই অর্ধগুলি আবার ১১৯-টী কাণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটীতে থাকৃত বিভিন্ন সংখ্যার সূক্ত। মোট ৪০০-টী ছিল সূক্ত এবং ১২২৫-টী ঋক্। সেগুলিকে কেউ কেউ ন'টী প্রপাঠকে বিভক্ত করেন। তাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটী প্রপাঠকে দু'টী ক'রে অর্ধ এবং বাকি চারটী প্রপাঠকে তিনটী ক'রে অর্ধ—মোট ২২-টী অর্ধ ছিল। আবার উত্তরার্চিকে ছিল ১৮৭-টী ত্রিঋচ্ এবং তাদের মধ্যে পূর্বার্চিকে মাত্র ২২৬-টী যোনির সমাবেশ ছিল। বাকি ৬১-টী সোমযাগের যোনি প্রাতঃসবনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ছিল, কিন্তু সেগুলি লুপ্ত যোনির মতনই পড়ে থাকৃত। বর্তমানে ঋগ্বেদের শাকল বা শাকল্য-শাখার পাঠে সামবেদে উল্লিখিত ১০৫-টী মন্ত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মনে হয়, কোন লুপ্ত শাখার অনুসন্ধান করলে ঐ মন্ত্রগুলি পাওয়া যেতে পারে।

সামবেদই সঙ্গীতের মূল। বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, পুরাণ, উপনিষদ্ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে সামবেদের যথেষ্ট প্রশংসা করা হয়েছে। অনেকের মতে, সামগান গাওয়া হোত মাত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটীতে। কিন্তু তা ঠিক নয়, ক্রুষ্টাদি বৈদিক পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরেও সাম গান করা হোত এবং এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত-

ভাবে আলোচনা করা হয়েছে পরে। বৈদিক গ্রন্থে 'স্বরমণ্ডল' শব্দটার আমরা উল্লেখ দেখি। শিক্ষাকার নারদও স্বরমণ্ডলের উল্লেখ করেছেন—"সপ্তস্বরাঃ ত্রয়োগ্রামা মূর্ছ্ছনাস্বেকবিংশতিঃ তানা একোনপঞ্চাশৎ ইত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্" (২।৪)। স্বরমণ্ডল অর্থে সাত স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছ্ছনা ও উনপঞ্চাশ তানের একত্র সমাবেশ। শিক্ষায় নারদ যে সাতস্বরের উল্লেখ করেছেন তা নিছক বৈদিক ক্রুষ্টাদি নয়, লৌকিক ষড্‌জাদি স্বরকেও তিনি গ্রহণ করেছেন। বৈদিক সামগানে ষড্‌জাদি স্বরের ব্যবহার হোত কিনা তার প্রমাণ নেই, কাজেই শিক্ষাকার নারদ যে স্বরমণ্ডলের কথা উল্লেখ করেছেন তা সামগানের যুগের শেষদিকের বিকাশ। তবে এটা ঠিক যে, সামগানে তিন থেকে সাতস্বর, গ্রাম, মূর্ছ্ছনা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল; গানের সঙ্গে থাকৃত বীণা ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য এবং সামগ-পুরনারীদের ছন্দায়িত নৃত্য।

সামগানকারী বা সামগরা মোটামুটি দুটীভাগে বিভক্ত ছিলেন: উদ্‌গাত্রী ও প্রস্তোত্রী। বৃহদ্ ও রথন্তর প্রভৃতি সামগুলি নির্দিষ্ট পদ-সংযোগে গান করা হোত। এই পদগুলিকে স্বকীয়পদ বলা হোত। কোন যাগে যখনই রথন্তর অথবা বৃহদ্‌সাম গাইবার নির্দেশ থাকৃত তখনি বুঝ্‌তে হবে যে, সর্বদা ঐ নির্দিষ্ট স্বকীয়পদই গান করতে হবে (—দ্রাহ্যায়ণ ২।১।২)। কখনো কখনো অপরাপর পদ যোজনা ক'রে গান করারও রীতি ছিল। যেমন উল্লিখিত হয়েছে "কবতীষু রথন্তরং গায়তে"। পদের এই 'কবতী' শব্দ তথা "কয়ানশ্চিত্র আ-ভুবৎ" প্রভৃতি ও আর দুটী পদ বামদেব্যসামের স্বকীয়-পদকে বুঝায়; অর্থাৎ এ-ধরণের ভিন্ন নির্দেশ থাকৃলে বুঝ্‌তে হবে যে, এগুলিকে বামদেব্য-সামের পরিবর্তে রথন্তরসামেই গান করতে হবে। বিভিন্ন যাগ-সম্পর্কে এ-ধরণের আরো অনেক ভিন্ন ভিন্ন সামের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি একই স্তোত্রে বিভিন্ন ধরণের সামের ব্যবহার হোত। ঋগ্বেদে এ-ধরণের গায়ত্র, বৃহদ্, বিরূপ, রৈবত প্রভৃতি সামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যজ্ঞকর্মে যখন স্তোত্র গান করা হোত তখন প্রত্যেকটী স্তোত্র কতকগুলি ভক্তিতে ভাগ করা থাকত, বিভিন্ন যাজ্ঞিক সামগরা ঐ সকল ভক্তি গান করতেন। ভক্তিগুলির সংখ্যা কখনো পাঁচটী ও কখনো বা সাতটী গণনা করা হোত। পাঁচটী ভক্তির সাধারণ নাম: প্রোস্তা, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন। প্রাস্তোত্রী পুরোহিতেরা প্রোস্তা, উদ্‌গাত্রীরা উদ্‌গান,

প্রতিহর্ত্রীরা প্রতিহার, উদ্গাত্রীরা উপদ্রব এবং অন্য সকল যাজ্ঞিক পুরোহিতেরা নিধানভক্তি গান করতেন। সামগান আরম্ভ করার আগে সকল সামগ 'হুম্' এই শব্দ উচ্চারণ করতেন। শাট্যায়ন বা শাট্যায়নিব্রাহ্মণে (১।১২।৭) একে 'হিংকার' বলে—"সকৃৎ হিংকৃত্যোবহিঃ পবমানেনস্তবীরণ্"। 'ওম্' উচ্চারণ ক'রেও সকল উদ্গীথগান আরম্ভ হোত। যেমন শাট্যায়নের ভাষ্যে (৬।১০।১৩) উল্লিখিত হয়েছে—"সর্বেষাং ওঙ্কারেণোদ্গাথাদানম্"। পুনরায় শাট্যায়নের ভাষ্যে (৬।১০।১) উল্লেখ পাওয়া যায়: "স্তোত্রগতস্য সাম্নঃ প্রস্তাবোদ্গীথ-প্রতিহারোপদ্রবনিধনানি ভক্তয়ঃ তদ্পাঞ্চবিধ্যভিত্যুক্তম্ তত্র প্রথমা ভক্তিঃ প্রস্তাবঃ"। পঞ্চবিধস্তোত্রে (১।১) সাতটী ভক্তির উল্লেখ আছে: "প্রস্তাবো-দ্গীথপ্রাতিহারোপদ্রবনিধনানিভক্তয়ঃ তৎপাঞ্চবিধ্যং স্বতম্ ব্যাখ্যাস্যামঃ। ওঙ্কার-হিংকারাভ্যাং সামবিধ্যম্"। মন্ত্রব্রাহ্মণে (৫) পঞ্চ ও সপ্ত এই দু'রকম সামেরই উল্লেখ আছে।[৩] বিবরণকারও উল্লেখ করেছেন: "প্রস্তাবস্তত উদ্গীথঃ প্রতিহারোপদ্রবৌ তথা নিধনং পঞ্চমেত্যাহুঃ হিংকারঃ প্রণব এব চ॥" পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধ সামশ্রেণী দুটির পার্থক্য হোল: সপ্তবিধসামে ওঙ্কার ও হিংকার দুইই থাকে, আর পঞ্চবিধসামে থাকে যেকোন একটী। তাণ্ড্যব্রাহ্মণ (৪।৯।৯), ছান্দোগ্য উপনিষৎ (২।২।১), সপ্তবিধসাম (২।১০।৩) প্রভৃতিতে উপদ্রবের উল্লেখ আছে। বহিষ্পবমাণের পাঁচটী পদে ভিন্ন ভিন্ন নিধনের বর্ণনা আছে এবং সেগুলির নাম: সাৎ, সাম, স্বঃ, ইডা, বাক্। শেষ চারটী পদে নিধন হোল 'আ' (শাট্যায়ন ব্রা° ৭।১৩।৭)। সায়ণ নিধনগুলির অর্থ করেছেন: "নিধনং নাম পঞ্চভিস্সপ্তভির্বা ভাগৈকপেতস্য সাম্ন অন্তিমো ভাগঃ"। পঞ্চবিধ ও সপ্তবিধসামের শেষভক্তি নিধন।

যেকোন যজ্ঞে স্তোত্র গান করতেন অধ্বর্যু, প্রস্তোত্রী, প্রতিহর্ত্রী, উদ্গাত্রী ও ব্রহ্মা। অবশ্য প্রত্যেকের করণীয় থাকত ভিন্ন ভিন্ন।[৪] সমস্ত যাগকর্মটী সম্পন্ন হোত ব্রহ্মার তত্ত্বাবধানে। তিনি সকল পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণদের চেয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানী হতেন। অধ্বর্যু জল আনার জন্যে হয়তো ব্রহ্মার কাছ থেকে অনুমতি চাইতেন, ব্রহ্মা বলতেন 'ওম্' অর্থাৎ 'হ্যাঁ' (Cf দ্রাহ্যায়ণ ১২।২।২৮;

৩। পাঁচটী ভক্তিযুক্ত পঞ্চবিধসাম ও সাতটী ভক্তিযুক্ত হলে সপ্তবিধসাম হয়।

৪। Cf কিথ: *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, Vol I (1825), pp 20—21.

শাট্যায়ন ৪।১০।২৯)। ব্রহ্মা চতুর্বেদবিশারদ হ'তেন—"ব্রহ্মা সর্ববিদ্" (নিরুক্ত); "স চ ব্রহ্মা বেদত্রয়োক্ত সর্বকর্মাভিজ্ঞঃ" (সায়ণ)। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (২৫।৮) আছে: "তদাহুর্মহাবাদা যত্ ঋচৈব হোত্রং ক্রিয়তে যজুষা আধ্বর্যবং সাম্না উদ্গীথং ব্যারব্ধা ত্রয়ীবিদ্যা ভবতি অথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়তে ইতি ত্রয্যা বিদ্যয়া ইতি ব্রুয়াৎ।" শতপথব্রাহ্মণেও (২।৫।৮।৪) আছে: "অথ কেন ব্রহ্মা-অনয়ৈবত্রয্যা"। যজ্ঞের অধ্যাত্ম সম্পদ নির্ভর করত ব্রহ্মার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর (Cf বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।১।৯; ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৪।১৭।৮)। ঋগ্বেদে (১০।৭১।১১) চারজন পুরোহিতের ইতিকর্তব্যতা উল্লিখিত হয়েছে: "ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতাবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিভিমীত উ ত্বঃ"। নিরুক্তকার যাস্ক এই ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন পুরোহিতদের কর্তব্য নির্ণয় ক'রে। আচার্য সায়ণও ঋক্ ও সামবেদের ভাষ্য-ভূমিকায় পুরোহিতদের ইতিকর্তব্যতা-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যজুর্বেদীয় পুরোহিত অধ্বর্যু যজ্ঞশরীর নির্মাণ করতেন, ঋক্‌বৈদিক পুরোহিত উদ্গাত্রী সামবেদ থেকে সামগান করতেন, ব্রহ্মা-পুরোহিত যজ্ঞের সকল প্রত্যবায় ও ত্রুটী-বিচ্যুতি সংশোধন করতেন। বৈদিক যুগের যজ্ঞ-নিয়ন্তা এই ব্রহ্মার চারটি বেদে পারদর্শিতার ধারণা থেকেই পরবর্তী পৌরাণিক যুগে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার চারটী মুখ কল্পিত হয়েছিল বোলে মনে হয়, কেননা পুরাণের ব্রহ্মা চারটী দিকের প্রতীক অথবা দ্রষ্টা হিসাবে চারমুখবিশিষ্ট। বৈদিক যুগের চারবেদ পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মার চারমুখে পরিণত হয়েছিল।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ (৬।৭।১২), আপস্তম্বধর্মসূত্র (১২।১৭।৯), শাট্যায়ন (১।২।২৬) ও দ্রাহ্যায়ণব্রাহ্মণ (৩।৪।৬) প্রভৃতিতে যজ্ঞকারীদের করণীয় ও সামগানরীতি সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে। জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণেও (৩।৭।৩০) যজ্ঞ-নিয়মের উল্লেখ আছে। যজ্ঞে বহিষ্পবমাণ-স্তোত্রে সামগরা কিভাবে সামগান করতেন তার বিবরণ আছে। উদ্গাত্রী সামবেদ থেকে গান করতেন—"উদ্গাতা সামবেদেন" (Cf. শতপথব্রাহ্মণ ২।৫।৮।৪; শাট্যায়ন ৪।১০।৭)। দ্রাহ্যায়ণে (১২।২।৬-৭) আছে: "তানি উদ্গাতৃকর্ভেকে উদ্গাতা সামবেদেন ইতি শ্রুতেঃ"। শাট্যায়নে (১।১।৪) আছে: "একশ্রুতিবিধানাৎ কর্মাণি চ উদ্গাতৈব কুর্যাৎ অনাদেশে"। সোমযাগে সামবেদের ও সামগদের যা কর্তব্য, ঋগ্বেদের ও হোতা প্রভৃতি পুরোহিতদের কর্তব্য তা থেকে ভিন্ন (Cf. শতপথব্রাহ্মণ ২।৫।৮।৪)।

শতপথ, ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[৫]

সামবিধানব্রাহ্মণের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সত্যব্রত সামশ্রমী উল্লেখ করেছেন: "প্রৌঢ়ব্রাহ্মণে ও ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণে যজ্ঞাধিকারীদের স্বর্গাদি ফললাভের জন্তে একাহ, অহীন ও সত্র নামক সোমযাগের ও অন্যান্য বিচিত্র যজ্ঞের ঔদ্‌গাত্র (গান) বিহিত আছে। সামবিধান-নামক তৃতীয় ব্রাহ্মণে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে নানান্ কৃচ্ছ্রাদি, ত্রিবিধ ব্রত, উপপাতক, মহাপাতক প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে; এছাড়া রুদ্রসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে সপ্তবিধ সামসমষ্টি বিহিত হয়েছে"। অধ্যাপক কিথ বলেছেন: "and the Samavidhana are of some value as dealing with magic practices of varied kinds".

সামবিধানব্রাহ্মণে তিনটী অধ্যায় বা প্রপাঠক আছে: প্রথম প্রপাঠকে আটটী, দ্বিতীয় প্রপাঠকে আটটী ও তৃতীয় প্রপাঠকে ন'টী—মোট পঁচিশটী কাণ্ড আছে। এদের মধ্যে মাত্র প্রথম প্রপাঠকের প্রথম কাণ্ডেই বৈদিক সামগানের ও স্বরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট প্রপাঠক বা কাণ্ডগুলিতে অগ্ন্যাধান, পবমানেষ্টি, দর্শপূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র, ঐষ্টিক চাতুর্মাস্য, পাশুক চাতুর্মাস্য, পশুবন্ধ, অবিকৃত সৌত্রামণী, কোকিল-সৌত্রামণী, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয়, আপ্তোর্যাম, দ্বাদশাহ, গবায়নসত্র, কুণ্ডপায়িন-ত্তাপশ্চিতসত্র, শতাব্দসত্র, সহস্রাব্দসত্র প্রভৃতি যজ্ঞের এবং তাদের বিধি ও ফলের বিবরণ আছে। এ-ছাড়া শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি আভিচারিক কর্মেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এজন্যে সামবিধানব্রাহ্মণ অথর্ববেদের সঙ্গে না হোয়ে সামবেদের সঙ্গে কেন সম্পর্কযুক্ত হোল তা বিচারের বিষয়।

সামবিধানব্রাহ্মণে ক্রুষ্ট, অতিক্রুষ্ট বা ক্রুষ্টতম স্বর থেকে স্বর-সংখ্যা আরম্ভ করা হয়েছে। বৈদিক সামগানের স্বর সাতটী: ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য। মন্দ্র ও অতিস্বার্য যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্বর। ক্রুষ্ট বা ক্রুষ্টতমকে প্রথম হিসাবে গণনা করলেও তা সপ্তম স্বর হিসাবে গণ্য, কেননা

৫। অধ্যাপক কিথ (A. B. Keith): *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, Vol. I—II (1925) এবং স্বামী ত্যাগীশানন্দ লিখিত: *General Introduction to the Chhandogya Upanishad* প্রবন্ধ (*Vedanta Kesari*, pp. 71-77, 133-137)।

নারদীশিক্ষায় ক্রম ভিন্ন হোলেও নামকরণে ঠিকই আছে। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১৩।১৭) বৈদিক ও সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক সাত স্বরকে 'যম' বা যোনি বলা হয়েছে, কেননা গানের অধিষ্ঠান ও কারণই (cause) হোল সাতস্বর। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে লৌকিক ও বৈদিক দু'রকম স্বরের পরিচয় আছে এবং উভয়ের বিকাশ বা গতিকে ভিন্ন বলা হয়েছে : যেমন, বৈদিক স্বরের গতি অবরোহণক্রমে ও লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরের গতি আরোহণক্রমে। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে আছে : "যে সপ্তস্বরাঃ ষড়্‌জঋষভগান্ধারাদয়ো গান্ধর্ববেদে সমাম্নাতা যে বা ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যাঃ সামসু নিগদিতাঃ তে যমা বিদিতব্যাঃ"।[৬] এ-থেকে বুঝা যায়, ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ও নারদীশিক্ষার সময়ে কেন, তার আগে থেকেই বৈদিকের মতন লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরেরও প্রচলন ছিল।

সামবিধানের ১ম প্রপাঠক ১ম কাণ্ড ৩য় মন্ত্রে সামস্বর ক্রুষ্টাদির অধিপতি-দেবতাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং অধ্যাত্মভূমি অন্তর্মুখী ভারতবর্ষের পক্ষে এ-ধারণা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সামবিধানের ৩য় মন্ত্রে বলা হয়েছে,

"তস্মোসৌ ক্রুষ্টতম ইব সাম্নঃ স্বরস্তং দেবা উপজীবন্তি যোঽবরেষাং প্রথমস্তং মনুষ্যা যো দ্বিতীয়স্তং গন্ধর্বাপ্সরসো যস্তৃতীয়স্তং পশবো যশ্চতুর্থস্তং পিতরো যে চাণ্ডেষু শেরতে যঃ পঞ্চমস্তমসুররক্ষাংসি যোঽন্ত্যস্তমোষধয়ো বনস্পতয়ো যচ্চান্যজ্জগৎ তস্মাদাহুঃ সামৈবান্নমিতি সাম হ্যেবামুপজীবনং প্রাযচ্ছদুপজীবনীয়ো ভবতি য এবং বেদ।"

সামগানে প্রথমাদি বৈদিক সাতস্বর লীলায়িত। সাতস্বরের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ ক্রুষ্টস্বরে ইন্দ্রাদি দেবতারা পরিতৃপ্ত হন। প্রথম স্বরে মনুষ্যেরা, দ্বিতীয়ে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ, তৃতীয়ে পশুরা, চতুর্থে পিতৃগণ ও বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রাণী, পঞ্চমে অসুর ও রাক্ষসেরা এবং অন্ত্য তথা ষষ্ঠে বৃক্ষলতা প্রভৃতি সন্তুষ্ট হয়। তত্ত্বদর্শীরা সেজন্যে সাম তথা সামস্বর ও সামগানকে অন্ন বলেন, কেননা বিশ্ব-চরাচর সমস্তই সামকে অবলম্বন ক'রে বেঁচে থাকে ও আনন্দ লাভ করে।

আচার্য সায়ণ এই মন্ত্রের ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন : এক উপাংশু ব্যতীত সকল বাক্যই (ধ্বনি বা শব্দই) মন্দ্র, মধ্য ও উত্তম বা তার এই তিনটী স্থানের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখ্‌লেও ওঙ্কার তথা অ+উ+ম এই অক্ষর বা উচ্চারণ-শব্দ তিনটীর ভেতর দিয়ে যেমন বিশ্বের সকল শব্দের,

৬। 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত' অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে।

কথায় ও বাক্যের প্রকাশ হয় তেমনি উচ্চ, মধ্যম ও নীচ (তার, মধ্য ও মন্দ্র) এই তিন স্থানের মাধ্যমে সকল রকমের শব্দই বাইরের জগতে প্রকাশ পায়—"উপাংশুব্যতিরিক্তাঃ সর্বা বাচো মন্দ্রমধ্যমোত্তমভেদেন ত্রিস্থানা ভবন্তি"। তারপর তিনি বলেছেন :

"তত্র মন্দ্রস্থানা বাক্ 'সপ্তযমা' ক্রুষ্টাদিসপ্তস্বররূপেত্যর্থঃ। ক্রুষ্টাদয় এব যমা উচ্যন্তে। তে চোত্তরোত্তরং নীচা ভবন্তি। এবং মধ্যমোত্তমস্থানে অপি বাচৌ বেদিতব্যে। অমুমেবার্থং শৌনক আহ—'পরিষদমন্দ্রমধ্যমোত্তমস্থানাস্তাহঃ সপ্তযমানি বাচঃ অনন্তরশ্চাত্র যমোঽবিশিষ্টঃ সপ্তস্বরা যে যমাস্তে পৃথগ্বা' ইতি। অনন্তরমিত্যস্ত বাক্যস্তায়মর্থঃ—যেষু যমেষু 'অনন্তরঃ' অব্যবহিতো 'যমঃ', সঃ 'অবিশিষ্টঃ' অস্পষ্টবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ, বিপ্রকৃষ্টৌ যমৌ ভেদেন জ্ঞাতুং শক্যতে, ন সন্নিকৃষ্ট ইতি। সপ্তস্বরা ইত্যস্তায়মর্থঃ—যে যমা ইত্যুক্তাঃ 'সপ্ত' তে 'স্বরাঃ' ষড়্জাদয়ঃ * * পৃথগ্বা। ক্রুষ্টাদয়ঃ ; * * 'পৃথগ্বা' ষড়্জাদিভ্যোঽন্যে বা বোদ্ধব্যাঃ। এবং সতি 'তৎ' তেষু ক্রুষ্টাদিসংজ্ঞকেষু ষড়্জাদিসপ্তস্বরেষু মধ্যে 'যোঽসৌ' সাম্নঃ সম্বন্ধী 'ক্রুষ্টতম ইব'।"

প্রথম প্রপাঠক ১ম খণ্ডের ৪র্থ মন্ত্রে ক্রুষ্টাদি সাতটী স্বরকে সাম-সমূহের মাংস, অস্থি, লোম প্রভৃতি বলা হয়েছে। মোটকথা সাতটী স্বরই সামগানের আশ্রয় ও উপায়। তবে সামবিধানব্রাহ্মণে আছে : ঋক্-রূপ বাক্যই সামের অধিষ্ঠান। যা ঋক্ নামে প্রসিদ্ধ, তাই বাক্য; বাক্য-রূপ ঋকেই রথন্তর প্রভৃতি সামগান অধিষ্ঠিত—"বাগ্বাব সাম্নঃ প্রতিষ্ঠা যদ্বৈতদ্বাগিত্যৃগেব সর্চি সাম প্রতিষ্ঠিতম্।" ঋক্‌গুলিতে স্বর যোজনা ক'রে গান করলেই তাঁকে সাম বা সামগান বলে, সুতরাং ঋক্‌ই 'যোনি' বা কারণ, ঋক্‌ই অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ও। এ-সম্বন্ধে আচার্য সায়ণ বলেছেন : "'ঋচি' গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবদ্ধায়াং 'সাম' গীতাত্মকং রথন্তরাদি প্রতিষ্ঠিতম্"। আধুনিক কালে 'বাক্য বা বাণী বড়—কি সুর বড়' এই নিয়ে বাদানুবাদেরও সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি, ঋক্ তথা বাক্যকে নিয়েই স্বর গান-রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সঙ্গীতের জগতে সুরই বড় এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু মনের ভাব-প্রকাশক ভাষা তথা কথার উপযোগিতাকেও অস্বীকার করা যায় না। গান বা সঙ্গীত সেজন্যে কথা ও সুরের বেণীবন্ধনে অখণ্ড-ভাবে রূপায়িত হয়। বৈদিক সামগানেও তাই ছিল, বৈদিকোত্তর যুগে এবং মোগল রাজত্বের আমলেও কথার সঙ্গে সুরের পরমসৌহার্দ্য ছিল। কথাবিহীন আলাপের সৃষ্টি তো পরেকার যুগে হয়েছে, কিন্তু তাহলেও আলাপে ভাষার

প্রয়োজনীয়তাকে বাদ দেওয়া হয়নি, তথাকথিত নিরর্থক 'ওম্ হরি ওম্, তান্থম্ তানানা দিম্, তানা দেরে দেরে' শব্দগুলি অর্থ ও ভাবের তথা ভাষা ও বাক্যেরই প্রকাশক।

সামবিধানব্রাহ্মণের ১ম প্রপাঠক ১ম কাণ্ড ৫ম মন্ত্রে আমরা পাই,

"স যদা গায়ত্রং বৃহত্যাং গায়তি বার্হতং জগত্যাং জাগতং ত্রিষ্টুভি সমতাং চাপন্নতে তস্মাদেতৎসামেত্যাহ সমা উ হ বা অস্মিশ্ছন্দাংসি সাম্যাদিতি[৭] তৎসামঃ সামত্বং ক্রুষ্টঃ প্রাজাপত্যো ব্রাহ্মো বা বৈশ্বদেবো বাদিত্যানাং প্রথমঃ সাধ্যানাং দ্বিতীয়োহগ্নেস্তৃতীয়ো বায়োশ্চতুর্থঃ সৌম্যো মন্দ্রো মিত্রাবরুণয়োরতিস্বার্যঃ।"

সামগানকারী বা সামগ উদ্গাতা যখন ঋকৃছন্দের ঋকে উৎপন্ন সাম, বৃহতীচ্ছন্দের ঋকে ও বৃহতীচ্ছন্দের ঋকে উৎপন্ন সাম, জগতীচ্ছন্দের ঋকে ও জগতীচ্ছন্দের ঋকে উৎপন্ন সাম, ত্রিষ্টুপছন্দের ঋকে গান করেন তখনি তিনি সামগান-বিষয়ে বিচিত্র ছন্দের সাম্য অবগত হন। সেই সাম্য বা সমতার জন্যেই 'সাম'-শব্দের সার্থকতা। ছন্দসকল বিচিত্র হোলেও সামগানের সময়ে সবগুলিই সমতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাই সামের সামত্ব। ক্রুষ্টস্বরের অধিপতি প্রজাপতি, কেননা প্রজাপতি ক্রুষ্টস্বরের বিকাশে প্রীত হন। ক্রুষ্টস্বরের দেবতা বা অধিদেবতা বিশ্বদেব। তাছাড়া প্রথমস্বরের অধিদেবতা আদিত্যগণ, দ্বিতীয়ের সাধ্যগণ, তৃতীয়ের অগ্নি, চতুর্থের বায়ু, মন্দ্রের (পঞ্চম-স্বরের) সোম বা চন্দ্র ও ষষ্ঠ অতিস্বার্যের মিত্র ও বরুণ অধিদেবতা; এঁরা সকলেই নিজের নিজের স্বরে প্রীতি লাভ করেন।

সামগানে যে ছন্দের ব্যবহার হোত তা ৪র্থ মন্ত্র থেকে জানা যায়। সামের সামত্ব সমতায়; অর্থাৎ সামগান বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে গান করলেও সামগান-রূপেই তা পরিচিত হয় আর সকল ছন্দ সামগানে মিলিত হোয়ে সমতা (harmony) আনয়ন করে। ভারতীয় সঙ্গীতে স্বর তথা স্বর-সম্বাদ বা melody-রই নাকি প্রাধান্য, স্বর-সাম্য বা harmony-র কোন স্থান নাই। কিন্তু একথা ঠিক নয়, আধুনিক কালের সঙ্গীতপদ্ধতি দেখে ঐ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। বৈদিক সামগানে স্বর-সম্বাদ ও স্বর-সাম্য—melody ও harmony দুইই ছিল। মিলনের উপায়ও সামগরা জানতেন, কালক্রমে সে-সম্বন্ধের জ্ঞান লোপ পেয়েছে একথাই মনে হয়। অবশ্য আচার্য সায়ণ সামের সাম্য অর্থ

৭। পাঠভেদ—'সাম্যাদিতি'।

ভিন্নভাবে করেছেন। তিনি বলেছেন : "যস্মাৎ সমানায়ামৃচি বহূনি সামানি গীয়ন্তে, 'তৎ' তস্মাৎ অপি 'সাম্নঃ সামত্বং' সম্পন্নমিতি", অর্থাৎ একই ঋকে বা বাক্যে বিচিত্র সামগান করা হয় অথবা একই ঋকে সামগান অসংখ্যভাবে প্রকাশ করা সম্ভব বোলে সামগানের সার্থকতা সম্পন্ন হয়। স্বরের সঙ্গে দেবতাদের সম্পর্ক-রূপ রহস্য সাধনমূলক।

এছাড়া সামবিধানব্রাহ্মণে বিভিন্ন সামের নামোল্লেখ আছে, যেমন রৌরব, যৌধাজয়, স্বর্বর্মহা, স্বর্বর্ময়া, বামদেব্য, বৈরূপ, মহানাম্নী, রেবতী, গায়ত্র, অমৃত-সংহিতা, মধুচ্ছন্দস, বারাহ বা বরাহ, পুরুষব্রত, পিতৃসংহিতা, কানী, উত্তর, প্রাণ, অপান, ভ্রাজা, অভ্রাজা, শুক্র, চন্দ্র, সেতু, রাজন, রৌহিণ, শুদ্ধাশুদ্ধীয়, কদাচন, নৌধস, শ্যৈত, মহানাম্নী প্রভৃতি। বিভিন্ন ঋকেরও নামকরণ করা হয়েছে, যেমন অগ্নিমূর্দ্ধা, ঘৃতবতী, শম্পাদম্ প্রভৃতি। বিভিন্ন ব্রতে বিভিন্ন ঋক্ ও সামের প্রচলন ছিল। সামবিধানব্রাহ্মণের সামগুলি বা সামগান কামনামূলক, কোন-না-কোন কামনা পরিপূরণের জন্যে ব্রতে, যজ্ঞে বা সর্গে সামগান করা হোত। ঋকে সংযোজিত স্বরের অধিপতি দেবতারা কামনা-পূরণের সহায়ক মাত্র। এজন্যে ব্রাহ্মণগুলি প্রধানতঃ কামনামূলক, বন্ধন-বিহীনতার শান্তি ও স্বাধীনতা তারা দিতে পারে না। আরণ্যক ও উপনিষদ্-গুলি মুক্তির পথ-প্রদর্শক, তাই শান্তিকামীরা আরণ্যক ও উপনিষদের পথচারী হন।

চতুর্থ অধ্যায়

আরণ্যক ও উপনিষদে সঙ্গীত

উপনিষদ্‌গুলি বেদের জ্ঞানকাণ্ড, কেননা এ-গুলিতে জ্ঞানের তথা আত্মজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ্‌কে বেদান্তও বলে—"বেদান্তোনামোপনিষৎ-প্রমাণম্"। ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলিতে যাগযজ্ঞ ও তার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির কথা আছে। মীমাংসাশাস্ত্র, মীমাংসাদর্শন বা পূর্বমীমাংসা ব্রাহ্মণসাহিত্যেরই প্রতিচ্ছায়া। পূর্বমীমাংসায় কর্ম তথা যাগযজ্ঞের প্রাধান্য, উত্তরমীমাংসা-রূপ বেদান্তে অধ্যাত্মবিদ্যার বিচার ও উপদেশ আছে। উপনিষৎ উত্তরমীমাংসার আশ্রয় বা অবলম্বন, এজন্যে সদানন্দ যতি উত্তরমীমাংসা-রূপ শারীরকসূত্র প্রভৃতিকে উপনিষদের উপকারী বা সহায়ক (অঙ্গ) বলেছেন—"তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ"।

বেদের বিভিন্ন শাখা আছে এবং থাকাও স্বাভাবিক। বৈদিকযুগেও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিচিত্র রুচিসম্পন্ন লোক ছিল, বেদের শাখাগুলিই তার প্রমাণ। বিচিত্র শাখার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ ও শিক্ষাশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। ব্যাকরণ-গুলির মোটামুটী নাম প্রাতিশাখ্য। বেদের প্রতিশাখার ছিল ব্যাকরণ, এজন্যে তাদের নাম প্রাতিশাখ্য। বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ এই তিনটী প্রধান অংশ। ব্রাহ্মণগুলিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম-মীমাংসাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্ত্য তথা শেষভাগই উপনিষৎ ও আরণ্যক। উপনিষদে চিন্তার চরম-পরিণতির আভাস পাওয়া যায়, উপনিষদ্‌কে এজন্যে বুদ্ধি ও বোধির ফলস্বরূপ বলা যায়। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ঐতরেয় ও কৌষীতকি ঋগ্বেদের, কেন ও ছান্দোগ্য সামবেদের, ঈশ, তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক যজুর্বেদের, প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষৎ অথর্ববেদের অন্তর্গত। আরণ্যক বা অরণ্য-সাহিত্যগুলি ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্-যুগের মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রাহ্মণসাহিত্য গৃহ-বাসীদের জন্যে ধর্ম তথা যাগযজ্ঞের উপদেশ দিয়েছে আর আরণ্যক বলেছে—বাণপ্রস্থীদের অরণ্যবাসী হবার জন্যে। কাজেই আরণ্যক হোল ব্রাহ্মণের কর্ম ও উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিচারের মাঝামাঝি যোগসূত্র—"The Aranyakas

form the transition link between the ritual of the Brahmanas and the philosophy of the Upanishads."[1]

অধ্যাপক পল্ ডয়সনের অভিমতও অনেকটা তাই, তিনি আরণ্যককে ব্রাহ্মণসাহিত্যের দৃষ্টিতে বিচার ক'রে নির্বাচিত করেছেন বাণপ্রস্থীদের জন্যে। অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গ বলেছেন, অরণ্যে একান্তে পঠন-পাঠন করা হোত বোলে 'আরণ্যক' নাম হয়েছে। উপনিষদ্‌ও অনেকটা সে-রকম, তাই একে 'রহস্যবিদ্যা' বলা হয়। অনেকে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ কোন প্রার্থক্য স্বীকার করেন না। বেদের কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রকৃতি দেখে মনে হয় যে, সেগুলি প্রকাশ্যভাবে লোকালয়ে করা সম্ভব হোত নাই। সেই অনুষ্ঠানের বিবরণ যে শুধু আরণ্যকেই আছে—তা নয়, সংহিতাগুলিতেও পাওয়া যায়। অধ্যাপক কিথ বলেছেন, প্রবর্গ্যব্রত তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে, অথচ তার মন্ত্রগুলিকে অনেক সময় বাজসনেয়ী-সংহিতার (৩৬।১ ; ৩৯।৬, ৭, ৮-১৩) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামবেদের আরণ্যগানে ও আরণ্যকসংহিতায় তার অনেক রহস্যপাঠ লিখিত হয়েছে, আবার ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন-আরণ্যকে ঋগ্বেদের অনেক রহস্যমন্ত্রেরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ও কৌষীতকি উপনিষদ্‌দুটীর অনুগামীরা মহাব্রত-অনুষ্ঠানটীকে আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যজুর্বেদীরা ঐ অনুষ্ঠানটীকে সংহিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন। সামবেদ অনুসারে মহাব্রতযজ্ঞ পঞ্চবিংশ ও জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। সুতরাং আরণ্যক ও ব্রাহ্মণের মূলগত পার্থক্য নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন। এ'রকম আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যেও সত্যিকারের পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ। অধ্যাপক কিথ তাই বলেছেন,

"As the distinction between Brahmana and Aranyaka is not an absolute one, though the Aranyakas tend to contain more advanced doctrines than the Brahmanas, so the distinction between Upanisad and Aranyakas is also not absolute, tradition actually incorporating the Upanisads in some cases in the Aranyakas."[2]

কিন্তু তাহলেও আরণ্যক ও উপনিষৎ এই দুটী পৃথক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও সার্থকতাকে নিয়ে। অধ্যাপক কিথ উভয়ের

১। স্যার রাধাকৃষ্ণন্ : *Indian Philosophy*, Vol. I. (1940), p. 65.

২। Cf. *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*, Vol. 1 (1925), p. 491.

পার্থক্য বা ভিন্নতাকে বস্তু হিসাবে স্বীকার না ক'রে অর্থবোধকতার দিক থেকে সামান্য আলাদা বোলে গ্রহণ করেছেন—"and thus we can perhaps see why the two different words Aranyaka and Upanisad came into being." তিনি বলেছেন, রহস্যবিদ্যার প্রকাশক আরণ্যক ও উপনিষৎ উভয়েই সমান, তবে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হোল: আরণ্যক বেদের রহস্যভাগগুলিকে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে উপদেশ দেয় অরণ্যে একান্তে বসে, আর উপনিষৎ সেগুলিকে দর্শন বা অনুভূতির ছাঁচে ফেলে গোপনে সাধন করতে বলে জ্ঞানকামীদের জন্যে।[৩]

উপনিষদ্‌গুলি রচিত হয়েছিল কোন্ সময়ে এ-নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেছেন, প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি খৃষ্টপূর্ব ১৪০০ শতকে রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক কাকাসু ওকাকুরা বলেছেন, উপনিষদ্‌গুলি অন্তত খৃষ্টপূর্ব ২০০০—৭০০ শতকের মধ্যে লেখা হয়েছিল ("These were written at least as early as from 2000 to 700 B.C.")।[৪]

সঙ্গীতের বা সাঙ্গীতিক উপাদানের সন্ধান পাই আমরা প্রধান তিনটী উপনিষদের ভেতর এবং সে তিনটী উপনিষৎ হোল: ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদের তাণ্ড্যশাখার তাণ্ড্যমহা-ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। অনেকের মতে, ছান্দোগ্য সামবেদীয় কৌথুমীশাখার উপনিষৎ। বৃহদারণ্যক (বৃহদ্+আরণ্যক) উপনিষৎ শতপথব্রাহ্মণের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই দুটী শাখারই শেষভাগের অন্তর্গত। তৈত্তিরীয়-উপনিষদ্‌খানি কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্গত।

এই তিনখানি উপনিষদের ভেতর ছান্দোগ্যের প্রাচীনতাই বেশীর ভাগ মনীষীরা স্বীকার করেন। আরণ্যক অরণ্যে বিচারজ্ঞানসম্পন্ন তাপস ঋষিদের উপদেশ থেকে জন্মলাভ করেছে। অধ্যাপক উইণ্টারনিজের মতে, বড় দুখানি

৩। "The former is a name, denoting the generic character of the texts, as those which from their secret nature must be dealt with in the special manner of being studied in the forest; the latter is a secret text, imparted at such a secret session, and in course of time more and more specifically appropriated to the description of secrets which were of philosophical character."—*Ibid.*, p. 491.

৪। ওকাকুরা (Okakura): *The Ideals of the East* (1903), pp. 81-82.

উপনিষৎ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি প্রাচীন ছোট বড় উপনিষদের উপাদানগুলিকে আত্মসাৎ ক'রে, কেননা এই দুটী উপনিষদের অনেক আখ্যায়িকা ও এমনকি অনেক মূলাংশের সঙ্গে অপরাপর উপনিষদের বিষয়বস্তুর মিল পাওয়া যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"We may take it that the greater Upanisads, like the Brihadaranyaka and the Chhandogya-Upanisad, originated in the *fusion* of several longer or shorter texts which had originally been regarded as separate Upanisads. ** The individual texts of which the greater Upanisads are composed, all belong to a period which cannot be very far removed from that of the Brahmanas and the Aranyakas, and is before Buddha and before Panini. For this reason the six above-mentioned Upanisads, —Aitareya, Brihadaranyaka, Chhandogya, Taittiriya, Kausitaki and and Kena—undoubtedly represent the earliest stage of development in the literature of the Upanisads." ৫

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমেই ওঙ্কারকে উদ্‌গীথ-রূপে উপাসনা করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত" এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে ওঙ্কারকে কেন 'উদ্‌গীথ' বলা হয় তার উত্তরে বলা হয়েছে: যেজন্যে 'ওম্' এই পবিত্র অক্ষরটী প্রথমে উচ্চারণ ক'রে উদ্‌গান অর্থাৎ উদাত্তকণ্ঠে বা উচ্চৈঃস্বরে গান করে সেজন্যে ওঙ্কার 'উদ্‌গীথ'। এখানেই ওঙ্কারের প্রসঙ্গে আমরা উচ্চৈঃস্বরে গানের বা সঙ্গীতের পরিচয় পেলাম। উচ্চৈঃস্বরে অর্থাৎ তারস্থান থেকে উচ্চারণ ক'রে, মন্দ্র বা মধ্য স্থান থেকে নয়। তৃতীয় মন্ত্রে উদ্‌গীথকে সামবেদের রস বা সারাংশ বলা হইয়াছে—"সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ"।

এখন উদ্‌গীথের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তাই আলোচনার বিষয়। ছান্দোগ্যে বাক্ ও সামের মিলনে উদ্‌গীথের সৃষ্টি বলা হয়েছে। বাক্‌কে অর্ক বা সূর্য (তাপ—heat) এবং সামকে প্রাণ বা প্রাণবায়ু-রূপে কল্পনা করা হয়েছে—"বাগেবর্ক; প্রাণঃ সাম"। তাছাড়া বলা হয়েছে: "তদ্‌বা এতন্মিথুনং যদ্‌বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক চ সাম চ"; অর্থাৎ বাক্ ও প্রাণের, ঋক ও সামের মিথুন (সংযোগ) থেকে উদ্‌গীথ তথা উদ্‌গানের সৃষ্টি। সঙ্গীতে কারণস্বর নাদের ও অন্যান্য বাক্যের উৎপত্তির বেলায় উল্লেখ করা হয়েছে,

৫। ডাঃ উইণ্টারনিজ (Winternitz): *A History of Sanskrit Literature* (1927), Vol I. p. 236.

নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে ॥[৬]

প্রাণ বা প্রাণবায়ু ও অনল অথবা তাপের সংমিশ্রণেই কারণশব্দের নাদের উৎপত্তি। টীকাকার সিংহভূপাল (১২২° খৃ) লিখেছেন : "অন্তঃকরণমাত্মপ্রেরিতং সদেহস্থ-মুদর্যমগ্নিমাহন্তি তাড়য়তি। স বহ্নির্মারুতং বায়ুং প্রেরয়তি। স পূর্বং ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতস্তেন বহ্নিনা প্রেরিতঃ সন্নূর্ধমার্গে গচ্ছন্নাঘাতেন নাভিহৃদয়কণ্ঠমূর্ধমুখেষু ধ্বনিং প্রকটয়তি"। উদ্গীথেরও উৎপত্তি বাক্-রূপী অর্ক তথা তাপ এবং সাম-রূপী প্রাণবায়ুর সংমিশ্রণে, কাজেই উদ্গীথই ওঙ্কার তথা নাদ এবং নাদই সঙ্গীতের অধিষ্ঠান ও আশ্রয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই প্রাচীন ধারণা পরবর্তীকালে যোগ, তন্ত্র ও শব্দশাস্ত্রকারেরা গ্রহণ করেছিলেন বোলে মনে হয়।

ছান্দোগ্যে বলা হয়েছে, প্রাণ ও সূর্য সমান গুণসম্পন্ন, কারণ প্রাণও উষ্ণ, সূর্যও উষ্ণ, তাপ উভয়েই আছে। ঋষিরা প্রাণকে 'স্বর' অর্থাৎ মৃত্যুকালে দেহ থেকে বহির্গমনশীল বলেন। সূর্যও তাই, সূর্যকেও স্বর অর্থাৎ অস্তাচলে বা দিনান্তে দৃষ্টির পারে গমনকারী এবং 'প্রত্যাস্বরঃ'—প্রত্যহ প্রত্যাগমনশীল অথবা দিনারম্ভে বা রাত্রের শেষে উদীয়মান বলা হয়। সমান গুণ ও স্বভাব-বিশিষ্ট বোলে প্রাণ ও সূর্যকে উদ্গীথ-রূপে উপাসনা করা উচিত।

পরে উদ্গীথকে বিশ্লেষণ ক'রে তার সার্থকতা দেখানো হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে : "উদ্-গী-থ ইতি ; প্রাণ এবোৎ, প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি, বাগ্গীঃ, বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতে, অন্নং থম, অন্নে হীদং সর্বং স্থিতম্"।[৭] 'গী' অর্থে বাক্, 'থ' অর্থে অন্ন, কেননা সমগ্র জগৎ অন্নে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং,

উদ্গীথ	=	উৎ	+	গী	+	থ
		।		।		।
"		প্রাণ		বাক্		অন্ন
		।		।		।
"		দ্যৌ		অন্তরীক্ষ		পৃথিবী
		।		।		।
"		আদিত্য		বায়ু		অগ্নি
		।		।		।
"		সামবেদ		যজুর্বেদ		ঋগ্বেদ

৬। শার্ঙ্গদেব : সঙ্গীতরত্নাকর (পুণা সং) ১।৩।৬
৭। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।৩.৬

এই উদ্‌গীথ ত্রয়ীই বিশ্বসৃষ্টির কারণ; স্বর, সুর বা সঙ্গীতকে তাই সকলের কারণ বলা হয়েছে। আবার ছান্দোগ্যে আছে: "ইয়মেবর্গাগ্নিঃ সাম" ইত্যাদি; অর্থাৎ পৃথিবীই ঋগ্বেদস্বরূপিণী; অগ্নিই সামবেদ। সাম ঋক্‌মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত, তাই সামগ বা সামগানকারী সামকে ঋক্‌মন্ত্রে অধিষ্ঠিত ক'রে গান করেন। প্রকৃতপক্ষে সামগান ঋক্‌ছন্দের ওপর বিভিন্ন স্বরের ও সাঙ্গীতিক উপাদানের সমাবেশ মাত্র। ঋক্‌ছন্দ—কথা ও সুর—সামসন্তান। আবার ঋক্ ও সাম যেন পুরুষ ও প্রকৃতি—পুরুষ ও স্ত্রী; বৈদিক সামগানের তথা সঙ্গীতের সৃষ্টি এই পুরুষ ও প্রকৃতির মিথুন থেকে। সামগানে যেমন ছন্দ ও স্বর দুইই থাকে, তেমনি সকল সঙ্গীতেই, অর্থাৎ কি উচ্চাঙ্গের মার্গ অথবা ক্ল্যাসিকাল এবং আধুনিক ও দেশজ উভয় সঙ্গীতেই সুর ও কথার একত্র সমাবেশ থাকে। অবশ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেলায় সুসঙ্গত অর্থবিহীন শব্দের সমাবেশে আলাপের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহলেও তাতে কথা বা শব্দ থাকে—তা সে 'তোম্ না না, দা দেরে, ওম্ হরি ওম্' প্রভৃতি যাই হোক। রাগের রস ও ভাবকে অনুভব করতে গেলে নিশ্চই ভাষা-রূপ মাধ্যমের উপযোগিতা আছে। বৈদিক সামগানও তাই ঋক্‌মন্ত্র বা ঋকের মাধ্যমকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে গান, বাদ্য ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। যজ্ঞের সময় বিচিত্র ছন্দে স্তব পাঠ করা হোত, আর তাতে থাকৃত ছন্দ (তাল) ও স্বর। যে স্তোম পনেরটী, সতেরটী অথবা একুশটী সাম নিয়ে গঠিত হোত, সেই স্তোমকে স্বরযোগে পাঠ, আবৃত্তি অথবা গান করার সময় তার নাম, গোত্র, বর্ণ ও অধিদেবতাদের চিন্তা করা হোত—"যেন ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাত্তচ্ছন্দ উপধাবেৎ, যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমমুপধাবেৎ"।[৮] সুতরাং বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই ভারতের দেবদেবী, দর্শন, সাহিত্য, ললিতকলা, শিল্প, কাব্য-সৌন্দর্য প্রভৃতি গডে উঠেছিল; কর্মকাণ্ডকে অবলম্বন ক'রে জ্ঞানকাণ্ডেরও সহস্রধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

বৈদিক স্তবগুলির নামকরণ করা হোত নানান্ ভাবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে, আরব্ধ যজ্ঞকর্মে 'বহিষ্পবমাণ' নামক স্তব-বিশেষের দ্বারা স্তুতি করতে উদ্যত উদ্‌গাত্রীরা পরস্পর সংলগ্ন হোয়ে যজ্ঞবেদী পরিক্রমণ করতেন।

৮। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২।৩।১০

অবশ্য এটী উদাহরণ বা উপমার আকারে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তাহলেও একথা ঠিক যে, তদনীন্তন সমাজে অনুষ্ঠিত বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন ক'রেই উপমা দেওয়া হোত। ছান্দোগ্যে আছে: "তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তি, ইত্যেবমাসসৃপুঃ তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ"।[৯] মন্ত্রের "স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তি" কথাগুলি সম্বন্ধে ভাষ্যকার আচার্য শংকর বলেছেন: "স্তোষ্যমাণা উদ্‌গাতৃপুরুষাঃ সংরব্ধাঃ সংলগ্নাঃ অন্যোঽন্যমেব সর্পন্তি"। গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যের এটী একটী নিদর্শন।

গানে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের ব্যবহার ছিল। এই তিনটী স্বরের প্রয়োগে মাত্রা ও লয়ের জ্ঞান থাকা দরকার, সুতরাং হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই তিনটী মাত্রারই পরিচায়ক। ছান্দোগ্যের মন্ত্রগানে অথবা পাঠে যে মাত্রা ব্যবহৃত হোত তার উদাহরণ—"ওম্ ৩ আদাম ৩ ওম্ ৩ পিবাম ৩ ওম্ ৩ দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা ২ হন্নমিহা ২ হহরদন্নপতে ৩ হন্নমিহা ২ হহরা ২ হরো ৩ মিতি॥"[১০] এই মন্ত্রের মাঝে মাঝে যে ৩ এবং ২ অঙ্কগুলি আছে, এদের অর্থ হোল—৩ অঙ্ক চিহ্নিত বাক্য-গুলিকে প্লুতস্বরে ও ২ অঙ্কচিহ্নিত শব্দগুলিকে দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করতে হয় এবং তবেই বেদমন্ত্র হয় ফলপ্রদ। জায়গায় জায়গায় পুনরাবৃত্তিও আছে। সুতরাং দেখা যায়, মন্ত্রগানেও নিয়ম-অনুসরণের রীতি ছিল, খামখেয়ালী ধারাকে কেউ গ্রহণ করত না। ভরতপূর্ব যুগে (খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর আগে) মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের ওপর যখন নিয়মানুবর্তিতার নজর পড়েছিল তখনও যেমন, তার অনেক আগে বৈদিক যুগে যখন গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয় গানের প্রচলন ছিল সে সময়েও তেমনি ছিল; তখনও অভিজাত শ্রেণীর বেলায় নিয়ম-নির্দেশ ও সাধারণ-প্রচলিতের বেলায় "কামচারপ্রবর্তিতত্বম্"-নীতি অনুসরণ করা হোত, কাজেই নিয়ম-নীতি বৈদিক যুগেও যেমন ছিল, বৈদিকোত্তর যুগেও ছিল এবং এখনও তেমনি আছে। তবে একেবারে মনুষ্য-সমাজের গোড়াকার দিকের কথা হোল আলাদা। মোটকথা বৈদিক মন্ত্রগানগুলিতে নিয়মের সন্ধান সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়।

উপনিষদের যুগে স্তোভাক্ষর-বিষয়ক উপাসনার প্রচলন ছিল। স্তোভ সামবেদেরই একটী অংশ-বিশেষের নাম। এই স্তোভের মধ্যে হাউ, হাই,

৯। ঐ, ১।১২।৪

১০। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।১২।৫

অথ, ইহ, ঈ কয়েকটী অক্ষরের উল্লেখ আছে। এই অক্ষরগুলিকে পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেব, আত্মা ইত্যাদি নামে চিন্তা ক'রে গান করার নিয়ম ছিল। যেমন—"অয়ং বাব লোকো হাউকারঃ, বায়ুর্হাইকারঃ, চন্দ্রমা অথকারঃ, আত্মেহকারঃ, অগ্নিরীকারঃ";[১১]—দৃশ্যমান জগৎ হাউকার, বায়ু হাইকার, চন্দ্র অথকার, আত্মা ইহ ও অগ্নি ইকার। পুনরায় "আদিত্য উকারঃ, নিহব একারঃ, বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ, প্রজাপতির্হিংকারঃ, প্রাণঃ স্বরঃ, অন্নং যা, বাক্ বিরাট্";[১২] অর্থাৎ আদিত্য উকার নামে স্তোভ, নিহব একার নামে স্তোভ, বিশ্বেদেবাগণ উকার-রূপ স্তোভ, প্রজাপতি হিংকার-রূপ স্তোভ, প্রাণ স্বর-নামক স্তোভ, অন্ন যা-নামক এবং বিরাট বাক্য-নামক স্তোভ। মোটকথা ছান্দোগ্যের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ২য় খণ্ড থেকে ৭ম খণ্ড পর্যন্ত সাম বা সামগানকে কিভাবে ধ্যান ও চিন্তা করতে হবে সে-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া আছে। এরই নাম সামোপাসনা। সঙ্গীত যে পবিত্র ও উপাসনার বস্তু তা বৈদিক বা ঔপনিষদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সূক্ষ্মদর্শীরা শিক্ষা দিয়েছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ২য় খণ্ডের ১ম থেকে ৭ম প্রপাঠক পর্যন্ত কিভাবে চিন্তা ক'রে সামোপাসনা করতে হয়, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সামোপাসনায় প্রত্যেকটী সামকে গান করার আগে মূর্তিমান ভেবে তাদের অধিদেবতাদের ধ্যান করার বিধি ছিল। সামগুলি যেন জীবন্ত, স্বর ও ছন্দ সংযোগে তাদের জাগ্রত করা হোত। সামগদের মন, প্রাণ ও কণ্ঠ একত্রিত হোত সামগানে। সামও বিভিন্ন রকমের ছিল: বৃহৎসাম, বৈরাজসাম, শক্করীসাম, রেবতীসাম, যজ্ঞাযজ্ঞীয়সাম প্রভৃতি। সামের উপাসনা ছান্দোগ্যে উল্লিখিত হয়েছে যেমন: "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত। পৃথিবী হিংকারঃ, অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরিক্ষমুদ্গীথঃ, আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, দ্যৌর্নিধনমিত্যূর্দ্ধ্বেষু"।[১৩] পাঁচ রকমভাবে সামের তথা সাম-সঙ্গীতের উপাসনা করা হোত, যথা—পৃথিবী, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ বা স্বর্গকে হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন-রূপে। এখানে প্রাকৃতিক সকল উপাদানই সঙ্গীতের অলংকার। পৃথিবী ও দ্যুলোকাদি লোক, দিক, ঋতু, প্রাণী ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি গানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর বিস্তৃত পরিচয় যেমন,

১১। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।১৩।১ ; ১২। ঐ, ১।১৩।২ ; ১৩। ঐ, ২।২।১

১	হিংকার	প্রস্তাব	উদ্গীথ	প্রতিহার	নিধন
২	পৃথিবী	অগ্নি	অন্তরীক্ষ	আদিত্য	স্বর্গ
৩	দ্যুলোক	আদিত্য	"	অগ্নি	পৃথিবী
৪	পূর্বদিকের বায়ু	মেঘোৎপাদক বায়ু	মেঘবর্ষণ	বিদ্যুৎ	জল
৫	বসন্ত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত
৬	ছাগ	মেষ	গো	অশ্ব	পুরুষ
৭	প্রাণ	বাক্	চক্ষু	কর্ণ	মন

দেখা যায়, হিংকারকে অধিষ্ঠান (ground)-রূপে কল্পনা ক'রে নিধনকে পরিপূর্ণ-বিকাশ হিসাবে চিন্তা করা হয়েছে। অবশ্য এই পাঁচটী সামের মধ্যে একটী ক্রমবিকাশের ধারা আছে। উদাহরণ যেমন, ৪র্থ ভাগে পূর্বদিকের বায়ু জলের বা বর্ষণের পরম্পরা-রূপে কারণ, কিন্তু কিভাবে সে সাক্ষাৎ-ভাবে বারিবর্ষণের কারণ হয় তার চিত্র বা ধারা দেওয়া হয়েছে মেঘোৎপাদক বায়ু, মেঘবর্ষণ ও বিদ্যুতের উল্লেখ ক'রে। উদ্গীথের স্থানে মেঘবর্ষণ জল হোলেও তা অন্তরীক্ষস্থ জল, পৃথিবীর কাজে তা লাগে না, পৃথিবীস্থ প্রাণীরা তাতে জীবন-ধারণ করে না, আর নিধনের স্থানে পৃথিবীস্থ জল—যা শস্য-শ্যামলতার কারণ, যা প্রাণীদের জীবন। অন্তরীক্ষস্থ জল ও পৃথিবীস্থ জলের মাঝামাঝি বিদ্যুৎ বা অন্তরীক্ষস্থ অগ্নির থাকা স্বাভাবিক। সামচিত্রের ৭ম ভাগে আছে প্রাণ বা প্রাণবায়ু এবং নিধনের স্থানে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় হিসাবে মন বা অন্তঃকরণ। সকল দিক থেকেই নিধনের পর্যায়ে স্বর্গ, পৃথিবী জল, হেমন্ত, মন এরা প্রত্যেক স্তরে শ্রেষ্ঠ বিকাশ হিসাবে পরিগণিত।

সামকে পশু হিসাবেও চিন্তা করার উপদেশ আছে—"ভবন্তি হাস্য

পশবঃ। পশুমান্ ভবতি। য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে"।[১৪] অবশ্য তার উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। সূর্যের বিভিন্ন বিকাশ মাংস, অস্থি প্রভৃতি রূপেও কল্পনা ক'রে সামের উপাসনা বিহিত আছে।

সাম-সঙ্গীতে বাইশটী অক্ষরের স্থান আছে। সামগীতি গান করার সময় হিংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, আদি, প্রতিহার ও নিধনকে চিন্তা করতে হয় তা আগেই বলা হয়েছে। হিংকার, প্রস্তাব এরা সামভক্তি অক্ষরের সমষ্টিবিশেষ। এই সাতটী সামভক্তির মধ্যে হিংকার তিনটী, প্রস্তাব তিনটী, আদি দুটী, প্রতিহার চারটী, উদ্‌গীথ তিনটী, উপদ্রব বারটী, নিধন তিনটী অক্ষরবিশিষ্ট। যেমন,

১। হিং+কা+র=৩
২। প্র+স্তা+ব=৩
৩। আ+দি=২
৪। প্র+তি+হা+র=৪
৫। উদ্+গী+থ=৩
৬। উ+প+দ্র+ব=৪
৭। নি+ধ+ন=৩

মোট = ২২ অক্ষর

"হিংকার ইতি ত্র্যক্ষরং, প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং, তৎসমম্। আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং, প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং, তত ইহৈকং তৎসমম্। উদ্‌গীথ ইতি ত্র্যক্ষরং, উপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং, * * নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং, তৎ সমমেব ভবতি, তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি।"[১৫] সামের বা সামগানের অবলম্বনই সাতটী ভক্তি বা বাইশটী অক্ষর; অথবা বাইশটী অক্ষরের সমষ্টিই সাতটী ভক্তি বা সাম। মার্গ ও আধুনিক সঙ্গীতের অবলম্বনও সাতটী স্বর ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ষড়্‌জাদি সাতটী স্বরও বাইশটী শ্রুতি বা সূক্ষ্মশব্দের সমষ্টি। সামের বাইশটী অক্ষর থেকেই পরবর্তীকালে মার্গ-সঙ্গীতে বাইশটী শ্রুতি কল্পিত হয়েছিল বো'লে মনে হয়। সামকে পশুরূপে চিন্তার কথা ("ভবতি হাস্য পশবঃ। পশুমান্ ভবতি") আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের ষড়্‌জাদি স্বরকেও পশু-প্রাণীদের স্বরের সঙ্গে তুলনা ক'রে ঐক্য ভাবা হয়েছে, যেমন ষড়্‌জের সঙ্গে ময়ূরের শব্দের, ঋষভের সঙ্গে বৃষের ধ্বনির, গান্ধারের সঙ্গে অজ বা ছাগলের ডাকের, মধ্যমের সঙ্গে সারসের শব্দের, পঞ্চমের

১৪। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২।৬।২; ১৫। ছান্দোগ্য ২।১০।১—৪

সঙ্গে কোকিলের ধ্বনির, ধৈবতের সঙ্গে অশ্বের শব্দের ও নিষাদের সঙ্গে হস্তীর ডাকের ঐক্য চিন্তা করা হয়েছে। সাতটী সামভক্তির অধিদেবতা যেমন অগ্নি, আদিত্য, পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ বা আকাশ, ষড়্‌জাদি সাতস্বরের কল্পিত অধিদেবতাও তেমনি পৃথ্বী, বরুণ বা আকাশ, অগ্নি, অপঃ, মরুত প্রভৃতি। মোটকথা শ্রুতি, স্বর, স্বরের বা গানের অধিদেবতা, স্বরের অনুযায়ী পশু-প্রাণীদের শব্দের ঐক্য-অনুশীলন এ'সমস্তই অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকে চলে এসেছে, তবে নামে, রূপে, প্রণালীতে ও সাধনায় পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কেননা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনই প্রকৃতির ধর্ম।

উদ্‌গান যাঁরা করেন তাঁদের উদ্‌গাতা বলা হয়, যেমন সামগানকারীদের বলা হয় সামগ। উদ্‌গাতারা অবশ্য সামগানই করতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্‌গানে ব্যবহৃত আরো সাতটী স্বরের পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলির নাম—বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত: "বিনর্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেঃ উদ্‌গীথঃ, অনিরুক্তঃ প্রজাপতেঃ, নিরুক্তঃ সোমস্য, মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ, শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য, ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেঃ, অপধ্বান্তং বরুণস্য, তান্ সর্বানেবোপসেবেত, বারুণন্ত্বেব বর্জয়েৎ।"[১৬]

(১) বিনর্দি—বৃষভধ্বনির মতন স্বর, পশুদের কল্যাণকর, অগ্নি এই স্বরের অধিদেবতা।
(২) অনিরুক্ত—অনভিব্যক্ত স্বর, প্রজাপতি এর অধিদেবতা।
(৩) নিরুক্ত—স্পষ্টতর স্বর, সোম বা চন্দ্র অধিদেবতা।
(৪) মৃদু—কোমল ও অল্পচেষ্টাতে উচ্চারিত স্বর, বায়ু অধিদেবতা।
(৫) শ্লক্ষ্ণ—শিথিল ও অল্প আয়াসেই নির্গত স্বর, ইন্দ্র অধিদেবতা।
(৬) ক্রৌঞ্চ—ক্রৌঞ্চপক্ষীর মতন স্বর, বৃহস্পতি অধিদেবতা।
(৭) অপধ্বান্ত—ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আঘাত করলে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় সেরকম স্বর, বরুণ এর অধিদেবতা।

বৈদিক এই সাত স্বরের বেলায় দেখা যায়, তাদের ধ্বনির সঙ্গে প্রাণী ও ধাতব বস্তুর ধ্বনির তুলনা করা হয়েছে। স্বরগুলির দেবতাও কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং মার্গ ও দেশীর এবং বর্তমান ক্ল্যাসিকাল ও আধুনিক সঙ্গীতের ষড়্‌জাদি

১৬। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২।২২।১

সাতস্বরেরও যে পশুপক্ষীদের ধ্বনির সঙ্গে ঐক্য কল্পনা করা হয়েছে এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কারণ নেই। ধ্যানক্ষেত্র ভারতবর্ষ প্রত্যেকটী জড়ের পিছনে চৈতন্যের বিকাশকে দেখ্‌তে চায়, স্বরের অধিদেবতা হিসাবে অগ্নি, ও আদিত্যাদি দেবতাদের কল্পনার পিছনে তাই ঐ পুণ্যপ্রবৃত্তি ও দিব্যদৃষ্টিভঙ্গি লুকোনো আছে।

ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে কর্মফলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে নৃত্য ও গীতের উল্লেখ করা হয়েছে—"অথ যদি গীত-বাদিত্রলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য গীত-বাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীত-বাদিত্রলোকেন সংপন্নো মহীয়তে।"[১৭] অর্থাৎ 'সাধক যদি গীত ও বাদ্যরূপ লোক (world) বা ভোগ কামনা করেন তবে তাঁর সংকল্প বা ইচ্ছামাত্রই গীত ও বাদ্য নিকটে উপস্থিত হয়, তিনি সেই গীত ও বাদ্য উপভোগের দ্বারা সমৃদ্ধ ও জগতে পূজিত হন এবং নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করেন'। এখানে গন্ধর্বলোকের কল্পনা করা হয়েছে। অবশ্য পুরাণে এই ধারণাটী প্রবল, কিন্তু ছান্দোগ্যের মতন প্রাচীন উপনিষদেও লোকের (world) কল্পনা করা হয়েছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি লোকের মতন গন্ধর্বলোকেরও বর্ণনা পাওয়া যায়; মানুষ গীত ও বাদ্যের অনুরাগী হোলে মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা গীত-বাদিত্রলোকে বা গন্ধর্বলোকে গমন করে। মোটকথা ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌কার গীত ও বাদ্যবিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং একথাও অনুমান করা অসমীচীন হবে না যে, সেই গীত ও বাদ্যের ধারণা তিনি তদানীন্তন সমাজ থেকেই পেয়েছিলেন।

* *

*

বৃহদারণ্যক উপনিষদে সঙ্গীতের আলোচনা যতটুকু আছে তা মাত্র উদ্‌গানকে (উদ্‌গান নামক সামগানকে) নিয়ে। বৃহদারণ্যকের সাঙ্গীতিক উপাদান প্রায় ছান্দোগ্যের মতন, তবে বৃহদারণ্যকে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি-বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে। গান ও সাঙ্গীতিক স্বর-সম্বন্ধে বেশীর ভাগ উপনিষদের সিদ্ধান্ত যে, বাক্ ও প্রাণের সংমিশ্রণেই স্বরের সৃষ্টি; স্বর সামগান ও পরবর্তী সকল গানেরই আশ্রয়; স্বর-সাধনার উদ্দেশ্য শক্তিকে জাগ্রত করা

১৭। ছান্দোগ্য ৮।২।৮

ও আধ্যাত্মিকতার চরমবিকাশকে লাভ ক'রে জন্ম-মৃত্যুরূপ প্রহেলিকার পারে যাওয়া।

উপনিষদে সঙ্গীতের আলোচনা রূপকচ্ছলে করা হয়েছে। শুধু সঙ্গীত কেন, ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যার প্রসঙ্গও রূপক আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সামগানের স্বরূপ ও উদ্গানের স্বর-সম্বন্ধে আলোচনা করার আগেই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অবতারণা করেছে এই-প্রসঙ্গে নিয়ে যে, প্রজাপতির দুই সন্তান ছিল— দেবতা ও অসুর—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যাঃ, দেবাশ্চাসুরাশ্চ", আর অসুরের চেয়ে দেবতা পদবীতে ও প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ বোলে দেবতারা বল্লেন: 'আমরা জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে উদ্গীথ তথা উদ্গানের মাধ্যমে অসুরদের অতিক্রম করব' —"ততঃ কানীয়সা এব দেবাঃ, জ্যায়সা অসুরাঃ, ত এষু লোকেষস্পর্ধন্ত ; তে হ দেবা উচুঃ, হন্তাসুরাণ্যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি"।[১৮] এটী রূপক আখ্যানের অবতারণা তা আগেই উল্লেখ করেছি। বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে দেবতা বলা হয়েছে। অসুর বলা হয় তাদের যারা 'অসু' বা প্রাণকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে থাকে ও পার্থিব সম্পদকে পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করে; দেবতাদের অর্থাৎ বাক্, প্রাণাদি ইন্দ্রিয়দের চেয়ে অসুরেরা নিকৃষ্ট এজন্যে যে, দেবতা বা ইন্দ্রিয়েরা চৈতন্যকে আশ্রয় ক'রে অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা অপার্থিব বস্তুকে লাভ করে এবং নিজেদের যথার্থ স্বরূপকে জান্‌তে পারে বিবেক ও বিচারের আশ্রয় নিয়ে। দেবতা ও অসুরের এই আখ্যানটীর অবতারণা করা হয়েছে এই কারণে যে, বাক্ প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র ও মন প্রভৃতি দেবতারা অসুরদের শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চাইলেও নিজেদের ভেতর নানান্ পরীক্ষার পর নির্ধারিত হোল: প্রাণই বড়; তবে 'প্রাণ বড়' অর্থে প্রাণ বাকের সঙ্গে সম্মিলিত হোয়ে বড়, ঠিক একা নয়। অবশ্য এখানে যজ্ঞকর্মের উদ্গানকে ও পবিত্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণকে উদ্দেশ্য ক'রেই প্রাণ ও বাক্যের সমবেত রূপকে বড় বা শ্রেষ্ঠ বলার প্রসঙ্গ করা হয়েছে। উদ্গান বা সামগান এবং মন্ত্রোচ্চারণের সার্থকতাই মনের সমতা ও প্রসন্নতা সাধন করা। যজ্ঞে উদ্গান ও সুরযোগে মন্ত্রোচ্চারণ করতে গেলে প্রাণবায়ুর (শ্বাসের) প্রয়োজন হয়, আর উদ্গান সর্বদাই সার্থক হয় বাক্ তথা বাণী অর্থাৎ কথাকে নিয়ে। প্রাণবায়ু-রূপ শ্বাসের মাধ্যমে যজ্ঞভূমিতে উদ্গান বা গান হোলে মন ধ্যানমুখী হয়, শান্তি ও প্রসন্নতার মধ্যে নিজেকে দেয় ডুবিয়ে,

১৮। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৩।১

আর সেটাই হোল উদ্‌গান ও সকল গানের চরম-সার্থকতা। এই সার্থকতাকে বরণ করাতেই শ্রেষ্ঠতা লাভ হয় দেবভাবাপন্ন মানুষের। তাছাড়া যজ্ঞীয় পবিত্র কর্মে প্রাণ ও বাক্ উদ্‌গানের সহায়তায় ঐ চরমপ্রশান্তি লাভ করে বোলে তারা কেবল ঐহিক সুখবিলাসী অজ্ঞানী অসুরদের চেয়েই শ্রেষ্ঠ নয়, অন্যান্য দেবতা তথা ইন্দ্রিয়দের চেয়েও প্রধান।

বৃহদারণ্যকে আছে, প্রাণ বা প্রাণবায়ু বাক্‌কে প্রথমে বহন করে। সেই বাক্ যখন আবার মৃত্যুকে অতিক্রম করে তখন তা অগ্নিতে পরিণত হয়। সেই অগ্নিও মৃত্যুঞ্জয়ী হোয়ে আপনার মহিমায় বিকশিত হয়—"স বৈ বাচমেব প্রথমা-মত্যবহৎ; সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোঽগ্নিরভবৎ; সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যু-মতিক্রান্তো দীপ্যতে"।[১৯] 'সাম' হোল প্রাণ ও বাকের মিথুনরূপ। 'সা'—বাক্, প্রকৃতি বা স্ত্রীবাচক ও 'অম্'—প্রাণ বা প্রাণবায়ু—পুংবাচক পুরুষ। এই পুরুষ ও প্রকৃতি তথা 'সা' ও 'অম্' সামের গীতিরূপ। আচার্য শংকরও ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: "তথা প্রাণনির্বর্ত্য স্বরাদিসমুদায়মাত্রং গীতিঃ সামশব্দে নাভিধীয়তে"। প্রাণবায়ু ও বাক্-রূপী অগ্নির (তাপের) সংযোগে নাদের (কারণশব্দের—causal sound) উৎপত্তি-সম্বন্ধে আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদের আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

সামগানের সময় সামগ বা উদ্‌গাতার স্বর যে সুমিষ্ট হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উল্লেখ করেছে—"* * তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত, তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্যাৎ"।[২০] ভাষ্যকার শংকর বলেছেন: "স্বর ইতি কণ্ঠগতং মাধুর্যম্"। বৃহদারণ্যকের মতে, স্বরকে সুমিষ্ট করতে গেলে উদ্‌গাতার বা সামগানকারীর স্বরবিজ্ঞান জানা উচিত। স্বরবিজ্ঞান জানার অর্থই প্রাণবায়ুর রহস্যকে জানা। আরণ্যকে তাই বলা হয়েছে: বাক্ই প্রাণের তথা সামের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়স্থান), কারণ 'সাম' নামক প্রাণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হোয়ে গীতির আকারে প্রকাশ পায়—"* * এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ"।[২১]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে "প্রাণো বৈ উক্‌থম্"[২২]—প্রাণই উক্‌থ বলতে প্রশংসামূলক সাম। এই সাম বা উদ্‌গান মহাব্রতযজ্ঞে গান করা হোত।

১৯। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৩।১২ ২০। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৩।২৫
২১। ঐ, ১।৩।২৭ ২২। ঐ, ১।৩।১।

মহাব্রতযজ্ঞে সামগানের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যেরও সমাবেশ থাকৃত। পাশ্চাত্যের 'মিড্‌সামার ইভ্‌' (Midsummer Eve) বা ইউরোপে 'মিড্‌সামার ডে' (Midsummer Day) ভারতীয় মহাব্রতযাগেরই অভিন্ন রূপ। 'মিড্‌সামার ইভ্‌ বা ডে' ইংরেজী ২৩শে জুন অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ ফ্রেজার তাঁর সুবিখ্যাত *The Golden Bough* এবং *Adonis, Attis, Osiris* বই-দুটীতে 'মিড্‌সামার ডে বা ইভ্‌' উৎসবটীর আলোচনা করেছেন, যার অনুষ্ঠানপ্রণালী অনেকটা মহাব্রতযজ্ঞের সঙ্গে মেলে। মহাব্রতযাগ 'গবমানয়সূত্র'-টীর দ্বিতীয় শেষ দিনে ('the second last day') অনুষ্ঠিত হয়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে (১৯।৩) উল্লিখিত আছেঃ সূর্য ছ'মাস ধরে দক্ষিণায়ন শেষ ক'রে যখন উত্তরায়নে যেতে শুরু করে তখনি ঠিক মহাব্রতযাগের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে (৪।১০।৩) ও তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের (১।২।৬) মতে, বছরের মাঝামাঝি গ্রীষ্মঋতুতে 'মহাব্রত' অনুষ্ঠিত হয়। শাঙ্খ্যায়ণ-শ্রৌতসূত্রে (১১।১৩) আছেঃ বৃহদ্‌, রথন্তর ও মহাদিবাকীর্ত্য এই সাম-তিনটী মহাব্রতে গান করা হয়। অনেকে আবার উক্‌থ-সামের উল্লেখ করেন নি, কিন্তু বৃহদারণ্যক মহাব্রতযাগে উক্‌থসামের বিধান দিয়েছে। বৃহদ্‌সাম ইন্দ্রদেবতার ও মহাদিবাকীর্ত্য-সাম সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে গীত হোত। ইন্দ্র ও সূর্যই এই যাগে প্রধান। মৈত্রায়ণীসংহিতায় (৪।৮।১০) ও তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (১।২।৩।১) উল্লেখ আছেঃ মহাদিবাকীর্ত্য-সামটী বিশেষভাবে বিষুবন্তযাগের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, বৃহদ্‌সাম মহাব্রত ও মহাদিবাকীর্ত্য-সাম বিষুবন্তযাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের (৮।৬) মতে, মহাদিবাকীর্ত্য-সামটী মহাব্রতযাগেরই অঙ্গ। অধ্যাপক হিলব্র্যাণ্ড (A. Hillebrandt) একথা স্বীকার করেন না, কিন্তু ডাঃ ফ্রেড্‌ল্যাণ্ডার (Dr. Friedlander) ও অধ্যাপক কিথ (Prof Keith) আশ্বলায়নের মতকে কতকটা গ্রহণ করেছেন। মোটকথা মহাব্রতযাগে কিংবা বিষুবন্তযাগে সামপাঠ বা সামগান অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য ছিল।[২৩]

২৩। Cf. অধ্যাপক কিথ: *The Vedic Mahavrata* published in *The Proceedings of the Third International Congress for the History of Religions* (1908), pt. II, pp. 49-58.

পরবর্তী মীমাংসাশাস্ত্রের যুগে যজুর্বেদীয় নক্ষত্রসত্র, কৃত্তিকাসত্র, স্বর্গসত্র, বিভিন্ন সোমযাগ, জ্যোতিষ্টোম, প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন, তৃতীয়-সবন, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞে বা যাগেও সামগানের ব্যবস্থা ছিল।[২৪]

উকৃথ-সামের পর বৃহদারণ্যকে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ ও অনুষ্টুভ ছন্দের উল্লেখ করা হয়েছে। গায়ত্রীতে আটটী অক্ষর আছে।[২৫] ঋক্, সাম ও যজু এই ত্রয়ীকে বাক্, মন ও প্রাণ বোলে কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া সঙ্গীতশাস্ত্রে বাক্যকে (শব্দকে) যেমন আহতনাদ ও প্রাণবায়ুকে অনাহতনাদ বলা হয়েছে, তেমনি বৃহদারণ্যকেও বিজ্ঞাতকে বলা হয়েছে বাক্ (স্বর) এবং অবিজ্ঞাতকে প্রাণ (প্রাণবায়ু)—"বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব। যৎকিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপম্, বাগধি বিজ্ঞাতা, বাগেনং তদ্‌ভূত্বাবতি"।

* *

*

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীর গোড়ায় সঙ্গীতের ইঙ্গিত অতি সামান্যভাবে আছে। 'শিক্ষা' বল্‌তে বুঝায় বর্ণের উচ্চারণপ্রণালী এবং স্বর ও মাত্রা প্রভৃতির নিয়ম-নির্দেশ। তৈত্তিরীয়ে আছে: "ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্ সাম সন্তানঃ।" শীক্ষা ও শিক্ষা একই শব্দ। 'বর্ণ' অকারাদি অক্ষরসমূহ, 'স্বর' অনুদাত্ত, স্বরিত ও উদাত্ত। অবশ্য 'স্বর' বল্‌তে বৈদিক প্রথমাদি ও লৌকিক ষড়্‌জাদি সাতস্বরকেও ধরা যায়। 'মাত্রা' হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত। 'বল' অর্থে শব্দোচ্চারণে প্রাণবায়ুর প্রযত্ন বা চেষ্টা; 'সাম' অর্থে সমতা বা একই নিয়মে উচ্চারণ; 'সন্তান' বল্‌তে বুঝায় ক্রমবদ্ধ বাক্য বা পদ। ঐতরেয়-আরণ্যকে গীতির শিক্ষা-সম্বন্ধে সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকায় আচার্য সায়ণও তৈত্তিরীয়ের এই শিক্ষাংশ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করেছেন। এছাড়া কঠ উপনিষদে (১।২৬) যম ও নচিকেতা-সংবাদে নৃত্য-গীতের উল্লেখ আছে—"তবৈব বাহাস্তব নৃত্য-গীতে"।

২৪। Cf. (ক) *Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar*, Vol. II (1928), pp. 119-132; (খ) শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী: 'যজ্ঞকথা' ও 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ'।

২৫। বৃহদারণ্যক উঃ ৫।১৪।১

পঞ্চম অধ্যায়

ঋক্‌তন্ত্রে সঙ্গীত

'ঋক্‌তন্ত্র' একখানি প্রাতিশাখ্য: একসঙ্গে বৈদিক শিক্ষা, ছন্দ ও ব্যাকরণ-গ্রন্থ। ডাঃ বার্ণেল বলেছেন, এটী সামবেদের অন্যতম প্রাতিশাখ্য, 'ঋক্' শব্দ থাকার জন্যে ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য নয়। ঋক্‌তন্ত্রে যে-সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি পুরোপুরি সামবেদের। ডাঃ বার্ণেলের অভিমতে, ঋকতন্ত্র একমাত্র কৌথুমীশাখার প্রাতিশাখ্য। তাঁর অনুমান যে, এই প্রাতিশাখ্যটীর সম্পর্ক ছিল জৈমিনীয় ও তবলকার বা রাণায়নীয় শাখার সঙ্গে, কিন্তু এখন সে-সম্পর্ক নাই, কেন নাই—তা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, এই সকল প্রশ্নের অবতারণা করা এখন অবান্তর। ডাঃ মনোমোহন ঘোষের অভিমতও তাই, তিনি এর প্রসঙ্গে বলেছেন: "But all these assumptions seem to be uncalled for".[১] কিন্তু শ্রদ্ধেয় সূর্যকান্ত শাস্ত্রী ঋক্‌তন্ত্রের নূতন সংস্করণের পরিচয়ে ডাঃ বার্ণেলের অভিমতই বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেছেন। ঋক্‌তন্ত্র যে কৌথুমীশাখার প্রাতিশাখ্য এর সপক্ষে তিনি নারদী (২।৮।১৯) ও যাজ্ঞবল্ক্য (১৯৮ শ্লো°) শিক্ষা-দুটীর প্রমাণবাক্যের নজির দিয়েছেন, যাদের থেকে মনে করা অসমীচীন নয় যে, ঋক্‌তন্ত্র-প্রাতিশাখ্যটী কৌথুমী বা কৌথুমশাখা ছাড়াও নারদ, লোমশ, গৌতম ও নৈগেয়-সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় এ-সম্বন্ধে একেবারে সুপরিস্ফুটভাবে কিছু বলেন নি।

সামবেদের অনেকগুলি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়: জৈমিনীয়, রাণায়নীয়, কৌথুম, গৌতমী ও নৈগেয় প্রভৃতি। ডাঃ বার্ণেল এই শাখাগুলির নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু আগেই বলেছি যে, তিনি ঋক্‌তন্ত্রকে কেবল কৌথুমীশাখারই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার ঋক্‌তন্ত্রের শাখা-নির্বাচন নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি, তবে ঋক্‌তন্ত্র-প্রাতিশাখ্যটীর পরিচয় দিতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। তিনি বলেছেন, ঋক্‌তন্ত্রটী হোল—

১। Cf. *The Indian Historical Quarterly*, Vol. XI, Dec., 1935, No. 4, p. 766

** "a grammatical treatise which shows how the *padas* must change in order to become the real hymnical text, and again, how by means of the Krama, *padas* become the true representatives of the Samhita".

প্রাতিশাখ্য কাকে বলে? এর পরিচয় দিতে গিয়ে মাধবাচার্য বলেছেন: "প্রতিশাখায়াং ভবম্ প্রাতিশাখ্যম্"। 'বৈদিকাভরণ'-এর গ্রন্থকার প্রাতিশাখ্যের স্বরূপ বল্‌তে গিয়ে 'বেদের শাখাসমষ্টি' অর্থ করেছেন, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। জার্মাণ পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার বৈদিকাভরণ-কারকেই অনুসরণ করেছেন এবং তাতে ফল হয়েছে যে, তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তও হয়েছে অযুক্তিকর। মাধবাচার্যের "প্রতিশাখায়াং ভবম্" অর্থটী জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী তাঁর 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'-র ৪।৩।৫৯ সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন।[২] পণ্ডিত অন্নভট্টও শুক্লযজুর্প্রাতিশাখ্যের মুখবন্ধে ঐ একই অর্থের উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত অন্নভট্ট বিস্তৃত বিচার ক'রে বলেছেন, কাত্যায়ন তাঁর বাজসনেয়ী-প্রাতিশাখ্যে শুক্লযজুর্বেদীয় পনেরটী শাখার পরিচয় দিয়েছেন[৩] এবং দুর্গাচার্যের প্রমাণ থেকেও অনুমান হয় যে, 'প্রাতিশাখ্য' বল্‌তে একাধিক শাখার ব্যাকরণ বুঝায়। দুর্গাচার্য নিরুক্তকার যাস্কের ভাষ্যকার। তিনি নিরুক্তের ১।১৭ সূত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন: "কিং পার্ষদানি? স্বচরণপর্ষদ্যেব যৈঃ প্রতিশাখং নিয়তমেব পদাবগ্রহপ্রগৃহ্যক্রমসংহিতাস্বরলক্ষণমুচ্যতে তানীমানি পার্ষদানি প্রাতিশাখ্যানীত্যর্থঃ"। পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার তাঁর 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য' পুস্তকে দুর্গাচার্যের এই প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন।[৪]

'পার্ষদ' শব্দটী প্রাতিশাখ্য-শব্দের সমান অথবা একই অর্থের বোধক। পার্ষদ, পর্ষদ ও পরিষৎ একই শব্দ এবং এরা একই অর্থের প্রকাশক। গোভিলগৃহ্যসূত্রের উল্লিখিত "আচার্যং সপরিষৎকং ভোজয়েৎ সব্রহ্মচারিণশ্চ" বাক্যটীর অর্থ করতে গিয়ে ভাষ্যকার নারায়ণ বলেছেন: "সহ পরিষদা শিষ্যগণেন বর্তত ইতি সপরিষৎকঃ তং। সমানং তুল্যকালং ব্রহ্মচারিত্বং যেষাং ত ইমেঽন্যশাখিনোঽপি সব্রহ্মচারিণঃ সবয়োঽভিধীয়ন্তে"।[৫] এ-থেকে প্রমাণ হয় যে, শিক্ষা-পিপাসু

২। Cf. 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' (গ্যাড্‌গিল-সম্পাদিত, বোম্বে ১৯০৪), পৃঃ ২৪৯

৩। Cf. কাত্যায়ন-রচিত 'বাজসনেয়ী-প্রাতিশাখ্য' (বেঙ্কটেশ্বর শর্মা-সংপাদিত, মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪), পৃঃ ২—৫

৪। Cf. *Ancient Sanskrit Literature* (London, 1859), p. 131.

৫। *The Indian Historical Quarterly*, Vol. XI, Dec. 1935, No. 4, pp. 761-768-তে প্রকাশিত ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ-লিখিত *Pratisakhyas and Vedic Sakhas* প্রবন্ধ (p. 764) দ্রষ্টব্য।

ছাত্রেরা একজন আচার্যের কাছে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং এই আচার্য ও ছাত্রদের সমবেত রূপই পার্ষদ, পরিষদ্ বা পারিষদকে গড়ে তোলে। ডাঃ মনোমোহন ঘোষ তাই বলেছেন :

"Thus Parsada-sutras evidently related to such Parisads comprising different schools of a Veda. Hence it seems justifiable to conclude that Parsada-sutras or Pratisakhyas related each one or all the sakhas of a Veda."[৬]

প্রাতিশাখ্য শব্দটীতে প্রতি+শাখা+উভয়ের গঠনোপাদান—এই তিনটী অংশ আছে। 'শাখা' বল্‌তে বুঝি বিভিন্ন বৈদিক সম্প্রদায় ; কিন্তু এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, শাখাগুলি একই অখণ্ড বেদের অথবা ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি বেদগুলির সঙ্গে পৃথক বা ভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত কিনা। ডাঃ মনোমোহন ঘোষ তাঁর *Pratisakhyas and Vedic Sakhas* আলোচনাটীতে এর বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : হিরণকেশীসূত্রের ওপর মহাদেবের ভাষ্য থেকে একটী বিষয় জানা যায় যে, শাখাগুলি বৈদিক পাঠভেদে বিভিন্ন হয়েছে—"শাখাভেদেঽধ্যয়নভেদাদ্বা সূত্রভেদাদ্বা।"[৭] প্রকৃতপক্ষে একথা সত্য যে, বৈদিক যজ্ঞে বিভিন্ন পুরোহিত ভিন্ন-ভিন্নভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন,[৮] এবং সেই উচ্চারণ ও সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগভেদের জন্যে ঋক্, সাম, যজুর্বেদও একদিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক শাখা হিসাবে গণ্য হতে পারে। পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার উল্লেখ করেছেন :

"The word (i.e. *Sakha*) is sometimes applied to the three original Samhitas, the Rigveda-Samhita, Samaveda-Samhita and Yajurveda-Samhita, in relation to one another and without reference to subordinate Sakhas belonging to each of them."[৯]

নিরুক্তকার যাস্ক কিন্তু 'বেদ' এই একবচনান্ত শব্দটী ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, বৈদিক মন্ত্রগুলি মুখে মুখে আবৃত্তি করা হোত, পরে স্মরণশক্তির হ্রাস পাওয়ায় পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা বেদগ্রন্থ রচনা বা সংকলন করেন। ডাঃ লক্ষ্মণ-

৬। Ibid , p. 567.

৭। পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার তাঁর *Ancient Sanskrit Literature* (1859, পৃঃ ১২৭) পুস্তকেও এর উল্লেখ করেছেন।

৮। জৈমিনীর 'পূর্বমীমাংসাসূত্র' ২।১।৩২-৩৭

৯। Cf, *Ancient Sanskrit Literature*, (1859), pp. 123-124.

স্বরূপ অনুমান করেন, প্রাতিশাখ্য-সম্বন্ধে নিরুক্তকার যাস্ক বিশেষভাবে জান্‌তেন। তাই তিনি লিখেছেন :

"Probably the sentence * * alludes to the Pratisakhayas, these being the oldest grammatical treatises."[১০]

ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপও 'পার্ষদ' ও 'প্রাতিশাখ্য' শব্দদুটীকে অভিন্ন বলেছেন, কেননা কখনো কখনো বৈদিক সাহিত্যে উভয়ে উভয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়—

"Sometimes the words *prasada* and *pratisakhya* are interchanged, as is shown by the evidence of a MS. in the Bodleian, which uses the word *parsada* in the place of *pratisakhya.* This leads to the conclusion that Yaska knew some *pratisakhyas*, although he is earlier than the modern *R Pratisakhya*"[১১]

পণ্ডিত মোক্ষ-মূলারও একথা স্বীকার করেছেন যদিও তিনি প্রাতিশাখ্য-রচয়িতা শৌনকের সঙ্গে পাণিনি ও যাস্কের বয়স-নিরূপণ নিয়ে যথেষ্ট বিচারের অবতারণা করেছেন।[১২] মোটকথা 'প্রাতিশাখ্য' বল্‌তে তিনি বৈদিকাভরণের গ্রন্থকারকে অনুসরণ ক'রে যে উল্লেখ করেছেন—"the Pratisakhyas relate to a group of sakhas", তাও ঠিক নয়, কেননা 'প্রাতিশাখ্য' শব্দে 'বেদের প্রত্যেকটী শাখাকে' অথবা 'বেদের সমস্ত শাখাকে' বুঝায়।

ডাঃ মনোমোহন ঘোষ উল্লেখ করেছেন, প্রাতিশাখ্যগুলির আলোচনা করলে দেখা যায়, নারদী প্রভৃতি শিক্ষাগুলির উপযোগিতা অনেকাংশে প্রাতিশাখ্যের দ্বারা পরিপূরণ হয়, তাই প্রাতিশাখ্যকে গৌণ-শিক্ষাগ্রন্থ বল্লেও অসমীচীন হয় না। তিনি বলেছেন,

"From the study of the contents of the Pratisakhyas we find that the scope of the siksa as given in the *Taittiriya Upanishad* (I. 2) applies to a considerable extent to the Pratisakhyas which should be called secondary siksas."[১৩]

১০। Cf. ডাঃ লক্ষ্মণ-স্বরূপ-অনূদিত ইংরেজী *The Nighantu and the Nirukta* (1921), p 20.

১১। Cf. *The Nighantu and the Nirukta* (1921), p, 220

১২। Cf. *Introduction to the Rigveda-Pratisakhya* (ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ-কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত), Vide *The Indian Historical Quarterly*, Vol. III, Sept. 1928, No. 3, pp. 612-613.

১৩। Cf. *The Indian Historical Quarterly*, Vol. XI, Dec. 1935, No, p. 768.

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষাবল্লীতে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য প্রাতিশাখ্যে এতগুলি বিষয়ের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ ও বিচার না থাকলেও তারো বিষয়বস্তু বড় কম নয়, সুতরাং শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্য উভয়ের প্রয়োজনই বৈদিক-সাহিত্য ও ভারতীয় সঙ্গীতের বেলায় আছে।

'প্রাতিশাখ্য' শব্দটীর স্বরূপ ও সার্থকতা-সম্বন্ধে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনীষীর অভিমত নিয়ে আলোচনা করেছি। মাধবাচার্য, মহাদেব, যাস্ক, দুর্গাচার্য ও বৈদিকাভরণকারের এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার, হুইট্নি, বার্ণেট, বার্ণেল, কিথ, ম্যাক্‌ডোনেল প্রভৃতি মনীষীদের মতবাদের কথা ছেড়ে দিলেও বেদের শাখা ও উপশাখা-সম্বন্ধে পণ্ডিত হিলব্র্যাণ্ডের যুক্তি বেশ সমীচীন বোলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যাজ্ঞিক ঋষিরা ঋক্‌মন্ত্র ও বৈদিক স্তোত্রগুলি সংগ্রহ ক'রে যাগযজ্ঞের চাহিদা-অনুযায়ী তাদের পরিবর্তন ও সুসংস্কৃত করেছিলেন। তাছাড়া তদানীন্তন প্রথা-অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় পরিবার অথবা সম্প্রদায় (গোষ্ঠী) নিজেদের মতন মন্ত্র বা স্তোত্রগুলিকে ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন, আর তাদের থেকে বিচিত্র শাখা ও উপশাখারও সৃষ্টি হয়েছিল। মনীষী হিলব্র্যাণ্ডের এই অনুমান অথবা সিদ্ধান্তের মধ্যে যৌক্তিকতা আছে। তবে ব্রাহ্মণ-সংহিতার যুগে যাগযজ্ঞের মধ্যে অনুষ্ঠান-আয়োজনই ছিল মাধুর্যের পরিধিতে সীমায়িত হোয়ে; ক্রমশঃ কর্মের ভেতর এলো দার্শনিক ও ধর্মভাবের আবহাওয়া—যাতে ক'রে পার্থিব সম্পদ ছাড়াও অপার্থিব আকাঙ্খা ও শান্তির দিকে মানুষ আত্মনিয়োগ করেছিল।

ঋক্‌তন্ত্রের গ্রন্থকার ঔদব্রজী। ইনি নাকি সামতন্ত্রেরও রচয়িতা। এছাড়া সামপ্রাতিশাখ্য 'পুষ্পসূত্র' এবং সংস্কৃত ভাষার একটী ব্যাকরণও তিনি রচনা করেছিলেন। কাত্যায়নের 'সামসর্বানুক্রমণী'[১৪] গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়,

সামতন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি সুখার্থং সামবেদিনাম্।
ঔদব্রজিকৃতং সূক্ষ্মং সামগানাং সুখাবহম্॥

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁর 'অক্ষরতন্ত্র' পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ

১৪। কাত্যায়ন-রচিত 'সর্বানুক্রম' বা 'সর্বানুক্রমণী' ও তার ভাষ্য-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা—Vide স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর-লিখিত প্রবন্ধ *Vedas, Vedangs, Etc.* in *Collected Works of Sir. R. G. Bhandarkar*, Vol. II (1928), pp. 293—306.

করেছেন : "গ্রন্থোক্ষমন্ত্রকৃতন্ত্রপ্রণেতুঃ শাকটায়নস্য সমকালিকেন মহামুনিনা আপিশলিনা প্রোক্তঃ। সামতন্ত্রং তু গার্গ্যোণেত্যেব বয়মুপদিষ্টাঃ প্রামাণিকাঃ"। 'বংশব্রাহ্মণ'-গ্রন্থে (পৃ° ১১) পাওয়া যায়—"পুষ্পযশসঃ ঔদব্রজেহ পুষ্পযশা ঔদব্রজিঃ"। পণ্ডিত সূর্যকান্ত শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"Tradition and *Samasarvanukramani* assign *Samatantra* to Audavraji; and the name Puspayasas Audavraji occurs in the *Vamsa-Brahmana* in the list of the illustrious ancients of the SV. literature. This Audavraji, the author of *Samatantra* may be identical with Audavraji, the originator of the *Riktantra.*"

বৈদিক সামগানে কথা ছিল মন্ত্রের আকারে, তাতে স্বর অর্থাৎ বিভিন্ন স্বর সংযোজন ক'রে গান করা হোত। মনীষী ব্লুম্‌ফিল্ডের অভিমতও অনেকটা তাই। তিনি বলেছেন, সামগান গোড়ার দিকে যে গাওয়া হোত, তাতে পুরোপুরিভাবে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার কোন ছোঁয়াচ ছিল না। সভ্যতার বিকাশ ও প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে সামগানের রূপ উন্নত এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছিল বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্যে :

"The Samaveda represents little more than the secondary employment in the service of religion of popular music and other quasi-musical noises. These were developed and refind in the course of civilization, and worked into the formal ritual of Brahminism, in order to add an element of beauty and emotion."—*Religion of the Veda*, p. 39.

অধ্যাপক সূর্যকান্ত শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, সামগানে তিনটী জিনিস লক্ষ্য করা যায় তার প্রাথমিক বিকাশের দিকে : প্রথম—তার হাউ, হাবৌ প্রভৃতি উচ্চারণযুক্ত গায়নপদ্ধতি, দ্বিতীয়—কথাগুলির প্রায়ই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ, আর তৃতীয়—স্বরের সঙ্গে কথার ঐক্য অসুন্দরভাবে। ডাঃ উইণ্টারনিজ্‌ও এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছেন :

"Of later origin are the socalled Ganas or 'song-books' proper (from *ga* 'to sing'), which designate the melodies by means of musical notes, and in which the texts are drawn up in the form which they take in singing, *i. e.* with all the extensions of syllables, repetitions and interpolations of syllables and even of whole words—the socalled 'stobhas' as hoyi, huva, hoi and so on, which are partly not unlike our hazzas and other shouts of joy. The oldest notation is probably that by means of syllables, as ta, co, na, etc. More frequent, however, is the designation of the seven notes by means of the figures 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7,

with which the F, E, D, C, B, A, G, of our scale correspond. When singing, the priests emphasize these various notes by means of movements of the hands and the fingers,"[১৫]

এই সমস্ত গান বা সামছন্দের আবার অধিদেবতা কল্পনা করা হোত। সামছন্দের অধিদেবতা হিসাবে ইন্দ্রের আধিপত্যই ছিল বেশী; যেমন পূর্বার্চিকের ৫৭টী ছন্দ তথা মন্ত্রগুচ্ছ গাওয়া হোত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং বইয়ের মাঝামাঝি ৩৬টী গান গাওয়া হোত ইন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে। অবশ্য গোড়ার দিকে ১২টী মন্ত্র ছিল অগ্নিদেবতার ও ১১টী ছিল সোম বা চন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শেষের অগ্নি ও সোম দেবতাদের উদ্দেশ্যে গানগুলি বুঝাতো ইন্দ্রদেবতাকেই ("Both these devisions are subordinate to the worship of Indra")।

'সাম' অর্থে প্রকৃতপক্ষে সুর (?) অথবা সুমিষ্ট স্বরকে বুঝায়; পরে ছন্দের তথা ঋক্‌ছন্দের ওপর ঐ সুর, স্বর বা স্বরসমষ্টি সংযোজিত হয়েছিল এবং তা থেকেই সামগানের বিকাশ হয়। সেই ঋক্‌ছন্দগুলিকে বলা হোত 'যোনি' বা কারণ (বীজ—'womb'), যাদের থেকে সুমিষ্ট স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। সামবেদভাষ্যে আচার্য সায়ণ উল্লেখ করেছেন: "ছন্দোনামকে গ্রন্থে নানাবিধানাম্ সাম্নাম্ যোনিভূতা এবর্চঃ পঠিতঃ"। পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের (১২।৬।৫) ভাষ্যেও তিনি লিখেছেন: "প্র-মংহিষ্ঠায় গায়ত ইতি যোনাবুৎপন্নম্ সাম প্র-মংহিষ্ঠা শব্দযোগাৎ প্র-মংহিষ্ঠায়াম্ তদত্র ঋচে কর্তব্যম্"। সামবেদের 'আর্চিক' বল্‌তে আমরা বুঝি ৫৮৫টী যোনি তথা সুর বা স্বরের কারণীভূত বীজ। সেই বীজগুলিকে চতুঃসারিযুক্ত বাণীবদ্ধ লাইন (single stanzas) বলা যায়; সেগুলির ওপর স্বর-সংযোজনা ক'রেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা সুরে গান করা হোত। কাজেই সামগানেও রূপভেদ ছিল ও তারা মোটামুটি তিন রকম শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: (১) গ্রামেগেয়গান, যাতে পূর্বার্চিকের ছিল সংযোজন, (২) অরণ্যেগেয়গান, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল আরণ্যক-সংহিতা, (৩) উহগান, যার অঙ্গীভূত ছিল উত্তরার্চিক।

গ্রামেগেয়গানকে বলা হোত 'যোনিগান', কেননা উহ ও উহ্যগানে যে সমস্ত কারণ (যোনি)-স্বরূপ ঋক্‌ছন্দ থাক্‌ত তারা ছিল গ্রামেগেয়-

১৫। Cf. ডাঃ উইণ্টারনিজ্: *A History of Indian Literature* (1927), Vol. I, pp. 166—167.

গানের অন্তর্ভুক্ত তা আগেও উল্লেখ করেছি। গ্রামেগেয়গানকে 'বেয়গান' অথবা 'বেগান'-ও বলা হোত, কারণ সেই গানগুলি শিক্ষা দেওয়া হোত অরণ্যেগেয়গানের পরে। অবশ্য এই অভিমতই পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী তাঁর 'ত্রয়ীটীকা'-গ্রন্থে (পৃ° ২০৫) প্রকাশ করেছেন। পূর্বার্চিকগুলিতে থাকে এক একটি মন্ত্র বা ঋক্ , সেগুলি আবার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের নামে নামকরণ করা হোত। সেই মন্ত্রগুলিই এক একটী 'সাম' বা সামগান এবং সেগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল গ্রামেগেয়গান ও অরণ্যেগেয়গানের মধ্যে।

সামগানের যোনিগুলি তিন অংশে বা ভাগে বিভক্ত: প্রথম অংশ গঠিত হোত ১—১১৪টী ঋক্ বা গানকে নিয়ে ও সেগুলি অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে উদ্‌গীত হোত; দ্বিতীয় অংশ ১১৫—৪৬৬ পর্যন্ত সামগুলিকে নিয়ে গঠিত ও তারা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে গীত হোত এবং তৃতীয় অংশ গঠিত হোত ৪৬৭—৫১৫ সংখ্যক সামকে নিয়ে এবং সেগুলি সোমদেবতার উদ্দেশ্যে গান করা হোত। তাছাড়া সমস্তগুলিকে আবার গানের ছন্দ-অনুসারে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হোত।

উত্তরার্চিকে একটী মাত্র মন্ত্র থাকৃত না, প্রগাথার সমষ্টিই ছিল তার প্রাণ। প্রগাথার পরিচয় দিতে গিয়ে আচার্য সায়ণ বলেছেন: "প্রকর্ষেণ গ্রন্থনম্ যত্র স প্রগাথাঃ"। ঋগ্বেদে এই প্রগাথার উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে—"বাচমষ্টাপদীং নবপদীম্" (ঋক্° ৮।৭৬।১২), "তিসৃভির্হি সামসম্মিতম্" (ঐতরেয়-ব্রা° ৩।২৩)। উত্তরার্চিকে ঋক্‌গুলি স্তোমের সংগঠনের জন্যে সাজানো থাকে এবং সেগুলির উদ্দেশ্য হোল—যাগে তাদের যথাযথ প্রয়োগ করা। সামগানগুলি যে কেবল সোমযোগেই গান করা হোত—তা নয়, অপরাপর যাগানুষ্ঠানেও তারা উদ্‌গীত হোত। প্রস্তোতৃরাই সামগান করতেন।

উহ্‌গানগুলি প্রায় উত্তরার্চিক ও গ্রামেগেয়গানেরই মতন ছিল। 'উহ্' অর্থে উপযোগী ক'রে সংযুক্ত করা ('উহতি'—adapts) বা স্মরণে রাখা।[১৬] উহগান আবার অরণ্যেগেয়গানের অনুরূপ স্বরে অথবা সুরে যজ্ঞবেদীর পাশে গান করা হোত। অবশ্য যে-যজ্ঞে এ'ধরণের উহগান উদ্‌গীত হোত

১৬। ডাঃ কালাণ্ড বলেছেন: "It is highly probable that amongst the Samavedic Brahmins in early times certain rules were established and handed down by oral tradition for the adaption (the *uha*) of the samans in the *grame-* and *araneygeyaganas*, * *."—Cf. *Panchavimsa-Brahmana* : *Introduction*, p. xiii.

সেগুলি সর্বসাধারণের জন্যে নির্বাচিত ছিল না। পুষ্পসূত্রে তাই বলা হয়েছে—"উহগীতৌ গ্রামগেয়বৎ উহ্যগান অরণ্যগেয়বৎ"।

ডাঃ উইণ্টারনিজ্ (M. Winternitz) সামবেদ-সংহিতা ও সামগানের রীতিনীতি ও স্বরূপ-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন:

"The best known of these, the Samaveda-Samhita of the Kauthumas, consists of two parts, the Arcika, the 'verse-collection' and the Uttararcika, the 'second verse-collection', Both parts consist of verses, which nearly all recur in the Rigveda. * * For in the Samveda, in the Arcika, as well as in the Uttararcika, the text is only a means to an end. The essential element is always the melody, and the purpose of *both* parts is that of teaching melodies."

সামবেদের আর্চিক বা পূর্বার্চিকে আছে ৫৮৫-টী ঋক্ এবং সেগুলির ওপর স্বর তথা সুর সংযোগ ক'রে গাওয়া হোত যাগযজ্ঞের উদ্দেশ্যে। প্রকৃতপক্ষে ঋক্‌গুলিই সামগানের বীজ বা কারণ (যোনি) এবং এ'সম্বন্ধে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পূর্বার্চিকের মতন উত্তরার্চিকেও আছে ৪০০-টী গান এবং প্রত্যেকটী গান রচিত হোত তিনটী ক'রে ঋক্ (stanzas) নিয়ে। ডাঃ উইণ্টারনিজ্ এ'সম্বন্ধে লিখেছেন,

"The first part of our Samaveda-Samhita, the Arcika, consists of five hundred and eighty-five single stanzas (*ric*) to which the various melodies (saman) belong, which were used at the sacrifice. The word *saman*, although frequently used for the designation of the text which had been either made or destined for singing, means originally only 'tune' or 'melody'. * * The stanza (*ric*) is therefore called the Yoni, *i. e.* 'the womb' out of which the melody came forth. * * The Arcika, then, is nothing but a collection of five hundred and eighty-five 'yonis' or single stanzas, which are sung to about double the number of different tunes. * * The Uttaracika, the second part of the Samaveda-Samhita, consists of four hundred chants, mostly of three stanzas each, out of which the stotras which are sung at the chief sacrifices are formed. * * A stotra then, consists of several, usually three stanzas, which are all sung to the same tune, namely to one of the tunes which the Arcika teaches. * * There are, attached to the Arcika, a Gramageyagana ('book of songs to be sung in the village') and an Aranyagana ('book of forest songs'). * * There are also two other books of songs, the Uhagana and Uhyagana. These were composed for the purpose of giving the Samans in the order in

which they were employed at the ritual, the Uhagana being connected with the Gramageyagana, the Uhyagana with the Aranyagana."[১৭]

সুতরাং গ্রামেগেয়গান ও অরণ্যেগেয়গান বৈদিক সামগান, তবে দুটীর মধ্যে প্রার্থক্য হোল: 'গ্রামেগেয়' গাওয়া হোত সাধারণ সমাজে, আর 'অরণ্যেগেয়' নির্বাচিত ছিল অরণ্যবাসী যাজ্ঞিকদের জন্যে, কেননা অরণ্যেগেয়গানকে মনে করা হোত অলৌকিক (mysterious) ও পবিত্র হিসাবে। তবে এ'দুটী গানই বৈদিক সমাজে একই সময়ে পাশাপাশি ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ গ্রামেগেয়গানকেও মর্যাদা দিল পরবর্তী সভ্যসমাজ, কারণ বিশেষ ক'রে সোমযজ্ঞের পরমপ্রিয় ছিল গ্রামেগেয়গান, আর অরণ্যেগেয়গান পরিগণিত হোল আদি অথবা প্রাচীন সঙ্গীত হিসাবে। কিন্তু দুটী গানকেই সমাজের ব্যবহারিক কাজে লাগানো হোত এ-কথা অধ্যাপক সাইমনও (Prof. Simon) স্বীকার করেছেন।

সুপ্রাচীন হিসাবে পরিগণিত অরণ্যেগেয়গান সম্বন্ধে সুপণ্ডিত বার্ণেল (A. C. Burnell) আর্ষেয়ব্রাহ্মণের মুখবন্ধে (*Introduction* (1876), p XXXV) অভিমত প্রকাশ করেছেন এই বোলে,

"The precise nature and function of the *Aranyegeyagana* seems yet undecided. May be, this appellation was given to these songs, because they were too archaic to be made any sense of even by the priests, who consequently, holding them as mystic and magical, reserved for charms, witchcrafts, medicine and other homely practices, which require privacy and are generally meant for plainer people, as opposed to the Soma sacrifices, which were meant for the rich lay sacrificers. It seems that the primitive Aryan used these magical songs, in order to control and make object to his will, spiritual agencies which he thought he could so control, which the more powerful spirits, *i. e.* the gods, he sought to propitiate by sacrifices, accompanied by *Gramegeya* songs, thus securing their assistence by winning their goodwill, since he thought, he had not the power to compel them. Thus while the *Gramegeyagana* is meant to be sung at Soma sacrifices, the *Aranyegeyagana* may have been originally meant to be sung at the charms."

মোটকথা উত্তরার্চিক যেমন পূর্বার্চিকের চেয়ে প্রাচীন, অরণ্যেগেয়গানও

১৭। (ক) Cf *A History of Indian Literature* (1927), Vol. I, pp. 165-167.

(খ) এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রামেগেয়গান ও অরণ্যেগেয়গানকে গ্রামগেয়গান ও অরণ্যগেয়গান বা আরণ্যগানও বলে।

তেমনি গ্রামেগেয়গানের চেয়ে প্রাচীন। তবে পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা উভয় গানই দাবী করত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেশীর ভাগ সময়েই যাগযজ্ঞের সঙ্গে বশীকরণ, রোগনিরাকরণ, মারণ, উচাটন প্রভৃতি 'Black Magic'-এর ছোঁয়াচ যোগ না করলে তার প্রাচীনতা প্রমাণ করার পক্ষে নিদর্শন খুঁজে পান না। আমরা স্বীকার করি যে, অথর্ববেদের কতক অংশ অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু তাই বোলে সকল বৈদিক যাগই ভৌতিক ও অলৌকিক মন্ত্র এবং অভিচারের সঙ্গে জড়িত ছিল না। দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হোত ঐহিক ও পারলৌকিক, পার্থিব ও অপার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ লাভ করার জন্যে। কাজেই গ্রামেগেয়গান সাধারণ সমাজের জন্যে নির্বাচিত থাকায় সামাজিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারই আসন শ্রদ্ধা পেয়েছিল ভারতীয় সমাজের বুকে, আর অরণ্যেগেয়গান আদর পেয়েছিল কেবল অরণ্যচারী অধ্যাত্ম শান্তিকামী ঋষি ও ঋত্বিকদের ভেতর, কেননা সে-গানের সঙ্গে যোগ ছিল পবিত্র যজ্ঞধূমের ও অপবার্থিব শান্তির, কাজেই তা যতই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে কুজ্ঝটিকাকৃত আজগুবী অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ বোলে মনে হোক না কেন, ভারতবাসীর কাছে চিরদিনই ছিল ও থাকবে অর্থপরিপূর্ণ এবং তীর্থরেণুর মতন পবিত্র ও স্বর্গীয়।

উত্তরার্চিকের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে অনেকে বলেন যে, সামবিধানব্রাহ্মণে নাকি উত্তরার্চিক, অরণ্যেগেয়গান ও উহগানের কোন উল্লেখ নেই, আছে মাত্র পূর্বার্চিক ও গ্রামেগেয়গানের। এই অভিমত পোষণ করেন পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গও (Prof. Oldenberg)। এই বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তের অনুগামী হয়ে তিনি বলেছেন যে, উত্তরার্চিক পূর্বার্চিকের পরবর্তী এবং শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলি এবং মশককল্প, লাট্যায়নের ও দ্রাহ্যায়ণের শ্রৌতসূত্র-গুলিও এমন কি পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। ডাঃ কালাণ্ড (Dr. Caland) পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গের মতবাদ সমর্থন করেছেন, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হোল ডাঃ কালাণ্ড পূর্বার্চিককে ঠিক প্রাচীন বলে স্বীকার করেন নি। ডাঃ কালাণ্ড পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের আলোচনায় (৪।৪।১) তাঁর মতবাদ সুপরিস্ফুট ক'রে বলেছেন যে, কতকগুলি ব্যাপারে বেশীর ভাগ মন্ত্র সোজাসুজি-ভাবে সংহিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। 'সম্ভার্য' শব্দটি থেকেও বুঝা যায় যে, বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অথবা অংশ থেকে বিচিত্র মন্ত্র চয়ন করা হয়েছিল যেগুলি

ক্রিয়া সামবেদের উপযোগী নয়,[১৮] কেননা উত্তরার্চিকে মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণভাবেই দেওয়া হয়েছিল একটার পর অপরটী সাজিয়ে এবং তা থেকেই বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণসাহিত্যের রচয়িতারা উত্তরার্চিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতেন না; সামগ বা সামগানকারীরাও জান্‌তেন মাত্র ঋগ্বেদকে, আর তাই ঋগ্বেদ থেকেই তাঁরা সামগানের মালমশলা জোগাড় করতেন। ডাঃ কালাণ্ড আরও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সাম-উদ্‌গাতারা মাত্র ঋগ্বেদের সঙ্গে পরিচিত থাকার জন্যে সোমযাগের গান ঋগ্বেদ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন।[১৯]

'আর্ষেয়কল্প' রচনা করেছিলেন ঋষি মশক। আবার ব্রাহ্মণ ও আর্ষেয়কল্পের

১৮। (ক) 'সম্ভার্য' সম্বন্ধে ডাঃ কালাণ্ড তাঁর 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ'-এর মুখবন্ধে (*Introduction*, Chapt. II, p. xv) উল্লেখ করেছেন: "The expression *sambharya* to denote a complex of verses to be taken from different parts of the Veda occurs thrice in the *Brahmana*: XI. 1. 5; XVI. 5. 11 and XVIII. 8. 8. This expression is simply incomprehensible from a Samavedistic standpoint, because in the *uttararcika* they are given as a whole, all after one another, but from a Rigvedistic standpoint they are truly *sambhary's*". (খ) Vide also 'ঋক্‌তন্ত্রম্‌'—*Introduction*, p. 24.

১৯। ডাঃ কালাণ্ড তাঁর 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ'-এর মুখবন্ধে (*Introduction*, chapt. II., pp. XIV—XV) বলেছেন: "This question is: 'was the *purvacika* or was the *uttararcika* the older part?' Scholars are at variance. I myself maintained that the *uttararcika* must be regarded as prior the *purvarcika*, chiefly on the argument that a collection of verses on which the Samans had to be chanted (as is the *uttararcika*) must have been *a priori* older than a collection of verses that served to register the melodies on which these verses had to be chanted (as is the *purvarcika*). Oldenberg, on the other hand, has made it appear that the *purvarcika* (together with the *aranyaka* part) was the older part, because this part only is mentioned in the *vratas*, and, moreover, the *uttararcika* is nowhere quoted in the *Samavidhana-brahmana*. I add to this that even so late a work as the *Atharvaparisista* mentions (46. 3. 6) as last verse of the Samaveda the last but one of the *purvarcika* (*viz*. SV. 1, 548). Convinced by Oldenberg's strong arguments, I thereupon proposed to formulate the facts thus: that from the oldest times on the chanters must have had at their disposal a certain collection of *tristichs* and *pragathas*, that served them at the Soma-rites for chanting after their melodies; that this collection might have been the fore-runner of the *uttararcika* as it is known to us nowadays" (Italics are ours).

ওপর ভিত্তি ক'রে ঋষি লাট্টায়ন ও দ্রাহ্যায়ণ তাঁদের শ্রৌতসূত্র রচনা করেছিলেন। তখন একমাত্র উত্তরার্চিকেরই অস্তিত্ব ছিল ও সেগুলি এমনি সুসংযতভাবে সাজানো ছিল যে, সোমযাগেই গান করা হোত।

শুধু তাই নয়, ডাঃ কালাণ্ড আরো অনুমান করেছেন যে, সোমযাগের প্রারম্ভ থেকে সামগরা ত্রিঋক্ ও প্রগাথার ওপর স্বর লীলায়িত ক'রে গান করতেন, কাজেই গানে একঘেয়ে ভাবের (monotonous) চেয়ে বৈচিত্র্যেরই স্থান ছিল। কিন্তু ডাঃ কালাণ্ডের এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে সঠিক বোলে গ্রহণ করতে আমরা অক্ষম। অধ্যাপক সূর্যকান্ত শাস্ত্রীও ডাঃ কালাণ্ডের অভিমত বা সিদ্ধান্তগুলিকে সঠিক বোলে স্বীকার করেন নি, বরং তিনি বলেছেন,

"But this is erroneous, and although native scholars are unanimous in prescribing the use of triplets at the Soma sacrifices, yet there seems nothing to prevent us from assuming, that in earlier times, when the sacrifice was yet in its crude form, the priests sang their melodies on solo verses, and that with the growth of the ritualism the idea of using triplets arose, the two stages of development being successively recorded in the *Purvarcika* and *Uttararcika.* That is actually happened so, will be clear from the *RV.* (1. 164. 24) :

গায়ত্রেণ প্রতিমিমীতে অর্কমর্কেণ সাম ত্রৈষ্টুভেন বাকম্।
বাকেন বাকম্ দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমীতে সপ্ত বাণীঃ॥

"Sayana raises the following discussions on 'অর্কেণ সাম'। 'অর্কেণ সাম, উক্তলক্ষণেন মন্ত্রেণ সাম, গায়ত্ররথন্তরসংজ্ঞাকম্ সাম প্রতিমিমীতে'। Thus the question of the priority of the *Purvarcika* to *Uttararcika* is settled once for all, and so far we perfectly agree with Oldenberg"[২০]

শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীজি পরিশেষে বলেছেন, মনীষী ওল্ডেনবার্গ নিজেও প্রথমতঃ স্বীকার করেছেন যে, ব্রাহ্মণসাহিত্য সৃষ্টি হবার আগে থেকে সোমযাগ বৈদিক সমাজে অনুষ্ঠিত হোত এবং দ্বিতীয়তঃ ত্রি-ঋক্‌যুক্ত প্রগাথাকে স্বরযোগে গান করা হোত; কাজেই একথা ঠিক যে, সাধারণতঃ ডাঃ কালাণ্ড, ওল্ডেনবার্গ-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উত্তরার্চিককে যে পরবর্তী রচনা বলেছেন তা মোটেই সত্য নয়, বরং উত্তরার্চিক পূর্বার্চিক ও এমন কি ব্রাহ্মণসাহিত্য ও শ্রৌতসূত্র

২০। Cf. *Riktantram* (সূর্যকান্ত শাস্ত্রী, এম. এ., কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৩৩), p. 26.

প্রাকৃতি রচিত হবার আগেও ছিল : "Thus we have seen that the *Uttararcika*, which was later than the *Purvarcika*, was yet older than the *Brahmana* and the *Sutra* works"[২১]

অধ্যাপক সূর্যকান্ত শাস্ত্রী 'ঋক্‌তন্ত্রে'-এর মুখবন্ধে (*Introduction*, p. 31) বৈদিক সঙ্গীতের কারণগ্রন্থ সামবেদের বিকাশ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনটী ক্রমবিকাশের ভেতর দিয়ে সামবেদ এবং সামগান সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অনেকের মতে বিকাশের স্তর চারটী। তবে মোটামুটি তিনটী অথবা চারটী বিকাশের স্তর যথা,

১। স্তোভ...............	১। এই 'স্তোভ' সম্বন্ধে অক্ষরতন্ত্রে ও সংজ্ঞাকরণে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা আছে।
২। ঋক্ বা ঋক্‌মন্ত্রগুলিকে স্বরের মাধ্যমে গানে রূপায়িত করা।	২। এসম্বন্ধে সামতন্ত্রে বিশদভাবে উল্লিখিত আছে। 'সামতন্ত্র' একটী ব্যাকরণের মতন নিয়মগ্রন্থ মাত্র। এতে মন্ত্রগুলি অথবা পদগুলি যেভাবে সামগানে রূপান্তরিত ও গান করতে হবে সে সম্বন্ধে দেওয়া আছে।
৩। গান ছাড়া সামগুলিকে আবার পদে রূপান্তরিত করা।	....

২১। (ক) ঐ, পৃ: ২৮

(খ) ডা: কালাণ্ড তাঁর 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ'-এর মুখবন্ধে (*Introduction*, Chapt. II, p. xv) উল্লেখ করেছেন : "From the passage in the Brahmana IV. 2. 19, where a *jarabodhiya-saman* is mentioned, to be chanted on SV. I. 25 (=II· 733-735) it seems right to infer, that the *uttararcika* was later than the *Brahmana*." এছাড়া ডা: কালাণ্ড এর আগেও ভূমিকার XV পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন : "To state it directly at the beginning of my argumentation, this is my hypothesis : the author of the *Brahmana* was not acquainted to with our *uttararcika*, it did not exist at his time, but the chanters drew the verses they wanted, directly from the *Riksamhita*, and the *uttararcika* was composed in later times, in order to have at hand, in the regular order of the sacrifices, the verses that were wanted" (Italics are ours).

৪। আর্চিক প্রভৃতি মন্ত্রের পদগুলিকে সংহিতায় পরিবর্তিত করা।	৪। ঋক্‌তন্ত্রে এসম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। ঋকতন্ত্রে কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে যেগুলির দ্বারা সামবেদের পদগুলিকে সংহিতায় রূপান্তরিত করা যায় এবং সেদিক থেকে একে প্রাতিশাখ্যই বলা যায়।

ঋক্‌গুলি থেকে সাম তথা সামগান রচনা সম্বন্ধে আচার্য শবর স্বামী জৈমিনীয়সূত্রের ভাষ্যে (৯।২।২৯) উল্লেখ করেছেন: "সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ। আহক ইমে গীত্যুপায়া নাম? উচ্যতে গীতির্নাম ক্রিয়া হ্যাভ্যন্তর-প্রযত্নজনিতস্বরবিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা, সামশব্দাভিলপ্যা। সা নিয়ত প্রমাণা, ঋচি গীয়তে। তৎসম্পাদনার্থোঽয়মৃগক্ষরবিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভ ইত্যেবমাদয়ঃ সর্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে"।[২২]

আচার্য সায়ণও সামবেদের ভাষ্যে (মুখবন্ধে) উল্লেখ করেছেন: "সামশব্দবাচ্যস্য গানস্য স্বরূপং ঋগক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈরক্ষর-বিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে"।

সামগানের স্বর ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, আতিস্বার্য। ডাঃ বার্ণেল 'আর্ষেয়ব্রাহ্মণ'-এর মুখবন্ধে (*Introduction* XLIII) ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বা অন্ত্য এই নাম ব্যবহার করেছেন। শ্রদ্ধেয় সূর্যকান্ত শাস্ত্রী মনীষী বার্ণেলের প্রসঙ্গক্রমে স্বর-সম্বন্ধে বলেছেন: "* * which partly correspond to the sadjadi seven svaras of usual music"। প্রকৃতপক্ষে 'partly correspond' বলাও কঠিন, কেননা নারদীশিক্ষায় নারদ "যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে সামগানের স্বরস্থানের সঙ্গে লৌকিক মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের স্বরস্থানের যে পরিপূর্ণ সাদৃশ্য বা ঐক্য

২২। এবিষয়ে অক্ষরবিকার, অক্ষরবিশ্লেষ, অক্ষরবিকর্ষণ ও স্তোভ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। অক্ষরবিকার-সম্বন্ধে পুষ্পসূত্র ৮।৮৭, অক্ষরবিশ্লেষ-সম্বন্ধে পুষ্পসূত্র ৬।১৫৩, অক্ষরবিকর্ষণ-সম্বন্ধে পুষ্পসূত্র ৭।১ দ্রষ্টব্য। 'স্তোভ' অর্থে—গানে (সামগানে) ভিন্ন ভিন্ন শব্দ (স্বর), বর্ণ ও কখনো কখনো সমগ্র বাক্য বা পদকে অন্তরনিবিষ্ট করা। আচার্য সায়ণ আবার 'স্তোভ' অর্থে বলেছেন—"কালক্ষেপমাত্রহেতুং শব্দরাশিং স্তোভ ইত্যাচক্ষতে"। অবশ্য এ-সম্বন্ধে আগেও আলোচিত হয়েছে।

দেখিয়েছেন, তাতে ক'রে partly, অর্থাৎ আংশিক ঐক্যের কথা ঠিক মনে হয় না, বরং বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের পুরোপুরি মিল উভয়ের স্বরস্থানে পাওয়া যায়। অবশ্য শিক্ষাকার নারদের কথা মেনে নিয়ে এই স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করতে আমরা সাহসী হচ্ছি, নচেৎ প্রাচীন বৈদিক সামসঙ্গীতের স্বররূপের পরিচয়ও আমরা সাক্ষাৎভাবে এখনো-পর্যন্ত পাইনি।

মনীষী বার্ণেল প্রথমাদি স্বরগুলিকে 'প্রকৃতি' স্বর হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন এবং 'বিকৃতি' সাত স্বর প্রকৃতি থেকে ভিন্ন; তাদের নাম প্রেঙ্খ, নমন, কর্ষণ, বিনত, অত্যুৎক্রম ও সম্প্রসারণ। এছাড়া ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১২।১) বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত এই সাত স্বরের পরিচয় পাই এবং আগেই অভিনিহিত, প্রাশ্লিষ্ট, জাত্য, ক্ষৈপ্র, পাদবৃত্ত, তৈরব্যঞ্জন ও তিরোবিরাম এই সাতটী স্বরের উল্লেখ আমরা করেছি। অবশ্য প্রথমাদি স্বরই সামগানের প্রধান আশ্রয়। তবে সকল বৈদিক শাখাই যে সম্পূর্ণ সাতস্বর সামগানে ব্যবহার করতেন তা নয়, পুষ্পসূত্রকার পুষ্পর্ষি ও শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন যে, কৌথুম ও রাণায়নীয়েরা গানে সাতস্বর ব্যবহার করতেন, কিন্তু জৈমিনীয়েরা করতেন ছ'টী স্বর ও অপরাপর শাখারা ব্যবহার করতেন পাঁচ স্বর তাদের গানের মধ্যে।

ডাঃ বার্ণেল (A. C. Burnell, Ph. D.) সামগান নিয়েও আলোচনা করেছেন[২৩] এবং তাঁর প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। সামগান যে অত্যন্ত প্রাচীন একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন : "I think it will be found sufficient to show what the *oldest* Indian Music was." তাঁর অনুসন্ধানের মালমশ্‌লা ছিল যতটুকু দেখা যায়— ডাঃ হগ্‌, অধ্যাপক রথ্‌ ও মাননীয় জার্মাণ (Dr. Haug, Prof. V. Roth, J. German) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের করা ভারতীয় বৈদিক-সাহিত্যের কয়েকখানি ইংরেজী অনুবাদ। তবে ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি মূল গ্রন্থ নিয়ে কতটুকু তিনি আলোচনা করেছেন তা আমাদের সঠিক জানা নেই।

২৩। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-সংকলিত *Indian Music by Various Authors*, pt. II (pp. 407—412)-এ ডাঃ বার্ণেল "The Saman Chants" সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

ডাঃ বার্ণেল বলেছেন: "The foundation of these Chants unquestionably very old"। এই Chants অর্থে সামগান বুঝায়। সামগানের আলোচনায় তার প্রাচীনত্বের কৌলীন্য তিনি রক্ষা করেছেন সত্য, কিন্তু সমগ্র ও সুপরিস্ফুটভাবে আলোচনা ও অনুশীলন তিনি করেন নি।

ডাঃ বার্ণেল সামগান-সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে প্রথমেই স্বরলিপির (Notation) ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন বেশী। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য সংগৃহীত স্বরলিপির পাণ্ডুলিপিই (Manuscripts) তাঁকে এদিক দিয়ে বেশী সাহায্য করেছে।

সামগানে স্বরের প্রয়োগ-ব্যাপারে তিনি সামবিধানব্রাহ্মণ, আর্ষেয়ব্রাহ্মণ ও নারদীশিক্ষার ইংরেজী অনুবাদের সহায়তা নিয়েছেন বিশেষ কোরে! আর্ষেয়ব্রাহ্মণের ওপর সায়ণাচার্যের ভাষ্যের উল্লেখও তিনি এক জায়গায় করেছেন এবং বলেছেন: সামবিধানে হয়েছে স্বর আরম্ভ যেমন 'ক্রুষ্ট' থেকে, আর্ষেয়-ভাষ্যে তেমনি আরম্ভ হয়েছে 'প্রথম' থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন: 'These again partly correspond to the *shadja*, *rishabha*, *gandhara*, *madhyama*, *panchama*, *dhaivata* and *nishada* of usual music"

কিন্তু ডাঃ বার্ণেল তাঁর সামগানের আলোচনায় বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেন নি। তিনি আগাগোড়া আচার্য সায়ণকেই অনুসরণ করেছেন, নারদের কথা উল্লেখও করেন নি। কিন্তু আচার্য সায়ণের স্বর-বিভাগ সম্পূর্ণ আধুনিক; প্রাচীনতার দিক দিয়ে নারদের বিভাগই বরং বেশী আদরণীয়। নারদ সামগানের স্বরবিকাশ অবরোহণ-গতিতে (downward movement) দিয়েছেন, আর আচার্য সায়ণ করেছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ আরোহণ-গতিতে। ডাঃ বার্ণেল কিন্তু এ-সকল বিভাগ বা বিকাশ-বৈচিত্র্যের কোন উল্লেখ করেন নি।

ডাঃ বার্ণেল উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের সকল-কিছু বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেন নি। আধুনিক সাত স্বরের উৎপত্তির কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু কেমন ক'রে বিকাশের ভেতর দিয়ে সাত স্বরের সৃষ্টি হোল তার কোন সন্ধান তিনি দিতে পারেন নি। তিনি হাগ্‌ব্যাণ্ড (Hugband, 840-930 A. D.) গ্রিগোরিয়ান 'Plain

Chant'-এর সঙ্গে উদাত্তাদি তিন স্বর থেকে যে সাত স্বরের উৎপত্তি হয়েছে তার একটা তুলনামূলক নাজির দিয়েছেন মাত্র। যেমন,

(ক) হাগ্‌ব্যাণ্ডের স্বরবিভাগ :

So, La, Si, Ut	Ri, Mi, Fa, Sol
grades	*finales*
La, Si, Ut, La	Mi, Fa, Sol, La
Superiores	*excellents*

(খ) ভারতীয় স্বরবিভাগ :

উদাত্ত	অনুদাত্ত	স্বরিত
নিষাদ, গান্ধার	ঋষভ, ধৈবত	ষড়্‌জ, মধ্যম, পঞ্চম

এখানে ডাঃ বার্ণেলের তুলনামূলক প্রচেষ্টার মধ্যে সার্থকতা কতটুকু তা আমরা বলতে পারিনে, কেননা হাগ্‌ব্যাণ্ডের gardes, finales, superiores এবং excellents—এই চারটী ভাগ ভারতীয় উদাত্তাদি বা মন্দ্র, মধ্য ও তারের মধ্যে সামান্য-কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তা কেবল উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্বরের উচ্চারণের দিক থেকেই করা হয়েছে, নচেৎ হাগব্যাণ্ডের বিভাগে একই স্বরের বার বার প্রয়োগ আছে, কিন্তু বৈদিক উদাত্তাদির বেলায় তা নাই।

ডাঃ বার্ণেল প্রকৃতি ও বিকৃতি স্বর নিয়েও যে সামান্য আলোচনা করেছেন তা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। তবে—প্রকৃতি প্রেঙ্খ, নমন, কর্ষণ, বিনত প্রভৃতি সাত স্বরকে তিনি 'purely modern' বলেছেন। তাঁর মতে 'বিনত' গ্রামগেয়গানে আর 'প্রেঙ্খ' উহগানে ব্যবহৃত হত : "*Vinata* occurs in the Gramegeyagana, *Prenkha* is put in the *Uha*"। অত্যুৎক্রম ও সম্প্রসারণ স্বরের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সামগানে যে "হুম্‌" শব্দ ব্যবহৃত হোত তাকে তিনি হিঙ্কারেরই নামান্তর বলেছেন। 'পুষ্পসূত্র'[২৪] থেকে শাখাভেদে স্বরপ্রয়োগের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

ডাঃ বার্ণেলের সাধু প্রচেষ্টার আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু সামগান নিয়ে যতটুকু আলোচনা তিনি করেছেন তার ঐতিহাসিক মূল্য খুব কমই বলতে হবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভেতর ফক্স্‌ ষ্ট্র্যাঙ্‌গয়েজ (Fox Strangways) সামগান নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তারও ঐতিহাসিক মূল্য বেশী নয়।

২৪। 'পুষ্পসূত্র' সামবেদের প্রাতিশাখ্য। ডাঃ বার্ণেল বোধ হয় ভুলক্রমে 'পুষ্প' শব্দ থাকার জন্যে "ফুলসূত্র" বোলে উল্লেখ করেছেন।

ঋক্‌তন্ত্রের আলোচনায় এতক্ষণ আমরা বেদের প্রাতিশাখ্যগুলিতে গান ও স্বরের কাহিনী সম্বন্ধেই আলোচনা করলাম। প্রকৃতপক্ষে ঋক্‌তন্ত্রের ভেতর বৈদিক সামগানের যতটুকু মালমশলা পাওয়া যায় তা অতি সামান্য। ঋক্‌তন্ত্রের প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ প্রপাঠক তিনটীতে মাত্র আলোচনা করা হয়েছে নাদ তথা শব্দ, গাথা, সাম, উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর সম্বন্ধে। যেমন,

(১) শ্বাসো নাদ ইতি শাকটায়নঃ।—১ম প্রপাঠক

(২) গাথাসু চ।

গাথাসু চ দ্বিমাত্রমন্তরং (নিত্যবিরেতি) ভবতি।—৪র্থ প্রপাঠক

(৩) ত্রিমাংত্র সমাসু।৯

ত্রিমাত্রমন্তরং সামসু বেদিতব্যং ভক্ত্যন্তেষু।

(৪) উদাত্তমুৎ॥১

উদাত্তমুৎসংজ্ঞং ভবতি। উচ্চমিত্যর্থঃ।—৬ষ্ঠ প্রপাঠক

(৫) আদ্যর্ধমাত্রা স্বরিতম্।৩

আদ্যার্ধমাত্রা উৎসংজ্ঞা ভবতি। তৎ স্বরিতং নাম।

'স্বরিত' স্বরটী-সম্বন্ধে বৃত্তিকার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীজি উল্লেখ করেছেন: "Svarita is nothing but a combination of *udatta* and *anudatta*, and its first half mora which is *udatta* is called *svarita*, the rest *prachaya* of the chandogas. Cf.

অত উর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যার্চিকং তু স্বরত্রয়ম্।
উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ তৃতীয়ঃ প্রচয়স্বরঃ॥"

বৃত্তিকার 'স্বরিতনিরূপণম্' বিশ্লেষণ-পর্বায়ে স্বরিতের রূপ নির্ধারণ করতে অনুদাত্ত, উদাত্ত ও প্রচয় স্বর তিনটীরও পরিচয় দিয়েছেন। সুদীর্ঘ আলোচনার পর তিনি উদাত্তের প্রথম অর্ধমাত্রাকেই 'স্বরিত' স্বর হিসাবে স্বীকার ক'রে বলেছেন যে, 'স্বরিত' বল্‌তে এছাড়া আর অন্য কোন স্বর নয়—"তস্মাদাদ্যার্ধমাত্রোদাত্ত এব স্বরিতঃ। ন স্বরিতং নাম স্বরান্তরমস্তীতি"।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত

প্রাতিশাখ্যের বিষয় শিক্ষা, ছন্দ ও ব্যাকরণকে নির্ণয় করা। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে, 'প্রাতিশাখ্য' শব্দের দ্বারা কেবল 'শিক্ষাশাস্ত্র' বুঝায়, কিন্তু ভাষ্যকার উবট তা স্বীকার করেন না, উবটের মতে—শিক্ষা, ছন্দ ও ব্যাকরণ এই তিনটীই প্রাতিশাখ্যের দ্বারা বুঝায়।

ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য বা ঋক্‌প্রাতিশাখ্য বেশীর ভাগ ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দেই লেখা।[১] জার্মাণ অধ্যাপক রেগ্‌নিয়ার (Prof. Regnier), অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার ও মোক্ষ-মূলারের মতে—ঋক্‌প্রাতিশাখ্যটী একজন গ্রন্থকারের দ্বারা লেখা নয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় রচনা করেছিলেন। অবশ্য এই অভিমতটী প্রথমে প্রকাশ করেন অধ্যাপক রেগ্‌নিয়ার। আসলে ঋষি শৌনকই ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের রচয়িতা এবং এই অভিমত বেশীরভাগ পণ্ডিত স্বীকার করেন। ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ ঋক্‌প্রাতিশাখ্য-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

"Saunaka, the author of the Rikpratisakhya (and Book V of the Aitareya-Aranyaka), should have been one of the last pre-Paninean writers on grammar, and his is certainly the earliest Pratisakhya."[২]

তিনি আরো বলেছেন, প্রাতিশাখ্যের আসল উদ্দেশ্য হোল: পদপাঠ ও সংহিতাপাঠের মধ্যে সত্যিকারের প্রতীয়মান প্রার্থক্যকে নির্ধারণ করা, আর এজন্যেই প্রাতিশাখ্য তার প্রসঙ্গ আরম্ভ করে এই আক্ষেপ ক'রে যে, পদপাঠ হোল 'প্রকৃতি' ও সংহিতা 'বিকৃতি'। মোটকথা প্রাতিশাখ্যের

১। ছন্দ সাতটী—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্ বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, জগতী ও ত্রিষ্টুপ্—"গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্‌বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্‌জগতীত্যেতানি সপ্ত ছন্দাংসি। চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী। ততোঽপি চতুর্ভিরক্ষরৈরধিকা অষ্টাবিংশত্যক্ষরা উষ্ণিক্।"—'বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ' (কাশী সং ১৯৩৪), পৃঃ ৪৬

২। (ক) Cf. *B. C. Law Volume*, pt. I (1945), p. 343.

(খ) অবশ্য ডাঃ ঘোষ মোক্ষ-মূলার, গোল্ডষ্টুকার প্রভৃতির মতন ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা বোলে স্বীকার না করলেও তার অধ্যায়গুলির পরস্পরের মধ্যে যে সময়ের পূর্বাপর ব্যবধান আছে একথা তিনি প্রকাশ করেছেন—"Particularly for the Rikpratisakhya it is important to note that its last eight Patalas are certainly later than the first ten."

আসল কাজই হোল পদপাঠ ও সংহিতার মধ্যে পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করা, আর তাই সে সন্ধি, মাত্রা, ছন্দ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, বিশেষ ক'রে অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীরও পরবর্তী বলেন, কারণ ব্যাড়ি, ব্যালি বা দাক্ষ্যায়ণ যে পাণিনীয় সূত্রের ওপর 'সংগ্রহ' রচনা করেছিলেন তার উল্লেখ ঋষি শৌনক তাঁর ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার তা স্বীকার করেন নি কেন তা 'ঋক্‌তন্ত্রে সঙ্গীত' আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি। আসলে বৈদিক ব্যাকরণ প্রাতিশাখ্যগুলির মধ্যে ঋক্‌প্রাতিশাখ্যই প্রাচীন। তবে প্রাতিশাখ্যে সঙ্গীতের আলোচনায় আমরা সকলের চেয়ে প্রাচীন ঋক্‌-প্রাতিশাখ্যের প্রসঙ্গ প্রথমে না ক'রে তার স্থানে ঋক্‌তন্ত্রের আলোচনা করেছি এজন্যে যে, প্রাতিশাখ্যের বিষয়বস্তু ঋকতন্ত্রে বেশী, তাতে পাঠক-পাঠিকাদের আলোচনায় প্রবেশের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হবে।

ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে আঠারটী পটল আছে; তারা আবার তিনটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটী পটল ভিন্ন ভিন্ন বর্গে ভাগ করা; প্রত্যেকটী বর্গে আবার পাঁচটী ক'রে পরিচ্ছেদ আছে। ভাষ্যকার উবটের মতে, ঋক্‌ভাষ্যের শেষের দশটী পরিচ্ছেদের কোন ঐতিহাসিকতা নেই, অর্থাৎ ঐ দশটী পরিচ্ছেদ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী যুগে, সুতরাং তাদের প্রামাণ্যের অভাব আছে। অবশ্য এবিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমতও আমরা উল্লেখ করেছি।

পণ্ডিত বিষ্ণুমিত্র তাঁর দু'টী বর্গবৃত্তিতে উল্লেখ করেছেন যে, বেদাভ্যাস পাঁচ রকমভাবে বিহিত: অধ্যয়ন, বিচার, অভ্যসন, জপ ও অধ্যাপন। বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে বেদসাহিত্যের যখন পঠনপাঠন ছিল তখন গোড়ার দিকে মুখে মুখে পাঠাভ্যাসের ছিল প্রচলন, পাঠ ও আবৃত্তি দ্বারাই বেদার্থ বা বেদজ্ঞান লাভ করা যেত। এজন্যেই বিষ্ণুমিত্র বেদাভ্যাসের কথা উল্লেখ করেছেন প্রাতিশাখ্য-আলোচনার মুখবন্ধে।

বিষ্ণুমিত্র পর, অবর ও পরাবর ব্রহ্মের তিনটী রূপ বা বিকাশের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য পরে প্রথম শ্লোকের তিনি পুনরুল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভই মানুষের চরমলক্ষ্য, কিন্তু সেই লাভ শব্দব্রহ্মের সম্যক্‌ জ্ঞান ছাড়া হয় না, তাই পরমব্রহ্মের উপলব্ধির আগে শব্দব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করা চাই। তিনি উল্লেখ করেছেন—"ইতি শব্দব্রহ্মজ্ঞানপূর্বকং পরং ব্রহ্মজ্ঞানম্"।

অর্থাৎ ঋষিরা বেদের আত্মা বলতে বলেছেন—"বেদাত্মা বেদসিদ্ধিঃ পরমার্থঃ পরমং আদিদেব ইত্যেবমাদিভিঃ"। বেদকে জানতে গেলে বেদের আত্মা-রূপ ব্রহ্মকে জানতে হবে; মন ও প্রাণের সংযোগে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

ঋষি শৌনক ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের "এতে স্বরাঃ" এই ৩য় সূত্রে স্বরের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষ্যকার উবট 'স্বর' বলতে বলেছেন—"স্বর্যন্তে শব্দ্যন্ত ইতি স্বরাঃ", যেমন অ, আ, ই ঈ প্রভৃতি। এই স্বর হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তিন রকম। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ২৭ থেকে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'হ্রস্ব'-স্বর বলতে যা একমাত্রা কাল থাকে, দু'মাত্রা কাল স্থায়ী স্বর 'দীর্ঘ' এবং তিন মাত্রা কালস্থায়ী 'প্লুত'-স্বর। এছাড়া অর্ধমাত্রা কালস্থায়ী স্বরও আছে। তৃতীয় পটলের প্রথম সূত্রে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উবট বলেছেন—"উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সংক্ষেপতঃ স্বরাস্ত্রয়ো বেদিতব্যাঃ"। এখানে 'স্বর' অর্থে অক্ষর, কেননা তার পরের সূত্রে শৌনক বলেছেন—"অক্ষরাশ্রয়াঃ", অর্থাৎ "স্বরোঽক্ষরমিত্যুক্তম্", স্বরকেই অক্ষর বলে, সুতরাং উদাত্তাদি স্বর তিনটিও অক্ষরের আশ্রয়ভূত। এছাড়া বৈদিক জাত্য (৩।৮), ক্ষৈপ্র, অভিনিহিত (৩।১৩) তৈরোব্যঞ্জন (৩।১৮), প্রচয় (৩।১৯) প্রভৃতি স্বরেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বেশীর ভাগ শিক্ষাতেই এই ক্ষৈপ্রাদি বৈদিক স্বরগুলির উল্লেখ আছে। পুনরায় ৩।৩৪ শ্লোকে জাত্য, অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট প্রভৃতি স্বরগুলি যে উচ্চারণকালে কম্পিত হয় ("এতে স্বরাঃ প্রকম্পন্তে") তার উল্লেখ করা হয়েছে। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ত্রয়োদশ পটলের প্রথম শ্লোকে পঞ্চবায়ুর বিবরণ আছে,

> বায়ুঃ প্রাণঃ কোষ্ঠ্যমনুপ্রদানং কণ্ঠস্য খে বিবৃতে সংবৃতে বা।
> আপদ্যতে শ্বাসতাং নাদতাং বা বক্ত্রীহায়াম্ ॥

নাভিতে প্রাণবায়ুর স্থিতি। শ্বাস ব্যাহত হোলে 'নাদ' তথা শব্দের সৃষ্টি হয়—"শ্বাসং নাদমাপদ্যতে"। 'নাদ' অর্থে শব্দ। দার্শনিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে নাদ পরে শব্দব্রহ্মে পরিণত হয়েছে। গোড়ার দিকে, অন্তত ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যের সময়েও 'নাদ' অর্থে শ্বাস বা বাতাসের দ্বারা আহত শব্দকেই বুঝাতো। পরে আন্তর অনুভূতির মাধ্যমে কারণব্রহ্মে তা রূপায়িত হয়েছিল।

ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ত্রয়োদশ পটলের ৪২ থেকে ৫০ শ্লোকগুলিই সঙ্গীতের

উপাদান যুগিয়েছে, তাই সেগুলিই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করব। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার শৌনক উল্লেখ করেছেন,

ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমং চ
স্থানান্যাহুঃ সপ্তযমানি বাচঃ ॥

ভাষ্যকার উবট বলেছেন: "বাচস্ত্রীণি স্থানানি সপ্তযমানি সপ্তযমা যেষু স্থানেষু তানি সপ্তযমান্যাহুরাচার্যাঃ। তেষু মন্দ্রমুরসি বর্ততে। মধ্যমং কণ্ঠে বর্ততে। উত্তমং শিরসি বর্ততে। এতানি স্থানানি স্বরবিশেষণান্যপি ভবন্তি। যথা মন্দ্রো স্বরেণাধীয়তে। মন্দ্রয়া বাচা প্রাতঃসবনে শংসেৎ। উরসাধীয়ত ইতি"।

মন্দ্র, মধ্য ও উত্তম অথবা মন্দ্র (খাদ), মধ্য ও তার (উচ্চ)—যা পরবর্তীকালে সঙ্গীতে উদারা, মুদারা ও তারা এই তিন স্থানরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাত্ত, স্বরিত ও অনুদাত্ত এই তিনটী বৈদিক গানে স্বর-রূপে ব্যবহৃত হোলেও পরেকার যুগে মন্দ্র, মধ্য ও তার 'স্থান'-হিসাবে যে পরিণত হয়েছে একথা তাদের উচ্চারণ ও ব্যবহারভঙ্গী দেখ্‌লেই স্পষ্ট বুঝা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, পাণিনি, নারদীয়, মাণ্ডুকী, লোমশী প্রভৃতি শিক্ষাগুলিতে এদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাষ্যকার উবট মন্দ্র বা খাদ স্বরের স্থান 'উরস্‌'-এ ("উরসি"), মধ্যম বা মধ্যের স্থান 'কণ্ঠ'-এ এবং উত্তম বা তারের স্থান 'শির'-এ নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাভিদেশে, কণ্ঠে ও তালুমূলেই এই তিনটী স্বরের স্থিতি গণ্য হতে পারে।

ভাষ্যকার উবট নিজেই "কে তে যমা নাম" ইত্যাদি উল্লেখ ক'রে যমের পরিচয় জান্‌তে চেয়েছেন। সূত্রকার বলেছেন,

সপ্ত স্বরা যে যমাস্তে।

'যম' বল্‌তে স্বর বুঝায়। স্বরসংখ্যা সাতটি ও তাদের নাম ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি লৌকিক স্বর। ভাষ্যেও বলা হয়েছে—"যে তে সপ্ত স্বরাঃ—ষড়্‌জঋষভগান্ধারমধ্যমপঞ্চমধৈবতনিষাদাঃ স্বরাঃ, ইতি গান্ধর্ববেদে সমাম্নাতাঃ। তথা সামসু—ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যাঃ (Cp. তৈ' প্রা' ২৩।১২) ইতি তে যমা নাম বেদিতব্যাঃ"।

এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভাষ্যকার উবট "যে তে সপ্ত স্বরাঃ" উল্লেখ ক'রে লৌকিক বা মার্গ-সঙ্গীতের ষড়্‌জাদি সাত স্বরের উল্লেখ

করেছেন ও পরে "তথা সামসু" কথাগুলির অবতারণা ক'রে বৈদিক সামগানের ক্রুষ্টাদি সাতস্বরেরও পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, উবটের সময়ে সমাজে লৌকিক স্বরেরই মাত্র প্রচলন ছিল এবং সামগান কদাচিৎ যাগযজ্ঞে গীত হোত। তাছাড়া তিনি লৌকিক মার্গ-স্বরের ও বৈদিক সাম-স্বরের উল্লেখ করলেও তাদের উভয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক তার কোন উল্লেখ করেন নি। আমাদের মনে হয়, প্রাতিশাখ্য যখন বেদ অথবা বেদশাখাদের শিক্ষা, ছন্দ ও ব্যাকরণ নির্ধারণ ক'রে থাকে তখন প্রাচীন ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে উল্লিখিত "যমাঃ" অর্থে বৈদিক সাতস্বর ক্রুষ্টাদির পরিচয় দেওয়াই উবটের পক্ষে উচিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদীয় প্রভৃতি শিক্ষাগুলিতে বৈদিক উদাত্তাদি তিন স্বর থেকে লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের সৃষ্টি হয়েছে দেখা যায়। এক 'স্বরিত' থেকেই সৃষ্টি হয়েছে সঙ্গীতের প্রধান তিনটী স্বর ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম—যাদের পণ্ডিত আহোবল তাঁর 'সঙ্গীতপারিজাত' গ্রন্থে (১৭০০ খৃ°) বলেছেন "স্বয়ম্ভু"—অজ্ঞাত বা সুপ্রাচীন স্বর। অবশ্য আজকাল সামগানে লৌকিক স্বরেরই ব্যবহার হয়, কেননা শিক্ষাকার নারদের (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) বৈদিক ও লৌকিক স্বরগুলির পারস্পরিক পরিচয় দেবার পর থেকে মনে হয় সমাজবাসী মানুষ বৈদিকগানে লৌকিক ষড়্জাদি স্বরই ব্যবহার ক'রে আস্‌ছে ও ক্রমশঃ পরবর্তীকালে বৈদিক স্বরগুলির প্রয়োগ লৌকিক স্বরের মাধ্যমেই চলে এসেছে।

এ'ছাড়া আর একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করবার যে, "সপ্ত স্বরা যে যমাস্তে" কথাগুলির উল্লেখ থাকায় ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যের রচনাকালের সময়ে স্বরের বিকাশ যে সম্পূর্ণ হয়েছিল একথা বুঝা যায় এবং সমস্ত প্রাতিশাখ্যগুলিতে একথা স্বীকারও করা হয়েছে।

লৌকিক কেন, বৈদিক স্বরগুলিও বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিনভাবে উচ্চারিত অর্থাৎ গীত হোত। ঋকৃপ্রাতিশাখ্যকার তাই উল্লেখ করেছেন,

তিস্রো বৃত্তীরুপদিশন্তি বাচো,
বিলম্বিতাং মধ্যমাং চ দ্রুতাং চ ॥

অবশ্য ভাষ্যকার উবট বালক তথা ছাত্রদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন ও শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের অধ্যাপন-বিষয়েই দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত ক্ষণভেদ স্বীকার করেছেন। অথবা সূত্রকারের অভিমত অনুসারে দেখা যায় যে, ৪৭ সংখ্যক "বৃত্যন্তরে কর্মবিশেষমাহুঃ" সূত্রের মর্যাদা অনুযায়ী বিলম্বিত ভাবে বা লয়ে

'প্রাতঃসবন', মধ্যম ধারায় 'মাধ্যন্দিন' ও দ্রুত ধারায় 'সবন হোমাদি' কার্য করতে প্রাচীন আচার্যেরা উপদেশ দিয়েছেন। অবশ্য এই ধারাই ক্রমশঃ পরে সঙ্গীতে প্রবেশ করেছিল, কেননা বেদপাঠ, বেদাধ্যাপন ও বৈদিক যাগাদি-কার্যে মাত্রাক্রমকে অনুসরণ ক'রে যেমন অভ্যাসে দ্রুত, প্রয়োগে মধ্য ও শিষ্যদের উপদেশদান-কালে বিলম্বিত লয় বা ক্ষণের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তেমনি ক্ষণসাম্য রক্ষার জন্যে মাত্রার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। যেমন, ৪৮ সংখ্যক সূত্রে বলা হয়েছে : "মাত্রাবিশেষঃ প্রতিবৃত্ত্যুপৈতি"। আচার্য উবট এটার ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন : "বৃত্তিং বৃত্তিং প্রতিবৃত্তি মাত্রা বিশেষো মাত্রাধিক্যমুপৈত্যুপগচ্ছতি। দ্রুতায়াং বৃত্তৌ যে বর্ণান্তে মধ্যমায়াং ত্রিভাগাধিকা ভবন্তি। তথা মধ্যমায়াং যে বর্ণাস্তে বিলম্বিতায়াং ত্রিভাগাধিকা ভবন্তি। চতুর্ভাগাধিকা ভবন্তীত্যেক ইতি"। ঠিক এর পরই ৪৯ সংখ্যক সূত্রে ঋষি শৌনক উল্লেখ করেছেন,

অভ্যাসার্থে দ্রুতাং বৃত্তিং প্রয়োগার্থে তু মধ্যমাম্।
শিষ্যাণামুপদেশার্থে কুর্যাদ্ বৃত্তিং বিলম্বিতাম্ ॥

সঙ্গীতশাস্ত্রীরা যেমন সাতস্বরকে পশুপক্ষীদের অন্তিম স্বর থেকে সৃষ্ট বলেছেন, সূত্রকার শৌনকও তেমনি মাত্রার পরিমাণ নির্ণয় করেছেন পশুপক্ষীদের ডাক থেকে। যেমন, নীলকণ্ঠ পাখীর (চাষ) ডাক বা শব্দ একমাত্রা পরিমাণ, বায়স বা কাকের শব্দ দু'মাত্রা ও শিখীর বা ময়ূরের শব্দ তিন মাত্রা পরিমাণ।

চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রাং বায়সোঽব্রবীৎ।
শিখী ত্রিমাত্রো বিজ্ঞেয় এষ মাত্রাপরিগ্রহঃ ॥

"এষ মাত্রাপরিগ্রহঃ"—এভাবেই পশুপক্ষীদের ডাক বা শব্দের ক্ষণ-পরিমাণ অনুসরণ ক'রে মাত্রার সৃষ্টি হয়েছিল।

ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যের ১৬শ পটল (পরিচ্ছেদ) আরম্ভ হয়েছে ছন্দপ্রসঙ্গ নিয়ে। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এই সাতটী ছন্দ বেদপাঠে তথা বেদাভ্যাসে দরকার। এই ছন্দগুলি সামগানে ব্যবহৃত হোত। কি দেবতা ও কি অসুর উভয়েই এই সাতটী ছন্দ ব্যবহার করতেন—"দৈবান্যপি চ সপ্তৈব" (১৬।৩), "সপ্ত চৈবাসুরাণ্যপি" (১৬।৪)। এসব দেবতা ও অসুরের মর্মকথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ; পুরাণ রূপক বর্ণনায় এ'দুটীকে ফেনাইত ও স্থানে স্থানে বিকৃত করছে। আমরা জানি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন প্রবল হোয়ে উঠেছিল,

বৌদ্ধরা তখন দাস অথবা শূদ্র, আবার বৌদ্ধধর্ম যখন প্রবল হোল ব্রাহ্মণেরা তখন দাস ও শূদ্র হিসাবে গণ্য ছিলেন। সুতরাং সামাজিক দ্বন্দ্বের ইতিকথা সকল যুগেই ছিল এবং এখনও ছদ্মবেশে আছে। মোটকথা ষোড়শ অধ্যায়টি ছন্দের অক্ষর-সংখ্যা ও গঠন নিয়েই আলোচিত হয়েছে।

প্রাতিশাখ্যে ছন্দগুলির অধিদেবতাও কল্পনা করা হয়েছে যেভাবে পরবর্তীকালে সঙ্গীতের স্বর এবং রাগের দেবতা কল্পিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সকল-কিছুর মর্মকথাই আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, অধ্যাত্ম সম্পদ ও ধর্মানুভূতিকে সে কোনদিনই কোন-কিছু থেকে বাদ দেয় নি এবং সেজন্যেই দেবতা, বর্ণচাতুর্য ও রসমাধুর্য প্রভৃতির কল্পনা সে করেছে সমস্ত-কিছুর পিছনে। যেমন ১৭ পটলের ১০ম সূত্রে বলা হয়েছে "বিচ্ছন্দা বায়ুদেবতা"। বর্ণপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে (১৭।১৪)—

> শ্বেতং চ সারঙ্গমতঃ পিশঙ্গং কৃষ্ণমেব চ।
> নীলং চ লোহিতং চৈব সুবর্ণামিব সপ্তমম্।
> অরুণং শ্যামগৌরে চ বভ্রু বৈ নকুলং তথা।

অর্থাৎ শ্বেত শঙ্খবর্ণ গায়ত্রীছন্দ ইত্যাদি। গোপথব্রাহ্মণ, শাঙ্খ্যায়নশ্রৌতসূত্র তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য, বাজসনেয়িপ্রাতিশাখ্য, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র প্রভৃতিতেও স্বর, স্থান, ছন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু-কিছু আলোচনা আছে।*

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৩৭ পৃষ্ঠায় ও আগে আমরা যে আলোচনা করেছি—গোল্ডষ্টুকার ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকে পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীরও পরবর্তী গ্রন্থ বোলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার তা স্বীকার করেন নি, কিন্তু ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের কয়েক জায়গায় ঋষি শৌনক ব্যাড়ি বা ব্যালির নামোল্লেখ করেছেন দেখা যায়। যেমন, ৩য় পটলের ২৮ সূত্রে আছে: "উক্তে ব্যালিঃ সমস্বরে"। উবট বলেছেন: ব্যালিস্ত্বাচার্য উক্তে অন্ত্যো মাত্রে * *।" ১৩শ পটলের ৩৭ সূত্রে আছে: "ব্যালির্নাসিক্যমনুনাসিকং বা"। উবট বলেছেন: "ব্যালিরাচার্যঃ সর্বমনুস্বারং" প্রভৃতি। শাকল্য, শাকটায়ন, গৌতম প্রভৃতি আচার্যদের মতন ব্যাড়ি বা ব্যালির নামোল্লেখও ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে থাকায় শৌনককে ব্যাড়ি বা ব্যালিরও পরবর্তী বা সমসাময়িক আচার্য ও গ্রন্থকার বোলে মনে করার যে কারণ নাই তা বলা যায় না।

সপ্তম অধ্যায়

সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে সঙ্গীত

'পুষ্পসূত্র' সামবেদের প্রাতিশাখ্য। এর রচয়িতা পুষ্পর্ষি। পুষ্পর্ষিকে অধিকাংশ মনীষী ঋকৃতন্ত্রের গ্রন্থকার ঔদব্রজীর সঙ্গে অভিন্ন বলেন। পণ্ডিত সূর্যকান্ত শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন: "A treatise on the SV. by the name *Puspasutra*, where the word *'puspa'* is strongly suggestive of Puspayasas (Puspayasas Audavraji) and the suggestion is strengthened by the colophon of a MS. which reads: ঔদব্রজীকৃতং পুষ্পসূত্রম্"। তাছাড়া তিনি আরো সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, যে-ঔদব্রজী 'ঋকৃতন্ত্র' রচনা করেছেন তিনিই 'সামতন্ত্র', 'পুষ্পসূত্র' ও ভাষার ওপর একখানি ব্যাকরণও রচনা করেছেন ("who also wrote *Sama-tantra*, *Puspasutra*, and a grammer on *bhasa*")। অবশ্য এ-সম্বন্ধে আমরা 'ঋকৃতন্ত্রে সঙ্গীত' আলোচনায় উল্লেখ করেছি।

ডাঃ কালাণ্ড পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের মুখবন্ধে (*Introduction*, chapt. II, p. XIII) 'পুষ্পসূত্র'-কে একটী সামগীতের চয়নগ্রন্থ বলেছেন। তাঁর অভিমত যে, 'পুষ্পসূত্র' উহ ও উহ্যগানগুলির প্রবর্তনকালের চেয়েও প্রাচীন ("we have now to prove our assertion that even the *Puspasutra* is older than *Uha* and *Uhyaganas*")। তবে সকল মনীষী এই মত গ্রহণ করেন না ("an assertion not accepted by all scholars")। 'পুষ্পসূত্র' সম্বন্ধে ডাঃ কালাণ্ডের অভিমত যে,

> "It is highly probable that amongst the Samavedic Brahmins in early times certain rules were established and handed down by oral tradition for the adaptation (the *uha*) of the samans in the *grame-* and *aranyegeya-ganas*, that these rules were atlast collected and arranged in a book (our *Puspasutra*) * * ."

এছাড়া ডাঃ কালাণ্ড আরো উল্লেখ করেছেন (পৃ° XVII): "These rules for adaptation were then fixed and systematically arranged in a special book: the *Puspasutra*"। কিন্তু সাম-গানগুলিকে পুষ্পসূত্রের নির্দেশ অনুযায়ী তাড়াতাড়ি ব্যবহারোপযোগী

করবার জন্যে আরো দুখানি বই 'উহগান' ও 'উহ্যরহস্যগান' রচিত হয়েছিল। উহগানকে তিনি গ্রামেগেয়গানের অন্তর্ভুক্ত যজ্ঞের উপযোগী সামগানের ও উহ্যরহস্যগানকে অরণ্যেগেয়গানের অন্তর্গত যজ্ঞীয় সামগানের পুস্তক বলেছেন। শেষোক্তকে তিনি সুপ্রাচীন সামবেদ-সাহিত্যের ইতিহাস বোলেও উল্লেখ করেছেন ("This is according to my view the history of the oldest Samavedic texts")।

পুষ্পসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন পরবর্তী যুগে অজাতশত্রু। প্রকৃতপক্ষে ৫ম প্রপাঠক থেকে অজাতশত্রু "শ্রীসামবেদায় নমঃ" বোলে তাঁর ভাষ্য আরম্ভ করেছেন। পুষ্পসূত্রে দশটী মাত্র প্রপাঠক বা অধ্যায় আছে, তাদের মধ্যে নবম প্রপাঠকেই সামগান-সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা আছে।

উহগান পুষ্পসূত্রের অনেক পরে রচিত হয়েছে—এই মতবাদ ডাঃ কালাণ্ড-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করলেও উহ ও রহস্যগানের বিবরণ এবং উদাহরণও পুষ্পসূত্রে বড় কম নেই। পুষ্পসূত্রের অষ্টম প্রপাঠকের পঞ্চমী কণ্ডিকায় উল্লেখ আছে: "উহগানে যোনিবৎস্বরাঃ"। অজাতশত্রু এর ভাষ্যে বলেছেন: "উহগানে যোনিবৎস্বরা ভবন্তি ইতি প্রকৃত্যাপদেন কৃতং উহগীতৌ যোনিবৎস্বরাঃ ক্রুষ্টাদয়ঃ"। ক্রুষ্টাদয়ের 'আদি' বল্‌তে প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতি স্বর। এছাড়া ৯ম প্রপাঠকের ২য় কণ্ডিকায় যে ৩য় শ্লোকটী পাওয়া যায় ডাঃ বার্ণেল ও মনীষী সাইমনের অভিমতে, সেটী সম্পূর্ণভাবে পুষ্পসূত্রে উহগানেরই নির্দেশ হিসাবে বুঝ্‌তে হবে। যেমন,

সন্ধিবৎপদবদ্‌গানমত্বমার্ভাবমেব চ।
প্রশ্লেষাশ্চাথ বিশ্লেষা উহে ত্বেবং নিবোধত॥

শ্রদ্ধেয় সূর্যকান্ত শাস্ত্রী তাই বলেন:

"We know that the *Pratisakhyas*, which teach how to turn the *padas* into *Samhita*, are centuries later than the *Samhitas*, and the same may be said with regard to the *Puspasutra*. In reality, these treatise belongs to the third strata of the Samavedic literature, *i e.*, the analytic literature, which consisted of *Riktantra*, *Samatantra*, *Aksaratantra* and numerous other works"[১]

পুষ্পর্ষি ও ভাষ্যকার অজাতশত্রু উভয়েই রাণায়নীয়, শাঠ্যায়ন, তাণ্ড্যব্রাহ্মণ

১। Cf. *Riktantram* (Lahore, 1933): Introduction, p. 30.

প্রভৃতিতে বিহিত উদ্গীতির বা বিভিন্ন স্বাধ্যায়ে প্রযুক্ত স্বরভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। 'গণগীতি'-র (একসঙ্গে অনেকের গান গাওয়ার পদ্ধতি) প্রচলন পুষ্প-সূত্রের সমাজে ছিল ("অন্যত্র গণগীতিভ্যঃ")। 'স্তোভ' গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয় এই উভয় গানেই প্রচলিত ছিল। গান গাওয়ার রীতি-নির্দেশেরও পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন নবম প্রপাঠকের ১মা কণ্ডিকায় (পৃ° ১৯৫) "অথ বিকল্পা" প্রভৃতি বাক্যের ভাষ্যে অজাতশত্রু উল্লেখ করেছেন: "* * ইদানীং বিকল্পা উচ্যন্তে ভাবশেষং চ, একস্মিন্ পাদে দ্বিধা গীতির্দৃশ্যতে, তত্র কিমুভয়প্রকারস্যাপি গানস্য যুগপৎপ্রয়োগো ভবতি" ইত্যাদি।

পুষ্পসূত্রের ৯ম প্রপাঠকের ২য় কণ্ডিকাটী সঙ্গীত-উপাদানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশেষ ক'রে ৮ম এবং ৯ম শ্লোক দু'টীর দান অপরিমেয়। পুষ্পর্ষি উল্লেখ করেছেন,

এতৈর্ভাবৈস্তু গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্-পৃথক্।
পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু॥
সামানি ষট্সু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তু কৌথুমাঃ।
ঊনানামন্যথাগীতিঃ পাদানামধিকাশ্চ যে॥

ভাষ্যকার অজাতশত্রু এ'দুটী শ্লোক নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি, কেননা এদের অর্থ সুপরিস্ফুট ও সহজ। চারটী বেদেরই বিভিন্ন শাখা ছিল এবং 'প্রতিশাখায়াং ভব'—প্রাতিশাখ্যই তার চাক্ষুষ প্রমাণ। বেদের শাখাবৈচিত্র্য থেকে বুঝা যায় যে, সকল মানুষের মনের বিকাশ কোনকালেই এক রকম নয়, সুতরাং বৈদিক সমাজেও রুচিভেদ ছিল এবং এই রুচিভেদ থেকেই সম্প্রদায়ভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। গোত্র, বংশ ও শ্রেণী অনুসারে সামাজিক ও ব্যবহারিক রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং তদনুযায়ী উপাস্য, উপাসনা এবং লক্ষ্য ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এভাবে একই সমাজের লোক বেদমাত্রকে অনুসরণ করলেও রুচির মাপকাটিতে বেদের অনেক-কিছুকে তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে ও তদনুযায়ী একই বেদের বিভিন্ন শাখা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া বৈদিক মন্ত্রগুলির পঠনপাঠন ও যাগকর্মে ব্যবহার করার মধ্যেও অনেক নিয়মকানুন ছিল এবং উচ্চারণ ও অনুষ্ঠানের অনেক বিচিত্র রূপেরও সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই যজ্ঞকার্যে গীত সামগানের রীতিও ভিন্ন ভিন্ন শাখানুসারী সম্প্রদায়ে বিভিন্ন হয়েছিল: বিভিন্ন হয়েছিল মন্ত্র-প্রয়োগে,

আবৃত্তিদানে ও গানে স্বরসংখ্যার ব্যবহারে। পুষ্পর্ষি 'সর্বাঃ শাখাঃ' বোধে কৌথুমী, রাণায়নীয়, জৈমিনীয় প্রভৃতি শাখার নামোল্লেখ করেছেন। এছাড়া বাজসনেয়, শৌনকেয়, গৌতমীয় প্রভৃতি শাখার নামও পাওয়া যায়। শিক্ষাকার নারদ তাঁর নারদীশিক্ষায় (১৷৯—১১) কয়েকটী শাখা ও শাখাভেদে স্বরের প্রয়োগ-বৈচিত্র্যের উল্লেখ করেছেন,

> কঠকালাপপ্রবৃত্তেষু তৈত্তিরীয়াহ্বরকেষু চ।
> ঋগ্বেদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ স্বরঃ॥
> ঋগ্বেদস্তু দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন চ বর্ততে।
> উচ্চমধ্যমসন্ধাতস্বরো ভবতি পার্থিবঃ।
> তৃতীয়প্রথমক্রুষ্টান্ কুর্বন্ত্যাহ্বরকাঃ স্বরান্।
> দ্বিতীয়াদ্যাঁস্তু মন্দ্রাং তাং স্তৈত্তিরীয়াশ্চতুরঃ স্বরান্॥

পণ্ডিত ভট্টশোভাকর তাঁর শিক্ষাভাষ্যে লিখেছেন : "কঠাদিশাখাসু ঋগ্বেদে সামবেদে চ ঋগ্‌যজুষাং সামিকস্বরঃ প্রবর্ততে স্বরিতে প্রথমস্বরানুসারেণ পাঠোঽবধার্যতে প্রথমস্বরদ্বিতীয়স্বরোঋগ্বেদেঽনুক্রিয়মাণাববধার্যতে ক্রুষ্টপ্রথমস্বর-সমুদায়ানুকারশ্চ লৌকিকে ব্যবহারে প্রবর্তয় ইত্যাহ।৯। ক্রুষ্টঃ উচ্চঃ মধ্যমঃ প্রথমঃ স্বরঃ।১০। তৃতীয়াদিষু স্বরানুসারেণাহ্বরকাণাং বা পাঠঃ দ্বিতীয়াদ্যনুকারেণ তৈত্তিরীয়াণাং সাম্নি তু সপ্ত স্বরা ভবন্তীত্যাহ"।১১

> প্রথমশ্চ দ্বিতীয়শ্চ তৃতীয়োঽথ চতুর্থকঃ।
> মন্দ্রঃ ক্রুষ্টো হ্যতিস্বার এতান্ কুর্বন্তি সামগাঃ॥
> দ্বিতীয়প্রথমাবেতৌ তাণ্ডিভাল্লবিনাং স্বরৌ।
> তথা শাতপথাবেতৌ স্বরৌ বাজসনেয়িনাম্॥
> এতে বিশেষতঃ প্রোক্তাঃ স্বরা বৈ সার্ববৈদিকাঃ।
> ইত্যেতচ্চরিতং সর্বং স্বরাণাং সার্ববৈদিকমিতি॥ ১২-১৪

ভাষ্য—"ছন্দোগানাং বাজসনেয়িনাং চ ব্রাহ্মণৌ গাথাস্বরৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ ভবত ইত্যাহ।১২। তাণ্ড্যপঞ্চবংশাদিকং ব্রাহ্মণং কৌথুমাদয়োঽধীয়ন্ত ইতি তাণ্ডিনঃ ভাল্লবিনঃ ছন্দোগা এব বাজসনেয়িনাম্।১৩। সর্ববেদেষু ভবং চরিতং স্বরিতম্"।১৪

মোটকথা শিক্ষাকার নারদের বক্তব্য এই যে, বৈদিক প্রথমাদি স্বর সাতটি, কিন্তু বেদের বিভিন্ন শাখার অনুসারীরা সকলেই সাতটী স্বর গানে ব্যবহার

করতেন না। কঠাদি শাখা, ঋগ্বেদী, সামবেদী, তৈত্তিরীয় ও আহ্বরকেরা মাত্র প্রথম স্বর (যা লৌকিক সঙ্গীতের মধ্যম স্বর তাই) গানে ব্যবহার করতেন। কিন্তু ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন—কঠাদিশাখায়, ঋগ্বেদে, সামবেদে ও যজুর্বেদে সামগরা সামিকস্বর ব্যবহার করতেন। তাঁরা প্রথম-স্বর অনুসারে তাঁদের বেদপাঠ নির্ধারণ করতেন। পুনরায় তাঁরা ঋগ্বেদে প্রথম-স্বর অনুসারে ও লৌকিক ব্যবহারে গানে ক্রুষ্ট ও প্রথম-স্বরদুটী প্রয়োগ করতেন। ঋগ্বেদীরা আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরদুটী ব্যবহার করতেন; এছাড়া উচ্চ ক্রুষ্ট এবং প্রথম স্বর দুটীতেও তাঁরা গান করতেন। আহ্বারকেরা গানে তৃতীয়, প্রথম ও ক্রুষ্ট স্বর তিনটী এবং সামগরা ও তৈত্তিরীয়েরা চারটী স্বর ব্যবহার করতেন। ছন্দোগ বা ছন্দোগানকারী ও বাজসনেয়িরা তাঁদের গাথায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরদুটী; তাণ্ডিভাল্ল, শাতপথ ও বাজসনেয়িয়েরা গানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরদুটী মাত্র ব্যবহার করতেন।

মোটকথা সামপ্রাতিশাখ্যের সময়ে সাতটী স্বরই সামগানে ব্যবহৃত হোত। প্রাতিশাখ্যে বিশেষ কোন বাদ্যের ও নৃত্যের কথা উল্লেখ না থাকলেও একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বৈদিক সমাজে বিভিন্ন রকমের বীণা, তার- ও তাঁতযন্ত্রের প্রচলন ছিল। বাদ্যের সঙ্গে তাল রক্ষা ক'রে সামগরা গান করতেন আর তাঁদের পুরনারীরা করতালি দিয়ে যজ্ঞবেদীর চারপাশে যে নৃত্য করতেন সে সকলের নজির পাওয়া যায় ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলিতে। অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি (Prof. S. Levi) সামবেদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

"* * the art of music had been fully developed by the Vedic age. Moreover the Rigveda (I. 92. 4). already knows maidens who decked in splendid raiment, dance and attract lovers, and the Atharva-veda (XII. 1. 41) tells how men dance and sing to music".[২]

অধ্যাপক কিথ উল্লেখ করেছেন যে, মহাব্রত-উৎসবে পুরনারীরা যজ্ঞাগ্নির চারদিকে নৃত্য করতেন শস্যোৎপাদন ও বৃষ্টি আনার জন্যে। শাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে (১।১১।৫) আছে: বিবাহ-উৎসবে পুরনারীরা নৃত্য করতেন, সেই নৃত্যের সঙ্গে থাকৃত নানারকমের বাদ্যযন্ত্র। অধ্যাপক কিথ তাই লিখেছেন,

২। (ক) অধ্যাপক কিথ: *The Sanskrit Drama* (Oxford, 1924), pp 15-16.

(খ) ঋগ্বেদের (১।৯২।৪) মন্ত্রে আছে: "অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিবা", অর্থাৎ ঊষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করছে। 'নর্তকী'-শব্দ থাকার জন্যে নৃত্যকলার অনুশীলন যে বৈদিক সমাজে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"Thus at the Mahavrata maidens dance round the fire as a spell to bring down rain for the crops, and to secure the prosperity of the herds. Before the marriage ceremony is completed (*Shankhyana-Grihyasutra*, I. 11. 5) there is dance of matrons whose husbands are still alive, * * and dancers are present who dance to the sound of the lute and the flute, dance, music, and song fill the whole day of moving".[৩]

ডাঃ কালাণ্ডও 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

"Behind the Choristers * * the wives of the Yajamanas take their seat ; each of them has two instruments, a *kandavina* and a *picchora* ; on these they play all together alternately, first on the *kandavina*, then on the *picchora*. The *kandavina* is a flute of bamboo, the *picchora* a guitar, which is beaten by means of a plectrum, Laty. IV. 2. 5-7, Drahy. XI. 2. 6-8. The Jaim. br. (cp. 'Das Jaiminiyabrahmana in Auswahl' No. 165) enumerates the following instruments : *karkari*, *alabu*, *vakra*, *kapisirsni*, *aisiki*, *apaghatalika* (cp. Ap., below), *vina kasyapi* (cp. Ath. S. IV. 37. 4 : *aghatah karkaryah* 'cymbals and lutes', Whiteny). Ap. XXI. 17. 6, 19 names three instruments : *apaghatalika*, *tambalavina* and *picchola* : the second is according to R. Garbe (see his Introduction to Ap. vol. III, page VIII) a tamil guitar. Baudh. XVI. 20 266. 9-10 ; 267. 9-10 names also three instruments : *aghati*, *picchola* and *karkarika*, on which cp. the Karmantasutra (Baudh. XXVI. 17. s. f.) ; Sankh. XVII. 3. 12 has : *ghatakarkarir avaghatarikah kandavinah picchora iti*, read perhaps *agahatarir avaghata*, etc ; but the following passage (sutra 15-17) is rather uncertain."[৪]

৩। (ক) কিথ : *The Sanskrit Drama* (1924), p. 26 ; (খ) ম্যাক্‌ডোনেল্ : *Sanskrit Literature*, p. 347.

৪। (ক) ডাঃ কালাণ্ড : *Panchavimsa-Brahmana* (Calcutta, 1931), p. 86 ;
(খ) এ ছাড়া 'শততন্ত্রী-বীণা'-র উল্লেখ ব্রাহ্মণে আছে। পরবর্তীকালে শততন্ত্রী-বীণার নাম হয় 'কাত্যায়নী-বীণা'। ডাঃ কালাণ্ড এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন : "It is provided with a hundred strings, man, forsooth, has a life of a hundred years, has a hundred powers (Verse 6. 12)। ব্রাহ্মণের যুগে সুতরাং বিভিন্ন তন্ত্রীযুক্ত বীণার প্রচলন ছিল। ডাঃ কালাণ্ড 'Hundred powers' শব্দ দুটির অর্থ করেছেন : "Female slaves, at least five, at highest fifty or twenty-five",—কমের পক্ষে ৫ জন এবং বেশীর ভাগ ৫০ অথবা ২৫ জন দাসী বীণা বাজাত। এ'ছাড়া ডাঃ কালাণ্ড তাঁর সংপাদিত পঞ্চবিংশব্রাহ্মণে বীণা সম্বন্ধে আরো উল্লেখ করেছেন : "Cp. Jaim. br. II. 45, 418, Kath. XXXIV. 5 : 39. 10 ; TS. VII. 5. 9. 2.—The *vina* is an instrumeut of wood, according to Sankh. consisting of a kind of crate and handle (cross-bar ?) ; it is covered with the skin of a red ox, hairs on the outside, it has ten holes at its back side, over each of which ten

অনেকের ধারণা যে, সামগানের যুগে গানের সঙ্গে বাদ্য ও নৃত্যের সহযোগিতা ছিল না, আর সেজন্যে সামগানকে 'সঙ্গীত' আখ্যা দেওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু এ'ধারণা ঠিক নয়, কেননা 'সঙ্গীত'-শব্দটার সার্থকতা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়ে সাধিত হয়, আর বৈদিক সমাজে সামগরাও গান করতেন ছন্দ ও তালের সমতা রক্ষা ক'রে, গানের সঙ্গে থাকত বিভিন্ন বাদ্য ও বেশীরভাগ সময় নৃত্য, স্মৃতরাং তিনের সমন্বয়ে সামগানও 'সঙ্গীত' নাম পাবার যোগ্য অধিকারী। এ'ছাড়া বাজসনেয়সংহিতায় পুরুষমেধযজ্ঞের প্রসঙ্গে দেখা যায়, ১৮৪ জন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে হত্যা ক'রে তাদের অধিদেবতাদের উদ্দেশ্যে অহুতি দেবার কথা আছে। সেখানে শব্দের উদ্দেশ্যে একজন গায়ককে, নৃত্যের উদ্দেশ্যে একটী পাখীকে, গানের উদ্দেশ্যে একজন অভিনেতাকে, উৎসবানন্দের উদ্দেশ্যে একজন বীণাবাদককে, ক্রন্দনের উদ্দেশ্যে একজন বংশীবাদককে বলি দেবার ও উৎসর্গ করার উল্লেখ আছে। ডাঃ উইণ্টারনিজ্ তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'-প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"No less than one hundred and eighty-four persons are to be slaughtered at this Parusamedha, there being offered, to give only a few examples, 'to Priestly Dignity a Brahmin, * * to Noise a singer, to Dancing a bard, to Singnig an actor, * * to the Joy of Festival a lute-player, to Cry a flute-player * *."[৫]

অবশ্য পণ্ডিত হিলব্র্যাণ্ড এই পুরুষমেধযজ্ঞে নরবলির কাহিনীকে রূপক বোলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিত ওল্ডেন্‌বার্গও অন্যভাবে লিখেছেন :

"There can be no doubt that the ritual is a mere priestly invention to fill up the apparent gap in the sacrificial system which provided no place for man."[৬]

strings are fastened; these strings are manufactured of *munja* or *darbha* grass. The strings are touched by the Udgatri by means of a reed of a piece of bamboo (with its leaves), that is bent of itself (not by the hand of man) : *indrenataya* (var *indrana*) *isikaya*, Jaim. br., and from this text the word is taken over by Laty. Drahy. * * Udgatri does not properly play on this instrument, having touched the strings * * with the plectrum he orders a Brahmin to play on it; Drahy, XI. 1. 1-16 ; cp. Ap. XXI. 18. 9 ; Sankh. XVII. 3. 1-11."—*Panchavimsa-Brahmana* (Cal. 1931), p. 88.

৫। Vide ডাঃ উণ্টারনিজ্ : *A History of Indian Literature* (1927), Vol. I, p. 174.

৬। Ibid., p. 175.

ছান্দোগ্য উপনিষদেও (১।১২।৪) 'হিং' শব্দের সৃষ্টিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তি,"—অর্থাৎ আরম্ভ যজ্ঞকর্ম 'বহিষ্পবমান' নামক স্তববিশেষের দ্বারা স্তুতি করতে উদ্যত উদ্‌গাতৃগণ যেমন পরস্পর সংলগ্নভাবে পরিক্রমণ করেন। মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন: Just as the men who are going the '*Bahispavamana* hymn move round linked to each others." সুতরাং যজ্ঞকর্মে উদ্‌গাতৃগণ গানের সঙ্গে-সঙ্গে মণ্ডলাকারে নৃত্য করতেন এবং তার অনুগামী যে বিভিন্ন বাদ্য থাকৃত তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যক্ষ এম্. রামকৃষ্ণ কবিও বৈদিক সামগানে নৃত্য-গীতের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

"* * a careful examination of the Vedic rites and *siksas* thereupon drives one to the irresistable conclusion that the origin of Indian music lay in certain rites where the priest and the performer chant some *gathas* alternately while the wife (*yajamani*) plays on *vina* and the closing of the sacrifice was enjoined with the conduct of a peculiar dance. The kind of *vina* mentioned for the above purpose is called *pichola* and in another place it is called *Audumvari* (ঔদুম্বরী) that is made of *Udumbara* wood."[৭]

অবশ্য 'পিচোলা' ও 'ঔদুম্বরী' বীণাদুটীর উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শিক্ষাকার নারদ মাত্র দারবী ও গাত্রবীণা এবং তৎপরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকার ভরত কেবল চিত্রা ও বিপঞ্চী-বীণা দুটীর নামোল্লেখ করেছেন, অথচ তাঁরা যে বৈদিক সামগানে ব্যবহৃত বীণাগুলির সম্বন্ধে জানতেন না—তাও বলা যায় না, সুতরাং তাঁদের বীণাযন্ত্রের বর্ণনা-প্রণালী রহস্যপূর্ণ বোলে মনে হয়। ভবিষ্যতে ঐকান্তিকী গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে যন্ত্র-সঙ্গীতের ইতিহাস লিখিত হোলে এ-রহস্য আরো উদ্‌ঘাটিত হবে আশা করি।

ব্রাহ্মণ, সংহিতা, কল্প অথবা শ্রৌতসূত্রাদির কথা ছেড়ে দিলে সুপ্রাচীন হিন্দুসাহিত্য ঋগ্বেদেই আমরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাই। যেমন ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ১০ সূক্ত ১ম ঋকে আছে,

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।

ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্ বংশমিব যেমিরে ॥[৮]

৭। Cf. *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society*, vol. III, July 1928, pt I, p. 20.

৮। Cf. 'ঋগ্বেদ-সংহিতা' (শ্রীপাদ শর্মা-সংপাদিত, ১৯৪০), পৃ° ৫

হে শতক্রতু, গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চকেরা, অর্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চনা করে, নর্তকেরা যেমন বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারেরা তেমনি তোমাকে উন্নত করে।

আচার্য সায়ণ উল্লেখ করেছেন: "বংশমিব যথাবংশাগ্রেনৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশং উন্নতং কুর্বন্তি। যথা বা সন্মার্গবর্তিনঃ স্বকীয়ং কুলং উন্নতং কুর্বন্তি তদ্বৎ এতাম্বচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে—গায়ন্তিত্বাগায়ত্রিণঃ প্রার্চন্তি তেহর্কমর্কিণো-ব্রাহ্মণাস্ত্বাশতক্রত উদ্যেমিরে বংশমিববংশোবনশয়ো ভবতি বননাচ্ছ্রূয়ত ইতি বেতি।"[৯]

এথেকে বুঝা যায়, ঋত্বিক ও সামগরা সামগান করতেন যজ্ঞের চারদিকে বসে; তাঁরা অর্চনা করতেন ও নর্তকেরা নৃত্য করতেন। নৃত্যের সময় বংশদণ্ড উন্নত ক'রে নৃত্য করার প্রথা ছিল। হরিদাস পালিত মহাশয় উল্লেখ করেছেন, আজও গম্ভীরামণ্ডপে শিবের কাছে নৃত্য করার সময় লোকে বেত (বেত্র) হাতে নিয়ে নাচে। গম্ভীরায়ও কেউ গান করে, কেউ স্তোত্র অথবা শিব-পূজার বন্দনা গায়, কেউ বেত হাতে নিয়ে নাচে। তাঁর মতে বৈদিক আচারই বর্তমান যুগে গম্ভীরায় অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে।[১০]

ঋক্‌সংহিতায় (২।৩৪।১৩) বাদ্যের উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন,

তে ক্ষোণীভিররুণেভির্নাঞ্জিভী
রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ।

রুদ্রপুত্র মরুৎগণ ক্ষোণী এবং অরুণবর্ণ অলঙ্কার-যুক্ত হোয়ে জলের নিবাস-রূপ মেঘে বর্দ্ধিত হয়েছেন।

আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন: "রুদ্রারুদ্রপুত্রাস্তেমরুতঃ ক্ষোণীভিঃ শব্দকারিবীণাখ্যৈর্বীণাবিশেষৈঃ" প্রভৃতি। 'ক্ষোণী' এক রকমের বীণা—ঋগ্বৈদিক স্তোত্রগানে ব্যবহৃত হোত, কিন্তু সেই ক্ষোণীবীণা কি ধরণের ছিল, তাতে তন্ত্রীর সমাবেশই বা কতগুলি ছিল সে-সম্বন্ধে ভাষ্যকার সায়ণও কিছু উল্লেখ করেন নি। পুনরায় ঋক্‌সংহিতার (২।৪৩।৩) 'কর্করি' নামক বাদ্য-বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়,

যদুৎপতন্ বদসি কর্করির্যথা
বৃহদ্ বদেম বিদথে সুবীরাঃ।

৯। Cf. 'ঋক্‌সংহিতা' (বম্বাই ১৮৯০), পৃঃ ১১০
১০। Cf. 'আদ্যের গম্ভীরা' (১৩১৯ সাল), পৃঃ ১৭৫

হে শকুনি, তুমি উড্ডীয়মান-কালে কর্করির মতন শব্দ কর। আমরা যেন পুত্রপৌত্রযুক্ত হোয়ে এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করতে পারি।

আচার্য সায়ণ বলেছেন: "কর্করির্যথা কর্করির্বদতি কর্করির্বাদ্যবিশেষঃ অন্যত্ৰাখ্যাতচরম্।" 'কর্করি' বাদ্য হোলেও সেই বাদ্যেরও কোন পরিচয় ঋক্‌সংহিতাকার অথবা ভাষ্যকার দেন নি।

অধ্যাপক ভি. এম্. আপ্তে তার *Social and Economic Conditions* প্রবন্ধে বেদ, সংহিতা প্রভৃতিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

"Music, both vocal and instrumental, and dancing continue to be among the amusements of this age (Vedic age).[১১] * * Several professional musicians are known, and the variety of instrumental music in vogue can be referred from the types of musicians enumerated, such as lute-prayers, flute-players, conch-blowers, drummers, etc. Among the musical instruments known are the *aghati* (cymbal) to accompany dancing (*RV* and *AV*), drums, flutes, and lutes of various types, and the harp or lyre with a hundred strings (*vina*). Many other instruments, of which we cannot form an exact idea, are also named. The Sailusha, included in the list of victims at the Purushamedha in the *Vajasaneya-Samhita*, probably means an 'actor' or 'dancer'.[১২]

এছাড়া সীমান্তোন্নয়ন-উৎসবে বধূকে গান করতে হোত এবং বিবাহ-উৎসবে বরও 'গাথা' গান করতেন। সামবেদে যে গাথা ও গান গীত হোত তার নিদর্শন পাওয়া যায় গোভিলগৃহ্যসূত্রে 'বামদেব্যগান'-এর বেলায়। এর প্রসঙ্গে অধ্যাপক আপ্তে পুনরায় উল্লেখ করেছেন,

"In the *Simantonnayana* ceremony * * the wife is asked to sing a song merrily, and in the marriage ceremony the bridegroom sings a *gatha* after the treading on the stone by the bride. The vogue of the musical recitations of the *Samaveda* is responsible for the rule in the *Gobhila-Grihya-sutra* that the *Vamadevya-gana* may be sung by way of a general expiation, at the end of every ceremony. The lute-players

১১। কৌষীতকিব্রাহ্মণে (২৯।৪।৫) নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে 'শিল্পত্রয়ম্' বলা হয়েছে। —Vide বেঙ্কটেশ্বর: *Indian Culture through the Ages* (1928), p. 58.

১২। (ক) *The History and Culture of the Indian People*: The Vedic Age (1951), Vol. I, p. 456; (খ) নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে বেদে 'দেবযান-বিদ্যা'-ও বলা হয়েছে।—Vide পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার সংপাদিত *Sacred Book of the East*, Vol. I, pp. 109-110.

are asked to play the lute in the ceremony of 'parting the hair', and four or eight women (not widows) perform a dance in the marriage ceremony. The restrictive rule that a *snataka* is not to practise or enjoy a programme of instrumental or vocal music or dance, shows their popularity."[১৩]

ঋগ্বেদে (১।১৬৪।২৪) সঙ্গীতের সাত স্বরকে সাতটী 'বাণী' বা 'ছন্দ' বলা হয়েছে এবং শতপথব্রাহ্মণে (১৩।১।৫।১) বেণু ও করতালির এবং 'বীণাগণগিন' অর্থাৎ সমবেত বাদ্যের (Orchestra) উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-আরণ্যকেও (১।১১) 'গীত' তথা সঙ্গীতের উল্লেখ আছে—"অপ্সু নাবম্ প্রতিষ্ঠিতম্। হাসিতং, রুদিতম্, গীতম্" প্রভৃতি।

এছাড়া যজ্ঞাদি উৎসবের পরে 'অবভৃথস্নান' নামে একটী অনুষ্ঠানের আয়োজন হোত এবং সেই অনুষ্ঠানটী বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগেও প্রচলিত ছিল। এই 'অবভৃথস্নান'-উৎসবটীতে নৃত্য, গীত ও বাদ্য থাকৃত, পুরুষ ও নারী উভয়েই নৃত্য, গীত ও বিভিন্ন বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাণীর সঙ্গে স্নান করতে যেতেন। তাতে তৈল-হরিদ্রাদি ("তৈলগোরস-গন্ধোদহরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ") মেখে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সঙ্গে স্নান সম্পন্ন হোত। আজও বাঙ্গালাদেশের কোন কোন জায়গায় নাকি এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সুতরাং এ-সব থেকে জানা যায়, বৈদিক যুগে স্তব, স্তোত্র, স্তুতি, গাথা, গান বা সামগানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য এবং বীণা ও মৃদঙ্গাদি বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্রের সহযোগ থাকৃত।

১৩। Cf. (ক) *The History and Culture of the Indian People*: The Vedic Age (1951), pp. 518-519.

(খ) এস্. ভি. বেঙ্কটেশ্বর: *Indian Culture through the Ages* (1928), p. 126,

অষ্টম অধ্যায়

শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত

প্রাতিশাখ্যগুলিতে প্রাচীন সাঙ্গীতিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় তা আগেই আলোচনা করেছি। ছন্দ ও ব্যাকরণ ছাড়া বেদের প্রতিশাখার এক একটি বিধিবদ্ধ নিয়মগ্রন্থ ছিল; স্বর বর্ণ ভাষা ও মন্ত্র প্রভৃতির উচ্চারণভঙ্গী, ছন্দ ও মাত্রা এই সব নির্দেশের জন্যে প্রাতিশাখ্যগুলির সৃষ্টি হয়েছিল।[১]

শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেই স্বরের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে স্বর ষড়্‌জাদি স্বর নয়; টীকাকার মহর্ষি কাত্যায়ন তাকে বলেছেন—"স্বর উদাত্তানুদাত্তস্বরিতপ্রচিতলক্ষণঃ" (১।১)। কিন্তু কি প্রাতিশাখ্যগুলিতে বা কি শিক্ষায় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী প্রধান স্বরের কথাই বলা হয়েছে। উদাত্তাদি তিনটী স্বরই কিন্তু প্রধান; এই প্রধান তিনটী স্বরকে অবলম্বন ক'রে কারো কারো মতে জাত্য, অভিনিহিত প্রভৃতি সাতটী স্বরের, আবার কারো বা মতে ষড়্‌জাদি সাত স্বরের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বরের উৎপত্তির কারণ 'বায়ু' অর্থাৎ বাতাস। এজন্যে ষষ্ঠ সূত্রে "বায়ুঃ খাৎ" এই কথাই প্রাতিশাখ্যকার বলেছেন। শব্দ বা বায়ু আকাশেরই গুণ —"শব্দগুণমাকাশম্"। ভারতীয় দার্শনিক ও বর্তমান বৈজ্ঞানিকেরাও একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করেন।

শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যের টীকাকার কাত্যায়ন বলেছেন: "বায়ুঃ কারণভূতঃ শব্দস্য, স চ খাদাকাশাদুৎপদ্যতে"। প্রাতিশাখ্যকার তাই ৭ম সূত্রে উল্লেখ

১। প্রাতিশাখ্যের প্রয়োজন কি সে সম্বন্ধে ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যের (১।১) ভাষ্যকার উবট বলেছেন: "এবং শিক্ষাচ্ছন্দোব্যাকরণৈর্যৎসর্বাসু শাখাসু সামান্যেন লক্ষণমুচ্যতে তদেবাস্যাং শাখায়ামনেন ব্যবস্থাপ্যত ইত্যেতৎ প্রয়োজনস্যাঙ্গস্য। * * সামান্যেন লক্ষণেন যদ্বিকল্পপ্রাপ্তং তদেবমস্যাং শাখায়াং ব্যবস্থিতং ভবতীতি প্রাতিশাখ্যপ্রয়োজনমুক্তম্"। অর্থাৎ ভাষ্যকার উবট আগেই আশঙ্কা তুলেছেন যে, শিক্ষা, ছন্দ ও ব্যাকরণে তো সামান্যভাবে বেদের নিয়ম-পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং পৃথক আর একটি প্রাতিশাখ্যের দরকার কি? তার উত্তরে তিনি বলেছেন: "সামান্য লক্ষণানুবাদেনৈব বিশেষলক্ষণং বিধাতুং শক্যতে", অর্থাৎ শিক্ষা, ছন্দ ও ব্যাকরণে সামান্যভাবে লক্ষণ বলা হোলেও তার অনুবাদ ক'রে আরো ভালভাবে বোঝাবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তাই বেদের প্রতিশাখার জন্যে এক একটি প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিতরত্ন কস্তূরিরঙ্গাচার্য বলেছেন: "শাখায়াং শাখায়াং প্রতিশাখম্। প্রতিশাখং ভব প্রাতিশাখ্যম্।" অবশ্য 'ঋকতন্ত্রে সঙ্গীত' প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আমরা আলোচনা করেছি।

করেছেন: "শব্দস্তৎ"; অর্থাৎ শব্দ বায়ুরই অভিন্ন রূপ—"বায়্বাত্মক ইত্যর্থঃ"। এই বায়ু থেকে কেমন ক'রে বর্ণ ও শব্দের উৎপত্তি হয় তারও পরিচয় দিতে প্রাতিশাখ্যকার কার্পণ্যবোধ করেন নি; বরং তিনি বলেছেন: "সমজ্ঝাতাদীন্ বাক্";[২] অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছায় শব্দ যখন শরীরের বিভিন্ন স্থানকে অতিক্রম করে তখন ঐ স্থান ও বাতাসের পরস্পর-সংস্পর্শ বা সজ্ঝাতের জন্যে "বাক্" বা শব্দময় হ'য়ে বর্ণের উৎপত্তি হয়। টীকায় কাত্যায়নও বলেছেন: 'যো বায়ুঃ সম্যক্করণৈরুপহিতো বেণুশঙ্খাদিভিঃ শব্দীভবতি স এব সজ্ঝাতাদীন্ প্রাপ্য বাগ্ ভবতি সজ্ঝাতঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স আদৌ যেষাং স্থানাদীনাং তে সজ্ঝাতাদয়ঃ তান্ প্রাপ্য বাগ্ভবতি বর্ণো ভবতীত্যর্থঃ"। বেণু ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দও এই রীতিতে উৎপন্ন হয়।

বাতাস শরীরের বিভিন্ন স্থানে সংহত হয় বোলেই শব্দ বা "বাক্" উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু স্থান কি ও ক'টী—সে সম্বন্ধে শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যকার বলেছেন: "ত্রীণি স্থানানি";[৩] অর্থাৎ স্থান তিনটী: "উরঃকণ্ঠশিরাত্মকানি শরীরে"—উরঃ, কণ্ঠ ও শির বা মস্তক। সকল শব্দ 'সংবৃত' ও 'বিবৃত' এই দু'রকম বায়ুর গতি বা বিস্তৃতি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়।[৪]

বায়ু বা শব্দের সৃষ্টির পর সঙ্গীতের দিক দিয়ে আমরা তার মাত্রার প্রয়োজনীয়তাকেই বেশী বুঝি। মাত্রার সংখ্যা তিনটী—হ্রস্ব, দীর্ঘ প্লুত।[৫] সঙ্গীতে স্বরের সঙ্গে বর্ণের সম্বন্ধ সর্বদাই থাকে, কেননা স্বর বা সুর ও বাণীর সমন্বিত মূর্তিই সঙ্গীত। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য বর্ণোচ্চারণের তিন রকম রীতি বা ভঙ্গীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে: "অমাত্রস্বরো হ্রস্বঃ,"[৬] অর্থাৎ অকারমাত্র স্বরই হ্রস্ব হয়, যেমন অ, ই, উ, ঋ, ৯। মহর্ষি কাত্যায়নও একথাই বলেছেন। অনুস্বার অর্দ্ধমাত্রাযুক্ত হয়। তার পরেকার সূত্রে[৭] আবার বলা হয়েছে:

২। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।৯

৩। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।১০

৪। "দ্বে করণে" (১।১১)। টীকা: 'সংবৃতবিবৃতাখ্যে বায়োর্ভবতঃ।"

৫। "তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যে "অষ্টৌস্থানানি" আর শিক্ষায় "সপ্ত বাচঃ স্থানানি" কথায় উল্লেখ দেখা যায়। তিন স্থানই পরে সাত বা আট স্থানে পরিণত হয়েছে। 'স্থান' অর্থে ঋক্প্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার উবট বলেছেন: "অধিকরণং বর্ণানাং স্থানশব্দেনোচ্যতে", অর্থাৎ অধিকরণই স্থান।

৬। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।৫৫

৭। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।৫৬

"মাত্রা চ," অর্থাৎ অকার বলতে যতটুকু সময় লাগে তাকেই ঠিক ঠিক 'মাত্রাস্বর' বলে। এই মাত্রাস্বরের স্থায়িত্ব নিয়েই অর্ধমাত্রা, একমাত্রা, দুমাত্রা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন "দ্বিস্তাবান্ দীর্ঘঃ", [৮] ;—অর্থাৎ হ্রস্বের চেয়ে দ্বিগুণকাল স্থায়ী বর্ণোচ্চারণ হোলে তাকে "দীর্ঘ" মাত্রা বলে, যেমন আ, ঈ, ঊ, ঋ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ ইত্যাদি। "প্লুতস্ত্রিঃ,"[৯]—অর্থাৎ হ্রস্বের তিনগুণকাল স্থায়ী বর্ণোচ্চারণ হোলে তাকে "প্লুতস্বর" বলে, যেমন আ-া-া, উ-ই-ই উ-উ-উ। তারপর "হ্রস্বগ্রহণে দীর্ঘপ্লুতৌ প্রতীয়াৎ", [১০] অর্থাৎ হ্রস্বস্বর ব্যবহার করলে বুঝতে হবে দীর্ঘ বা প্লুতস্বরেরও অপেক্ষা আছে। বর্ণ যখন উচ্চারণ ছাড়া প্রকাশ করা যায় না, বর্ণের সঙ্গে শব্দের নিত্য মিতালী তখন সঙ্গীতেও এই উচ্চারণরীতিগুলির আবশ্যকতা আছে, আর সেজন্যেই এগুলি আমাদের জানা উচিত।

এরপর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের প্রকৃতি ও পরিচয় আমাদের জানা দরকার। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যেও এগুলির বিষয় বলা হয়েছে। যেমন "উচ্চৈরুদাত্তঃ", [১১] "নীচৈরনুদাত্তঃ", [১২] "উভয়বাস্তস্বরিতঃ" [১৩]। টীকাকার কাত্যায়ন এগুলি সম্বন্ধে বলেছেন—(ক) "আয়ামেনোর্দ্ধগমনেন গাত্রাণাং যঃ স্বরো নিষ্পদ্যতে স উদাত্তসংজ্ঞো ভবতি"; (খ) "নীচৈর্মার্দবেণাধোগমনেন গাত্রাণাং যঃ স্বরো নিষ্পদ্যতে সোঽনুদাত্তসংজ্ঞো ভবতি"; (গ) "উদাত্তস্যোর্দ্ধগমনং গাত্রাণাং প্রযত্ন অনুদাত্তস্যাধোগমনং গাত্রাণাং প্রযত্ন আভ্যাং প্রযত্নাভ্যাং সমাহারীভূতাভ্যাং যঃ স্বর উচ্চার্যতে স স্বরিতসংজ্ঞো ভবতি"। সংক্ষেপে উচ্চ বা তারশব্দকে আমরা 'উদাত্ত', নীচ বা মন্দ্র (খাদ)-কে 'অনুদাত্ত' ও মধ্য স্বরকে 'স্বরিত' বলি। প্রাতিশাখ্যকার বলেছেন: এই উদাত্তাদি তিনটী স্বরই পরে অর্থাৎ পরবর্তীকালে সাত স্বরে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাকার যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ এঁরাও এই কথা অনুমোদন করেছেন। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব ও এমন কি ঋকৃতন্ত্র, সামতন্ত্র, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় প্রভৃতি প্রাতিশাখ্যও এই কথা সমর্থন করেছে, তবে সকলের মধ্যে কিছু-কিছু ভিন্ন মতও আছে। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যে এ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "উদাত্তাদয়ঃ পরে সপ্ত"[১৪]; অর্থাৎ

৮। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।৫৭
৯। ঐ ১।৫৮
১০। ঐ ১।৬৩
১৪। ঐ ১।১১২
১১। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।১০৮
১২। ঐ ১।১০৯
১৩। ঐ ১।১১০

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী প্রধান বৈদিক স্বর পরবর্তীকালে অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট, তৈরোব্যঞ্জন, তৈরোবিরাম, পাদবৃত্ত ও তাথাভাব্য এই সাত স্বরে পরিবর্তিত হয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্য, মাধ্যন্দিন, বর্ণতত্ত্বপ্রদীপিকা, প্রাতিশাখ্য-প্রদীপ, মাণ্ডুকী, নারদী প্রভৃতি শিক্ষায়ও এই স্বরগুলির নাম স্বীকার করা হয়েছে, তবে কারো কারো মতে "অষ্টৌ স্বরান্", আর তাথাভাব্যের জায়গায় 'জাত্য' এই স্বরের নাম করা হয়েছে মাত্র। বর্ণরত্নপ্রদীপিকা-শিক্ষার মতে—স্বর আটটাই। যেমন বলা হয়েছে,

জাত্যোঽভিনিহিতঃ ক্ষৈপ্রঃ প্রশ্লিষ্টস্তদনন্তরম্।
তৈরোব্যঞ্জনঽএবাথ তৈরোবিরাম এব চ॥
পাদবৃত্তস্ততস্তদ্বত্তাথাভাব্যস্তথাঽষ্টমঃ॥[১৫]

জাত্য, অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট বা প্রাশ্লিষ্ট, তৈরোব্যঞ্জন, তৈরোবিরাম, পাদবৃত্ত ও তাথাভাব্য। কিন্তু অপরাপর শিক্ষায় 'জাত্য' স্বরকে ধ'রে সাতটী মাত্র স্বর বলা হয়েছে। যেমন অথর্ববেদীয়া মাণ্ডুকীশিক্ষায় আছে,

সপ্তস্বরান্ প্রবক্ষ্যামি তেষাং চৈব বলাবলম্।
* * *
অভিনিহিতঃ প্রাশ্লিষ্টো[১৬] জাত্যঃ ক্ষৈপ্রশ্চ পাদবৃত্তশ্চ।
তৈরোব্যঞ্জনঃ ষষ্ঠস্তিরোবিরামশ্চ সপ্তমঃ॥[১৭]

একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করবার যে, ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যের ২য় পটলের ২৩ সূত্রে "তে ক্ষৈপ্রাঃ প্রকৃতোদয়াঃ" একথা বোলে ক্ষৈপ্রকে "সন্ধি" ("তে ক্ষৈপ্রাঃ সন্ধয়ঃ" —উবটভাষ্য) বলা হয়েছে। ২।৩৪ সূত্রে "অথাভিনিহিতঃ সন্ধিরেতৈঃ * *" বলা হয়েছে। ৩।১৩ সূত্রে ক্ষৈপ্র ও অভিনিহিতকেও 'সন্ধি' বলা হয়েছে—"ক্ষৈপ্রসন্ধিষু চাভিনিহিতসন্ধিষু * *"—(উবটভাষ্য)। কিন্তু ৩।১৮ সূত্রে আবার আছে,

বৈবৃত্ততৈরোব্যঞ্জনৌ ক্ষৈপ্রাভিনিহিতৌ চ তান্।
প্রশ্লিষ্টং চ যথাসন্ধি স্বরানাচক্ষতে পৃথক্॥

এই সূত্রের ভাষ্যে উবট পরিষ্কারভাবে বলেছেন : "তিরোঽন্তর্দ্ধানং ব্যঞ্জনং

১৫। শিক্ষাসংগ্রহ, (কাশী সং), পৃঃ ১২২
১৬। অপরাপর জায়গায় "প্রশ্লিষ্ট" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
১৭। শিক্ষাসংগ্রহ, (কাশী সং), পৃঃ ৪৬৯

স্বস্তেতি তৈরোব্যঞ্জনঃ। * * স্বারান্ (বা স্বরান্) কথয়ন্তি ব্যালি প্রভৃতয়ঃ"। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঋকৃপ্রাতিশাখ্যকার ক্ষৈপ্র, অভিনিহিত প্রভৃতিকে 'সন্ধি' বলেছেন, কিন্তু ঠিক স্বর বলতে চান নি। তবে ব্যালি বা ব্যাড়ি প্রভৃতি আচার্যেরা এদের স্বর বোলে স্বীকার করেছেন যা ঋকৃপ্রাতিশাখ্যকার ঠিক করেন নি। ৩য় পটল ২৮ এবং ১৩ পটল ৩৭ সূত্রে আচার্য ব্যালির নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু আশ্চর্য যে, তৃতীয় পটলের ৩৪ সূত্রে "জাত্যোঽভিনিহিতশ্চৈব ক্ষৈপ্রঃ প্রশ্লিষ্ট এব চ। এতে স্বারাঃ প্রকম্পন্তে * *" শ্লোকে জ্যাত্যাদি যে 'স্বর' একথা প্রাতিশাখ্যকার আবার নিজেই উল্লেখ করেছেন।

শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যের টীকায় কাত্যায়ন কিন্তু অভিনিহিতাদিকে সাত স্বর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ঋক্ ও তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য "মন্দ্রাদিষু ত্রিষু স্থানেষু সপ্তসপ্ত যমাঃ"[১৮] এই কথা উল্লেখ ক'রে "যমাঃ" অর্থে বলেছে 'স্বরসমূহ'। অবশ্য শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যকার ১২৭ সূত্রে "সপ্ত" শব্দে সাতস্বরেরই ইঙ্গিত করেছেন। এসম্বন্ধে কাত্যায়ন আবার ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরের কথা উল্লেখ ক'রেও বলেছেন "অপরে ত্বাহুঃ জ্যাত্যাভিনিহিত * *"। সুতরাং ভাষ্যকার কাত্যায়নের অভিমতে 'সপ্তস্বর' বল্‌তে ষড়্‌জাদি সাত স্বর অথবা জাত্যাদি সাত স্বরও হয়। কাজেই দেখা যায় যে, উদাত্তাদি তিনটী স্বর থেকে পরে সাত স্বর পরিণতি লাভ করেছে। যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু তাঁর শিক্ষায় স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করেছেন ;

> গান্ধর্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরাঃ।
> ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ ॥
> উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
> শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥[১৯]

গান্ধর্ববেদে বা গীতিশাস্ত্রে যে সাতটী স্বর ষড়্‌জাদি নামে কথিত, বেদে অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বে তারাই উদাত্তাদি নামে পরিচিত। সুতরাং একথা ঠিক যে, বৈদিক স্বর উদাত্তাদি থেকেই লৌকিক বা বেণুস্বরে প্রচলিত ষড়্‌জাদি সাত স্বর উৎপন্ন হয়েছে। তাই যাজ্ঞবল্ক্য লৌকিক সাত স্বরের সৃষ্টিক্রম দেখাবার জন্যে বলেছেন,

উদাত্ত	থেকে	নিষাদ	(নি)
		গান্ধার	(গা)

১৮। Chapter XXIII, p. 11 ১৯। শিক্ষাসংগ্রহ, (কাশী সং), পৃঃ ১০২

অনুদাত্ত	”	ঋষভ	(ঋি)
		ধৈবত	(ধা)
স্বরিত	”	ষড়্‌জ	(সা)
		মধ্যম	(মা)
		পঞ্চম	(পা)[২০]

মহর্ষি কাত্যায়নের অভিমত অনুসারেই যদি ধরা যায় যে, “উদাত্তাদয়ঃ পরে সপ্ত” এই ১১২ সূত্রে অভিনিহিত প্রভৃতি সাত স্বরকেই বোঝায় তবে তাদের মধ্যে প্রাতিশাখ্যকার বলেছেন : ‘ত্রয়ো নীচস্বরপরাঃ’[২১], অর্থাৎ অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র ও প্রশ্লিষ্ট স্বর তিনটী নিম্নস্বর হবে। এর পর প্রাতিশাখ্যকার আবার ১১৪-১২০ শ্লোকগুলিতে প্রত্যেক স্বরের নামের ও প্রকৃতির সার্থকতা দেখিয়েছেন। পুনরায় ১২৭ সূত্র থেকে দেখা যায়—ঋক্, যজু ও সামবেদ প্রভৃতিতে কোন্ কোন্ স্বর ব্যবহার করা হবে সে-সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছেন। যেমন ১২৭ সূত্রে বলা হয়েছে : “সপ্ত”। কাত্যায়ন এই সূত্রের টীকায় ব্যাখ্যা করেছেন : “সামসু সপ্তস্বরানাহুঃ ষড়্‌জ-ঋষভ-গান্ধার-মধ্যম-পঞ্চম-ধৈবত-নিষাদান্ * *,” অর্থাৎ সামগানে ষড়্‌জাদি সাতটী স্বর ব্যবহার করা হোত।[২২] এর পর টীকাকার নিজেই প্রশ্ন করেছেন : ‘কেন’ ? যজুর্বেদে তো দেখা যায় যে, অধ্বর্যুর পক্ষে সামগান বিহিত আছে, শতপথব্রাহ্মণেও একথার উল্লেখ আছে, সুতরাং ‘সামগানে’ (“সামসু”) শব্দটী কেবল অধ্বর্যুই গান করবেন এই অর্থে সামান্য লক্ষণ দেখিয়ে বলা হয়েছে যে, নচেৎ “অপরে ত্বাহুঃ”, অর্থাৎ কারো কারো মতে অভিহিতাদি সাত স্বর সামগানে ব্যবহার করা হোত। তারপর বাজসনেয়িরাও তাথাভাব্য

২০। আমরা অন্যত্র দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বৈদিক স্বর মধ্য বা স্বরিত থেকে উৎপন্ন ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম (স-ম-প) কি ক'রে আদি ও স্বয়ম্ভু স্বর হোতে পারে। সামিক যুগের গোড়ার দিকে সামগানে এই তিন স্বরেরই আরোহণ ও অবরোহণক্রমে গতি ছিল। পরে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরে সামগান লীলায়িত হয়েছিল।

২১। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।১১৭

২২। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যে (১৩ পটল ৪৪ সূত্র) যেখানে বলা হয়েছে : “সপ্ত স্বরা যে যমাস্তে” সেখানে গান্ধর্ববেদে যে ষড়্‌জাদি স্বর ব্যবহার করা হোত তার কথাই বলা হয়েছে। তবে তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে (২৩।১২ সূত্র).কিন্তু স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামগানে ক্রুষ্ট-প্রথমাদি সাতটী বৈদিক স্বর সামগানে ব্যবহার করা হোত। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার উবটও সেকথা উল্লেখ করেছেন।

স্বরটীকে ব্যবহার করতে চান না। যজুর্বেদে স্পষ্টই বলা হয়েছে: "ত্রীন্",[২৩] কেবল উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী স্বরই সামগানে ব্যবহার করা হোত। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণে আবার দুটী স্বর—যেমন উদাত্ত আর অনুদাত্ত ব্যবহৃত হোত এবং সেকথা প্রাতিশাখ্যকার "দ্বৌ"[২৪] সূত্রে ইঙ্গিত করেছেন। তারপর "একম্"[২৫] এই সূত্রে তানলক্ষণে যে একটী মাত্র স্বর উদাত্তই যজ্ঞকর্মে ব্যবহার করা হোত সেকথাও বলা হয়েছে।

অবশ্য শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যকারের ইঙ্গিতই ঠিক, কেননা সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রেও বলা হয়েছে: "সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্-পৃথক্।"[২৬] যেমন কোন শাখা সামগান ছ'টী স্বরে, কৌথুমশাখা দুই অথবা সাত স্বরে এবং অন্যান্য শাখা কেউ পাঁচ অথবা চার স্বরে গান করতেন। তাছাড়া আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ এই ক্রমবিকাশের ধারাও যে স্বরে ব্যবহৃত হোত তা ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাতিশাখ্য, শিক্ষা ও প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র সকলেই স্বীকার করেছে। সিংহভূপাল (১২২০ খৃ') সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকায় এ'সম্বন্ধে বলেছেন,

> একস্বরপ্রয়োগো হি আর্চিকস্ত্বভিধীয়তে।
> গাথিকো দ্বিস্বরো জ্ঞেয়স্ত্রিস্বরশ্চৈব সামিকঃ॥
> চতুঃস্বরপ্রয়োগো হি স্বরান্তরক উচ্যতে।
> ঔড়ুবঃ পঞ্চভিশ্চৈব ষাড়বঃ ষট্স্বরো ভবেৎ।
> সংপূর্ণঃ সপ্তভিশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গীতয়োক্তৃভিঃ॥[২৭]

আর্চিক এক স্বরের, গাথিক দুটী স্বরের, সামিক তিন স্বরের, স্বরান্তর চার স্বরের, ওড়ব পাঁচ স্বরের, ষাড়ব ছয় স্বরের এবং সম্পূর্ণ সাত স্বরের গান। রত্নকারের টীকাকার কালিনাথ (১৪৪৬—১৪৬৫ খৃ') বলেছেন: "যজ্ঞপ্রয়োগেষ্বৃচামেক-স্বরাশ্রয়ত্বাৎ"—বৈদিক যুগে যজ্ঞে আর্চিক গান করা হোত, আর গাথা সম্বন্ধে গাথিক, সামগান সম্বন্ধে সামিক ইত্যাদি বুঝতে হবে। কালিনাথ সামিক গান সম্বন্ধে আবার একটি নতুন কথা বলেছেন; যেমন: "সাম্নাং তু ত্রিস্বরত্বং সপ্তস্বর-

২৩। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।১২৮ ২৪। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ১।১২৯
২৫। ঐ ১।১৩০ ২৬। পুষ্পসূত্র, (কাশী সং) পৃঃ ১১৮
২৭। সঙ্গীতরত্নাকর ১।৪।৩৯ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে বক্তব্য যে, প্রমাণশ্লোক-গুলিতে "তথা চাহ নারদঃ" বোলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এই নারদ মকরন্দকার কি, শিক্ষাকার তা বলা কঠিন, কারণ এই শ্লোকগুলি মকরন্দে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

বন্থেহপি মন্দ্রাদিস্থানত্রয়বিবক্ষয়া ;" অর্থাৎ কালিনাথের বক্তব্য যে, 'সামিক' বল্‌তে তিন স্বরের সমষ্টিকে বুঝায়, তবে তিন স্বরের এখানে রহস্যজনক একটি ব্যাখ্যা এই যে, সামগান সাত স্বরেই[২৮] গাওয়া হোত, কিন্তু মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে ঐ সাত স্বর লীলায়িত হয় বোলে 'তিন স্বরবিশিষ্ট' বল্‌তে তিন স্থানকেই বুঝ্‌তে হবে। কালিনাথের এই ব্যাখ্যা আমাদের ঠিক মনঃপূত নয়, কেননা তিনি ঐতিহাসিক বিকাশের স্তরকে ঠিক লক্ষ্য করেছেন বোলে মনে হয় না। সামিক যুগের গোড়ায় সামগান যখন তিন স্বরে গাওয়া হোত তাকেই বলা হোত 'সামিক গান'; তবে সামগানকে ক্রমশঃ তিন থেকে সাত স্বরে গাওয়ার রীতি প্রচলিত হয় সামিক যুগেই, কেননা নারদীশিক্ষায় আমরা দেখি, নারদ যখন "যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" বোলে বৈদিকের সঙ্গে লৌকিক গানের একটি মিতালী পাতালেন তখনো বৈদিক সামগানের প্রচলন একমাত্র ঋষি-সমাজে প্রচলিত ছিল, আর সাধারণের কাছে তা বিশেষ অনাদরের জিনিষ হোয়ে দাঁড়িয়েছিল বলা যায়। সামিক গানে তিনটি স্বর মাত্র ছিল, আর ঐ সময়েই স্বরান্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ গানেরও সৃষ্টি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সামিক যুগ সামগান যতদিন প্রচলিত ছিল ততদিনকে নিয়েই ধরতে হবে, কাজেই কালিনাথের ব্যাখ্যা কতদূর সমীচীন তা ঐতিহাসিকেরা আলোচনা ক'রে দেখ্‌বেন।

শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যের ১ম অধ্যায় ১৩০ সূত্রের পর ৮ম অধ্যায়ের ৩০ শ্লোক পর্যন্ত স্বর, বর্ণ, আখ্যাত প্রভৃতি সম্বন্ধে যা যা আলোচনা করা হয়েছে তা বর্তমান সঙ্গীতের ব্যবহারিক সাধনার পক্ষে বিশেষ-কিছু জানার জিনিষ নয়। তবে ৮ম অধ্যায়ের ৩১ সূত্রে "বর্ণদেবতাঃ" প্রভৃতি সূত্রে বর্ণের দেবতাদের উল্লেখ আছে। যেমন, "আগ্নেয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ[২৯], কণ্ঠস্থান থেকে যে সব বর্ণ উৎপন্ন হয় তাদের দেবতা অগ্নি; "নৈঋত্যা জিহ্বামূলীয়াঃ",[৩০] জিহ্বামূল থেকে যে সকল বর্ণের সৃষ্টি হয় তাদের দেবতা নিঋতি,

২৮। কালিনাথ এখানে সাত স্বর বল্‌তে ষড়্‌জাদি, অভিনিহিতাদি বা প্রথমাদি কোন্‌টা সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নি। তবে নারদীশিক্ষাকারের ইঙ্গিত থেকে এই সাত স্বরকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়াদিই বুঝ্‌তে হবে। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যের ১।১২৭ সূত্রের টীকায় মহর্ষি কাত্যায়ন "সামসু * * ষড়্‌জ-ঋষভ" ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা এই মন্তব্যকে সমীচীন হিসাবে মনে করি না, কারণ ষড়্‌জাদি হোল লৌকিক স্বর, বৈদিক নয়।

২৯। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ৮।৩২ ৩০। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ৮।৩৩

"সৌম্যাস্তালব্যাঃ",[৩১] তালুস্থান থেকে যে সব বর্ণ উৎপন্ন হয় তাদের দেবতা সোম বা চন্দ্র, "রৌদ্রা দন্ত্যাঃ",[৩২] দন্ত্যস্থান থেকে যে সকল বর্ণ উৎপন্ন হয় তাদের দেবতা রুদ্র, "ওষ্ঠ্যা আশ্বিনাঃ",[৩৩] ওষ্ঠস্থান থেকে যে বর্ণসকলের সৃষ্টি হয় তাদের দেবতা অশ্বি, "ব্যায়ব্যা মূর্দ্ধন্যাঃ",[৩৪] মূর্দ্ধস্থান থেকে যে সব বর্ণ উৎপন্ন হয় তাদের দেবতা বায়ু, আর এই স্থানগুলি ছাড়া অপরাপর স্থান থেকে যে সব বর্ণ উৎপন্ন হয় তাদের দেবতা বৈশ্বদেবা বা বিশ্বেদেব।

এর পর ৮ম অধ্যায়ের ৪৯ সূত্রে পদের গোত্র এবং ৫১ সূত্রে পদের দেবতারও নাম করা হয়েছে। এ'থেকে মনে হয় যে, হিন্দুর আধ্যাত্মিক মন তার সব-কিছুকে পবিত্রতার দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌তে চায় এবং এই সংস্কার ও দৃষ্টিভঙ্গী তার আবহমান-কাল প্রচলিত আছে। প্রাতিশাখ্যে বর্ণ, স্বর বা পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা ঔপনিষদিক যুগেই গড়ে উঠেছিল এবং এর বীজ রোপণ করা হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। ঋগ্বেদে মিত্র, বরুণ, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতিকে মূর্তিমান দেবতা বোলে উপাসনা করা হোত ও সমস্ত প্রকৃতির ভেতর একটা জীবন্ত প্রাণশক্তির কল্পনা ক'রে তার কাছে আত্ম-নিবেদন করা আর্য-নরনারীদের একটি স্বতঃপ্রবৃত্তি হিসাবে গণ্য ছিল, আর সেই থেকেই প্রত্যেক জিনিষের পিছনে প্রত্যক্ষ এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা দেবী কল্পনা করা তাদের বৈশিষ্ট্য হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, জড় থেকে চৈতন্যে বা জগৎ থেকে জগতাতীত সত্ত্বায় উপনীত হবার এটাই হোল একটা প্রকৃষ্ট উপায় এবং এই উপায়ই ভারতের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, চারুকলা ও ধর্ম সব-কিছুতে প্রবেশ লাভ করেছে।

৩১। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ৮।৩৪ ৩২। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ৮।৩৫
৩৩। ঐ ৮।৩৬ ৩৪। ঐ ৮।৩

নবম অধ্যায়

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের মোটামুটি সংস্করণ পাওয়া যায়: (১) উইলিয়াম ডি. হুইট্‌নি (W. D. Whitney) সম্পাদিত 'ত্রিভাষ্যরত্ন'-ভাষ্য সহিত *Notes on the Taittiriya-Pratisakhya* নাম দিয়ে—যেটি মনীষী হুইট্‌নি ইংরেজী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর সোসাইটীতে দান করেছিলেন। এটীর পাণ্ডুলিপির (*MSS.*) অপরপীঠে লেখা ছিল "Krishna-yajuh-pratisakhya by Kartikeya" (কার্তিকেয়-প্রণীত কৃষ্ণযজুঃপ্রাতিশাখ্য); (২) *Bibliotheca Sanskrita, No, 33*-র সোমচার্য-বিরচিত 'ত্রিরত্নভাষ্য' ও গার্গ্য গোপালযজ্ঞ-বিরচিত 'বৈদিকাভরণব্যাখ্যা' (মহীশূর, ইংরেজী ১৯০৬ সংস্করণ)। শেষেরটীর সম্পাদনা করেন কে. রঙ্গাচার্য। অবশ্য শেষোক্ত সংস্করণটীতে 'কার্তিকেয়-প্রণীত কৃষ্ণযজুঃপ্রাতিশাখ্য' ইত্যাদি নামের কোন উল্লেখ নেই।

তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের ১ম অধ্যায়ে ৩৮-এর সূত্রে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর-তিনটীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মনীষী হুইট্‌নী উদাত্তের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন acute, অনুদাত্তের grave (literally 'not elevated') ও সমাহার স্বরিতের circumflex। দ্বিতীয় অধ্যায় ৪র্থ সূত্রে নাদ বা স্বরের সৃষ্টি কিভাবে হয় তার উল্লেখ আছে: "সংবৃতে কণ্ঠে নাদঃ ক্রিয়তে", অর্থাৎ কণ্ঠ যখন বদ্ধ বা সংকুচিত হয় তখন স্বর-উৎপন্ন হয়। হুইট্‌নি নাদের ইংরেজী করেছেন 'tone'। ঋক্‌প্রাতি-শাখ্যের ১৩।১ এবং বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যে ১।১১ সূত্রেও এই স্বরোৎপত্তির বর্ণনা আছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের ৯ম সূত্রের ওপর বৈদিকভরণব্যাখ্যার উল্লেখ মূল্যবান, কিন্তু সোমাচার্য এই সূত্রটী-সম্বন্ধে কোন-কিছুই লিখেন নি। গার্গ্য গোপালযজ্ঞ বলেছেন: "উত্তরে অধ্যায়ে উদাত্তাদিস্বরস্বরূপনিরূপণার্থং সামবেদ-প্রসিদ্ধান্ ক্রুষ্টপ্রথমাদীন্ সপ্তস্বরান্ ব্যক্তি"। উদাত্তাদি স্বর নির্ণয় করার জন্যে ক্রুষ্ট-প্রথমাদি সামবেদের সাতটি স্বর সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকার যে পরিচয়ের

কথা উল্লেখ করেছেন, ঐতিহাসিক নথিপত্রের দিক থেকে তার একটি অভিনবত্ব আছে। ঋক্ প্রভৃতি প্রাতিশাখ্যে 'যমাঃ' অর্থে 'স্বরাঃ'—'ষড়্জাদয় ইতি', আবার তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যের "মন্দ্রাদিষু ত্রিষু স্থানেষু সপ্ত-সপ্ত যমাঃ" (২৩।১৩) এই সূত্রের সোমাচার্য দু'রকম অর্থ করেছেন : (১) "ত্রিষু মন্দ্রাদিষু স্থানেষু একৈকস্মিন্ সপ্ত-সপ্ত যমাঃ ভবন্তি"; ও (২) "যমাঃ [১] স্বরা উদাত্তাদয় ইতি"। যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডুকী প্রভৃতি শিক্ষায় "উদাত্তশ্চানুদাত্তেন প্রশ্লিষ্টো ভবতি স্বরঃ"—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় প্রভৃতিকে স্বর বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় "অষ্টৌ স্বরান্ প্রবক্ষ্যামি * * জাত্যোঽভিনিহিতঃ" প্রভৃতি উল্লিখিত হয়েছে। অবশ্য লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের কথা ছেড়ে দিলেও বৈদিক স্বর যে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রচলিত ছিল সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাছাড়া শিক্ষাগুলির মাধ্যমে আমরা জান্তে পারি যে, ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বর উদাত্তাদি তিনটী বৈদিক স্বর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শিক্ষাকার যাজ্ঞবল্ক্য ৭ম শ্লোকে তার পরিচয় দিয়েছেন,

উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥

অনুদাত্ত থেকে ঋষভ ও ধৈবত (রি ধ), উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গান্ধার (নি গ) এবং স্বরিত থেকে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম (সমপ) বিকাশ লাভ করেছে।[২] সুতরাং উদাত্তাদি তিন স্বরের মাধ্যমে ষড়্জাদি লৌকিক সাত স্বরকে নিরূপণ করার প্রসঙ্গ যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত বোলে মনে হয়, কিন্তু বৈদিক উদাত্তাদি তিন অথবা উদাত্তাদি প্রচয় এই চার স্বরকে নিরূপণ করার জন্যে বৈদিক ক্রুষ্টাদি সাত স্বরের

১। অধ্যাপক হুইট্‌নি এখানে মন্তব্য করেছেন: "As synonym of *yama*, the commentator gives *svara*, doubtless here to be understood as 'musical note, tone of the gamut', he adds 'acute, and so on,' which might be said blunderingly, as if the word he had just given meant 'accent' instead of 'musical tone' and also intelligently, as implying the identity of accent with musical pitch—an identity which is the ground of their common appellation (Vide *Rik. Prat.* XIII. 7).

"We are to *assume*, without much question, that the scales pass into one another by a *constant ascending series*, like the bass and suprano scales in our own (European) system of musical notation".

২। প্রজ্ঞানানন্দ : 'রাগ ও রূপ'—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সার্থকতা আমাদের কাছে একটু অভিনব বোলে মনে হয়। কিন্তু নূতন হিসাবে মনে করার আবার কোন কারণও নেই, কেননা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত 'স্বর' তিনটী উচ্চ, নীচ ও মধ্য অথবা তার, মন্দ্র ও মধ্য (তারা, উদারা, মুদারা) হিসাবেই বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে 'স্থান' হিসাবে আছে। এই তিনটী স্থানে যেমন লৌকিক সাত স্বর লীলায়িত, তেমনি বৈদিক প্রথমাদি সাত স্বরও ছিল। সুতরাং ক্রুষ্টাদি সামবৈদিক সাত স্বর দিয়ে উদাত্তাদি স্থান-স্বরের স্বরূপ নির্ণয় ("উদাত্তাদিস্বরস্বরূপনিরূপণার্থম্") করাও স্বাভাবিক এবং তার পরিচয় ২৩।১৫-১৭ সূত্রগুলিতে সুপরিস্ফুট করা হয়েছে। এছাড়া ঐ ৯ম সূত্রের ব্যাখ্যায় গার্গ্য গোপালজ্জ নিজেই লিখেছেন: "অথ ধৃতাৎ পরেষাং ত্রয়াণাং স্বরাণামুৎপত্তিমাহ * * নীচৈঃ কুর্বন্তি অবক্ষিপ্তং কুর্বন্তি। অত্রৈবদবক্ষিপ্ত-শ্চতুর্থাখ্যস্স্বরঃ। অবক্ষিপ্ততরো মন্দ্রাখ্যঃ। অবক্ষিপ্ততমোঽতিস্বার্যসংজ্ঞঃ। এবমেতে হৃদয়প্রদেশে জায়ন্ত ইতি নীচৈশ্‌শব্দবাচ্যা ভবন্তি। অত এবোক্তং 'নীচৈরনুদাত্তঃ' (১-৩৯) ইতি"। 'অবক্ষিপ্ত' অর্থে নীচ (খাদ) বা অনুদাত্ত, 'ঈষৎ অবক্ষিপ্ত' (নীচ) সামবেদের চতুর্থ স্বর। 'অবক্ষিপ্ততর' (আরো নীচ) অর্থে সামবেদের মন্দ্র স্বর, অবক্ষিপ্ততম (তারো নীচ) অর্থে অতিস্বার্য। প্রাতিশাখ্যকারের অভিপ্রায় যে, এ'সমস্ত স্বরই হৃদয়প্রদেশ (heart) থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যদিও সোমাচার্য ঐ সম্বন্ধে কোন-কিছু বলেন নি।

বাক্য তথা শব্দ সাত রকমের সে সম্বন্ধে প্রাতিশাখ্যকার বলেছেন: "সপ্ত বাচ স্থানানি ভবন্তি" (২৩।৪), যেমন উপাংশু, ধ্বনি, নিমদ, উপব্দিমৎ, মন্দ্র, মধ্যম, ও তার—"উপাংশুধ্বনিনিমোদোপব্দিমন্মন্দ্রমধ্যমতারাণি"। অধ্যাপক হুইট্‌নি এদের ইংরেজী অনুবাদ করেছেন inaudiable, murmur, wishper, mumbling, soft, middle, loud. তার মধ্যে মন্দ্র (খাদ—soft) বক্ষে, মধ্য বা মধ্যম (middle) কণ্ঠে এবং তার (উচ্চ—loud) শিরে; অর্থাৎ বক্ষে, কণ্ঠে ও শিরে বাতাস ব্যাহত (আঘাত প্রাপ্ত) হোয়ে মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বরে রূপায়িত হয়। পাণিনীয়শিক্ষায় (৩৬-৩৭) আছে,

> প্রাতঃ পঠেন্নিত্যমুরস্থিতেন স্বরেণ শার্দূলরুতোপমেন।
> মাধ্যন্দিনে কণ্ঠগতেন চৈব চক্রাহ্বসঙ্কূজিতসংনিভেন॥
> তারন্তু বিদ্যাৎসবনং তৃতীয়ং শিরোগতন্তচ্চ সদা প্রয়োজ্যম্।
> ময়ূরহংসান্যভৃতস্বরাণাং তুল্যেন নাদেন শিরস্থিতেন॥

প্রাতঃকালে বেদপাঠ বক্ষ থেকে উত্থিত স্বরযোগে করা উচিত, যার শব্দ

হবে শার্দুলের ডাকের (স্বরের) মতন, মধ্যস্থে কণ্ঠ থেকে সৃষ্ট শব্দে—যার শব্দ চক্রবাকের ডাকের মতন শোনাবে, তৃতীয় স্বর শির থেকে নির্গত হবে ও সেই শব্দ ময়ূর, হংস ও কোকিলের স্বরের মতন উচ্চ বা তীব্র (তার) হবে। ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্যেও (১৩।৭) স্থানের কথা উল্লিখিত হয়েছে—"তেষাং স্থানং প্রতি নাদাত্তদুক্তম্"। ভাষ্যকার উবট লিখেছেন: "এবং শ্বাসাদীনি ত্রীণ্যনুপ্রদানানি বর্ণকালস্থানানি ভবন্তি। নাধিকানি। নন্যূনস্থানানি।" বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যেও (১।১০।৩০) তিনটী স্বরস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় তার (উচ্চ) শব্দের স্থান নির্ণীত হয়েছে ভ্রূমধ্যে।

উদাত্তাদি তিনটী স্বর ছাড়া তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যকার ১২ সূত্রে ক্রুষ্টাদি সাতটী বৈদিক স্বরের নামোল্লেখ করেছেন—"ক্রুষ্টপ্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থমন্দ্রাতিস্বার্যাঃ" এবং ১৩ সূত্রে ক্রুষ্টাদি স্বরগুলির স্বরূপ কিভাবে উপলব্ধি হয় সে-সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন: "তেষাং দীপ্তিজ্জোপলব্ধিঃ"। "দীপ্তি" অর্থে সপ্ত যম বা স্বরের উত্তরোত্তর দীপ্তি, এজন্যে ত্রিভাষ্যরত্নে ১৩ সূত্রের অর্থ করা হয়েছে: "তেষাম্ খলু সপ্তযমানাম্ উত্তরোত্তরদীপ্তিজা পূর্বপূর্বোপলব্ধিঃ স্যাৎ। তৎ কথম্: অতিস্বার্যদীপ্তিজা মন্দ্রোপলব্ধিঃ, মন্দ্রাশ্চতুর্থোপলব্ধিঃ, চতুর্থাৎ তৃতীয়ঃ, তৃতীয়াদ্দ্বিতীয়ঃ, দ্বিতীয়াৎ প্রথমঃ, প্রথমাৎ ক্রুষ্টঃ উপলভ্যতে"। অধ্যাপক হুইট্‌নি ১৩ সূত্রটীর ওপর বিশেষ আলোকপাত করতে পারেন নি, কেননা তিনি এটীকে রূপকের পর্যায়ে ফেলেছেন এবং ভাষ্যকারের বিবৃতিকে একরকম অর্থহীনই বলেছেন,

"The comment throws no light upon it, nor do I get any from any other quarter. * * Perhaps the expression is nothing more than one violently figurative, signifying that each tone receives light from, or is set in its true light by the rest, or the ones, or one nearest it: only, in that case, we should look for some word combined with *dipti* to indicate the source of the light."

গার্গ্য গোপালযজ্ঞ তাঁর বৈদিকাভরণব্যাখ্যায় "তেষাং দীপ্তিজ্জোউলব্ধিঃ" সূত্রটী-সম্বন্ধে লিখেছেন: "নমু যদ্যপ্যেষাং দীপ্তিভেদাৎ পরস্পরভেদোপলব্ধির্জায়তে তথাপি কীদৃশো দীপ্তিঃ কস্যোপলব্ধিহেতুরিত্যেতত্তু ন জ্ঞায়তে। কিং চ তদবগমেঽপি অস্মাৎ শাখাবর্তিনাং স্বরাণাং কিমায়াতামিত্যত আহ * *"। এর পর "মন্দ্রাদয়ো দ্বিতীয়ান্তাশ্চত্বারস্তৈত্তিরীয়কাঃ" সূত্রের ব্যাখ্যায় পণ্ডিত গার্গ্য "দীপ্তিজ্জোপলব্ধিঃ" সূত্রটীর ভাব সুপরিস্ফুট করেছেন। ঠিক এর

আগে তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যকার "দ্বিতীয়প্রথমক্রুষ্টাস্ত্রয় আহ্বারকাস্বরাঃ" সূত্রে* আহ্বারক-সম্প্রদায় যে তাঁদের সামগানে বা বৈদিকগানে মাত্র প্রথম, দ্বিতীয় ও ক্রুষ্ট স্বর তিনটী ব্যবহার করতেন সে-কথা উল্লেখ করেছেন। ত্রিরত্ন-ভাষ্যকারও এ' সম্বন্ধে লিখেছেন : "দ্বিতীয়শ্চ * * ত্রয়ঃ আহ্বারকস্বরাঃ স্যুঃ এষাম্ তৈরেব প্রয়োগো বেদিতব্য। আহ্বারকানাম্ স্বরা আহ্বারকস্বরাঃ"। অধ্যাপক হুইট্‌নি "মন্দ্রাদয়ো দ্বিতীয়ান্তাশ্চত্বারস্তৈত্তিরীয়কাঃ" সূত্রটীর অনুবাদ করেছেন : "The four beginning with *mandra* and ending with 'second' are those of the Taittiriyas"; অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও মন্দ্র তৈত্তিরীয়দের সামস্বর। পণ্ডিত গার্গ্য তাঁর বৈদিকাভরণভাষ্যে আহ্বারক-সম্প্রদায়ের ক্রুষ্ট, প্রথম ও দ্বিতীয় এই তিনটী স্বরের প্রসঙ্গ তুলেও উল্লেখ করেছেন : "আহ্বারকা—উৎক্ষেপিণ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়প্রথমক্রুষ্টা * *। তেন তৃতীয়াখ্যো মধ্যমস্বরঃ। স মধ্যম উৎক্ষেপিতায়া অবধির্ভবতি। ততশ্চ তৃতীয়াখ্যান্ মধ্যমস্বরাদয়ামাদিভিরুৎক্ষেপকারণৈ কিঞ্চিৎদুৎক্ষিপ্তো দ্বিতীয়াখ্য-স্বরঃ। উৎক্ষিপ্ততরঃ প্রথমাখ্যঃ। উৎক্ষিপ্ততমঃ ক্রুষ্টাখ্যঃ। এতেন চতুর্থাদীনাং পরেষাং ত্রয়াণাং স্বরানামবক্ষেপিত্বমপি দর্শিতং ভবতি। তত্র মধ্যমাৎ তৃতীয়াখ্যাৎ স্বরাৎ অন্ববসর্গাদিভিরবক্ষেপকারণৈঃ কিঞ্চিদবক্ষিপ্তঃ চতুর্থাখ্যস্বরঃ। অবক্ষিপ্ততর মন্দ্রাখ্যঃ। অবক্ষিপ্ততমঃ অতিস্বার্যাখ্যঃ। তদেবং সামবেদবর্তিনঃ ক্রুষ্টাদয়ঃ সপ্তস্বরাঃ সম্যঙ্ নিরূপিতাঃ। তেষু মন্দ্রাদয়ো দ্বিতীয়ান্তাশ্চত্বারঃ স্বরাঃ প্রতিলোমক্রমেণ মন্দ্রচতুর্থতৃতীয়দ্বিতীয়াস্তৈত্তিরীয়কা ভবন্তি। * * যথাক্রমমস্মৎ স্বাধ্যায়বর্তিনঃ অনুদাত্তস্বরিতপ্রচয়োদাত্তা ভবন্তীত্যর্থঃ (১৬-১৭)"। এখানে অধ্যাপক হুইট্‌নি ও বৈদিকাভরণব্যাখ্যাকার গার্গ্য গোপালযজ্বের মধ্যে সামস্বর ও উদাত্তাদি স্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে সামান্য কিছু মতদ্বৈত আছে। তবে অধ্যাপক হুইট্‌নি দ্বিতীয় স্বরকে উদাত্ত, মন্দ্রকে অনুদাত্ত এবং তৃতীয় ও চতুর্থকে যথাক্রমে স্বরিত ও প্রচয় বলেছেন।

অধ্যাপক হুইট্‌নি লিখেছেন,

"The order of the four tones is not made entirely clear by the rule, nor by the commentator's explanation of it. The latter says that 'the

৩। এই ২৩শ অধ্যায়ের সূত্রটীর সূত্রসংখ্যায় কিছুটা বিপর্যয় দেখা যায়; যেমন অধ্যাপক হুইট্‌নি-সম্পাদিত সংস্করণে এটীর সূত্রসংখ্যা দেওয়া হয়েছে ১৪ এবং কে. রঙ্গাচার্য-সম্পাদিত মহীশূর সংস্করণে এটীর সংখ্যা ১৩।

mandra of the Taittiriyas is born or produced from the 'second', and if the expression be used in a manner akin with those under rule 13, this would imply that the *mandra* came first, and the '*second*' after which would, of course, accord best with the value of the two names; *mandra* would thus be the lowest of the four *yamas*, as it is the lowest of the three *sthanas*. But the commentator then goes on to say that the series of *yamas* thus 'begining with second' is styled tone-quaternion (*chaturtham*), and this would imply that the order is second, *mandra*, third, fourth. yet further, he add that 'second' is *udatta*, *mandra* is *anudatta* and 'third' and 'fourth' are *svarita* and *pracaya*."

অধ্যাপক হুইট্‌নি পুনরায় লিখেছেন,

"This makes the impression of a purely formal and unintelligent identification, * * which, however, are in respect to tone only three, since the *pracaya* is 'of *udatta* tone' XXI. 10 : স্বরিতাৎ সংহিতায়ামনুদাত্তানাং প্রচয় উদাত্তশ্রুতিঃ" ; i. e., 'of grave syllables following a circumflex in Samhita there is *pracaya* having the tone of acute (The theory of the *pracaya* accent has been so fully set forth in the note to *Atharva-Pratishakhya*, iii. 65).

এক্ষণে গার্গ্য গোপালযজ্ব ও অধ্যাপক হুইট্‌নির উপরিউক্ত আলোচনাটীকে সাজালে এই দাঁড়ায় যে, ক্রুষ্টস্বর উৎক্ষিপ্ততম, প্রথম-স্বর উৎক্ষিপ্ততর, দ্বিতীয়-স্বর কিঞ্চিৎ উৎক্ষিপ্ত, তৃতীয় মধ্যম, চতুর্থ কিঞ্চিৎ অবক্ষেপিত, মন্দ্র অবক্ষেপিততর ও অনুদাত্ত—অতিস্বার্য অবক্ষেপিততম। অর্থাৎ এটীর নক্সার আকার এই হয় যে,
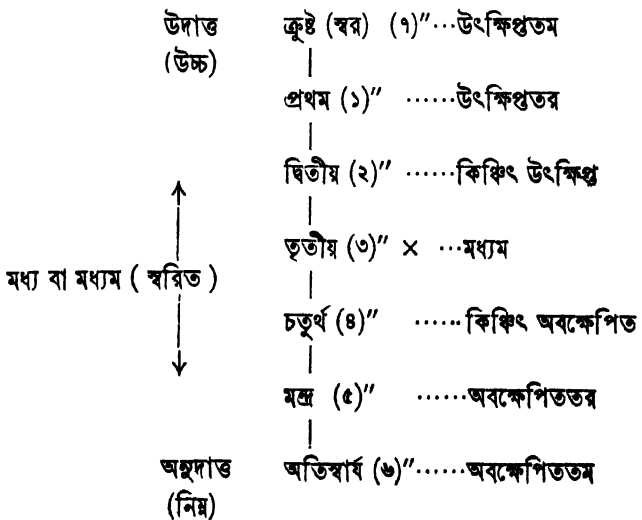
অবশ্য সূত্রকারও ঐ কথাই বলেছেন, কেননা তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্যকার পরবর্তী "দ্বিতীয়াস্মন্দ্রস্তৈত্তিরীয়াণাম্; তৃতীয়চতুর্থাবনন্তরম্; তচ্চতুর্যমামিত্যাচক্ষতে" (১৮-২০) সূত্র-তিনটীতে তিনি ঐ সিদ্ধান্ত করেছেন। ত্রিরত্নভাষ্যকারও উল্লেখ করেছেনঃ "তৈত্তিরীয়ানাং দ্বিতীয়াৎ খলুঃ মন্দ্রো জায়তে; তদনন্তরাং তৃতীয়চতুর্থৌ স্যাতাম্। এতদ্ এব দ্বিতীয়াদি স্বরমণ্ডলং চতুর্যমং ইত্যাচক্ষতে। যো দ্বিতীয়ঃ স উদাত্তঃ, যো মন্দ্রঃ সোঽনুদাত্তঃ, যৌ তৃতীয়চতুর্থৌ তৌ স্বরিতপ্রচয়ভিত্যার্থঃ। অনেন সূত্রেন পূর্বেষাং এব চতুর্ণাং স্বরাণাং ক্রমনিয়মঃ ক্রিয়তে; চতুঃসংখ্যা তৌ পূর্বসূত্রেনৈবোক্তা, তস্মাদ্ অত্র চতুর্যমং ইত্যেতৎ সংজ্ঞাবিধিপরং ইতি প্রতীয়তে"।

মোটকথা . এ'থেকে সামস্বরের সঙ্গে বৈদিক উদাত্তাদি তিনটী স্বরের একটি ঘনিষ্ট সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ব্রাহ্মণ, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগুলিতে উদাত্তাদিকে স্বর বা 'যম' হিসাবে গণ্য করলেও তারা ঠিক সামস্বর থেকে ভিন্ন কিনা গবেষণার বিষয়। তবে উদাত্তাদি স্বর-তিনটী পরে উচ্চ, নীচ ও মধ্যস্থানে অথবা স্থান-স্বরে পরিণত হয়েছিল। সঙ্গীতের দিক থেকে এই উপাদান অপরিহার্য, কেননা স্বরের স্বরূপ, সৃষ্টি ও বিকাশ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিস্ফুট হয় না।

দশম অধ্যায়

পাণিনীয়শিক্ষায় সঙ্গীত

পাণিনীয়শিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন, শিব মহেশ্বরের মতে ৬৩ অথবা ৬৪-টী বর্ণ আছে; তবে মোটামুটি ২১-টী স্বর ও ২৫-টী স্পর্শবর্ণের পরিচয় আমরা পাই। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সৃষ্টি-রহস্যের সন্ধান দিতে গিয়ে 'কাশিকাবৃত্তি'-র গ্রন্থকার নন্দিকেশ্বর উল্লেখ করেছেন যে, নটরাজ তাণ্ডবনৃত্য শেষ ক'রে যখন নব-পঞ্চবার ঢক্কা নিনাদ বা ডমরুধ্বনি করেছিলেন তখন ১৪-টী পর্যায়ে বর্ণগুলির সৃষ্টি হয়। এই কাহিনীর বর্ণনা করেছেন নাগোজীভট্টও তাঁর 'মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত' গ্রন্থে ও উপমন্যু কাশিকার 'তত্ত্ববিমর্শিনী'-ব্যাখ্যায়। নন্দিকেশ্বর 'কাশিকাবৃত্তি'-তে বর্ণনা করেছেন,

> নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো
>
> ননাদ ঢক্কাং নব-পঞ্চবারম্।
>
> উর্ধর্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধা-
>
> নেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥

নটরাজ-শিবের এই তাণ্ডবনৃত্যের ধারণা থেকেই পরবর্তীকালে শিল্পে নটরাজ-মহাকালের মূর্তি কল্পিত হয়েছে; শুধু তাই নয়, নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীরও বিকাশ হয়েছে সেই অপরূপ কল্পনা থেকে। ডাঃ আনন্দ কুমার-স্বামী তাঁর বিখ্যাত *The Dance of Shiva* (1948) বইয়ে নটরাজের নৃত্য ও বিকাশ-ভঙ্গীমার কয়েকটী ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন প্রথমতঃ 'শিবপ্রদোষস্তোত্র'-টীতে শিবের তাণ্ডবনৃত্য-সম্বন্ধে কল্পনা করা হয়েছে : ত্রিজগতের জননীকে স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বিচিত্র মণি-মাণিক্য দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। শূলপাণি কৈলাস-পর্বতের চূড়ায় নৃত্য করছেন, দেবতারা আছেন তাঁকে চারদিকে ঘিরে, দেবী সরস্বতী বীণার তারে ঝঙ্কার তুলছেন, ইন্দ্র বাজাচ্ছেন বেণু বা বংশী, ব্রহ্মার করতালের ছন্দে লক্ষ্মী গান করছেন, বিষ্ণু বাজাচ্ছেন মৃদঙ্গ, আর গন্ধর্ব যক্ষ অমর ও অপ্সরারাও আছেন চারদিকে। 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থে এটীকে শিবের 'সন্ধ্যানৃত্য' বোলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নৃত্যেশ্বর-শিবের দুটী হাত কিন্তু অসুরকে দমন করছে না, আর দেবতারা

একযোগে স্তুতিগান করছেন। ইলোরা, এলিফেন্টা ও ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্যে এবং বিশেষ ক'রে দাক্ষিণাত্যের চিদাম্বরম্-মন্দিরে চারহাতবিশিষ্ট নৃত্যরত অপরূপ নটরাজমূর্তির তখনো সৃষ্টি হয়নি বলা যায়। চিদাম্বরম্-মন্দিরের নটরাজমূর্তি শিল্প-সৌন্দর্যের জগতে এক অসামান্য ও স্বর্গীয় কল্পনা এবং সৃষ্টি, শিল্পের হাটে তার মূল্য নাই, অমূল্য ও অপার্থিব সেই অবদান।[১]

ইলোরা, এলিফেন্টা প্রভৃতিতে শিবের তাণ্ডবনৃত্যে তামসিক ভাবের প্রকাশই বেশী। শিব সেখানে ভৈরব বা বীরভদ্র, দশহাতবিশিষ্ট, শশ্মানপ্রাঙ্গনে দেবীর সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্য করছেন ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে। কিন্তু চিদাম্বরম্-মন্দিরের নাট্যমন্দিরে নটরাজের নদন্ত-নৃত্যের তুলনা নাই।

শ্রদ্ধেয় হ্যাভেল (E B. Havell) উল্লেখ করেছেন, নটরাজের তাণ্ডব-নৃত্যে প্রকৃতির সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রহস্যই প্রকাশিত—"the Tandavan, which summed up the threefold processes of Nature, creation, preservation, and destruction")। বেদের রুদ্রই পরে শিবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল ; ভারতীয় শিল্পে তাই ভৈরবের আবির্ভাব—যা শিবের প্রলয়ঙ্কর রূপ। অবশ্য শিবের ভয়ঙ্কর-মূর্তি ভৈরবের মধ্যে কল্যাণ-সুন্দর-রূপেরও দৈন্য নাই। তবে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনটী গুণের মধ্যে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে রাজসিকতার অভিব্যক্তি থাকলেও তামসিকতার বিকাশই অধিক। শিব-নটরাজের বা নটেশের যে মূর্তি বাঙ্গালাদেশে পাওয়া যায় তাতে সাত্ত্বিক ভাবেরই আধিক্য দেখা যায়, অবশ্য সে-সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

শোনা যায়, পার্বতীকে সন্তুষ্ট করার জন্যে শিব তাণ্ডবনৃত্য করেছিলেন। পার্বতীও নৃত্য করেছিলেন, তার নাম 'লাস্য'। সঙ্গীতে 'তাল' শব্দটী তাণ্ডব ও লাস্য শব্দ-দুটীর আদি-অক্ষর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণভারতে শৈব-সম্প্রদায়ের প্রভাব বেশী, তাই শিব কখনো ধ্যানমৌন শান্ত-সমাহিত যোগী, আবার কখনো বা ভয়ঙ্কর-বেশ ভৈরব। এলিফেন্টায় ও দক্ষিণভারতের শিবতাণ্ডবে ভয়ঙ্কর-মূর্তিরই প্রকাশ, কিন্তু রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ময়ুরভঞ্জরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং বা তাম্রশাসনোক্ত খিজ্জিঙ্গকোট্টের ভগ্নাবশেষ থেকে নটরাজের যে মূর্তিটী (সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দী) আবিষ্কার করেছিলেন তাতে

১। Cf. *The Dance of Shiva* (Bombay, 1948), pp. 48-47.

যোগানন্দের প্রসন্নতাই ছিল। রায়বাহাদুর চন্দ নটরাজ-প্রতিমার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "প্রতিমার দেহের অধিকাংশ ভাগই এখনও পাওয়া যায় নাই। * * নটরাজের মুখমণ্ডলে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধজাত যোগানন্দ-সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; কমনীয় দেহখানি ধীর গম্ভীরভাবে নৃত্যের ছলে বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। তামিলদেশের সুপ্রসিদ্ধ নটরাজমূর্তিতে গতিশীলতা প্রবলতর। খিচিং-এর মূর্তিতে গতির ও স্থিতির—জ্ঞানের ও কর্মের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে"।[২]

নটরাজের নৃত্য সৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণত নটরাজমূর্তি চারহাতবিশিষ্ট। দক্ষিণদিকের ওপরের হাতে ডমরু অনন্ত অনাহত শব্দের প্রতীক, অখণ্ড মহাকালের বুকে তা যেন লয় ও ছন্দ বা তাল রক্ষা করছে। ডমরুর ধ্বনি বা শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ ও পঞ্চভূতের যোগসূত্র জড়িত। বিশ্ববৈচিত্র্যের উপাদানই পঞ্চভূত; শব্দও তাই। নৈয়ায়িকেরা 'শব্দগুণমাকাশম্' সূত্রে শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন, কাজেই শব্দ আকাশ বা মহাকাশের প্রকাশক। নটরাজের বামদিকের ওপরের হাতে 'অর্ধমুদ্রা', তাতে আছে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড—ধ্বংশের পরিচায়ক। দক্ষিণদিকে নীচেকার হাতে 'অভয়মুদ্রা'—শান্তি ও সান্ত্বনার উদ্বোধক। বামদিকের নীচেকার হাত উন্নত বা উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত এবং তা চরণের দিকে নমিত। এই চরণ ভক্তগণকে আশ্রয় দান করছে। যে হাতটী এই চরণের দিকে নমিত সেটীতে আছে 'গজহস্তমুদ্রা' এবং তা বিঘ্ননাশক গণপতি বা বিনায়ককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এই হাতটী সর্ববিঘ্ন-নাশের প্রতীক। পদতলে বামন 'অপস্মার'-পুরুষ বা অসুর ত্রিপুর অজ্ঞান ও অপবিত্রতার নিদর্শন। বামনের হাতে সর্প—বন্ধন বা অজ্ঞান-রূপ সংসার-চক্রের পরিচায়ক। নটরাজ বামনকে পদদলিত করছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ ক'রে তিনি মুক্তি ও শান্তির আলোক দান করছেন। বামন পদ্মপীঠের ওপর শায়িত। নৃত্যে শিবের পাঁচটী শক্তি বা পঞ্চক্রিয়া বিকশিত: সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। এই পঞ্চক্রিয়ার অধিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিব। নটরাজ-শিবের হাতে মুদ্রা বা হস্তকরণগুলি নৃত্যে ভাব ও রসের প্রকাশক। নটরাজের চারদিকে প্রভাবমণ্ডল বা অগ্নিশিখার চক্র বিশ্বের ও বিশ্ববাসিগণের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। অধ্যাপক জিমার এটীকে ওঙ্কারেরও

২। Cf. রায়বাহাদুর চন্দ: 'মূর্তি ও মন্দির' (১৩২৪), পৃ° ১০—১১

প্রতীক বলেছেন।[৩] নটরাজের শিরে জটজাল নৃত্যের তালে তালে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে; জটার বাঁধনে গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে অর্ধচন্দ্র বা অগ্নি জ্ঞানের, শিরে সর্প প্রকৃতি বা প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের দক্ষিণকর্ণে মনুষ্যদেহের ও বামকর্ণে এক নারীদেহের ভূষণ। শ্রদ্ধেয় হ্যাভেল এটীকে বলেছেন—পুরুষ-প্রকৃতির তথা নটরাজ যে পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের মিলিত প্রতিমূর্তি ("by which is expressed the nature of the Diety, combining both the male and female principle"[৪]।

শ্রদ্ধেয় হ্যাভেলের মতে, নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে দুটী ভাব অন্তর্নিহিত আছে: একটী—প্রকৃতির বাইরের জড়বিকাশের খেলা ও অপরটী—অধ্যাত্ম জগতের লীলার অভিব্যক্তি, যাতে মানুষের সকল-কিছু কামনা, অজ্ঞান ও বন্ধনের অবসান হয়।[৫] তিনি নটরাজের নৃত্যের একটী পৌরাণিক আখ্যানও দিয়েছেন। আখ্যানটী আদিম কালের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। গল্পটী হোল: একদিন শিব যোগীবেশে অরণ্যে ঋষিদের কাছে গিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন ও ঋষিদের হারিয়ে দিলেন। ঋষিরা তাতে ক্রুদ্ধ হোয়ে অভিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা যজ্ঞাগ্নিতে একটী ভয়ঙ্কর-মূর্তি ব্যাঘ্র সৃষ্টি করলেন শিবকে আক্রমণ করার জন্যে। শিব তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে বাঘের শরীর থেকে চামড়াটী খুলে নিয়ে নিজের গাত্রে পরিধান করলেন। তারপর ঋষিরা বিষাক্ত সর্প সৃষ্টি করলেন, শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নৃত্য করতে লাগলেন। পরে ঋষিদের যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকটাকার একটী বামন-রূপ অসুর বার হোয়ে শিবকে আক্রমণ করল। শিব অসুরকে পদভারে দলিত ক'রে তার পৃষ্ঠদেশ ভেঙে দিলেন। শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য স্বর্গলোকের দেবতা ও ঋষিরা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। এই নৃত্যের দৃশ্যটী এলিফেণ্টার

৩। Cf. *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization* (1946), pp. 153—154.

৪। Cf. (ক) *The Ideals of Indian Art* (London, 1920), p. 80; (খ) আনন্দ কুমার-স্বামী: *The Dance of Shiva.* (1948), pp. 84—87.

৫। Cf. (ক) *The Himalayas in Indian Art* (London, (1924), p. 65; (খ) এস. শিবপদসুন্দরম্: *The Saiva School of Hinduism* (London, 1834), pp. 185-186.

'গুহায় চাক্ষুসভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে। সম্ভবতঃ শিবের ত্রিমূর্তি যিনি রচনা করেছিলেন তিনিই এই তাণ্ডবনৃত্যকারী শিবের স্রষ্টা।

বাঙ্গালাদেশেও নটরাজের মূর্তি পাওয়া গেছে এবং তা এলিফেণ্টা ও চিদাম্বরম্-এর মূর্তি থেকে ভিন্ন। শ্রদ্ধেয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture* (1933) বইয়ে উল্লেখ করেছেন, বাখরগঞ্জ জেলায় কাশীপুরে নটরাজ বা নটেশের একটী তাণ্ডবমূর্তি পাওয়া গেছে, রাজসাহীর 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' ও 'ঢাকা মিউজিয়ম'-এ এই মূর্তি রক্ষিত আছে। এছাড়া উড়িষ্যায় দশহাত-বিশিষ্ট শিব-তাণ্ডবের একটী মূর্তি পাওয়া গেছে এবং বাঙ্গালার সেন-রাজাদের তাম্রমুদ্রায়ও ঐ ধরণের দশহাতযুক্ত শিব-নটরাজের মূর্তি দেখা যায়।[৬] ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন যে, বাঙ্গালায় নটরাজের মূর্তিগুলি খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১০ম-১২শ শতাব্দীর হবে:

নটরাজ-শিবের প্রতিমা বাংলাদেশে সুপ্রচুর; কিন্তু বাংলার নটরাজ-রূপকল্পনা যেন দক্ষিণী রূপক-রচনাকে অনুসরণ করে নাই। দশ ও দ্বাদশহস্ত এই ধরনের নটরাজ-শিবের প্রতিমা এ'পর্যন্ত বাংলাদেশের বাহিরে আর কোথাও বড় একটা পাওয়া যায় না। পূর্ব-দক্ষিণ বাংলায় নৃত্যপর শিবের যত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে সবই দশহস্ত এবং তাঁহার লক্ষণ ও লাঞ্ছন-সন্নিবেশ পুরোপুরি মৎস্যপুরাণের বর্ণানুযায়ী; দক্ষিণ-ভারতীয় চতুর্হস্ত নটরাজ শিব-প্রতিমায় শিবের পদতলে যে অপস্মার-পুরুষটিকে দেখা যায়—বাংলাদেশে তাহার চিহ্নও নাই। এই ধরনের দশহস্ত, মৎস্যপুরাণ অনুসারী নটরাজ-শিবের মূর্তিগুলির একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে মূর্তিটিকে বলা হইয়াছে—'নটেশ্বর'। দ্বাদশহস্ত নটরাজ-শিবের যে ক'টি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তাহাদের হস্তধৃত লক্ষণ ও লাঞ্ছন একটু পৃথক এবং সন্নিবেশও ভিন্ন-প্রকারের, এই ধরনের মূর্তিগুলিতে এক হাতে বীণা এবং দুই হাতে করতালের নৃত্যের তাল রাখা হইতেছে। শিব যে নৃত্য ও সঙ্গীতরাজ ইহা দেখানও যেন এই প্রতিমাগুলির উদ্দেশ্য।[৭]

সুতরাং বাঙ্গালাদেশে নটরাজ-মূর্তির রূপ-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং নূতন ধরনের। বাঙ্গালার জলবায়ু ও প্রতিভাই পুরাতানের মধ্যে নূতন-কিছু সৃষ্টি করার দিকে সর্বদা উন্মুখ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নটরাজকে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তির প্রতিচ্ছবি-রূপে বর্ণনা করেছেন এবং স্বভাব-সৌন্দর্যের পূজারী বিশ্বকবির পক্ষে তা যথার্থই হয়েছে। অশান্ত প্রকৃতি-সিন্ধুকে কবি বলেছেন—চিৎসত্তা বা চৈতন্য এবং

৬। Cf. *Archaeological Survey of India, New Imperial Series*, Vol. *XLVII*, p 109.

৭। Cf. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'—আদিপর্ব (২য় সংস্করণ; ১৩৫৮), পৃ° ৬২১

তারই বহির্বিকাশ হোল নৃত্যচঞ্চল বিশ্ববৈচিত্র্য। নটরাজ প্রকৃতির মৌন-মর্মকথাকে মুখর ও প্রাণবান ক'রে তুলেছেন অপরূপ নৃত্যের ছন্দে। কবি তাই নটরাজের বর্ণনায় বলেছেন,

চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জনে,
নটরাজ নৃত্য করে উন্মুখর অশান্ত পবনে।

চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গ ও উন্মুখর অশান্ত পবনই কল্পনা-বিলাসী শিল্পীর সৃজনশীল মনে জাগিয়েছে নটরাজের প্রলয়চঞ্চল তাণ্ডবের ধারণা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নটরাজ'-ঋতুরঙ্গশালায় ও বিভিন্ন ঋতুদের বিচিত্র বর্ণনার মধ্যে নটরাজের মর্মকথা প্রকাশ করেছেন। তিনি মুখবন্ধে লিখেছেন: "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পাদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পাদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়"।[৮] প্রকৃতপক্ষে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের পিছনে সৃষ্টি ও জীবন-রহস্যের মর্মকথাই তাই। মুক্তির ভিখারী কবিও তাই মনের আনন্দে গান ক'রে বলেছিলেন,

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে এলিফেণ্টার প্রস্তরমূর্তিতে এবং খৃষ্টীয় ১০ম-১১শ

৮। কবিগুরুর ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হোয়ে শ্রীপ্রতিমা দেবীও নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

"জীবজগতের মধ্যে অহরহ যে নিগূঢ় দ্বন্দ্ব চলেছে, অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণীজগৎ পর্যন্ত নিজেকে টিকিয়ে রাখবার যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ঝড়, তাই প্রাণের বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত অফুরন্ত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের চিত্ত সাধনা করছে সেই অসীম গতিশক্তিকে দেহের সীমার মধ্যে অনুভব করতে। শিবের তাণ্ডব হ'ল সেই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিশক্তির প্রত্যক্ষ রূপ। তার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আবর্ত আমরা দেখি। তাণ্ডবের প্রতি পাদক্ষেপের ছন্দে পৃথিবীর ধূলিকণাও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষের কল্পনা যে কত গভীরভাবে অ্যাবষ্ট্রাক্টকে নিরুদ্দেশকে অনুভব করতে পারে শিবের তাণ্ডবে তারই অদ্ভুত প্রকাশ। এর থেকে বোঝা যায় ভারতীয় নৃত্য একদিন অনঙ্গদহনের অর্থাৎ স্থূল অঙ্গ-সীমানা অতিক্রমণের পথে আধ্যাত্মিক প্রেরণাতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।"—'নৃত্য' (বিশ্বভারতী), পৃ: ৯

শতাব্দীতে দক্ষিণভারতে চিদাম্বরম্-মন্দিরে ব্রোঞ্জমূর্তিতে শিবের তাণ্ডবনৃত্যের ভঙ্গিমায় ভাব ও রসের যে আন্তর রূপলোক সৃষ্টি হয়েছিল কবিগুরুর সার্থক লেখনীতে তা প্রাণবান হোয়ে উঠেছে।

নটরাজ-শিবের প্রস্তরমূর্তির পরিকল্পনা-সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় হ্যাবেল উল্লেখ করেছেন, যদিও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রাক্কালে প্রস্তর-মূর্তির সৃষ্টি-কল্পনা হয়েছিল বোলে আমরা স্বীকার করি তথাপি নটরাজের মূর্তি-কল্পনা ঠিক কখন্ থেকে প্রথম আরম্ভ হোল তা আমরা জানি না—

"The date of the earliest known stone sculptures of this type, somewhere about the sixth century A. D., gives no idea as to when the Nataraja image was first conceived."

তবে ধ্যানঘনমূর্তি-শিবের কল্পনা কিভাবে ভারতীয় সমাজে জন্মলাভ করেছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে মনীষী হ্যাভেল তাঁর *The Himalayas in Indian Art* (1924) এবং *Indian Sculpture and Painting* (1908) বইদুটীতে সুবিশাল গগনচুম্বী চিরতুষারাবৃত শুভ্র হিমালয়-পর্বতকেই তার কারণ বলেছেন। আকাশ-রূপ স্বর্গ থেকে পতিত হোয়ে স্রোতাস্বিনী গঙ্গা হিমালয়-রূপী শিবের জটাজালে আশ্রয় নিয়েছিল। অসংখ্য শৃঙ্গযুক্ত রুক্ষ-পর্বতমালা হিমগিরি-শিবের জটাজাল। তিনি বলেছেন (পৃ° ১০),

"The Himalayas * * from the center of the World-Lotus. The seed-vessel of the Lotus was Brahma's holy city in the region of Mt. Kailasa, and of the lake Manasarovara, whose deep blue waters mirrored the Creator's mind. The Himalayan snows were the glettering up-turned petals of the flower."

পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পের বেশীর ভাগ উপাদানই মহিমময় হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ডাঃ আনন্দ কুমার-স্বামী বলেছেন, নটরাজের নামে উৎসর্গীত দক্ষিণ-ভারতের চিদাম্বরম্-মন্দিরের কতকাংশ (এবং নটরাজমূর্তিটীও) নির্মিত হয়েছিল খৃষ্টীয় ১০ম কিংবা ১১শ শতাব্দীতে।[১] অধ্যাপক জিমার মূর্তিটীর

১। "Parts of the temple at Chidambaram, one of the most sacred of all Southern shrines, and dedicated to Nataraja, are as old as the tenth or eleventh century, Nritya-Sabha, or Dancing Hall, of thirty-six pillars about eight feet high, being the oldest and most beautiful element."—*Introduction to Indian Art* (1923), p. 94.

চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ-গর্জ্জনে,
নটরাজ নৃত্য করে উন্মুখর অশান্ত পবনে।

—রবীন্দ্রনাথ

এলিফেণ্টায় নটরাজ-শিবতাণ্ডবমূর্তি
(তামসিক)
(খৃঃ ৫ম শতাব্দী)

শিব নটরাজ

চিদাম্বরম খৃঃ ১০০০ খ্রী

বাংলাদেশে শিবতাণ্ডবমূর্তি

১০ম ১১শ শতাব্দী।

ঢাকা জেলায় শঙ্করবান্ধা প্রাপ্ত।

কোনারকের নটীমূর্তি (খঞ্জনী বাদনরতা)

(খৃঃ ১৩শ শতাব্দী)

নির্মাণকালও ঐ খৃষ্টীয় ১০ম ও ১২শ শতাব্দীতে বলেছেন।[১০] শিল্পজ্ঞানী শ্রীঅজিত ঘোষ উল্লেখ করেছেন, শিব-নটরাজের ব্রোঞ্জমূর্তির সৃষ্টি হয়েছিল চোল-বংশের রাজত্বের সময়ে (৮৫০-১১৫০ খৃষ্টাব্দে)। তিনি বলেছেন,

"The Nataraja image in bronze is the supreme example of symbolic art. It is also one of the most beautiful and vital of the creations of the Indian artistic genius and is undoubtedly entitled to rank among the seven greatest achievements of the art of Bharat. The artists who flourished during the rule of the Chola dynasty (850—1150 A. D.) created this immortal image of the Dancing Siva and in it they have given concrete expression to the conception of Siva in the mystic philosophy of South India".[১১]

এলিফেণ্টায়ও শিব-তাণ্ডবের মূর্তি আছে। এলিফেণ্টার গুহা ও শিবের মূর্তিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল খৃষ্টীয় ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। ডাঃ হীরানন্দ শাস্ত্রীর অভিমত তাই।[১২] তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ডাঃ বার্গেস্ প্রভৃতি মনীষীরা এলিফেণ্টার শিল্প-সম্পদকে খৃষ্টীয় ৮ম অথবা ৯ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বোলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তা সঙ্গত নয়, কেননা পাহাড়ের গুহাগুলি ভাস্কর্যের অবদান-হিসাবে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও জৈন এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বৌদ্ধ গুহাগুলি তৈরী হয়েছিল প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৩ শতক থেকে, শিব অথবা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত ব্রাহ্মণ্য-গুহাগুলি আনুমানিক খৃষ্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দে এবং জৈন-গুহাগুলি বৌদ্ধ-যুগের সমসাময়িক। ভারতবর্ষে গুপ্তযুগেই ভাস্কর্যের চরম উন্নতি সাধিত হয়েছিল। অনেকের মতে, খৃষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দের মধ্যে মৌর্য-সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল থেকেই নাকি ভাস্কর্য-সৃষ্টির সূচনা আরম্ভ হয়। কাজেই প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও পরবর্তী শিল্প-বিকাশের কাল নির্ণয় করা যায় মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে ৮ম শতাব্দী এবং খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী থেকে ১২শ শতাব্দী।

১০। "Shiva-Nataraja is represented in a beautiful series of South Indian bronzes dating from the tenth and twelfth centuries A. D."—*Myths and Symbols in Indian Art and Civilization* (1946), p. 152.

১১। Vide *The Seven Wonders of Indian Art* in *Hindusthan Standard*, Pooja Annual, 1951, p. 175.

১২। "** it can reasonably be assumed that they were excavated about the sixth century (A. D.)."—*A Guide to Elephanta* (1934), p. 2.

অবশ্য খৃষ্টপূর্ব ১ম শতকে অন্ধ্র-রাজত্বের সূচনাকালে ভাস্কর্যের ও মূর্তিশিল্পের আরম্ভ হয় প্রথমে। মধ্যযুগীয় শিল্পসৃষ্টির প্রারম্ভ-কাল আমরা আগেই বলেছি যে, গুপ্তযুগে খৃষ্টীয় ৩৫০-৬৫০ শতাব্দী।[১৩] মোটকথা গুপ্তযুগই এনে দেয় সমগ্র শিল্প-বিকাশের জগতে নূতন যুগ ও নব-জাগরণ। সারনাথের বৌদ্ধমূর্তি, ঝাঁসির ললিতপুর বিভাগের অন্তর্গত দেওঘরের বিষ্ণু ও শিবমূর্তি, ইলোরা ও এলিফেণ্টার মূর্তি-সৌন্দর্য গুপ্তযুগেরই অবদান। মাননীয় পার্সি-ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত *Indian Architecture* (2nd ed.), শ্রদ্ধেয় হ্যাভেল তাঁর *The Ancient and Mediaeval Architecture of India* এবং জেমস্ ফার্গুসন তাঁর *History of Indian and Eastern Architecture* (Vols I & II) প্রভৃতি বইগুলিতে ভারতের ভাস্কর্য এবং মাননীয় গোপীনাথ রাও তাঁর সুবিখ্যাত *Hindu Iconography* (Vols I & II) এবং শ্রদ্ধেয় বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর *The Indian Buddhist Iconography* (1924) পুস্তকগুলিতে মূর্তি-বিকাশের ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। এগুলি থেকে মোটামুটি বলা যায় যে, মূর্তি ও শিল্প-সৌন্দর্য উৎকীর্ণ হয়েছিল বরাবর-পাহাড়ে খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২৫০ শতকে, ভারহুত-স্তূপে খৃষ্টপূর্ব ১৫০ শতকে, চৈত্য-পাহাড়ে খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক—খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে, কার্লে-চৈত্য খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে, পুনায় জুনার-পর্বতগুহায় খৃষ্টীয় ১ম শতকে, নাসিকের পাণ্ডুলেনে খৃষ্টপূর্ব

অপর

১৩। শ্রদ্ধেয় ম্যাক্‌ডোনেল্ (A. A. Macdonell) তাঁর সুচিন্তিত *Buddhist Religious Art* প্রবন্ধে বৌদ্ধশিল্প তথা ভারতীয় শিল্পকে তিনটী স্তরে ভাগ করেছেন: (১) খৃষ্টপূর্ব ২৬০ শতক—৫০ খৃষ্টাব্দ, (২) ৫০ খৃষ্টাব্দ—৩৫০ খৃষ্টাব্দ (৩) ৩৫০ খৃষ্টাব্দ—৬৫০ খৃষ্টাব্দ। তিনি উল্লেখ করেছেন: "The history of Indian art really begins with the reign of Asoka (272-231 B. C.), * *. The history of Buddhistic religious art in India extended over more than nine centuries and may be divided into three roughly equal periods. The earliest reaches from 260 B. C. to A. D. 50. * * The second and, as far as Buddhist sculpture is concerned, best period extends roughly from A. D. 50-350. The third period (A. D. 350—650) is noteworthy chiefly for what it produced in the way of pictorial art"—*The Proceedings of the International Congress for the History of Religions* (1908), part II, pp. 74-75.

মাননীয় গার্ডনার (P. Gardner) তাঁর *Greek Influences on the Religious Art of North India* প্রবন্ধে (পৃ° ৭৯-৮৫) ভারতশিল্পের ওপর গ্রীস প্রভৃতি বিদেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এ' সম্বন্ধে বলা যায় যে, আসলে ডা: কুমার-স্বামী ও শ্রদ্ধেয় হ্যাভেল যে বলেছেন—বিদেশীরা ভারতীয় শিল্পের মর্মকথা বুঝেন নাই একথাই সত্য।

১ম শতকে, উদয়গিরির (উড়িষ্যা) রাণীগুম্ফায় খৃষ্টপূর্ব ১৫০ শতকে, সারনাথের ধামেক-স্তূপে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-শতাব্দীতে, সাঁচীর গুপ্ত-মন্দিরে খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে, ধারওয়ারে অইহোলে-মন্দিরে খৃষ্টীয় ৫ শতাব্দে, বিজাপুরে বাদামীর মন্দিরে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে, ভুবনেশ্বর-মন্দিরে খৃষ্টীয় ৮ম-১০০০ শতাব্দীতে, লিঙ্গরাজ-মন্দিরে খৃষ্টীয় ১০০০ শতাব্দীতে খাজুরাহের মন্দিরে খৃষ্টীয় ১০০০-১০৫০ শতাব্দীতে, কোনারকের সূর্য-মন্দিরে প্রায় খৃষ্টীয় ১২৫০ শতাব্দীতে প্রভৃতি। মোটকথা দেখা যায়, খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে খৃষ্টীয় ১২শ কিংবা ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিশিল্পের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানে মূর্তি বা মন্দিরের বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন বেদী বা অগ্নিগৃহের বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আচার্য (পি. কে. আচার্য) উল্লেখ করেছেন,

"The idea of the sepulchre or the burial vault was analogous with the Buddhist temple where, however, the image of Buddha was installed in the later edifices. So far as the Hindu architecture is concerned the sacrificial altars out of which the temple seems to have grown up ...... purely a religious structure and had nothing to do with *chaityas* or monuments built in memory of the dead."[১৪]

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, কল্পসূত্রের পরিশিষ্ট 'শুল্বসূত্র'-গ্রন্থে যজ্ঞবেদী-নির্মাণের বিবরণ দেওয়া আছে। বেদীগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের তৈরী হোত। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫।৪।১১) বিভিন্ন ছাঁচের বেদীর উল্লেখ আছে। বৌধায়ন ও আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রদুটীতেও ঐ সংহিতা অনুযায়ী 'চিতি' বা বেদীর বিবরণ পাওয়া যায়। 'চতুরস্র-শ্যেনচিৎ' বেদী শ্যেনপক্ষীর মতন দেখ্তে ছিল। 'কঙ্ক-চিৎ' ছিল লম্বপদবিশিষ্ট হেরন-পাখীর মতন দেখ্তে। এছাড়া 'প্রৌগ-চিৎ', 'উভয়ত-প্রৌগচিৎ', 'রথচক্র-চিৎ', 'দ্রোণ-চিৎ', 'পরিচয়-চিৎ', 'সমুচ্চয়-চিৎ', 'কূর্ম-চিৎ' প্রভৃতি নামেও যজ্ঞবেদী ছিল। সবগুলি ইষ্টক

১৪। Vide *The Origin of Hindu Temple* in *Indian Culture*, Vol. I, July 1934, p. 89. Cf. also আচার্য: *Indian Architecture*.

দিয়ে তৈরী হোত এবং দৈর্ঘ্যে হোত বিভিন্ন 'পুরুষ' অনুযায়ী। এই চিতিগুলিই পরে মন্দির, গির্জা ও মসজিদে রূপায়িত হয়েছিল।[১৫]

বৈদিক সাহিত্যেও শিল্পের উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণে (৩।২।১।৫) আছে: "যদ্ বৈ প্রতিরূপং তচ্ছিল্পম্"। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৬।৫।১)—"শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পান্যেতেষাম্ বৈ শিল্পানাং অনুকৃতিঃ শিল্পং অধিগম্যতে"। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের ভাষ্যে আচার্য সায়ণ লিখেছেন: "শিল্পশব্দশ্চ আশ্রয়করম্ কর্ম ব্রুতে * * কৌশলম্।"[১৬] কাজেই শিল্প তথা শিল্পকর্ম যে বৈদিক সমাজে সুনির্দিষ্টভাবে ছিল তার প্রমাণ বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ উল্লেখ করেছেন: বেদমন্ত্রে অনেক বৈদিক দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা পাওয়া যায়। তারপর আজ থেকে প্রায় ২৫০০ হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধে ও বিদেহে মৃত মহাপুরুষদের চিতাভস্মের ওপর স্তূপের এবং যক্ষ বা যক্ষীর আবাস চৈত্য-বৃক্ষের উপাসনার প্রচলন ছিল। মহাপরিনির্বাণসূত্রে ও অন্যত্র বৈশালীর লিচ্ছবীদের চৈত্যবৃক্ষগুলিকে পূজা করার জন্যে বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়েছিলেন। পালি-বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গে (ক্ষুদ্রবর্গে) উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহ নগরের বেণুবনে বাস করছিলেন তখন ভিক্ষুদের বাসের জন্যে বিহার নির্মিত হয়েছিল ও অনাচারপরায়ণ ষট্‌বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্ত্রী-পুরুষের প্রতিভান চিত্র বা প্রতিকৃতি সেই বিহারের দেওয়ালে অঙ্কিত করেছিলেন। বিনয়পিটকের সুত্তবিভঙ্গে (ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ, ৪১ পাচিত্তিয়) পাওয়া যায়, এক সময়ে যখন শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে বুদ্ধদেব বাস করছিলেন তখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের উদ্যানে চিত্রাগারে অনেক প্রতিভান বা মনুষ্য-চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, জনপ্রবাহের সঙ্গে ষট্‌বর্গীয়া ভিক্ষুণীরাও সেই চিত্রাগার দেখ্‌তে গিয়েছিলেন।[১৭]

১৫। Cf. (ক) আচার্য: *Architecture of Manasara*, Vols. III-V and plates CVIII—CXII.

(খ) 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এ শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-লিখিত 'অগ্নি'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ: ৩২৪-৩৪৯

১৬। Vide ডাঃ বড়ুয়া (B. M. Barua): *Art as defined in the Brahmanas* (প্রবন্ধ) in *Indian Culture*, Vol. I, July 1934, pp. 118-120.

১৭। Cf. (ক) রায়বাহাদুর চন্দ: 'মূর্তি ও মন্দির' (১৯২৪), পৃ: ১—৩

(খ) পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সরকার ডাঃ কুমার-স্বামীর *Elements of Buddhist Iconography* (1935) বইখানি সমালোচনার অবসরে বৌদ্ধশিল্পের প্রতীক প্রভৃতির

রায়বাহাদুর চন্দ আরো লিখেছেন: "প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে ভাস্কর্য-কলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত হয় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দে শুঙ্গবংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং এই শুঙ্গশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দের মধ্যভাগে মধ্যভারতে। সারনাথ, পাটলিপুত্র এবং বিদিশার ভগ্নাবশেষের মধ্যে শুঙ্গশিল্পের কিছু-কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। * * * শুঙ্গরাজ্যের অধঃপতনের অনতিকাল পরেই যেন প্রাচ্য ও মধ্যভারতে প্রাচীন শিল্পের ধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতাব্দে নির্মিত যে কয়খানি মূর্তি এযাবৎ সাঁচীতে, সারনাথে এবং শ্রাবস্তীতে পাওয়া গিয়াছে তাহা মথুরার লাল পাথরের দ্বারা মথুরার কারখানায় নির্মিত"।[১৮]

শুঙ্গবংশের পর শক-কুষাণ-গুপ্ত প্রভৃতি যুগে ভাস্কর্য ও মূর্তিশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং নটরাজের মূর্তি খৃষ্টপূর্ব অথবা খৃষ্টীয় যুগের গোড়াকার দিকে পরিকল্পিত না হোলেও প্রস্তরমূর্তিশিল্পের যে তখন সৃষ্টি হয়েছিল তা স্বীকার করতে হবে। তারপর খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভেই যে নটরাজের মূর্তি কল্পিত হয়নি তা-ই বা কিভাবে বলা যায়? কেননা কাশিকাবৃত্তিকার নন্দিকেশ্বর এবং অভিনয়দর্পণ-রচয়িতা নন্দিকেশ্বর যদি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হন তবে নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে নন্দিকেশ্বর জীবিত ছিলেন এবং "নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো"—শ্লোকের জীবন্ত প্রতীক নটরাজ-শিবের কল্পনা তিনি ঐ সময়েই করেছিলেন। কল্পনা কোন-কিছু সত্যবস্তুকে আশ্রয় ক'রেই মনঃসমুদ্রে তরঙ্গের আকারে ওঠে। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর সমাজে নটরাজের প্রস্তর-মূর্তির প্রচলন ছিল কিনা জানি না, তবে ধ্যানের রূপ যে সাধক ও শিল্পীর অন্তরে বর্তমান ছিল একথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, খৃষ্টপূর্ব পাঁচ কিংবা ছ'হাজার বছর আগে সুপ্রাচীন সিন্ধু-উপত্যকায় একটী নর্তকের মূর্তি পাওয়া

আরম্ভকাল-সম্বন্ধে ডাঃ কুমার-স্বামীর অভিমতের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন:—"* * have been applied in this work to explain the fundamental symbols of the Buddhist art which began in India about the second century B. C. The author has critically studied the entire Sruti literature and has tried to show that the Buddhist symbols are of Vedic origin and that concepts symbolically expressed in the Vedas have found iconographic expression for the first time in early Buddhist art."—Vide *Indian Culture*, Vol. II, April 1939, p. 831.

১৮। 'মূর্তি ও মন্দির' (১৯২৪), পৃ° ৪, ৬

গেছে যার সঙ্গে তুলনা হোতে পারে শিব-নটরাজের। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা উল্লেখ করেছেন—"the figure was three-headed or three-faced and in that case it represented the youthful Siva-Nataraja."[১৯] ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন—"the figure of a male dancer, standing on his right leg, with the left leg raised high, the anscestor of Siva-Nataraja."[২০] মহেঞ্জোদড়োর মূর্তিটাকে সকলে নর্তক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ডান পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বাম পা নটরাজের মতন নৃত্যের ছন্দে উত্থিত মূর্তিটা সত্যিকারের শিব-নটরাজেরই মূর্তি কিনা, সে-সম্বন্ধে কোন তথ্যই প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা এখনো উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেন নি। আমাদের মনে হয়, এই তত্ত্বটা যথাযথভাবে আবিষ্কৃত হোলে মূর্তিশিল্পের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করবে এবং নৃত্য, মুদ্রা বা হস্তকরণ ও প্রস্তর-শিল্প যে ভারতবর্ষে কত প্রাচীন তাও নির্ধারিত হবে।

নন্দিকেশ্বরের ধ্যাননেত্রে শিব-নটরাজের মূর্তি সুপরিস্ফুট ছিল, সেজন্যে তিনি নটরাজের ডমরু-ধ্বনিকে বর্ণ-সৃষ্টির মূলে প্রাধান্য দিয়েছেন। অ ই উন্ বর্ণগুলিকে ১৪-টী পর্যায়ে ভাগ ক'রে তিনি তাদের নাম দিয়েছেন শিবসূত্র বা মহেশ্বরসূত্র। ১৪-টী পর্যায়ের মধ্যে অ ই উন্ থেকে হল্ পর্যন্ত সমস্ত স্বর ও স্পর্শবর্ণগুলি নিহিত। ডাঃ ভাণ্ডারকর ও পণ্ডিত ভাগবত বলেছেন, সকলের চেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত অক্ষর ২০টী: ৫ অর্ধ-স্বরবর্ণ +৫ নাসিকাবর্ণ+৫ লঘু+৫ গুরুবর্ণ=হযবরট্, লণ্, ঞমঙণনম্, ঝভঞ্, ঘঢধষ্, থফছঠথব্। শষসর্, হল্ বর্ণগুলি পরে যুক্ত হয়। ঋক্ ও যজুর্বেদের ব্রাহ্মণগুলিতে যে অক্ষর বা বর্ণের ব্যবহার হয়েছে সেগুলি সাধারণতঃ বিবর্তনের দ্বিতীয় যুগের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া অক্ষর, বর্ণ, পদ প্রভৃতি বৈয়াকরণিক শব্দগুলির অর্থে ও ভাবে যথেষ্ট বিবর্তন দেখা যায়। ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখ করেছেন, ঋগ্বৈদিক যুগে 'পদ' শব্দটার অর্থ ছিল এখনকার চেয়ে ভিন্ন। 'অক্ষর' অর্থে যেমন ক্ষুদ্র শব্দসমষ্টি (smallest sound-unit) বুঝাত, 'পদ' বলতে তেমনি সামান্যভাবে

১৯। Cf. *Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, March, 1932. p. 143.
২০। Cf. *Hindu Civilization* (2nd ed. 1950), p. 19.

ভাবসমষ্টিকে (smallest sense-unit) প্রকাশ করত। ঋগ্বেদে (১।১৬৪।২৩) 'পদ' বেশীর ভাগ সময় মন্ত্রের 'চরণ' অর্থে ব্যবহৃত হোত। পণ্ডিত লাইবিচ (Liebich) বলেছেন, বেদের মন্ত্রগুলিকে ঋষিরা 'বাক্'-এর সঙ্গে ছন্দ যোগ ক'রে উচ্চারণ বা পাঠ করতেন, তাতে থাকৃত নৃত্যান্বিত একটী গতি ("thus every metrical unit, i. e., the verse-foot came to be regarded as a 'step' of the goddess dancing along in perfect harmony with the sacred speech")। সংস্কৃত পদ্যযুগ যখন গদ্যযুগে রূপান্তরিত হোল তখন 'পদ' অর্থে বুঝাত শব্দ, কিন্তু পদ বা পাদ নয়। ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগেও পরিবর্তন এসেছিল। ঐতরেয়ব্রাহ্মণেই (৫।৫।৭) মনে হয়—প্রথমে 'স্বর' ও 'বর্ণ' শব্দের আবির্ভাব হয়। সামবেদের ব্রাহ্মণ-গুলিতে উল্লেখ দেখা যায়—"রথন্তরবর্ণা ঋক্", অর্থাৎ রথন্তরসামকে স্বর দিয়ে গান করতে হবে। 'বর্ণ'-শব্দে গোড়াকার দিকে বুঝাত 'রঙ' (colour) ও পরে ব্রাহ্মণের যুগে রূপান্তরিত হোল তা স্বরের বা গানের শব্দে (sound of melody)। কিন্তু অধ্যাপক কিথ ঐতরেয়ব্রাহ্মণের (৩।২।১৩) "স্বরবত্যয়া বাচা" শব্দগুলির অর্থ করেছেন 'সুমিষ্ট বাক্যের দ্বারা', আর আচার্য সায়ণ করেছেন ভিন্নভাবে, অর্থাৎ সায়ণ তার ব্যাখ্যা করেছেন—"স্বরযুক্তয়া", অর্থাৎ স্বরযুক্ত ঋক্ পাঠ করতে হবে। ঐতরেয়-আরণ্যকে (৩।২।৫) এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে (২।২২।২-৫) বর্ণ হিসাবে স্পর্শ, উষ্ম ও অন্তঃস্থ বর্ণ-শব্দগুলিরও উল্লেখ করা হয়েছে। অ, উ, ম এই ওঙ্কারের তিনটী পবিত্র বর্ণও ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৫।৫।৭) প্রথমে পাওয়া যায়।

শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৫।১।১৮) 'একবচন' ও 'বহুবচন' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং অথর্ব-প্রাতিশাখ্যে (১।৭৫; ২।৪৭) 'দ্বিবচন' শব্দটিরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যে 'দ্বিবচন'-এর ব্যবহার আগে থেকেই ছিল। এজন্যে অনেকে ঋক্প্রাতিশাখ্যকে কেবল ব্রাহ্মণসাহিত্য প্রভৃতিরই নয়, পাণিনিরও পরবর্তী ব্যাকরণ বল্তে চান এবং এই মতবাদের প্রচারকদের অন্যতম পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকার[২১] নিজেই ছিলেন। কিন্তু গোল্ডষ্টুকারের অনুমান ঠিক নয়, কেননা অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেন, বৃহদ্দেবতা গ্রন্থখানি শৌনকের ঋক্প্রাতিশাখ্যের পরবর্তী এবং পাণিনির

২১। Cf. *Panini: His Place in Sanskrit Literature* (London 1861),

পূর্ববর্তী। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের চেয়ে প্রাচীন বলায় সপক্ষে গোল্ডষ্টুকারের যুক্তি হোল: আচার্য ব্যাড়ি বা দাক্ষায়ণ পতঞ্জলিকে অনুসরণ ক'রে পাণিনির সূত্রের ওপর তাঁর 'সংগ্রহ' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষ-মূলার বলেছেন, প্রাতিশাখ্যে যে ব্যাড়ির নামোল্লেখ আছে, আসলে তিনিই যে সংগ্রহকার ব্যাড়ি বা ব্যালি তার প্রমাণ কি?[২২] অবশ্য পাণিনির দান সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে অফুরন্ত। অধ্যাপক বেন্‌ফি (Prof. Benfey) তাই পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—"the most comprehensive grammar of the richest language within the briefest compass imaginable—or rather unimaginable." পাণিনির আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব ৪০০ শতকে, কিন্তু 'পাণিনীয়শিক্ষা' রচিত হয় তার অনেক পরে।[২৩]

ডাঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁর *History of Classical Sanskrit Literature* (1937) পুস্তকে[২৪] উল্লেখ করেছেন: ঐতরেয়ব্রাহ্মণে কতকগুলি গাথার উল্লেখ আছে এবং সেগুলির রূপ বেশ প্রাচীন বোলে মনে হয়। অষ্টাধ্যায়ীকার পাণিনি তাঁর সময়কার প্রচলিত ভাষাকে অবলম্বন ক'রে ৩৯৭৮-গুলি সূত্রের সমাবেশ দিয়ে ব্যাকরণ রচনা করেন, তাই তাঁর সময়কার অনেক ভাষা পরবর্তীকালে অপ্রচলিত হোয়ে গেছে। এমনকি কাত্যায়নের সময়েরও অনেক চলিতভাষা পরে লোপ পেয়েছিল। তাই ভাষার ক্রমবিবর্তনের যুগকে সাধারণত কয়েকটী স্তরে বিভক্ত করা যায়: (১) প্রথম—ঋগ্বেদ-সংহিতা, যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ ও অথর্ববেদের আদিভাগগুলিকে নিয়ে বৈদিক যুগ; (২) দ্বিতীয়—ব্রাহ্মণসাহিত্যগুলির যুগ, (৩) তৃতীয়—নিরুক্তকার যাস্ক ও পাণিনির যুগ। তারপর কাত্যায়ন ও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি প্রভৃতির যুগ। যাস্ক ও পাণিনির যুগকে 'মধ্য-সংস্কৃত-ও (Middle Sanskrit) বলা যায়। তারপর সাংস্কৃতিক বা ক্ল্যাসিক্যাল যুগের আবির্ভাব। এই

২২। Vide (ক) *Introduction to the Rikpratisakhya* (1896), pp. 20-21.
(খ) এ'বিষয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি।

২৩। এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা Vide ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ: *Aspects of Pre-Paninean Sanskrit Grammar* in *B. C. Law Volume*, pt. I (1945). pp. 334-345.

২৪। Vide *Introduction*, pp. XXVII-XXXV.

সাংস্কৃতিক বা ক্ল্যাসিক্যাল যুগে পুরাণ, প্রাচীন কাব্য, নাট্যসাহিত্য, স্মৃতি ও কাত্যায়নের বার্তিক তথা ব্যাকরণশাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং পাণিনিকে মধ্যসংস্কৃত ও কাত্যায়নকে ক্ল্যাসিকাল-সংস্কৃত যুগের গুণী হিসাবে আমাদের গণ্য করা উচিত। ডাঃ ভাণ্ডারকরের অভিমত অন্ততঃ তাই। তিনি তাঁর *Date of Patanjali* প্রবন্ধে বলেছেন,

"Panini's work contains the grammar of Middle Sanskrit, while Katyayana's that of Classical Sanskrit, though he gives his sanction to the archaic forms on the principle, as he himself has stated, on which the authors of the sacrificial sessions, though they had ceased to be held in their time."

অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার উল্লেখ করেছেন: আবার দেখা যায়, কাত্যায়ন এমন কতকগুলি ভাষার ব্যবহার করেছেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে সেগুলির স্থান নাই, তার কারণ মনে হয়, পাণিনির সময়ে সে-সব ভাষার প্রচলন ছিল না। অবশ্য এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। পতঞ্জলি প্রধানতঃ কাত্যায়নের বার্তিকেরও পরে তাঁর 'মহাভাষ্য' ও 'যোগদর্শন' রচনা করেন।

আবার পতঞ্জলি তথা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগদর্শনকার পতঞ্জলি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কিনা এ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভেতর যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকে 'পতঞ্জলিচরিত্র'-রচয়িতা পতঞ্জলিকে (খৃ° ১৮শ শতাব্দী) 'বাসবদত্তা'-র ভাষ্যে শিবরাম-কর্তৃক উল্লিখিত পতঞ্জলির (খৃ° ১৮ শতাব্দী) সঙ্গে অভিন্ন বলেন, কিন্তু মহাভাষ্যকার ও যোগসূত্রকার এ'দুজন পতঞ্জলিকে এক ব্যক্তি বল্‌তে তাঁরা চান না। এ ছাড়া ঐতিহাসিক আল্‌বেরুণী 'কিতাব পাতঞ্জলি'-র নামোল্লেখ করেছেন এবং তিনি 'সাংক' (সাংখ্য) নামে একটী যোগদর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থও অনুবাদ করেছিলেন। অবশ্য 'কেতাব পাতঞ্জল' ও সাংক' তথা সাংখ্য-রচয়িতারা অভিন্ন কি ভিন্ন লোক ছিলেন সে-সম্বন্ধে তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থ হিসাবে 'পাতঞ্জলতন্ত্র' নামে একটী গ্রন্থেরও নামোল্লেখ পাওয়া যায়। ভর্তৃহরি, কাত্যায়ন, বামন, জয়াদিত্য, নাগেশ প্রভৃতি শব্দশাস্ত্রকার ও ভাষ্য-রচয়িতারা দুই পতঞ্জলির মধ্যে ঐক্য বা অনৈক্যের কোন প্রশ্নই তুলেন নি। তবে নাগেশ চরকের ভাষ্যে 'চরকে পতঞ্জলিঃ' শব্দগুলি উল্লেখ করেছেন। চরকের অপর ভাষ্যকাররা চক্রপাণি ও ভোজ পতঞ্জলিতন্ত্রের গ্রন্থকারকেও মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বল্‌তে চেয়েছেন।

হার্ভার্ডের অধ্যাপক উড্ (Prof. J. H. Wood) তাঁর *Introduction to the Yoga System* গ্রন্থে কয়েকটী যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন—মহাভাষ্যকার ও যোগদর্শনকার পতঞ্জলি এক ও অভিন্ন গ্রন্থকার নন। কিন্তু ডাঃ দাশগুপ্ত (Dr. S. N. Dasgupta) তা স্বীকার করেন না এবং তাঁর সিদ্ধান্তকেই আমরা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত বোলে মনে করি। তিনি বলেছেন: "So far as I have examined the *Mahabhasya* I have not been able to discover anything there which can warrent us in holding that the two Patanjali's cannot be identified". তিনি আরো লিখেছেন: "I am also convinced that the writer of the *Mahabhasya* knew most of the important parts of the Samkhya-Yoga metaphysics."[২৫]

সে যাই হোক, ভাষার প্রসঙ্গে অধ্যাপক মোক্ষ-মূলার পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির ভাষাকে সাধারণভাবে ব্যাকরণের দিক থেকে নূতন বা রেণেসাঁ-যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত মোক্ষ-মূলারের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত বিচারের বিষয়। তবে নিরুক্তকার যাস্ক ও পাণিনি প্রায় কাছাকাছি সময়ের গুণী, কাজেই যাস্কের নিরুক্তে যে-ভাষার প্রয়োগ হয়েছে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ভাষার সঙ্গে তার মিল অনেক পরিমাণে থাক্‌বে। পুরাণ ও ইতিহাসগুলি ভাষা-বিবর্তনের মাঝামাঝি যুগে রচিত বোলে মনে হয়। পতঞ্জলির ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী; ব্যাকরণের জগতে তাঁর মহাভাষ্যের সম্মান ও প্রামাণ্য অত্যন্ত বেশী। শবর-স্বামীর ভাষায় প্রাচীন ও নূতনের সংমিশ্রণ আছে। আচার্য শংকর মধ্যযুগীয় ভাষাকে গ্রহণ করেছেন তাঁর ভাষ্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ-রচনায়। নৈয়ায়িকেরা ভাষা-বিবর্তনের শেষযুগের অন্তর্ভুক্ত, তাই আধুনিকতার রূপই তাঁদের ভাষায় সুপরিস্ফুট।

শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের ভাষা প্রাচীন ও ক্ল্যাসিক্যালে মিশানো, কেননা ভাষা, উচ্চারণ ও স্বর প্রভৃতি নির্ণয় করাই বৈদিক সাহিত্যগুলির উদ্দেশ্য। সকল শিক্ষাই ঠিক একই সময়ে রচিত নয়, কতকগুলির মধ্যে ক্ল্যাসিক্যাল ও আধুনিকতার ভাব সুপরিস্ফুট।

২৫। বিস্তৃত আলোচনা—Vide (ক) ডাঃ দাশগুপ্ত: *A History of Indian Philosophy* (1932), Vol. I, pp. 229-233.

পাণিনীয় শিক্ষাকার স্বরের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অতি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন, যা দার্শনিক হোলেও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সকলেই প্রায় ঐ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষাকার যোগশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাই পাণ্ডিত্যের দিক থেকে তিনি স্বর, শব্দ বা নাদোৎপত্তির বিবরণ দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন (৬-৭),

> আত্মা বুদ্ধ্যাসমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
> মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্।
> মারুতস্তূরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্ ॥

বুদ্ধি তথা চৈতন্যযুক্ত আত্মা প্রথমে মন বা অন্তঃকরণকে প্রেরণ করে। সেই অন্তঃকরণ আত্মার দ্বারা প্রেরিত হোয়ে দেহস্থ অগ্নিকে সৃষ্টি করে ও অগ্নি মারুত বা প্রাণবায়ুকে প্রেরণ করে, প্রাণবায়ু আবার উরদেশে স্থিত অর্থাৎ আহত হোয়ে মন্দ্র বা শব্দ (নাদ) সৃষ্টি করে ও সেই নাদ থেকেই স্বর অভিব্যক্ত হয়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর সঙ্গীত-গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেব তাঁর প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রত্নাকরে (১।৩।৩-৫) এই স্বরোৎপত্তির বিবরণটীকে আরো বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

> আত্মা বিবক্ষমাণোঽয়ং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
> দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥
> ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্ধপথে চরন্।
> নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্ধাস্যেষ্বাবির্ভাবয়তি ধ্বনিম্ ॥
> নাদোঽতিসূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মশ্চ পুষ্টোঽপুষ্টশ্চ কৃত্রিমঃ।
> ইতি পঞ্চভিধা ধত্তে পঞ্চস্থানস্থিতঃ ক্রমাৎ ॥

কালিনাথের চেয়ে প্রাচীন টীকাকার সিংহভূপালই এর ব্যাখ্যা সাবলীলভাবে করেছেন। তিনি লিখেছেন: "* * আত্মা মনোঽন্তঃকরণং প্রেরয়তে। তদন্তঃকরণমাত্মপ্রেরিতং সদেহস্থমূদর্ষমগ্নিমাহন্তি তাড়য়তি। স বহ্নিমারুতং বায়ুং প্রেরয়তি। স পূর্বং ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতস্তেন বহ্নিনা প্রেরিতঃ সন্নূর্ধমার্গে গচ্ছন্নাঘাতেন নাভিহৃদয়কণ্ঠমূর্ধমুখেষু ধ্বনিং প্রকটয়তি। ঊর্ধপথ ইতি প্রকৃত-গানোপযোগার্থম্, অধোঽপ্যনাহতস্য নাদস্যোৎপত্তেঃ, * *"।

মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (psychological standpoint) থেকে এর বিচার করলে একথা সত্য যে, ইচ্ছা অথবা ইচ্ছাশক্তি (will-power) ব্যতীত

মানুষ কেন, কোন প্রাণীই জগতে কোন কাজ করতে পারে না, সকল কাজের মূলে তাই ইচ্ছার প্রেরণাশক্তি (motive power) থাকে। অবশ্য ইচ্ছা বা বাসনার সৃষ্টি হয় মনে তথা অন্তঃকরণে, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মন বা অন্তঃকরণ জড় এবং তা জ্ঞান বা চৈতন্যের মাধ্যম অথবা যন্ত্রমাত্র, চৈতন্যের দ্বারা উদ্দীপিত না হোলে মনে কোন ইচ্ছারই উদ্বোধন হয় না। বুদ্ধি চৈতন্যের একটী বিকাশ, আবার অন্তঃকরণেরও একটী বিশিষ্ট উপাদান। বুদ্ধিবৃত্তি-রূপ বিচারের সহযোগে মনের মধ্যে ইচ্ছার স্পন্দন জাগে। কিন্তু সেই স্পন্দনের পিছনে থাকে প্রাণবায়ুর সংঘাত, প্রাণের সংঘাত থেকে হয় তাপের সৃষ্টি (heat-energy)। ঐ সংঘাতজনিত তাপ ও বায়ুর সংমিশ্রণ তথা ইচ্ছার প্রেরণারূপ কম্পন সূক্ষ্মশব্দের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই সূক্ষ্মশব্দের নাম 'অনাহত' শব্দ বা নাদ, সেই শব্দ বাইরে ব্যক্ত হোয়ে প্রকাশ পেলেই হয় 'স্বর'। মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে (১৮-২০ শ্লো°) উল্লেখ করেছেন,

নাদরূপা পরা শক্তির্নাদরূপো মহেশ্বরঃ।
যদুক্তং ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥
তন্মধ্যে সংস্থিতঃ প্রাণঃ প্রাণাদ্ বহ্নিসমুদ্গমঃ।
বহ্নিমারুতসংযোগান্নাদঃ সমুপজায়তে।
নাদাদুৎপদ্যতে বিন্দুর্নাদাৎ সর্বং চ বাঙ্‌ময়ম্॥

নাদই কারণ-শব্দ, যা অনাহত ও আহত এই দুটী শব্দের কারণ (cause), 'বিন্দু' অনাহত সূক্ষ্মশব্দ এবং 'বাক্য' আহত স্থূলশব্দ।

অবশ্য এই ধারণা ও অনুভূতি যোগদর্শনের। দর্শন অধ্যাত্মভূমির পথপ্রদর্শক। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার আদিভূমি, সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ কলা বা শিল্প সঙ্গীতের জন্ম-রহস্যের সঙ্গে যে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা মেশানো থাক্‌বে তাতে আর বৈচিত্র্য কি? সঙ্গীতশিল্পী সাধক, সঙ্গীত-সাধনার মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু-রূপ শৃঙ্খলের পারে যাওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ও চরম-আদর্শ। সঙ্গীতশাস্ত্রীগণের স্বর-সৃষ্টির ইতিকথা তাই দার্শনিক পরিবেশে পুষ্ট হোলেও তার মধ্যে বৈজ্ঞানিকী পদ্ধতি ও উপায় আছে। শিক্ষাশাস্ত্রের আমলে এই ধারণার সৃষ্টি ও পরিপুষ্ট হয়েছিল এবং আমাদের মনে হয়, শিক্ষাগুলি সেই ধারণার বীজ খুঁজে পেয়েছিল বেদ থেকে, তা সে বেদ-সংকলনের মধ্যযুগেই হোক আর শেষের দিকেই হোক।

প্রাচীন ও আধুনিক সংগীতশাস্ত্রকারেরা তাই ঐ মহতী ধারণাকেই তাঁদের সৃজনশীল মনে বরণ করেছিলেন।

পাণিনীয়শিক্ষাকার স্বর-হিসাবে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতকে গ্রহণ করেছেন—"স্বরাস্ত্রয়ঃ"। কালনিয়ম (timming) রক্ষার জন্যে তিনি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত তথা দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত মাত্রা ও লয়ের বর্ণনা করেছেন। এ-ছাড়া লৌকিক ষড়্জাদি স্বর-সাতটীর প্রসঙ্গকেও তিনি বাদ দেননি। যাজ্ঞবল্ক্যের মতন তিনিও উল্লেখ করেছেন (১২ শ্লো°),

উদাত্তে নিষাদগান্ধারাবানুদাত্তঋষভধৈবতৌ।
স্বরিতঃ প্রভবা হেতো ষড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

উদাত্ত থেকে প্রকাশ পেয়েছে নিষাদ ও গান্ধার, অনুদাত্ত থেকে ঋষভ ও ধৈবত এবং স্বরিত থেকে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম।[২৬] স্বরের আটটী স্থানের ("অষ্টৌ স্থানানি") কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন—উরঃ, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। তিনি স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণগুলির স্থান নির্ণয় করেছেন এই আটটী অংশে। মাত্রার স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে শিক্ষাকার বলেছেন, হৃদয়ে একমাত্রা, মূর্ধায় অর্ধমাত্রা ও নাসিকায় অর্ধমাত্রার অবস্থান। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে কিভাবে স্বরোচ্চারণ করা উচিত তাদেরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন। সেখানেও পশুপক্ষীর ডাককে অনুকরণ করার কথা আছে। কাজেই পরবর্তী শাস্ত্রকারেরা যে ষড়্জাদি সাতস্বরের জন্ম-রহস্যের সঙ্গে পশুপক্ষীদের শব্দের অন্তিম স্বরানুকরণকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন তাতে আর বিচিত্র কি।

মাত্রার প্রসঙ্গে পাণিনিশিক্ষাকারও ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার অথবা অন্যান্য শিক্ষাশাস্ত্রীদের মতন উল্লেখ করেছেন (৪৯ শ্লো°),

চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রং ত্বেব বায়সঃ।
শিখী রৌতি ত্রিমাত্রং তু নকুলস্ত্বর্ধমাত্রকম্ ॥

ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও শিক্ষার যুগে মানুষ বিরাট প্রকৃতিকেই গ্রহণ করেছিল বিশ্ব-সংসারের মূলকারণরূপে, তাই সব-কিছুর কারণ ও ঐক্য খুঁজে পাবার চেষ্টা করত সে প্রকৃতির ভেতর থেকে। তখনকার অন্তর্মুখীনতা অবশ্য এর অন্য একটি কারণ।

২৬। এ'সম্বন্ধে আগে আলোচিত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় সঙ্গীত

শিক্ষাগুলি প্রাতিশাখ্যের পরেই সৃষ্টি হয়েছে বৈদিক গানের ছন্দলালিত্য ও স্বর নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে। অনেকে শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিকে একই সময়ের রচিত বলেন। যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রণীত। যাজ্ঞবল্ক্য অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং স্বরশাস্ত্রেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। সুতরাং আমরা যাজ্ঞবল্ক্যকে ঋষি বোলেই অভিহিত করব। যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদশাখীয় শিক্ষা।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গ্রন্থ-সূচনায় 'তিনটী স্বরের লক্ষণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করব'—"অথাতস্ত্রৈস্বর্যলক্ষণং ব্যাখ্যাস্যামঃ" বোলে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত তিনটী স্বরের উল্লেখ করেছেন। তিনি এই তিনটী স্বরকে বৈদিক বলেছেন—"ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ"। উচ্চাদি অথবা উদাত্তাদি স্বরের দেবতা ও স্থান নির্দেশ করেছেন অনেকটা আধ্যাত্মিকী তথা দার্শনিকী মনোবৃত্তি নিয়ে যেগুলি সাধারণের কাছে মনে হবে রূপকের অনুশীলন বোলে। তিনি বলেছেন,

> শুক্লমুচ্চং বিজানীয়ান্নীচং লোহিতমেব চ।
> শ্যামং তু স্বরিতং বিদ্যাদগ্নিরুচ্চস্য দৈবতম্ ॥
> নীচং সোমং বিজানীয়াৎ স্বরিতে সবিতা ভবেৎ।
> উদাত্তং ব্রাহ্মণং বিদ্যান্নীচং ক্ষত্রিয়মেব চ ॥
> বৈশ্যং তু স্বরিতং বিদ্যাদ্ভারদ্বাজমুদাত্তকম্।
> নীচং গৌতমমিত্যাহুর্গার্গ্যং তু স্বরিতং বিদুঃ ॥
> বিদ্যাদুদাত্তং গায়ত্রং নীচং ত্রৈষ্টুভমেব চ।
> জাগতং স্বরিতং বিদ্যাদেবমেব নিয়োগতঃ ॥২-৫

অপরাপর শিক্ষার সঙ্গে দেবতা, বর্ণ, জাতি প্রভৃতির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।৪।১) বর্ণনার সঙ্গে সাধারণভাবে এর মিল নাই, যদিও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে ঐক্য পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা দেখি,

স্বর		বর্ণ	দেবতা	জাতি	ঋষি	ছন্দ
উদাত্ত	উচ্চ	শুক্ল	অগ্নি	ব্রাহ্মণ	ভরদ্বাজ	গায়ত্রী
অনুদাত্ত	নীচ	লোহিত	সোম (তেজঃ)	ক্ষত্রিয়	গৌতম	ত্রৈষ্টুভ
স্বরিত	মধ্যম	কৃষ্ণ	সবিতা	বৈশ্য	গার্গ্য	জগতী

কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৬।১) দেবতাদের বর্ণের কথা বলা হয়েছে : "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য," অর্থাৎ অগ্নির লোহিত, জলের (অপঃ) শুক্ল ও অন্ন বা পৃথিবীর কৃষ্ণ রূপ। কাজেই ছান্দোগ্য অনুযায়ী উদাত্তাদি স্বরের বিভাগ হয়,

অগ্নি (তেজঃ)	অপঃ (বরুণ)	পৃথিবী (অন্ন)
|	|	|
লোহিত	শুক্ল	কৃষ্ণ
|	|	|
অনুদাত্ত (নীচ)	উদাত্ত (উচ্চ)	স্বরিত (মধ্যম)

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, অগ্নি শুক্ল ও উদাত্ত, সোম (তেজঃ) লোহিত ও অনুদাত্ত এবং সবিতা বা সূর্য কৃষ্ণ ও স্বরিত, কাজেই ছান্দোগ্যে বর্ণিত বিভাগের সঙ্গে এ-বর্ণনা ঠিক মিলে না। কিন্তু ছান্দোগ্যের ৬।৪।৩ শ্লোকে আবার সোম বা চন্দ্রমাকে তেজঃস্বরূপ চিন্তা ক'রে তার বর্ণ নির্ণয় করা হয়েছে লোহিত। অর্থাৎ ৬।৪।৩ শ্লোক অনুযায়ী তাহলে বিভাগ হয়,

সোম (তেজঃ)	অপঃ	পৃথিবী
|	|	|
লোহিত	শুক্ল	কৃষ্ণ
|	|	|
অনুদাত্ত	উদাত্ত	স্বরিত

এই বিভাগের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনার অনেকটা মিল আছে, কারণ সোম বা চন্দ্র বৈদিকযুগের গোড়াকার দিকে বরুণ, আকাশ, আকাশস্থ সূর্য অথবা পৃথিবীস্থ সূর্য বা অগ্নি-রূপেই কল্পিত হোত। অপঃ বা সলিল ও বরুণ বা আকাশ,

আর সবিতা বা সূর্যকে যাজ্ঞবল্ক্য কৃষ্ণবর্ণ বোলে বর্ণনা করেছেন এবং ছান্দোগ্যে আছে—পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং এর মধ্যে বৈষম্য বিশেষ নাই, কেননা বৈদিক-যুগের গোড়ার দিকে বরুণ বা আকাশ (দ্যৌ) প্রথম দেবতা ও পরে হোল পৃথিবী, আকাশ বা দ্যৌ—পুরুষ এবং পৃথিবী—স্ত্রী সুতরাং পুরুষপ্রকৃতিরূপে কল্পিত। বাজসনেয়ী-সংহিতায় (২৩।৪৮) আছে—"দ্যৌ সমুদ্রঃ", আকাশই সমুদ্র, ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (১।২৪)—"বরুণ আদিত্যঃ", অথবা শতপথব্রাহ্মণে (৫।২।৪।২৩) —"যো বৈ বরুণঃ সোঽগ্নিঃ", বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।১।২)—"আপো বা অর্কঃ।"[১] সুতরাং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য-বর্ণিত দেবতা ও বর্ণের সঙ্গে ছান্দোগ্যের ঐক্য সকল দিক থেকেই আছে।

ব্রাহ্মণসাহিত্য ও উপনিষদের যুগে ত্রিত্ববাদের সৃষ্টি হয়। ছান্দোগ্যে (৬।৪।১) বলা হয়েছে—"ত্রীণি রূপানীত্যেব সত্যম্",—লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই বর্ণ বা রঙ-তিনটী সত্য, আর অবশিষ্ট সমস্তই বিকৃত সুতরাং মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ-বর্ণের মধ্যে শুক্ল ও কৃষ্ণ-বর্ণকে চরম দুটী সীমা বলা যায়, কেননা সকল বর্ণের সংমিশ্রণে শুক্ল বা শ্বেত বর্ণের সৃষ্টি এবং সকল বর্ণই লীন হয় কৃষ্ণবর্ণে, তাই শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ সর্ববর্ণগ্রাসী, সামান্য-রূপী ও নিত্য। অবশ্য লোহিতকেও উপনিষদ্‌কার নিত্য হিসাবে স্বীকার করেছেন। ঋগ্বেদে "লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" শব্দের উল্লেখ আছে এবং এ থেকে পণ্ডিতগণ সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণ-তিনটীর সৃষ্টি হয়েছে বোলে স্বীকার করেন। কাজেই ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের রচনার কালেই যে ত্রিত্বযুগের উৎপত্তি হয়েছে একথা স্বীকার করায় আপত্তি নাই। ত্রিত্ববাদের যুগে সমস্ত প্রধান উপাদানকে তিনটী ক'রে কল্পনা ও বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন মিত্র-বরুণ-অগ্নি, দ্যৌ-পৃথিবী-অগ্নি, অগ্নি-সোম-সবিতা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ, সত্ত্ব-রজঃ-তম, দেবতা-অসুর-গন্ধর্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, গায়ত্রী-ত্রিষ্টুভ-জগতী প্রভৃতি। মোটকথা সামাজিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বৈদিক যুগেই জন্মলাভ করেছিল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকার পরিবেশকে নিয়ে। তাছাড়া গোত্র, গোষ্ঠী ও সমাজ (clan and community) সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং মানুষের মনে সংঘবদ্ধতার ভাব তখন সুদৃঢ়, কোন-কিছুকে একক হিসাবে ভাবতে সে আর তখন চায় নি। অধ্যাত্ম সম্পদের জন্মভূমি

১। প্রজ্ঞানানন্দ: "রাগ ও রূপ', পৃ° ৭৬

ভারতবর্ষে স্বরগুলিকেও দেবতা, ঋষি, বর্ণ, ছন্দ, ও জাতি প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে সাম-উপাসনার বর্ণনা করা হয়েছে ২য় প্রপাঠকের ২য়-৭ম খণ্ড পর্যন্ত ঠিক এইভাবেই কল্পনা ক'রে, যেমন—

হিংকার	প্রস্তাব	উদ্গীথ	প্রতিহার	নিধন
পৃথিবী	অগ্নি	অন্তরীক্ষ	আদিত্য	স্বর্গ
দ্যুলোক	আদিত্য	অন্তরীক্ষ	অগ্নি	পৃথিবী
পূর্বদিকের বায়ু	মেঘোৎপাদক বায়ু	মেঘবর্ষণ	বিদ্যুৎ	জল
বসন্ত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত
ছাগ	মেষ	গো	অশ্ব	পুরুষ
প্রাণ	বাক্	চক্ষু	কর্ণ	মন

তাছাড়া ছান্দোগ্যের ২।১১।১ শ্লোকে মনকে উদীয়মান সূর্য, বাক্‌কে উদিত সূর্য, চক্ষুকে মধ্যাহ্নের সূর্য, স্রোত্রকে অপরাহ্ণকালীন সূর্য ও প্রাণকে অস্তোন্মুখ সূর্য-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। সকল ধারণার মূলেই আদিত্য, সূর্য বা মিত্রকে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই দার্শনিক চিন্তাধারার তখন স্বর্ণযুগ। একে বৌদ্ধিক পরিণতির যুগও (intellectual period) বলা যায়। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে ষড়্‌জাদি সাত স্বরের যে দেবতা, বর্ণ, ঋষি, স্থান প্রভৃতির কল্পনা করা হয়েছে তা মোটেই নূতন ও বিচিত্র নয়। তাছাড়া রাগগুলি পশুপক্ষী থেকে উৎপত্তি হয়েছে, বিভিন্ন ঋতুতে তাদের গাইতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও রসে তারা যুক্ত ও অনুবিদ্ধ—এ'সবের ধারণাও বৈদিক যুগ থেকে মানুষ গ্রহণ করেছে, হটাৎ নূতন-কিছু আবিষ্কার তারা করেনি। এই ধারণার বশবর্তী হোয়েই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উদাত্তাদি স্বর-তিনটীর দেবতা, বর্ণ, জাতি, ঋষি, ছন্দ প্রভৃতির কল্পনা করেছেন। ভাববিলাসী ও আধ্যাত্মজ্ঞানকামী ভারতবাসীর কাছে এ'সকল নূতন ও আশ্চর্যের কিছুই নয়।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ষড়্‌জাদি সাতটী স্বরকে গান্ধর্ববেদসম্মত এবং উদাত্তাদি স্বর

তিনটীকে বৈদিক হিসাবে গণ্য করেছেন—"গান্ধর্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত ষড়্জাদয় স্বরাঃ, ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয়ঃ উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ", অর্থাৎ বেদের তথা বৈদিক গানের উদাত্তাদি তিন স্বরই পরবর্তীকালে বেদোত্তর ও বেদসম্মত গানশাস্ত্র গান্ধর্ববেদে ষড়্জাদি সাত স্বর-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের কারণ (cause) উদাত্তাদি তিন স্বর। কিভাবে বৈদিক তিন স্বর থেকে সাত স্বরের জন্ম হোল তার পরিচয় দিতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যও বলেছেন,

উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমাঃ ॥

অর্থাৎ,

কিন্তু কি প্রণালীর (process) মাধ্যমে লৌকিক সাত স্বর উদাত্তাদি থেকে সৃষ্টি হোল তার কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরিচয় তিনি দেন নি। অবশ্য লৌকিক সাত স্বরের জন্মকথার অবতারণায় ষড়্জাদি স্বর যে বৈদিকত্বের সম্মান পাবার অধিকারী একথাই যাজ্ঞবল্ক্য প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এ'সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি,[২] তাই সংক্ষেপে এখানে বলা যায় যে, উদাত্তাদি স্বর-তিনটীর মধ্যে স্বরিত থেকে অভিব্যক্ত ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চম (সমপ) স্বর-তিনটিই আদিম স্বর, আর সেজন্যে একে 'স্বয়ম্ভু' স্বর বলা হয়েছে। এই স্বর তিনটীকে অবলম্বন ক'রেই অপরাপর স্বরগুলি সৃষ্টি হয়েছে।

স্বরের পর মাত্রার প্রসঙ্গ তুলে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, মাত্রার ধারণা করতে গেলে আমাদের সূর্যরশ্মিতে প্রতিভাত অণুর প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত। চারটি অণুর সমবায়ে যে চতুরণুর সৃষ্টি হয়, তাকেই মাত্রা বলে—

সূর্যরশ্মিরপ্রতীকাশাৎ কণিকা যত্র দৃশ্যতে,
আণবস্তু তু সা মাত্রা মাত্রা তু চতুরাণবা"।

এই মাত্রার বিকাশভেদ আছে। মন দ্বারা আমরা একটী মাত্র অণুর

২। প্রজ্ঞানানন্দ: 'রাগ ও রূপ', পৃ: ৭৪—৭৯

কল্পনা করতে পারি, আর কণ্ঠে থাকে দুটী মাত্রা ও জিহ্বার অগ্রে তিন মাত্রার অবস্থান। এক মাত্রাকে বলে হ্রস্ব, দু'মাত্রার সমষ্টি দীর্ঘ, তিনমাত্রার সমষ্টি প্লুত, আর ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্রা-বিশিষ্ট। এছাড়া যাজ্ঞবল্ক্য পশুপক্ষীর স্বরেও মাত্রাস্থিতির উল্লেখ করেছেন, যেমন নীলকণ্ঠের শব্দ একমাত্রাবিশিষ্ট, কাকের ডাকে থাকে দুটী মাত্রা ও ময়ূরের শব্দ তিনমাত্রাযুক্ত।

বর্ণ তথা শব্দের লক্ষণ সম্বন্ধেও যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় আলোচিত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, যার প্রকৃতি শান্ত, দন্ত ওষ্ঠ শোভন ও সুশ্রী, যে প্রগল্ভ নয় কিন্তু বিনীত, যে ভীত নয় ও যার শব্দ অনুনাসিক বা নাসিকা থেকে উচ্চারিত হয় না, তার শব্দ বা কণ্ঠ সুমিষ্ট। কণ্ঠকে সুমিষ্ট রাখার জন্যে দন্ত ধৌত করা উচিত আম্র, পলাশ, বিল্ব প্রভৃতি গাছের ডাল দিয়ে। পরে উদাত্তাদি তিন স্বর অঙ্গুলি-উত্তোলনের সাহায্যে কিভাবে উচ্চারণ করা উচিত সে-সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

উদাত্তাদি তিন ও ষড়্‌জাদি সাত স্বর ছাড়াও যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বাচার্যদের মতন জাত্যাদি আটটী স্বরের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> জাত্যোঽভিনিহিতঃ ক্ষৈপ্রঃ প্রশ্লিষ্টশ্চ তথাঽপরঃ।
> তৈরোব্যঞ্জনসংজ্ঞশ্চ তথা তৈরোবিরামকঃ।
> পাদবৃত্তো ভবেৎ তদ্বৎ তাথাভাব্য ইতি স্বরাঃ॥

জাত্য অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট, তৈরোব্যঞ্জন, তৈরোবিরাম, পাদবৃত্ত ও তাথাভাব্য এই আটটী স্বর বেদপাঠে ব্যবহৃত হোত, সুতরাং তাদের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্পর্শাদি বর্ণগুলির রঙ ও দেবতাদের পরিচয় আছে, যেমন—স্পর্শবর্ণ কৃষ্ণ, অন্তস্থবর্ণ কপিল, অনুস্বার পীত, জিহ্বামূলীয় বর্ণ রক্ত। দেবতা ছাড়া বর্ণগুলি পুরুষ, স্ত্রী কিংবা নপুংসক কিনা সে-সবেরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বর্ণগুলির প্রয়োগপ্রণালীরও উল্লেখ আছে। যেমন, সিংহ চিৎকার করলে হৃদ থেকে যেমন তা মেঘদুন্দুভির শব্দের মতন শোনায় অথবা ভাদ্রমাসে মেঘ যেমন শব্দ করে, বানরেরা বৃক্ষশাখায় লাফালাফি করার সময় যেমন শব্দ করে, তেমনি ভাবে শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। পারাশরী-শিক্ষা, মাধ্যন্দিনীশিক্ষা প্রভৃতিতেও এ'ধরনের উল্লেখ আছে। অবশ্য বর্তমান সঙ্গীত-সাধনার ধারায় এগুলি তত মূল্যবান নয়।

এখানে একটী বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য গান্ধর্ববেদের

লৌকিক সাতস্বর ও বৈদিক উদাত্তাদি তিন স্বরের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু সামগানের প্রথমাদি সাত স্বরের কোন বর্ণনা দেন নি। এ' থেকে অনুমান করা যায় যে, হয় যাজ্ঞবল্ক্যের সময়ে প্রথমাদি স্বরের সৃষ্টি হয় নি, মাত্র উদাত্তাদি স্বরই ছিল, নতুবা তখন প্রথমাদি স্বরযোগে সামগানের রীতি লোপ পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উদাত্তাদি স্বর বৈদিক প্রথমাদি সাত স্বর থেকে মোটেই প্রাচীন নয় এবং এ'সম্বন্ধে আমরা আগেও আলোচন করেছি। উদাত্তাদি উচ্চ, নীচ ও মধ্য স্বর হিসাবে ব্যবহৃত হোত ও পরবর্তীকালে এ'থেকেই মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থানরূপে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রথমাদি সাত স্বরও মন্দ্রাদি তিনস্থানে লীলায়িত ছিল, সুতরাং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদিক স্বর-হিসাবে উদাত্তাদিরই মাত্র নামোল্লেখ করেছেন কেন, তার কারণ অনুধাবন করা কঠিন। উদাত্তাদিকে প্রথমাদি অথবা ষড়্জাদির মতন স্বর হিসাবে গণ্য করা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ এরা পরবর্তীকালে স্থান-হিসাবে গণ্য হয়েছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

মাণ্ডুকীশিক্ষায় সঙ্গীত

মাণ্ডুকী অথর্ববেদীয়া শিক্ষা। ঋষি মণ্ডুক এই শিক্ষা রচনা করেন বোলে এর নাম 'মাণ্ডুকীশিক্ষা'। ঋষি মণ্ডুক প্রথমেই মাত্রা-সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন। তিনি বলেছেন: "তিস্রো বৃত্তীরনুক্রান্তা দ্রুতমধ্যবিলম্বিতা", মাত্রা দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতা ভেদে তিন রকম। বেদাভ্যাসে দ্রুত, পাঠের উপলব্ধিতে বিলম্বিত ও বেদবচন-প্রয়োগের সময় মধ্যম বৃত্তি অনুসরণ করতে হয়। এই বৃত্তিই পরে সঙ্গীতে 'লয়' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঋষি মণ্ডুক প্রাজপাত্য-যাগে বিলম্বিত, ঐন্দ্রীযাগে মধ্য ও অগ্নিমারুতযাগে দ্রুত বৃত্তির প্রয়োগের কথা বলেছেন।

এর পর ঋষি মণ্ডুক স্বর-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রথমেই "সপ্ত স্বরাস্তু গীয়ন্তে সামভিঃ সামগৈর্বুধৈঃ",—বিচক্ষণ সামগানকারীরা সাতটী স্বর গানে (সামগানে) ব্যবহার করেন। এই সামগানের স্বর প্রথমাদি নয়, পরন্তু ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ। তিনি উল্লেখ করেছেন,

> ষড়্‌জঋভগান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
> ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তেহ সামসু ॥

কিন্তু সামস্বর ঠিক ষড়্‌জাদি সাত স্বর নয়, যদিও বৈদিকত্বের সম্মান পাবার এরা অধিকারী। আচার্য সায়ণ তাঁর সামবেদভাষ্যোপক্রমণিকায় উল্লেখ করেছেন: "সামশব্দবাচ্যস্য গানস্য * * ক্রুষ্টাদিভি: সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরবিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে। ক্রুষ্টঃ প্রথমো দ্বিতীয়স্তৃতীয়শ্চতুর্থঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠেশ্চেত্যেতি সপ্ত স্বরাঃ"। সামবিধানব্রাহ্মণের ভাষ্যেও তিনি একথারই উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ঋষি মণ্ডুক যে "সপ্ত স্বরাস্তু গীয়ন্তে সামভিঃ সামগৈর্বুধৈঃ" শব্দগুলির অবতারণা ক'রে ষড়্‌জাদি লৌকিক সাত স্বরের বেলায় "স্বরাঃ সপ্তেহ সামসু" বলেছেন তা কতটুকু সমীচীন সম্পূর্ণ বিচারের বিষয়। এমন কি অনেক পরবর্তী গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেবও তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে সামস্বর যে প্রথমাদি এবং ষড়্‌জাদি লৌকিক স্বর একথা স্বীকার করেছেন। কাজেই মনে হয়,

মাণ্ডুকী-শিক্ষাকারের সময় প্রথমাদি বৈদিক স্বরের প্রচলন সমাজ থেকে লোপ পেয়েছিল (?)। কেননা ৮ম শ্লোকের পরও "ষড়্জং বদতি ময়ূরো" (৯ম শ্লোক), "কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতে ষড়্জঋষভস্তথা" (১১শ শ্লোক), "পদ্মপ্রভবঃ ষড়্জঃ" (১৩শ শ্লোক) প্রভৃতির প্রসঙ্গে লৌকিক স্বরের আলোচনাই তিনি করেছেন। তবে উদাত্তাদি স্বর নিয়ে যে তিনি অনুশীলন করেন নি, তা নয়, কিন্তু তাদের সামগোষ্ঠীর ভেতর অন্তর্ভুক্ত করেন নি। উদাত্তাদি স্বর-সম্বন্ধে ঋষি মণ্ডুক উল্লেখ করেছেন,

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতঃ প্রচিতস্তথা।
চতুর্বিধং স্বরো দৃষ্টঃ স্বরচিন্তাবিশারদৈঃ॥

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্রচয় এই চার স্বরের কথা তিনি বলেছেন। অবশ্য প্রচয় স্বরিতের অন্তর্ভুক্ত। স্বরগুলির স্থান-সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে হস্ত-সঞ্চালনের নিয়ম আছে, অর্থাৎ বৈদিক যুগে হস্তের অঙ্গুলিগুলির সঙ্কেতের দ্বারা স্বর-নির্দেশের বিধি ছিল। বাণী বা কথা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে অঙ্গুলি-নির্দেশ করতে হোত— "যথা বাণী তথা পাণী" অথবা "যত্রৈব তু স্থিতা বাণী পাণিস্তত্রৈব ধার্যতে", অথবা "ঋগ্‌যজুঃ সামগাদীনি হস্তহীনানি যঃ পঠেৎ" প্রভৃতি।

যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষার মতন মাণ্ডুকীতেও স্বর-নিয়মনের প্রণালী দেওয়া আছে, যেমন দন্তধাবন ও মুখ-প্রাক্ষালন কিভাবে করতে হয়, প্রাতঃকালে গায়কের তথা বেদপাঠকের কর্তব্য কি, প্রভৃতি। শার্দূল, চক্রবাক, শিখণ্ডী, ময়ূর, ব্যাঘ্র প্রভৃতির শব্দের মতন মাধ্যন্দিনযাগে কিংবা প্রাতে কিভাবে শব্দোচ্চারণ করতে হয় সে-সবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মোটকথা বেদপাঠ ও বেদগান করতে গেলে কিভাবে কণ্ঠস্বরের যত্ন ও সাধনা করতে হয় শাস্ত্রকারেরা সে-সবের উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষাকার মণ্ডুক অভিনিহিত, প্রশ্লিষ্ট, জাত্য, ক্ষৈপ্র, পাদবৃত্ত, তৈরোব্যঞ্জন, তিরোবিরাম প্রভৃতি সাত স্বরেরও পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে মাণ্ডুকীর পার্থক্য হোল: যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা যেখানে এই স্বরগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে সংখ্যা হিসাবে বলেছে "অষ্টৌ স্বরান্ প্রবক্ষ্যামি", মাণ্ডুকী সেখানে বলেছে: "সপ্ত স্বরান্ প্রবক্ষ্যামি" অথবা "তিরোবিরামশ্চ সপ্তমঃ"। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ("সদাশিবতনুজেন বালকৃষ্ণেন ধীমতা") তাঁর 'প্রাতিশাখ্য-প্রদীপশিক্ষা'-য় উল্লেখ করেছেন: "উদাত্তাদয় পরে সপ্ত",—উদাত্ত প্রভৃতি

তিন অথবা চার স্বর পরবর্তীকালে অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র প্রভৃতি সাত স্বরে ("সপ্তস্বরাঃ") অভিব্যক্ত হয়েছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন: "উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ", অর্থাৎ উদাত্তাদি তিন স্বর থেকে পরবর্তী সময়ে ষড়্জাদি সাত স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, অভিনিহিতাদি সাত অথবা আট স্বর ও ষড়্জাদি সাত স্বর উভয়ই উদাত্তাদি স্বর থেকে অভিব্যক্ত হয়েছে। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ 'প্রাতিশাখ্যপ্রদীপশিক্ষা'-য় স্বীকার করেছেন যে, কোন কোন মতে তাথাভাব্যকেও অষ্টম স্বর হিসাবে গণ্য করা হয়—"কেষাংচিন্মতে নাষ্টমস্তু তাথাভাব্যঃ"। অবশ্য ভরদ্বাজকুলতিলক পণ্ডিত অমরেশ তাঁর "বর্ণরত্নপ্রদীপিকাশিক্ষা"-য় আটটী স্বরের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন—"অষ্টৌ স্বরান্ প্রবক্ষ্যামি * * জাত্যোঽভিনিহিতঃ" প্রভৃতি। পণ্ডিত অমরেশ এই আট স্বরের লক্ষণ এবং স্বরূপও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। দৈবজ্ঞ কেশবরামও তাঁর "পদাত্মিকাশিক্ষা"-য় জাত্য, অভিনিহিত প্রভৃতি আটটি ("অষ্টমঃ") স্বরের কথা বলেছেন। কিন্তু পণ্ডিত রামকৃষ্ণ তাঁর 'স্বরাঙ্কুশশিক্ষা'-য় "পাদবৃত্তস্তু সপ্তমঃ"—সাতটী স্বরের প্রামাণ্যই স্বীকার করেছেন। অবশ্য পাণিনীয়শিক্ষাকার কি জানি কেন এ'সম্বন্ধে কোন-কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেন নি বা এই স্বরগুলির পরিচয় দেবারও আবশ্যকতা বোধ করেন নি। মোটকথা শিক্ষাকারদের ভেতর এই স্বরগুলির সংখ্যা-নির্ণয় নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে এবং পাঠপ্রয়োগেও মনে হয় সম্প্রদায়ভেদ ছিল।

নারদীশিক্ষায় (পৃ°৪০৭) পশুপক্ষীর বুলির মধ্যে স্বর-বিন্যাস আছে বোলে উক্ত হয়েছে। মাণ্ডুকীশিক্ষায় (পৃ°৪৬৩) বলা হয়েছে,

> ষড়্জেঃ বদতি ময়ূরো গাভো রম্ভন্তি চর্ষভঃ।
> অজা বদতি গান্ধারো ক্রৌঞ্চনাদস্তু মধ্যমে।
> পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চমে স্বরে।
> অশ্বস্তু ধৈবতে প্রাহ নিষাদো কুঞ্জরস্তু নিষাদবান্॥

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে শ্লোকের বাচনিক অভিব্যক্তি ভিন্ন হোলেও ভাব এবং অর্থের দিক থেকে সকলের মাণ্ডুকীর সমশ্রেণীয়। সঙ্গীতদর্পণ, রত্নাকর এবং প্রাতিশাখ্য প্রভৃতিতেও ঐভাবে পশুপক্ষীর আওয়াজের মধ্যে স্বর-বিন্যাসের কথা উক্ত আছে। এর থেকে স্বরের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও এখন আমরা যে-ভাবে স্বরের প্রয়োগ করি তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই তবে শ্রুতির

পরিবর্তন করলে হয়তো মিলতে পারে। কিন্তু এ'শ্লোকগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, সে-যুগে স্বরের মান (standard) নির্ধারিত হয়েছিলো যথাযথভাবে। তখনো সাধারণভাবে সেই মানকে অনুসরণ করা হোত। স্বর-সংস্থানের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যেই উদাহরণ-স্বরূপ পশুপক্ষীর স্বরের নির্দেশ দেওয়া হ'য়েছে বোলে মনে হয়। কাজেই বলা যায়, স্বরের বিকাশ ঘটেছে শিক্ষা-যুগেরও বহুপূর্বে এবং ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ধীরে ধীরে লাভ করেছে সম্পূর্ণতা যার জন্যে সম্ভবপর হয়েছে ঐ মিল খুঁজে বার করা, আর স্বরের পূর্ণ বিকাশ এবং তার জ্ঞান ছাড়া যা কখনো সম্ভবপর হোতে পারে না।

এগুলি থেকে আবার মনে হয়, মানুষের মনে সুরের ছোঁওয়া লাগে পাখীর গান তথা প্রকৃতির সঙ্গীত থেকে, আর তা থেকেই তার মনে স্বর-বিভাগের চিন্তার উদয় হয়। মানুষের চেয়ে পশুপক্ষীদের আওয়াজে স্বরের বিকাশ অনেক স্পষ্টতর—মানুষের কথা বলায় বা কান্নার মাঝে যা খুঁজে পাওয়া কঠিন। সঙ্গীতের কথা বললুম না, কারণ সুর বা গান পাখীর মধ্যে যেমন সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি অপরিহার্য। আর তাদের গান বা ডাকের মধ্যে স্বরের স্তর এবং ক্রমপর্যায় যেমন প্রকট হোয়ে ওঠে তেমনটী মানুষের কথা বলার মাঝে হয় না। গান মানুষের জন্মগত নয়। কোন শিশু গান শোনার আগে সে গান গাইতে পারে না—'হরবোলা' যেরকম কথা বলতে পারেনা না শুনলে। কিন্তু কোকিলের গান শোনার প্রয়োজন হয় না। কাকের বাসায় জন্ম ও পরিপুষ্ট হওয়া সত্বেও সে গেয়ে ওঠে তার স্বর-বিকাশের সাথে সাথে, কাকের ডাকের অনুকরণ করে না। তাই কবিগুরুর উক্তিতে পাই,

পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশী করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান,
আমি গাই গান।

আমাদের কাছে একটী পরমসত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করে বোলে মনে হয়। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের মতানুযায়ী জীব-জগতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে সৃষ্টির শেষ অঙ্কে। সুতরাং মানুষের আগে এসেছে পশুপক্ষী তাদের স্বর ও বোধ হয় সুর নিয়ে, কাজেই বল্‌তে হয়—মনুষ্যপূর্ব যুগেও জগতে সঙ্গীত সাধনা চলছিলো, মানুষ এসে তাতে যোগ দিয়েছে—বৃদ্ধি করেছে তার গতি। জগতের প্রতিটী

আদি-সম্পদের মতন সঙ্গীত-সম্পদও ছিলো সঞ্চিত প্রকৃতির ভাণ্ডারে। তার শব্দ-ভাণ্ডারের মধ্যে মিশেছিলো সঙ্গীত ওতঃপ্রোতভাবে, আর স্বরের স্তর ছিলো জাগরূক স্পষ্ট রূপ নিয়ে। তার অক্ষয় ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে জলপ্রপাতের প্রচণ্ড ঝংকারে—পূর্ণ করেছে পর্বত-গহ্বর মহাওঙ্কার নাদে। তার সঙ্গীত মুখরিত হয়েছে বন-মর্মরে, জেগেছে ঝরণার কলস্বনে। পাখীর কাকলিতে পেয়েছে মুক্তি গান সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে। মানুষ তাকে চিনেছে, তাকে জেনেছে, তাকে লভেছে যুগ-যুগান্তের সাধনায়। প্রকৃতির সম্পদকে সে খুঁজে বার করেছে, তাকে গ্রহণ করেছে, তার রূপ দিয়েছে বড়জোর, সৃষ্টির কথাই ওঠে না। স্বরের দিক থেকেও তাই বলতে হয়, মানুষ স্বরকে শুধু ভাগ করেছে, নামের বাঁধনে বেঁধেছে তার সন্ধান পেয়ে, স্বরকে সৃষ্টি করার দৃষ্টি ও অবকাশ তার মেলেনি। সে কেবল শুনেছে, জেনেছে আবার শুনিয়েছে।

ময়ূরের স্বর, গাভীর স্বর, ছাগের স্বর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বরের মাঝে যে পার্থক্য তার তাৎপর্যকে গ্রহণ ক'রে মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় তাকে দিয়েছে স্বর-সংস্থাপনে বৈচিত্র্যের খবর। মানুষ তার মেধাবলে বুঝতে পেরেছে ময়ূরের স্বর আর গাভীর স্বর এক নয়। দেখেছে—তার নিজের কণ্ঠে যে এক এক সময় এক এক স্বরের উদ্ভব হয় তারাও এক নয়। প্রকৃতির ঐ বিচিত্র স্বরের সঙ্গে স্বর মেলাতে হোলে তাকেও বিচিত্রভাবে স্বরবিন্যাস করতে হয়। এভাবে এসেছে স্বরের সংজ্ঞা। পরিবর্তনশীল কালের প্রভাবে স্বরের বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটার ফলেই আমরা আজকের স্বরগ্রামের সঙ্গে সেদিনকার স্বরগ্রামের যথাযথ মিল পাচ্ছি না, আর সেজন্যেই ময়ূরের স্বরের সঙ্গে আমাদের ষড়্জের যোগ হয়েছে ছিন্ন এবং যার জন্যে এই বিভ্রাটের উৎপত্তি। তবুও ময়ূরের কেকারবের মধ্যে 'পা—র্সা' এই ধ্বনির সাদৃশ্য পাওয়া যায় বোলেই মনে হয়। 'র্সা র্গা র্মা, পা র্গা'—এই ভাবে স্বরবিন্যাস ক'রে কোকিলের ডাকের অনেকটা অনুকরণ করা যায়। হাতির ডাকের মাঝে নিষাদের তীব্রতার আমেজ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বিভিন্ন শ্রুতির প্রয়োগের সাহায্যে এইভাবে মেলাতে পারলে অনেক স্বরের সঙ্গেই পশুপক্ষীদের আওয়াজের মিল পাওয়া যায়। এ' দিক থেকে বিচার করলে স্বর কবে সৃষ্টি হয়েছিলো এ-প্রশ্নও অবান্তর হোয়ে পড়ে। মোটকথা মাণ্ডুকীশিক্ষাকার অপরাপর

আচার্যদের মতন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ই দিয়েছেন।

ঋষি মণ্ডুক স্বরগুলির বর্ণ, স্থান প্রভৃতিরও উল্লেখ করেছেন। যেমন, ষড়্জের পদ্মপত্রের মতন বর্ণ, ঋষভের শুকপিঞ্জর, গান্ধার কনক বা স্বর্ণাভ, মধ্যম কুন্দ, পঞ্চম কৃষ্ণ, ধৈবত পীত ও নিষাদ সর্ববর্ণযুক্ত। পুনরায় ক্রুষ্ট বাহ্যাঙ্গুষ্ঠে, মধ্যম অঙ্গুষ্ঠে, গান্ধার প্রাদেশে, পঞ্চম মধ্যমাঙ্গুলিতে, ষড়্জ অনামিকায়, ধৈবত কনিষ্ঠায় ও নিষাদ কনিষ্ঠাঙ্গুলির নীচে অবস্থিত। শিক্ষাকার মণ্ডুক লৌকিক স্বরের আলোচনায় হঠাৎ কেন ক্রুষ্ট এই বৈদিক সামস্বরকে গ্রহণ করলেন তা বলা সুকঠিন, অথচ তিনি ঋষভের কোন পরিচয় দেন নি, কিংবা ক্রুষ্ট বল্‌তে তিনি ঋষভকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাও যুক্তিযুক্ত নয়। তারপর স্বরের বর্ণকল্পনাও কিছু অলৌকিক বা অস্বাভাবিক নয়। স্বর কম্পনের সমষ্টি, বর্ণও তাই। বিজ্ঞানেও স্বরের বর্ণ (রঙ্) স্বীকৃত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বর্ণরত্নপ্রদীপিকাশিক্ষায় সঙ্গীত

'বর্ণরত্নপ্রদীপিকাশিক্ষা' বা 'অমরেশীশিক্ষা' গ্রন্থখানি ভারদ্বাজবংশের আচার্য অমরেশ বৈদিক প্রাতিশাখ্যদের অনুসরণ ক'রে রচনা করেছিলেন। এই শিক্ষাটী যাজ্ঞবল্ক্য, লোমশী, মাণ্ডুকী ও এমনকি নারদীর চেয়েও আধুনিক বোলে মনে হয়। আচার্য অমরেশের উদ্দেশ্যই ছিল বেদপাঠ যখন জ্ঞান-সংগ্রহের জন্যে অপরিহার্য তখন তার পাঠশুদ্ধি ও বর্ণজ্ঞান প্রয়োজন এবং তারই জন্যে এই শিক্ষার রচনা। অমরেশ লিখেছেন (৩-৯ শ্লো°),

বালানাং পাঠশুদ্ধ্যর্থং বর্ণজ্ঞানাদিহেতবে ॥

*   *   *   *

স্বরসংস্কারয়োর্বেদে নিয়মঃ কথিতো যতঃ।
ততো বিচার্য বক্তব্যো বর্ণসংঘাতঽউত্তমঃ ॥
মন্ত্রো যঃ স্বরতো হীনো বর্ণতো বাঽপি কুত্রচিৎ।
নিষ্ফলং তং বিজানীয়াত্তথৈবাশুভসূচকম্ ॥
বেদস্যাধ্যয়নাদ্ধর্মঃ সম্প্রদানাত্তথা শ্রুতেঃ।
বর্ণশোঽক্ষরশো জ্ঞানাদ্বিভক্তিপদশোঽপিচ ॥
স্বরো বর্ণোঽক্ষরং মাত্রা তৎপ্রয়োগাঽর্থঽএবচ।
মন্ত্রং জিজ্ঞাসমানেন বেদিতব্যং পদে পদে ॥
স্থানং চ করণং মাত্রা সম্যগুচ্চারণং তথা।
যো ন বেদ স নির্লজ্জঃ পাঠামীতি কথং বদেৎ ॥

বেদপাঠে স্বর, মাত্রা, স্থান, করণ, উচ্চারণপদ্ধতি (intonation) প্রভৃতির প্রয়োজন এবং সে-সবের নির্ধারণ-ব্যাপারে প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগুলির উপযোগিতা।

শিক্ষা সাধারণভাবে ৩২খানি আমরা ছাপার অক্ষরে পাই এবং সেগুলি হোল: যাজ্ঞবল্ক্য, বাসিষ্ঠী, সঠিক কাত্যায়নী, পারাশরী, মাণ্ডব্য, আমোঘানন্দিনী, লঘ্বমোঘানন্দিনী, মাধ্যন্দিনীয়, লঘুমাধ্যন্দিনীয়, অমরেশী, কেশবী বা সঠিক কেশবী, তৎকৃতপদ্যাত্মিকা, মল্লশর্ম, স্বরাংকুশ, ষোড়শশ্লোকী,

অবমাননির্ণয়, স্বরভক্তিলক্ষণ, ক্রমসন্ধান, মনঃসার, প্রাতিশাখ্যপ্রদীপ, বেদসূত্রপরিভাষা, বেদপরিভাষাকারিকা, যজুর্বিধান, স্বরাষ্টক, ক্রমকারিকা, পাণিনীয়, পাণিনীয়শিক্ষাপ্রকাশটীকা, নারদীয়, গৌতমী, লোমশী, মাণ্ডুকী ও অথর্বণপরিশিষ্টম্। তবে এদের মধ্যে শিক্ষাপ্রকাশ, যাজ্ঞবল্ক্য, পাণিনীয়, মাণ্ডুকী, বর্ণরত্নপ্রদীপিকা বা অমরেশী ও বিশেষভাবে নারদীয় শিক্ষাগুলিই বর্তমান সাঙ্গীতিক জ্ঞানের পক্ষে উপযোগী।

বর্ণরত্নপ্রদীপিকাকার বর্ণ, স্বর, অক্ষর, মাত্রা, মন্ত্র, পদ, স্থান, করণ প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বেদপাঠে এগুলির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার মাধ্যমে একথাই বল্‌তে চেয়েছেন যে, স্তোত্রে, স্তবে, পাঠে বা গানে বৈদিক ও লৌকিক স্বর, হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতাদি মাত্রা, মন্দ্র মধ্য তারাদি স্থান, স্বর ও মাত্রা-নির্দেশের জন্যে হস্ত বা অঙ্গুলিকরণ দরকার।

অমরেশ বলেছেন, শব্দের অর্থনির্ণয়কারীদের মতে ২১টী স্বর— "একবিংশতিরুচ্যন্তে স্বরাঃ শব্দার্থচিন্তকৈঃ"। কিন্তু ক-কার থেকে ম-কার পর্যন্ত ২৫টী স্পর্শবর্ণ, এছাড়া শ ষ স এবং অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় প্রভৃতি বর্ণ আছে। পাঠে ও স্বরের উচ্চারণে বর্ণের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠক ও গায়কের জ্ঞান থাকা উচিত, তাই শিক্ষাগুলি বর্ণের পরিচয় দিয়েছে।

শিক্ষাকারের মতে, একমাত্রাবিশিষ্ট বর্ণ হোলেই তা হ্রস্ব, দ্বিমাত্রাযুক্ত দীর্ঘ, ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট প্লুত এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অর্দ্ধমাত্রা। যেমন,

একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রিকম্॥
তদর্দ্ধমণু তস্যার্দ্ধং পরমাণ্বভিধীয়তে।

স্থান আটটী: উর, কণ্ঠ্য, শির, জিহ্বামূল, দন্ত্য, নাসিকা তালু ও ওষ্ঠ্য। এই আটটী স্থানে বাতাস আহত হোয়ে আট রকম শব্দের বা স্বরের সৃষ্টি করে। অবশ্য কণ্ঠগত শব্দ বা স্বরই গানের বিশেষ উপযোগী। কিন্তু তাহ্‌লেও শব্দের স্থানবিশেষের জন্যে উচ্চারণভেদ হয় এবং সেই উচ্চারণভেদের সঠিক জ্ঞানের জন্যে স্থানগুলির অবস্থান ও প্রকৃতি আমাদের জানা উচিত।

অমরেশ বলেছেন—"অষ্টৌ স্বরান্ প্রবক্ষ্যামি", অর্থাৎ তাঁর মতে স্বর আটটী। কোন কোন শিক্ষাকারের মতে যে সাতটী স্বর সে সম্বন্ধে আমরা

আগেই আলোচনা করেছি। অমরেশের মতে আটটী স্বর হোল: জাত্য, অভিনিহিত, ক্ষৈপ্র, প্রশ্লিষ্ট, তৈরোবাঞ্জন, তৈরোবিরাম, পাদবৃত্ত ও তাথাভাব্য। অবশ্য এই স্বরগুলির নাম-সম্বন্ধে আমরা অপরিচিত নই, কিন্তু অমরেশ স্বরের আলোচনায় কেন বৈদিক প্রথমাদি ও লৌকিক ষড়্জাদি স্বরগুলির কোন পরিচয় দেন নি তা সত্যই রহস্যজনক। যদি মনে করা যায়, অমরেশের সময়ে বা সমাজে বৈদিক ও লৌকিক কোনটী শ্রেণীর স্বরেরই প্রচলন ছিল না, তাহলে তা চিন্তা করা ঠিক হবে না, কেননা বৈদিক স্বরের প্রচলন বৈদিক যুগের গোড়ার দিকেই পাঠে ও গানে ছিল, আর লৌকিক সাত স্বরের প্রচলনও বৈদিকযুগের সমসাময়িক তা আগেই আমরা প্রমাণ করেছি। তবে জাত্যাদি সাত বা আট স্বরের অনুশীলন মাত্র বেদপাঠে হয় এবং অমরেশের উদ্দেশ্য যখন বেদপাঠের নিয়মন করা তখন তাঁর শিক্ষার রচনা জাত্যাদির মাত্র পরিচয় দানের জন্যে, কিন্তু বৈদিক ও লৌকিক স্বরগুলির নাম, প্রকৃতি ও প্রচলন সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবেই জানিতেন।

অমরেশের একটী বৈশিষ্ট্য যে, তিনি বেদপাঠের বা বেদপাঠগানের জাত্যাদি স্বরগুলির আন্তর লক্ষণ ও তাদের নামের সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন (৬০-৬৩ শ্লো°),

> এও আভ্যামুদাত্তাভ্যামকারো নীচ এব চ।
> লুপ্যতে সন্ধিকার্যে যত্তং চাভিনিহিতং বিদুঃ ॥
>
> * * * *
>
> উচ্চঃ পূর্বঃ পরো নীচ ইকারোঽন্যোঽন্যসঙ্গতঃ।
> প্রশ্লিষ্টঃ সম্বরো জ্ঞেয়ঃ স্রুচীবাভীদ্ধতাঁযথা।

এভাবে আটটী স্বরের সার্থকতাই তিনি দেখিয়েছেন। জাত্যাদি কোন্ কোন্ স্বর উচ্চ, নীচ ও মধ্য তথা তার মন্দ্র ও মধ্য হবে তারও পরিচয় তিনি দিয়েছেন—"জাত্যাভিনিহিতক্ষৈপ্রপ্রশ্লিষ্টাঃ স্বরিতা ইমে"। তাছাড়া এই স্বরগুলি ঋজু বা সরল কিংবা বক্র হবে তারও উল্লেখ তিনি করেছেন—"জাত্যাভিনিহিতঃ ক্ষৈপ্রঃ প্রশ্লিষ্টশ্চ চতুর্থকঃ, এতে স্বরাঃ প্রকম্পন্তে দৃষ্টোদাত্তং পুরঃ স্থিতম্"। বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতিতেও ঐ ধারার অনুবর্তন দেখা যায়, কারণ গমক, মীড়, ক্রন্তন, কম্পন প্রভৃতি এখনো স্বরোচ্চারণের বেলায় ব্যবহৃত হয়। বৈদিক পাঠের সময় শিক্ষাকার বলেছেন, বাজসনেয়ক মন্ত্রোচ্চারণের

রীতি-সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য উল্লেখ করেছেন—উচ্চ নীচ ও মধ্য এই তিন স্বরেরই ব্যবহার হবে—"স্বর উচ্চঃ স্বরো নীচঃ স্বরঃ স্বরিত এব চ"। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণদুটীর উচ্চারণে এবং ব্যবহারেও তিনি ভেদের কথা উল্লেখ করেছেন, কেননা বেদপাঠে এবং গানে স্বর ও ব্যঞ্জন এই দু'রকম বর্ণেরই ব্যবহার হয়। পদ ও প্রত্যয়-প্রসঙ্গে শাকটায়ন, শাকল্য, শৌনক প্রভৃতির মতভেদের উল্লেখ আছে, যেমন শাকটায়ন বলেছেন—প্রত্যয়ের সবর্ণত্ব হবে, শাকল্যের মতে হবে অবিকার, ইত্যাদি। অবশ্য শাখা ও সম্প্রদায়ভেদে পদে স্বর-প্রয়োগের বিভিন্নতা বৈদিক যুগে ছিল, শিক্ষাকার তার নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র।

অমরেশ স্বরকে 'যম'-ও বলেছেন—"যমোৎপত্তির্ভবেত্তত্র" (১৭৫ শ্লোঃ)। স্বরের মধ্যে সজাতীয় ও বিজাতীয় এই দুটী শ্রুতির উল্লেখ তিনি করেছেন—"স্বরমধ্যে সজাতীয়ে বিজাতীয়ে দ্বয়ো শ্রুতিঃ"। এছাড়া আখ্যাত, নিপাত, উদাত্তাদি স্বর প্রভৃতির বর্ণ বা শ্রেণী, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতিরও নির্ণয় করা হয়েছে, যেমন ভার্গব, বায়ব্যম্ প্রভৃতি আখ্যাত, কাশ্যপ, বারুণ প্রভৃতি নিপাত। এছাড়া উদাত্ত ব্রাহ্মণ, ভারদ্বাজ ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দ, নীচ বা অনুদাত্ত ক্ষত্রিয়, গৌতম দেবতা ও ত্রৈষ্টুভ ছন্দ, স্বরিত বৈশ্য, গার্গ্য মুনি ও জাগতী ছন্দ। উদাত্তের গায়ত্রীছন্দ ব্রহ্মসাধনে, অনুদাত্তের ত্রৈষ্টুভছন্দ অঘনাশনে এবং স্বরিতের জাগতীছন্দ শত্রুনাশনে প্রযুক্ত হয়। যেমন,

উদাত্তং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদ্ভারদ্বাজঃ ঋষিস্ততঃ।
গায়ত্রং চ ভবেচ্ছন্দো নিয়োগো ব্রহ্মসাধনে॥
নীচং তু ক্ষত্রিয়ং প্রাহুর্গৈতমোঽস্য চ দেবতা।
চন্দস্ত্রৈষ্টুভমেবাস্য বিনিয়োগাঽঘনাশনে॥
স্বরিতং বৈশ্যমেবাহুর্নির্গার্গ্যোঽস্যকীর্তিতম্।
জাগতং তু ভবেচ্ছন্দো নিয়োগঃ শত্রুনাশনে॥

অমরেশ বলেছেন, উদাত্তাদি তিন স্বরের (মন্ত্রের) এই গুপ্তরহস্য তিনিই উদ্‌ঘাটন করেছেন—"এষা মন্ত্ররহস্যস্য মঞ্জুষোদ্‌ঘাটিতা ময়া", আর এই রহস্যের সমাধানে সাধক ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হন—"ব্রহ্মলোকে মহীয়তে"।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, পাঠে বা গানে আভ্যুদয়িক বা মাঙ্গলিক ও আভিচারিক এই উভয় প্রয়োগ বা কর্মের প্রচলন বৈদিক যুগেও ছিল, কেননা তা না হোলে অমরেশ শিক্ষার আলোচনায় এ'সকল প্রসঙ্গের উল্লেখ

করতেন না। সঙ্গীতমকরন্দে নারদ ও সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব তানলক্ষণে আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক এই উভয় কর্মে বিভিন্ন তান-প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সে-সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে আমরা চেষ্টা করব। অথর্বপরিশিষ্টেও এ'ধরণের উল্লেখ আছে—"অভিচারস্ত কল্পস্ত শান্তিকল্পস্তথাঽপরঃ"। অবশ্য অথর্ববেদে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ আছে। অথর্বপরিশিষ্টে ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, বারুণী, কৌবেরী, কৌমারী, গান্ধারী প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে আহুতি দানের প্রসঙ্গে শান্তি ও অভিচার কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষাকারের নির্দেশ থেকে একথা বুঝা যায় যে, বৈদিক অনুদাত্ত, স্বরিত ও উদাত্ত স্বর-তিনটীর প্রয়োগ বেদপাঠে ও গানে ব্যবহার হোলেও তাদের প্রয়োগে ভাল ও মন্দ দু'রকম ফলই পাঠক ও গায়কেরা পেতেন। গৃহবাসীরাই বেদপাঠে বা গানে কামনা-পরিপূরণের আশা নিয়ে যখন স্বর-প্রয়োগ করতেন তখন শান্তি ও অশান্তি দু'রকম ফলই পেতেন প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, আর অরণ্যচারী নিষ্কামীরা গানে উদাত্তাদি স্বরের প্রয়োগে একমাত্র কল্যাণ ও প্রশান্তি লাভ করতেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

নারদীশিক্ষায় সঙ্গীত

নারদীশিক্ষা রচনা অথবা সংকলন করেন ঋষি নারদ। এই নারদের রচনা ও আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি এই পুস্তকের পরিশিষ্টে "সঙ্গীতমকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ" ও "নারদীয় রাগনিরূপণ" শীর্ষক দুটি তুলনামূলক সমালোচনায়, তাই এখানে আমরা সে-সবের পুনরুল্লেখ করব না।

অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, নারদীশিক্ষার আলোচ্য বিষয়বস্তু বহুবিধ ও ভাবসম্পদে মূল্যবান। বৈদিক ও বৈদিকোত্তর এই দুই যুগের সঙ্গীতের মধ্যে তিনি মিতালী ঘটিয়েছিলেন ও সেই সেই যুগের সকল-কিছু উপাদানেরই নারদ পরিচয় দিয়েছেন। মোটকথা নারদীশিক্ষা না থাকলে আমাদের পক্ষে বৈদিক সামগানের স্বরূপ ও রীতিনীতি এবং সঙ্গে-সঙ্গে লৌকিক মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের সঙ্গে বৈদিকের সম্পর্ক ও তাদের খুঁটিনাটী সম্বন্ধে জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হোত। কাজেই শিক্ষাকার নারদকে আমরা সংস্কার ও নবজাগরণ-যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত-রূপে গণ্য করব।

শিক্ষাকার নারদকে অনেকে বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের ও এমনকি 'সঙ্গীত-সময়সার' প্রণেতা পার্শ্বদেবেরও পরবর্তী বলেছেন, আমরা কিন্তু তা মোটেই স্বীকার করি না। নারদীশিক্ষায় বরং বৈদিকগানের লক্ষণ ও পরিচয় যত বিশদ ও সুচারুভাবে দেওয়া আছে, অপর কোন শিক্ষায় ও সঙ্গীতগ্রন্থে তা নাই। নারদীর বিষয়বস্তু, বিশ্লেষণপ্রণালী, ও রচনাবৈশিষ্ট্য দেখ্‌লে মনে হয় এই শিক্ষাগ্রন্থখানি অতীব প্রাচীন ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রেরও (খৃঃ ২য়-৩য় শতাব্দী) পূর্ববর্তী।

নারদীশিক্ষা মুদ্রিত আকারে যা পাওয়া যায় তার প্রথমটী বেনারস থেকে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ছাপা ও মেসার্স ব্রজবিহারী দাস এ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। এতে ভট্টশোভাকরের একটী প্রাঞ্জল টীকা দেওয়া আছে। আর অপরটী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কল্‌কাতায় মুদ্রিত ও সামগাচার্য পণ্ডিত সত্যব্রত

সামশ্রমি-কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সামশ্রমি জয়ন্ত স্বামী-প্রণীত ঋগ্বেদীয় "স্বরাঙ্কুশ" নামেও একটী গ্রন্থের সম্পাদন করেন।

'নারদী' সামবেদের শিক্ষাগ্রন্থ। শিক্ষাকার প্রথমেই অবতারণা করেছেন,

অথাতঃ স্বরশাস্ত্রাণাং সর্বেষাং বেদনিশ্চয়ম্।
উচ্চনীচবিশেষাদ্ধি স্বরাণ্যন্যং প্রবর্ততে ॥
আর্চিকং গাথিকং চৈব সামিকং চ স্বরান্তরম্।
কৃতান্তে স্বরশাস্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যং বিশেষতঃ ॥
একান্তরস্বরো হ্যক্ষু গাথাসু দ্ব্যন্তরঃ স্বরঃ।
সামসু ত্র্যন্তরং বিদ্যাদেবতাবৎ স্বরতোন্তরম্ ॥

উচ্চ, নীচ ও মধ্য তথা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর-তিনটী বেদে ব্যবহৃত হোত। নারদ এই স্বর-তিনটী ছাড়াও সামগানের সাত স্বর—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট এবং লৌকিক সাত স্বর—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের পরিচয় দিয়েছেন। স্বর-সংখ্যার তারতম্যে ও প্রয়োগে গানগুলির বিচিত্র নাম হোত, যেমন আর্চিক, গাথিক (গাথা), সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ গান। আর্চিকগানে থাকৃত একটী মাত্র স্বর, গাথিকে বা গাথায় দুটী, সামিকে তিনটী, স্বরান্তরে চার, ঔড়বে পাঁচ, ষাড়বে ছয় ও সম্পূর্ণগানে সাতটী স্বর। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে যে, ঐ সাতটী শ্রেণীর গান একই সময়ে সমাজে সৃষ্টি হয়নি, ক্রমবিকাশের ধারাকে অবলম্বন ক'রে সাতটী শ্রেণীর পূর্ণবিকাশ হোতে কয়েক শত বছর লেগেছিলো। অবশ্য ক্রমোন্নতির গতিই মানুষের মনে সৃষ্টি করেছিলো ইচ্ছা, মানুষ তাই প্রতিভার মাধ্যমে একঘেয়ে এক স্বর থেকে সাত স্বরের সৃষ্টি করেছিলো; সমাজের চাহিদা, ক্রমোন্নতির প্রেরণা ও অন্তরের সূক্ষ্মা জুগিয়ে-ছিলো মানুষকে উপাদান সেই এক স্বর থেকে সাত স্বরের বৈচিত্র্যকে সৃষ্টি করতে। মোটামুটি সাতটী যুগের অবদান সাত স্বর ও সাত শ্রেণীর গান, এবং সাতটী নামই সাতটী কালিক স্তর বা যুগের দিকদর্শক মাত্র। বর্তমানে প্রথম চারটী স্তর লুপ্ত হয়েছে, শেষের ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ শ্রেণী স্মৃতি বহন করছে আজো-পর্যন্ত সেই অতীতের হারাণো সম্পদের। তবে আধুনিক সঙ্গীতশাস্ত্রে তান-প্রস্তারের ভূমিকায় ঐ সাত শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তারা নিজেদের স্বরূপ হারিয়ে অবশিষ্ট রেখেছে কেবল তাদের অর্থ ও ভাবের

সার্থকতা। ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে উল্লেখ আছে আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষড়ব ও সম্পূর্ণ সাতটী তানের কথা। এক স্বরের সমষ্টি নিয়ে আর্চিক তান—সাতটী, দুটী স্বরের সমষ্টি নিয়ে গাথিক তান—একুশটী, তিন স্বরের সমাবেশ নিয়ে সামিক তান—পয়ত্রিশটী, চার স্বরের সমষ্টি নিয়ে স্বরান্তর তান—পয়ত্রিশটী, পাঁচ স্বরের সমাবেশ নিয়ে ঔডব তান—একুশটী, ছয় স্বরের সমষ্টি নিয়ে ষাড়ব তান—সাতটী এবং সাত স্বরের সমাবেশ নিয়ে সম্পূর্ণ তান মাত্র একটী। প্রকৃতপক্ষে সাত স্বরের সমবায়ে ৫০৪০টী তান সৃষ্টি হোতে পারে।

এ'ছাড়া এখানে একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে আর্চিকাদি সাতটী গানের নামোল্লেখ করেছেন নারদের প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত ক'রে। তিনি বলেছেন (পৃ' ১৭-১৮) : ইদানীং সপ্তবিধস্বরযোগস্ত নামানি কথ্যন্তে। আর্চিকং গাথিকং সামিকং স্বরান্তরং ঔড়বং ষাড়বং সম্পূর্ণং চেতি। তথা চাহ নারদঃ,

আর্চিকো গাথিকশ্চৈব সামিকশ্চ স্বরান্তরঃ।
ঔড়বং ষাড়বশ্চৈব সম্পূর্ণশ্চেতি সপ্তমঃ ॥
একস্বরপ্রয়োগো হি আর্চিকঃ সোঽভিধীয়তে।
গাথিকো দ্বিস্বরো জ্ঞেয়স্ত্রিস্বরশ্চৈব সামিকঃ ॥
চতুঃস্বরপ্রয়োগো হি কথিতস্তু স্বরান্তরঃ ॥

শার্ঙ্গদেবও তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে "আর্চিকো গাথিকশ্চাথ সামিকোঽথ স্বরান্তরঃ, একস্বরাদিতানানাং চতুর্নামভিধাঃ ইমাঃ" প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন। তবে গানের চেয়ে মতঙ্গ ও শার্ঙ্গদেব একস্বর, দ্বিস্বরযুক্ত আর্চিকাদি তানের ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন। টীকাকার সিংহভূপাল এবং কালিনাথও এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং সিংহভূপাল মতঙ্গের মতন "তথা চাহ নারদঃ" কথাগুলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, "তথা চাহ নারদঃ" এই উক্তিতে নারদ বল্‌তে কোন্‌ নারদকে মতঙ্গ বা পরবর্তী গ্রন্থকার ও টীকাকারেরা লক্ষ্য করেছেন তা বলা কঠিন; কেননা শিক্ষাকার নারদ তাঁর নারদীতে ঠিক এ'ধরণের শ্লোক বা শব্দগুলির ব্যবহার করেন নি। তিনি নারদীর প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন: "আর্চিকং গাথিকং চৈব সামিকং চ স্বরান্তরম্‌", কিন্তু মতঙ্গ অথবা সিংহভূপাল যে-ভাবে উদ্ধৃতিবাক্যটী

দেখিয়েছেন এটা তার সঙ্গে মেলে না, অথচ মতঙ্গ প্রভৃতি যে ভুল প্রমাণবাক্যের নজির দিয়েছেন তাও বলা যায় না। কাজেই একথা অনুমান করতে হবে যে, হয় নারদীশিক্ষার অনেকাংশ এখন লুপ্ত হয়েছে, অথবা নারদের 'নারদীশিক্ষা' নামে অপর কোন একটা প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল, যা এখনো ছাপা বা আবিষ্কৃত হয় নি, অথচ মতঙ্গের সময়ে প্রচলিত ছিলো।

এরপর শাস্ত্রী নারদ স্বরস্থানের পরিচয় দিয়েছেন: "উরঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চৈব স্থানানি ত্রীণি বাঙ্‌ময়ে",—উর, কণ্ঠ ও শির এ'তিনটী স্থানে স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার অথবা নীচ, মধ্য ও উচ্চরূপে প্রকাশ পায়। 'শিক্ষাপ্রকাশ' গ্রন্থে এই তিনটী স্থানের উল্লেখ আছে, সেখানেও শীর্ষদেশে তার বা উচ্চ স্বর তৃতীয়সবনে জগতিছন্দের মাধ্যমে প্রযোজ্য, কণ্ঠে মধ্যম স্বর মাধ্যন্দিনসবনে ত্রিষ্টুপের মাধ্যমে এবং হৃৎদেশে মন্দ্র বা নীচ স্বর প্রাতঃসবনে গায়ত্রী ছন্দের মারফতে প্রযোজ্য। ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় নাভিদেশে যে তাপ (heat-energy) বা উন্মুখী-ভাবের স্পন্দন সৃষ্টি হয় সেই স্পন্দনের ফলে প্রাণবায়ু প্রথমে হৃৎদেশে মন্দ্রস্বর (অনুদাত্ত)-রূপে, পরে কণ্ঠে মধ্যস্বর (স্বরিত) ও পরিশেষে শীর্ষে তারস্বর (উদাত্ত)-রূপে অভিব্যক্ত হয়। একই গতিরুচ্ছল প্রাণবায়ু শরীরের মধ্যে তিনটী স্থানে আহত হোয়ে উচ্চ, নীচ ও মধ্য তিন রকম স্বর (ধ্বনি) সৃষ্টি করে।

বৈদিক সামগানের স্বর হিসাবে নারদীকার প্রথমাদি সাত স্বরকে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি জাত্য, তৈরব্যঞ্জন, প্রাশ্লিষ্ট, ক্ষৈপ্র প্রভৃতি স্বরের পরিচয়ের সঙ্গে তাদের নামোল্লেখও করেছেন। গানের বা সামগানের স্বর হিসাবে প্রথমাদিকে তিনি মেনেছেন। লৌকিকের সঙ্গে তুলনা ক'রে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

সামগান যে সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গান করা হোত তার প্রমাণ আমরা সামবেদের প্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রের "এতৈর্ভাবৈস্তু গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্ পৃথক্" (৯।৫) শ্লোকগুলি থেকে বুঝতে পারি। বিভিন্ন স্বর-সংখ্যার প্রয়োগ ও গানপদ্ধতির জন্যেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সামগীতির ভেদ সৃষ্টি হয়েছিলে। বেদের শাখা যেমন বিভিন্ন, তাদের গান এবং স্বরপ্রয়োগও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ছিলো। মানুষের রুচি বিচিত্র, সুতরাং সামাজিক সকল জিনিসের মধ্যে ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

শিক্ষাকার নারদ শাখাভেদে বৈদিক স্বরের প্রয়োগ-সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

কঠকালাবপ্রবৃত্তেষু তৈত্তিরীয়াহ্বরকেষু চ।
ঋগ্বেদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ স্বরঃ॥
ঋগ্বেদস্তু দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন চ বর্ত্ততে।
উচ্চমধ্যমসঙ্ঘাত[১] স্বরো ভবতি পার্থিবঃ॥
তৃতীয়প্রথমক্রুষ্টান্ কুর্বন্ত্যাহ্বরকাঃ স্বরান্।
দ্বিতীয়াদ্যাংস্তু মন্দ্রাং তাং স্তৈত্তিরীয়াশ্চতুরঃ স্বরান্॥
প্রথমশ্চ দ্বিতীয়শ্চ তৃতীয়োঽথ চতুর্থকঃ।
মন্দ্রঃ ক্রুষ্টো হ্যতিস্বার এতান্ কুর্বন্তি সামগাঃ॥
দ্বিতীয়প্রথমাবেতৌ তাণ্ডিভাল্লবিনাং স্বরৌ।
তথা শাতপথাবেতৌ স্বরৌ বাজসনেয়িনাম্॥
এতে বিশেষতঃ প্রোক্তাঃ স্বরা বৈ সার্ববৈদিকাঃ।
ইত্যেতচ্চরিতং সর্বং স্বরাণাং সার্ববৈদিকমিতি॥[২]

বেদের প্রত্যেকটী শাখা তাদের সামগানে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সাত অথবা তারো কম স্বরের সমাবেশ করত। ডাঃ উইন্টারনিজ্ তাঁর *A History of Indian Literature*-এর প্রথম ভাগে (পৃঃ ৫৩-৫৬) সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের প্রসঙ্গে 'শাখা' তথা বেদের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন :

"There must once have existed a fairly large number of Samhitas, which originated in different schools of priests and singers, and which continued to be handed down in the same. However, many of these *collections* were nothing but slightly diverging recensions—Sakhas, *branches*, as the Indians say—of one and the sama Samhita."

সংহিতা যেমন ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা ও অথর্ব-বেদসংহিতা চারটী। যজুর্বেদসংহিতার আবার দুটী শাখা—কৃষ্ণযজুর্বেদসংহিতা ও শুক্লযজুর্বেদসংহিতা। কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় ও মৈত্রিয়াণী-সংহিতা এবং শুক্লযজুর অন্তর্গত বাজসনেয়িসংহিতা। ডাঃ উইন্টারনিজ্ (পৃ° ৫৪) এ' সম্বন্ধে আবার উল্লেখ করেছেন,

১। পাঠভেদ—"উচ্চমধ্যমসংঘাতঃ"।
২। নারদীশিক্ষা, ১।৯—১৪

"There are, therefore, not only Samhitas, but also Brahmanas, Aranyakas and Upanishads of the Rigveda, as well as of the Atharva-veda, of the Samaveda, and of the Yajurveda. Thus, for example, the Aitareya-Brahmana belongs to the Rigveda, the Satapatha-Brahmana to the White Yajurveda and the Chandogya-Upanishad to the Samaveda, and so on".

ব্রাহ্মণসাহিত্যও অসংখ্য। এগুলি চারটী বেদের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণ যেমন, জৈমিনীয়, আর্ষেয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি, শতপথ, তৈত্তিরীয়, তাণ্ড্য, ষড়্‌বিংশ, জৈমিনীয় (তলবকার), উপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, সংহিতোপনিষদ্‌-ব্রাহ্মণ, বংশ, সামবিধান, গোপথ (পূর্ব ও উত্তর-ভাগ), চরক, শ্বেতাশ্বতর, কাঠক, মৈত্রায়ণী, ভাল্লবি, পৈঙ্গী, কঙ্কতি, জাবাল, শাট্যায়ন, সৌলভ, শৈলালি, বৌরুকি, ঔখেয়, হারিদ্রাবিক, তুম্বুরু, আরুণেয়ব্রাহ্মণ প্রভৃতি।[৩] মহাভারতের আদিপর্বে (৬৪) আছে,

> বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্‌,
> সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকং চৈব স্বমাত্মজম্‌।
> প্রভুর্বরিষ্টো বরদো বৈশম্পায়নবেম চ,
> সংহিতাস্তৈ পৃথক্তেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥

ব্রাহ্মণ-সংহিতার গ্রন্থকারগণের নাম এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়; তাঁরা সকলেই বেদকে অবলম্বন ক'রে এক একটী ব্রাহ্মণ রচনা বা সংকলন করেছিলেন। বৈশম্পায়নকে অনেকে আচার্য চরক বোলে মনে করেন, কেননা কাশিকাবৃত্তিতে (৪।৩।১০৪) আছে: "বৈশম্পায়নান্তেবাসিনো নব। * * চরক ইতি বৈশম্পায়স্যাখ্যা। তৎসম্বন্ধেন সর্বে তদন্তেবাসিনশ্চরকা ইত্যুচ্যতে"। মহর্ষি পতঞ্জলিও তাঁর মহাভাষ্যে (৪।৩।১০৪) উল্লেখ করেছেন: "বৈশম্পায়নান্তেবাসী কঠঃ। কঠোন্তেবাসী খাড়ায়নঃ। বৈশম্পায়নান্তেবাসী কলাপী।" মহাভাষ্য ৪।২।১৩৮ এবং কাশিকাবৃত্তি ৪।৩।১০৪ শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য। মহাভারতের সভাপর্বে (৪র্থ অধ্যায়), মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৩৫ অধ্যায়), শতপথব্রাহ্মণে (৩।৮।২।২৪ ; ৪।১।২।১৯ ; ৪।২।৪।১ ; ৪।২।৩।১৫ ; ৬।২।২।১ ; ৬।২।১।১০ ; ৮।১।৩।৭) এবং বায়ুপুরাণে (৬২ অধ্যায়) চরক ও বৈশম্পায়নের অভিন্নতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। মোটকথা প্রত্যেকটী ঋষি

৩। তৃতীয় পরিশিষ্টে এগুলির একটী সুস্পষ্ট তালিকা (chart) দেওয়া হয়েছে।

ও মন্ত্রদ্রষ্টা চারবেদকে অবলম্বন ক'রে ব্রাহ্মণ ও সংহিতা রচনা করেছিলেন। এ'ছাড়া সূত্রযুগের সাহিত্যও অসংখ্য। মোটকথা বৈদিক সাহিত্যের রূপ আমাদের কাছে অখণ্ড রূপে ধরা দিলেও তার শাখা-প্রশাখা বিচিত্র।

পূর্বে-কথিত নারদীশিক্ষার শ্লোকগুলির (১।৯-১৪) মর্মার্থ এই: কঠাদি শাখায়, তৈত্তিরীয় ও আহ্বরক সম্প্রদায়ে, ঋক্ ও সামবেদে গানে প্রথম স্বরের প্রাধান্য। টীকাকার ভট্টশোভাকর উল্লেখ করেছেন: "কঠাদিশাখাসু ঋগ্বেদে সামবেদে চ ঋগ যজুসাং সামিক স্বরঃ প্রবর্ত্তত্তে স্বরিতে প্রথমস্বরানুসারেণ পাঠোঽবধার্যতে প্রথমস্বরদ্বিতীয়স্বরো ঋগ্বেদেঽনুক্রিয়মানাবধার্যতে ক্রুষ্টপ্রথমস্বরসমুদায়ানুকারশ্চ লৌকিকে ব্যবহারে প্রবর্তয় ইত্যাহ"। মোটকথা গানে সাতস্বরেরই ব্যবহার হোত, তবে আরম্ভ হোত ভিন্ন ভিন্ন স্বর থেকে। ঋগ্বেদে গান দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর থেকে ক্রুষ্ট ও প্রথম স্বর পর্যন্ত লীলায়িত হোত। আহ্বরক-সম্প্রদায় তৃতীয়, প্রথম ও ক্রুষ্ট থেকে এবং তৈত্তিরীয়কেরা দ্বিতীয়াদি স্বর থেকে আরম্ভ ক'রে তৃতীয়, চতুর্থ ও মন্দ্র পর্যন্ত এই পর পর চারটী স্বর ব্যবহার করতেন। সামগান-কারীরা প্রথম থেকে অতিস্বার্য এই সাত স্বরই পর পর, ছন্দগানকারীরা ও বাজসনেয়িরা গাথাস্বর প্রথম ও দ্বিতীয়কে অনুসরণ ক'রে গান করতেন। তাণ্ড্যপঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ও শতপথব্রাহ্মণের অনুগামীরা এবং কৌথুমিয়েরা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর থেকে গান আরম্ভ করতেন। পুষ্পসূত্রে এরকম সাতটীর কম স্বরকে ব্যবহার ক'রে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় গান করার রীতি পাওয়া যায়। নারদীতে কোন্ স্বরকে অথবা স্বরগুলিকে প্রথমে আশ্রয় ক'রে কোন্ কোন্ শাখা গান করতো তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কণ্ডিকার প্রথম শ্লোক থেকে তান, রাগ, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতির লক্ষণ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। সেই তান, রাগ প্রভৃতিকে নারদ বলেছেন পবিত্র ও কল্যাণকর—"তানরাগস্বরগ্রামমূর্ছনানাং তু লক্ষণম্, পবিত্রং পাবনং পুণ্যং নারদেন প্রকীর্তিতম্"।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম কণ্ডিকায় শিক্ষাকার নারদ সামগানের আসল পরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় কণ্ডিকা থেকে লৌকিক সঙ্গীতের বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। তান, রাগ, গ্রাম, মূর্ছনা, অলংকার এসব লৌকিক তথা মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের অঙ্গাভরণ, তবে বৈদিক গানেরও লক্ষণ এবং স্বরূপ তিনি লৌকিকের পাশে পাশে স্পষ্টভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন। নারদী-

শিক্ষায় 'রাগ' শব্দটী সবার চেয়ে বিস্ময়ের সঞ্চার করে প্রথমের দিকে, কিন্তু সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখ্‌লে রাগের প্রচলনও যে নারদীশিক্ষার যুগে ছিল তা সহজেই ধরা পড়ে এবং বিস্ময়ের পরিবর্তে আমাদের হৃদয়ে বরং আনন্দই সৃষ্টি করে। বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরা নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের যুগে রাগের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না তা আগেই উল্লেখ করেছি, সুতরাং ভরতপূর্ব গ্রন্থ নারদীতে রাগের প্রচলন যে অচল হোয়ে থাকবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি। কিন্তু শিক্ষাকার নারদ স্পষ্ট ক'রে দ্বিতীয় কণ্ডিকার দ্বিতীয় শ্লোকে 'রাগ' শব্দটীর উল্লেখ করেছেন এই মনোভাব নিয়ে যে, রাগের স্বরূপ তিনি ভালভাবে জানতেন এবং রাগের প্রচলনও ছিল অব্যাহত তদানীন্তন সমাজে। শুধু তাই নয়, চতুর্থ কণ্ডিকার ৫ম শ্লোকেও শিক্ষাকার গ্রামরাগদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন: "নিপততি মধ্যমরাগে তন্নিষাদং ষাড়বং বিন্দ্যাৎ"। এখানে মধ্যমরাগকে মধ্যমগ্রাম-রূপে ব্যাখ্যা করার কোন কারণ নাই। এ'ছাড়া দশম ও একাদশ শ্লোকে কৈশিক অথবা কৈশিকমধ্যম গ্রামরাগের নামোল্লেখ করা হয়েছে—"কৈশিকং ভাবয়িত্বা * * মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ" এবং "কাকলির্দৃশ্যতে যত্র * * কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্"। টীকাকার ভট্টশোভাকর এ'দুটী শ্লোক সম্বন্ধে লিখেছেন: "* * তদা কৈশিকমধ্যমো গ্রামরাগো ভবতী মধ্যমগ্রামাদুৎপন্নস্ত * * তদা মধ্যমগ্রামসম্ভবং কৈশিকং কশ্যপঋষিরাহ, * *।" ঋষি কশ্যপ ছিলেন একজন বিচক্ষণ সঙ্গীতশাস্ত্রী। মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে অনেকবার কাশ্যপ বা কশ্যপের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন —"কাশ্যপেনাপ্যুক্তম্" (পৃ: ৮৭)। শিক্ষাকার নারদ কশ্যপের নামোল্লেখ করায় একথা বুঝা যায় যে, কশ্যপ শিক্ষাকার নারদের পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক হোলেও বয়সে বড় গুণী।

শিক্ষাকার নারদ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে ষড়্‌জগ্রাম, পঞ্চম, কৈশিক, মধ্যম, কৈশিকমধ্যম, মধ্যমগ্রাম ও সাধারিত এই সাতটী গ্রামরাগের নামোল্লেখ করেছেন। যেমন,

ঈষৎ স্পৃষ্টো নিষাদস্তু গান্ধারশ্চাধিকো ভবেৎ।
ধৈবতঃ কম্পিতো যত্র ষড়্‌জগ্রামং তু নির্দিশেৎ॥

অন্তরঃ স্বরসংযুক্তা কাকলির্যত্র দৃশ্যতে।
তং তু সাধারিতং বিদ্যাৎ পঞ্চমস্থং তু কৈশিকম্॥
কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈঃ সমন্ততঃ।
যস্মাৎ তু মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ॥
কাকলির্দৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্য তু।
কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসম্ভবম্॥[৪]

আচার্য শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরের রাগাধ্যায়ে এগুলিকে শুদ্ধরাগ তথা শুদ্ধগ্রামরাগ বলেছেন। যেমন,

শুদ্ধাদিগীতিযোগেন রাগাঃ শুদ্ধাদয়ো মতাঃ॥
ষড়্জগ্রামসমুৎপন্নঃ শুদ্ধকৈশিকমধ্যমঃ।
শুদ্ধসাধারিতঃ ষড়্জগ্রামো গ্রামে তু মধ্যমে॥
পঞ্চমো মধ্যমগ্রামঃ ষাড়বঃ শুদ্ধকৈশিকঃ।
শুদ্ধা সপ্তেতি * * *॥[৫]

টীকাকার সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন, ষড়্জগ্রাম থেকে শুদ্ধকৈশিকমধ্যম, শুদ্ধসাধারিত ও ষড়্জগ্রাম এই তিনটী এবং মধ্যমগ্রাম থেকে পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষাড়ব ও শুদ্ধকৈশিক এই চারটী, মোট সাতটী গ্রামরাগের সৃষ্টি হয়েছে।[৬] শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর 'শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্' গ্রন্থে এগুলিকে ষড়্জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, শুদ্ধকৈশিক, শুদ্ধপঞ্চম, শুদ্ধকৈশিকমধ্যম, শুদ্ধসাধারিত ও শুদ্ধষাড়ব নামে উল্লেখ করেছেন।[৭] মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে (পৃ ৮৭) পরোক্ষভাবে এই রাগ বা গ্রামরাগগুলির উল্লেখ করেছেন ভরতের প্রমাণবাক্যের নজির দিয়ে, যদিও বর্তমান সংস্করণের কোন নাট্যশাস্ত্রেই এই শ্লোকগুলিকে পাওয়া যায় না এবং তারি জন্যে মনে হয় নাট্যশাস্ত্রের বৃহৎ সংস্করণ একটী ছিল। মতঙ্গ বলেছেন: তথাচাহ ভরতঃ—

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
গর্ভে সাধারিতশ্চৈবাবমর্শে * * তু পঞ্চমঃ॥

৪। Cf. শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃ ৪০৯
৫। Cf. 'সঙ্গীতরত্নাকর', ২য় ভাগ (আডেয়ার সং), পৃ ৬-৭
৬। Cf. অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়: *Ragas and Raginis* (1948), pp 20-21.
৭। Cf. শ্রীমল্লক্ষ্যসঙ্গীতম্ (১৯৩৪), পরিশিষ্টম্, পৃ ১

সংহারে কৈশিকঃ প্রোক্তঃ পূর্বরঙ্গে তু ষাড়বঃ।
চিত্রস্তাষ্টাদশাঙ্গস্থ স্বস্তে কৈশিকমধ্যমঃ॥
শুদ্ধানাং বিনিয়োগোঽয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ।

এখানে ব্রহ্মার মতের উল্লেখ পাওয়া যায়, কেননা ব্রহ্মাও একজন বিচক্ষণ সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন। তবে বর্তমানে ব্রহ্মার রচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। ব্রহ্মা শিক্ষাকার নারদ, কোহল, দত্তিল, ভরত, দুর্গাশক্তি ও মতঙ্গাদির চেয়ে প্রাচীন ও প্রামাণিক গুণী।

স্বর, গ্রাম ও মূর্ছনার পরিচয় দিতে গিয়ে নারদ শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন,

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানাএকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্॥

স্বর সাতটী, গ্রাম তিনটী, মূর্ছনা একুশটী ও একোনপঞ্চাশৎ তান আর এদের সমবেত রূপের নাম 'স্বরমণ্ডল'। "সপ্ত স্বরাঃ" বল্‌তে শিক্ষাকার নারদ প্রথমাদি বৈদিক সাত স্বরের কথা বলেন নি, তিনি বলেছেন "ষড়্‌জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো পঞ্চমস্তথা, পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ"। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নারদীশিক্ষাকারের সময়েই শুধু নয়, তারো অনেক আগে থেকে বৈদিক সমাজে বেদগানের পাশাপাশি লৌকিক গানেরও প্রচলন ছিল এবং তার সুস্পষ্ট নিদর্শন অরণ্যেগেয়গান ও গ্রামেগেয়-গানের অনুশীলন থেকে পাওয়া যায়।

তিনটী গ্রামের পরিচয় দিয়ে নারদ বলেছেন,

ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারস্ত্রয়ো গ্রামাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ভূলোকাজ্জায়তে ষড়্‌জো ভুবর্লোকাচ্চ মধ্যমঃ॥
স্বর্গান্নান্যত্র গান্ধারো নারদস্য মতং যথা।
স্বররাগবিশেষণ গ্রামরাগো ইতি স্মৃতাঃ॥

ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনটী গ্রাম এবং এই তিনটী গ্রামের প্রামাণ্য শিক্ষাকার নারদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনটীর প্রচলন-স্থানের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি অনেকটা পৌরাণিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে ষড়্‌জগ্রাম, ভুবর্লোকে মধ্যম ও স্বর্গলোকে গান্ধার-গ্রামের প্রচলন এবং এটাই নারদের অভিমত। অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায়, ভুবর্লোক তথা অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্গলোকের

অস্তিত্বও পৃথিবীতে, পৃথিবীর মাটিকে ছাড়িয়ে এক পুরাণ এবং দর্শনই অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সে যাই হোক, একথা সত্য যে, শিক্ষাকার নারদের সময়ে গান্ধার-গ্রামের প্রচলন ছিল না, কিন্তু গান্ধারগ্রামের স্বরূপ ও পরিচয় তিনি বিশেষভাবে জানতেন, কেননা পনেরটী তান যে গান্ধারগ্রামের আশ্রিত—"তানান্ পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামমাশ্রিতান্" এই প্রসঙ্গের তিনি উল্লেখ করেছেন। তবে গান্ধারগ্রাম যে কেন পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হোয়ে স্বর্গলোকে পূজা পেলো তার কোন কারণসঙ্গত আর্জি তিনি পেশ করেন নি। আমাদের মনে হয়, নারদের সময়ে ষড়্‌জগ্রামের মতন মধ্যমগ্রামেরও প্রচলন ছিল, কেননা তিনি এই দুটী গ্রামের স্বরসন্নিবেশের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান সমাজে মধ্যমগ্রামেরও প্রচলন নেই, আর কেন নেই তার কোন ইতিহাসও ঠিকভাবে আমাদের জানা নেই।

নারদীশিক্ষাকারের পর দত্তিল, ভরত, মতঙ্গ, মকরন্দকার নারদ,[৮] শার্ঙ্গদেব এঁরা সকলেই ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রামদুটীর অস্তিত্ব মেনেছেন। তবে দত্তিল স্বীকার করেছেন: "কেচিদ্ গান্ধারমপ্যাহুঃ সনেহোপলভ্যতে"—কোন কোন গুণী গান্ধারগ্রামের কথা বলেছেন, কিন্তু পৃথিবীলোকে সে গ্রামের প্রচলন নেই। মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে "ষড়্‌জমধ্যমসংজ্ঞৌ তু দ্বৌ গ্রামৌ বিশ্রুতৌ কিল" প্রভৃতি কথার উল্লেখ করলেও গান্ধারগ্রামের কিন্তু নামোল্লেখ করেছেন—"গান্ধারং নারদো ব্রুতে"। মতঙ্গ নারদের ওপর আবার দায়িত্ব চাপিয়ে বলেছেন "সতু মর্ত্যৈর্ন গীয়তে"।

গ্রামের সৃষ্টি-কাহিনীর উল্লেখ করতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন—"সামবেদাৎ স্বরা জাতাঃ,"—সামবেদ থেকে স্বরের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই স্বর অথবা স্বরসন্নিবেশ থেকে গ্রামের উৎপত্তি—"স্বরেভ্যো গ্রামসম্ভবঃ"। কিন্তু মতঙ্গের এই উক্তি ও স্বীকৃতি কতটুকু সমীচীন তা বিচারের বিষয়। সামবেদ থেকে স্বরের উৎপত্তি না হোলেও সামবেদে তথা সামগানে সাতস্বরের ব্যবহার হোত ও সেই সাত স্বর বৈদিক প্রথমাদি, লৌকিক ষড়্‌জাদি নয়। যদি বলা যায়, বৈদিক প্রথমাদি সাত স্বরকে অনুসরণ ক'রেই লৌকিক ষড়্‌জাদি

৮। মকরন্দকার নারদ শিক্ষাকার নারদ থেকে ভিন্ন ব্যক্তি, এ'সম্বন্ধে আমরা এ'গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

সাতটী স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তাও সত্য নয়, কেননা এই দুটী শ্রেণীর স্বরের প্রচলন বৈদিক সমাজে পাশাপাশি ছিল। তারপর গ্রামে স্বরসন্নিবেশের প্রসঙ্গে একথা স্বীকার্য যে, বৈদিক ও লৌকিক এই উভয় শ্রেণীর স্বরই গ্রামের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকৃত, কাজেই মতঙ্গের "সামবেদাৎ স্বরা জাতাঃ স্বরেভ্যো গ্রামসম্ভবঃ" শ্লোকার্দ্ধটীর বিষয়ে আরো অধিক গবেষণার প্রয়োজন এবং সে-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনারও দরকার।

দত্তিল ও নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের কথাকে এখানে আমরা বাদ দিয়েছি। ভরত দত্তিলের সমাজে বাস ক'রে অথবা তাঁর ভাবধারার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হোয়েও গান্ধারগ্রামের কোন নামোল্লেখ করেন নি, বরং তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন—"অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি" (নাট্য শা° ২৮।২২)। তাই এই দুটী গ্রামের মাত্র শ্রুতি এবং মূর্ছ্নারই তিনি পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য ভরতোত্তর সকল গ্রন্থকার ভরতের প্রভাবকে এড়িয়ে উঠতে পারেন নি। এ'দিক থেকে পরবর্তী গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেবের ও তৎপরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের কথা ছেড়ে দিলে মকরন্দকার নারদের স্বকীয়তা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির কথাই সেজন্যে আমাদের মনে পড়ে। মকরন্দকার নারদ ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর ভেতরকার সঙ্গীতগুণী। তিনি গ্রামের পরিচয় দিয়েছেন—"গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যাৎ" বোলে। ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনটী গ্রামের তিনি বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তাঁর সময়ে গান্ধারগ্রামের প্রচলন না থাক্‌লেও তার পরিচিতি দানে তিনি কার্পণ্যবোধ করেন নি। তাই এদিক থেকে আমরা তাঁর উদারতার কাছে কৃতজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকেরাও তাঁর কাছে ঋণী থাকবেন।

মূর্ছ্না, তান, জাতি ও জাত্যাংশযুক্ত স্বরসমূহকে 'গ্রাম' বলে। যে স্বরগুলিতে পঞ্চম নিজের তৃতীয় শ্রুতিতে বিশ্রান্ত অর্থাৎ বিকৃত হয় তার নাম 'মধ্যমগ্রাম' এবং যে স্বরগুলির ভেতর পঞ্চম নিজের চতুর্থ শ্রুতিতে অবস্থিত অর্থাৎ অবিকৃত থাকে তাকে 'ষড়্জগ্রাম' বলে।

সঙ্গীতদর্পণে পণ্ডিত দামোদর (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী) উল্লেখ করেছেন যে, স্বরগুলির মধ্যে ধৈবত ত্রিশ্রুতিক বা অবিকৃত থাক্‌লে ষড়্জগ্রাম ও ধৈবত চারশ্রুতিক বা অবিকৃত থাক্‌লে মধ্যমগ্রাম হয়, অথবা পঞ্চম যখন নিজের চারশ্রুতির ওপর অবিকৃত ও স্থির থাকে তখন ঐ সপ্তককে 'ষড়্জগ্রাম' এবং যখন ঐ পঞ্চম তিনশ্রুতির ওপর থাকে তখন 'মধ্যমগ্রাম' হয়—(১) "যথা

ধত্রিশ্রুতিঃ ষড়্জে মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ"; (২) "ষড়্জগ্রামঃ পঞ্চমে স্বচতুর্থশ্রুতিসংস্থিতে, স্বোপান্ত্যশ্রুতিসংস্থেঽস্মিন্ মধ্যমগ্রাম ইষ্যতে"। স্বরসমূহের মধ্যে গান্ধার ঋষভের অন্তিম ও মধ্যমের আদিশ্রুতি গ্রহণ ক'রে চারশ্রুতি-সম্পন্ন এবং ধৈবত পঞ্চমের শেষশ্রুতি ও নিষাদ ধৈবতের অন্তিম ও ষড়্জের আদিশ্রুতি গ্রহণ ক'রে বিকৃত হোলে 'গান্ধারগ্রাম' হয়। দত্তিলের মতে, মধ্যমগ্রামে পঞ্চম, ষড়্জগ্রামে ধৈবত ও উভয়গ্রামে মধ্যমস্বরের বিকাশ থাকে—"পঞ্চমং মধ্যমগ্রামে ষড়্জগ্রামে তু ধৈবতম্, অলোপিনং বিজানীয়াৎ সর্বত্রৈব তু মধ্যমম্"। মতঙ্গ বলেছেন, স্বর, শ্রুতি, মূর্ছনা, জাতিরাগ বা রাগ এগুলিকে ব্যবস্থাপন করার জন্যে গ্রামের প্রয়োজন হয়।[৯]

মকরন্দকার নারদ উল্লেখ করেছেন,

ষড়্জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়মুদাহৃতম্।
ষড়্জশ্চ মধ্যমশ্চৈব চৈতৌ ভূমৌ প্রকল্পিতৌ॥

ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনগ্রাম; এদের মধ্যে ষড়্জ ও মধ্যম 'ভূমৌ'—পৃথিবীলোকে এবং "স্বর্গলোকেঽপি গান্ধারঃ"—স্বর্গলোকে গান্ধারগ্রামের প্রচলন। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ শতাব্দী) শ্রদ্ধেয় নরহরি চক্রবর্তী তিনগ্রাম সম্বন্ধে প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

গ্রামঃ স্বরাণামতিসূক্ষ্মভাবং, সংজোযনং স্থানকুলং ত্রিধা সঃ।
ষড়্জস্তথা মধ্যম এব ভূম্যাং গান্ধারনামা কিল দেবলোকে॥[১০]

পৃথিবীতে মানুষের সমাজে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রাম এবং দেবলোকে গান্ধারগ্রামের অনুশীলন হোত। এখানে "সংজোযনং স্থান কুলং ত্রিধা সঃ" শব্দগুলি বিশেষ অর্থের বোধক। এই শব্দগুলির অর্থ স্থান ও শ্রেণীভেদে তিনরকম, অথবা তিনটী গ্রামের 'সংজোযনং' বা প্রয়োগ হোত স্থান ও কুলভেদে। 'স্থান' যেমন পৃথিবী ও স্বর্গলোক তথা মনুষ্য ও দেবলোক, এবং 'কুল'—দেব, মনুষ্য ও গন্ধর্ব

৯। গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য:

(ক) A. H. Fox-Strangways: *The Gandhara-grama*, Journal of the Royal Asiatic Society for Great Britain and Ireland, 1935, pp. 687—696.

(খ) M. S. Ramaswami Aiyar: *The Question of Gramas*, JRAS for Great Britain and Ireland, 1936, pp. 629—640

১০। 'ভক্তিরত্নাকর' (গৌড়িয় মিশন সং), পৃ ২৪০

অথবা দেবতা, মনুষ্য ও যক্ষকিন্নরাদি। মেঘদূতের টীকায় মল্লিনাথ ঠিক এ'ভাবেই এদের অর্থপ্রকাশ করেছেন,

ষড়্‌জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ।
ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ ॥[১১]

পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজে ষড়্‌জ ও মধ্যমগ্রামের প্রচলন এবং গান্ধারগ্রাম একমাত্র দেবযোনি তথা গন্ধর্ব, যক্ষ ও কিন্নরাদি অনুশীলন করতো। তবে কি জানি কেন, শাস্ত্রকারেরা ষড়্‌জগ্রামকেই উত্তম বলেছেন—"ষড়্‌জগ্রামস্ত্রিষূত্তমঃ"। শার্ঙ্গদেব বলেছেন—"ষড়্‌জঃ প্রধানমাদ্যত্বাদ্‌" (সঙ্গীতরত্নাকর ১।৪৬)। তিন গ্রামেরই মূর্ছনা ও তান কল্পিত হয়েছে। নারদীশিক্ষায় তিনগ্রামের মূর্ছনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নারদ মূর্ছনাগুলিকেও কুল ও শ্রেণী হিসাবে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন,

উপজীবন্তি গন্ধর্বা দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ ॥
পিতৃণাং মূর্ছনা সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ।
ঋষীণাং মূর্ছনাঃ সপ্ত যাস্তিমা লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ ॥[১২]

পণ্ডিত ভট্টশোভাকর এদের টীকায় উল্লেখ করেছেন: "সপ্তউত্তরমন্দ্রাভিরুদ্‌-গতাঽশ্বক্রান্তা-সৌবীরা-হৃষ্যকা-উত্তরায়তা-রজনীতি ষড়্‌জাদিস্বরগতাঃ সপ্তঋষি-সম্বন্ধিন্য-উক্তাঃ দেবমূর্ছনানাং গন্ধর্বা অনুযায়িনঃ, পিতৃমূর্ছনানাং তু যক্ষাঃ, ঋষিমূর্ছনানাং মনুষ্যা ইত্যাহ"।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বংশ বা কুল ও শ্রেণী হিসাবে মূর্ছনাগুলির ব্যবহার হোত। মূর্ছনাগুলি গ্রামকে আশ্রয় ক'রেই বিকাশ লাভ করতো, সুতরাং কুল ও শ্রেণী হিসাবে তিনগ্রামের ব্যবহারভেদও ছিল। তান সম্বন্ধেও তাই।

মূর্ছনা ও গান্ধারগ্রাম-সম্পর্কে আমাদের মনে পড়ে মেঘদূতে উত্তরমেঘ সম্বন্ধে যেখানে বিয়োগবিরহবিধুরা যক্ষপত্নী যক্ষের প্রত্যাগমনকে সার্থক করার জন্যে নাম ও গোত্রাঙ্কিত মূর্ছনার আলাপ করতে উদ্যতা হয়েছিলেন বীণার তারগুলিতে ঝঙ্কারের অনুরণন্‌ তুলে। সেই মূর্ছনার প্রয়োগ হোত সম্ভবতঃ আভিচারিক ব্যাপারে, কেননা বীণার তন্ত্রীগুলিতে সেই মূর্ছনার জাল বুনেই যক্ষিণী যক্ষকে

১১। 'মেঘদূতম্‌' (পুনা সং, অধ্যাপক কাশীনাথ বাপু পাঠক-সম্পাদিত, ১৯১৬), পৃ° ৫২
১২। 'শিক্ষাসংগ্রহঃ' (কাশী সংস্করণ), পৃ° ৪০০

আহ্বান করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু কামনা তাঁর বিফল হয়েছিল অতি-তীব্র ব্যাকুলতা ও দুঃখের জন্তে। যক্ষপত্নীর চোখের জল সিক্ত করেছিল বীণার তারগুলিকে, মূর্ছনা পেয়েছিল বাধা ঝঙ্কৃত ক'রে নিজেকে প্রকাশ করতে, কাজেই আভিচারিক উদ্দেশ্য হয়েছিল নিষ্ফল। টীকাকার মল্লিনাথ আরো চমৎকারভাবে বলেছেন যে, আভিচারিক মূর্ছনাটী নাকি স্থাপিত হয়েছিল যক্ষ ও গন্ধর্বদের ব্যবহৃত গান্ধারগ্রামে। অবশ্য গান্ধারগ্রামে মূর্ছনার প্রয়োগকারিণীও ছিলেন যক্ষপত্নী, তিনি সাধারণ মনুষ্যসমাজের নারী নন। মনে হয়, অমর কবি কালিদাস তাই মেঘদূতের উত্তরমেঘে (৯১ শ্লো°) এই রূপক ঘটনাটী এভাবে বর্ণনা করেছেন,

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রীরার্দ্রা নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচি—
ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মধিকৃতাং মূর্ছনাং বিস্মরন্তী॥

মল্লিনাথ টীকায় উল্লেখ করেছেন: "হে সৌম্য সাধো। মলিনবসনে।* * উৎসঙ্গ উরৌ বীণাং নিক্ষিপ্য। মম গোত্রং নামাঙ্কশ্চিহ্নং যস্মিংস্তন্মদ্গোত্রাঙ্কং মন্নামাঙ্কং যথা তথা। 'গোত্রং নাম্নি কুলেঽচলে' ইত্যমরঃ। বিরচিতানি পদানি যস্য তত্তথোক্তং গেয়ং গানার্হং প্রবন্ধাদি।* * দেবযোনিত্বাদ্-গান্ধারগ্রামেণ গাতুকামেত্যর্থঃ। তদুক্তম্—'ষড্‌জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ। নতু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ' ইতি॥ তথা নয়নসলিলৈঃ প্রিয়তমস্মৃতিজনিতৈরশ্রুভিরার্দ্রাং তন্ত্রীং কথংচিৎকৃচ্ছ্রেণ সারয়িত্বা। আর্দ্রত্বাপহরণায় করেণ প্রস্থজ্যান্যথা কণনাসংভবাদিতি ভাবঃ। ভূয়োভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ স্বয়মাত্মনা কৃতামপি। বিস্মরণানর্হামপীত্যর্থঃ। মূর্ছনাং স্বরারোহাবরোহক্রমম্। 'স্বরাণাং স্থাপনাঃ সাস্তা মূর্ছনাঃ সপ্ত সপ্ত হি' ইতি—সঙ্গীতরত্নাকরে। বিস্মরন্তী বা।* * বিস্মরণং চাত্র দয়িতগুণস্মৃতিজনিত-মূর্ছাবশাদেব। তথা চ রসরত্নাকরে—"বিয়োগাযোগয়োরিষ্টগুণানাং কীর্তনাস্মৃতেঃ। সাক্ষাৎকারোঽথবা মূর্ছা দশধা জায়তে তথা' ইতি॥ মৎসাদৃশ্য-মিত্যাদিনা মনঃসঙ্গানুবৃত্তিঃ সূচিতা"।[১৩]

টীকাকার মল্লিকনাথের অন্যান্য শাস্ত্রের মতন সঙ্গীতশাস্ত্রেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি

১৩। 'মেঘদূতম্' (পুনা সং,—অধ্যাপক কাশীনাথ বাপু পাঠক, ১৯১৬), পৃ° ৫২

ছিল, কেননা সঙ্গীতরত্নাকর থেকে তিনি মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরমেঘের এই ৯১ শ্লোকেই কেবল "দেবযোনিত্বাদ্গান্ধারগ্রামেণ গাতু কামেত্যর্থঃ"—'দেবযোনিদের পক্ষে গান্ধারগ্রাম গানের প্রশস্ত' বলেন নি, তিনি ৭৭ শ্লোকের টীকায়ও একথা উল্লেখ করেছেন। কবি কালিদাসের "রক্তকণ্ঠৈ-রুদ্গায়ন্তী ধনপতি যশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্" শ্লোকাংশের টীকায় মল্লিনাথ লিখেছেন—"রক্তো মধুরঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠধ্বনির্যেষাং তে তৈঃ সুন্দরকণ্ঠধ্বনি-ভির্ধনপতিযশঃ কুবেরকীর্তিমুদ্গায়দ্ভিরুচ্চৈর্গায়নশীলৈঃ। দেবগানস্তু গান্ধার-গ্রামত্বাত্তারতরং গায়ন্তিরিত্যর্থঃ। কিন্নরৈঃ সার্ধং সহ।"[১৪] সুমিষ্ট কণ্ঠযুক্ত কিন্নরেরা ধনপতি যক্ষরাজ কুবেরের দেবগান-রূপ যশোগান করেছিলেন গান্ধারাগ্রামে। সেখানে গান্ধারগ্রামে যে মূর্ছনা বা মূর্ছনাসমূহ ব্যবহৃত হয়েছিল তা বা সেগুলি আভিচারিক উদ্দেশ্য নয়, পরন্তু আভ্যুদয়িক ব্যাপারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গান্ধারগ্রামে মূর্ছনাগুলি ব্যবহৃত হোত আভিচারিক ও আভ্যুদয়িক এই উভয় উদ্দেশ্যেই। তিনগ্রামের তানের বেলায়ও তাই। নারদ সঙ্গীতমকরন্দে "পূর্ণরাগাঃ প্রগীয়তে" বোলে পূর্ণতানগুলিকে আয়ু, ধন, যশ, বুদ্ধি, ধনধান্য লাভ-রূপ আভ্যুদয়িক উদ্দেশ্যে প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। তেমনি "ষাড়বেন প্রগাতব্যং" শ্লোকে আভিচারিক ব্যবহার ব্যাধীনাশ, শত্রুনাশ প্রভৃতি ও "ঔড়বেন প্রগাতব্যং" প্রসঙ্গে আভ্যুদয়িক প্রয়োগ শান্তিকর্মের উদ্দেশ্যে বলেছেন।[১৫] বৈষ্ণব-কবি নরহরি ঠাকুর 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন,

তথাহি কোহলীয়ে—
আয়ুর্ধর্মো যশঃকীর্তির্বুদ্ধিসৌখ্যধনানি চ।
রাজ্যাভিবৃদ্ধিসন্তানং পূর্ণরাগেষু জায়ন্তে ॥

* * *

সংগ্রামে বীরতা রূপলাবণ্যগুণকীর্তনম্।
গানে ষাড়বরাগাণাং গদিতং পূর্বসূরিভিঃ ॥

১৪। 'মেঘদূতম' (পুনা সং, অধ্যাপক কাশীনাথ বাপু পাঠক, ১৯১৬), পৃ: ৪৪
১৫। 'সঙ্গীতমকরন্দ' (বরোদা সং), ৮০—৮৩

ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে ভয়শোকবিনাশনে।
উড়বাস্তু প্রগাতব্যা গ্রহশান্ত্যর্থকর্মণি ।[১৬]

কোহল ও মকরন্দকার নারদের এই বর্ণনাগুলি প্রায় সমান। কোহল নাট্য-শাস্ত্রকার ভরতেরও পূর্ববর্তী গ্রন্থকার। মকরন্দকার নারদ, পুরাণকারগণ ও শার্ঙ্গদেব সম্ভবতঃ কোহলের কাছে এই ধারণার জন্যে ঋণী। পরে বিস্তৃতভাবে আমরা মকরন্দ, পুরাণাদি ও রত্নাকর থেকে তানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এক্ষণে মূর্ছনা ও গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে টীকাকার মল্লিনাথ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কবি কালিদাস কিন্তু নিজে গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি, তবে ১৬ শ্লোকে গানকে এবং ৯১ শ্লোকে বীণার মূর্ছনাকে কিন্নর ও যক্ষজাতি অথবা গন্ধর্ব প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। 'মেঘদূত' কাব্যগ্রন্থখানি যক্ষ ও যক্ষপত্নীকে নিয়েই রচিত। উত্তরমেঘে ৯১ শ্লোকটী "নিক্ষিপ্য বীণাং মদ্‌গোত্রাঙ্ক বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা, * * স্বয়মধিকৃতাং মূর্ছনাং" কথাগুলিতে একটী গোপন রহস্য যেন লুকোনো আছে বোলে মনে হয়। নিজের বিরচিত গোত্র ও নামাঙ্কিত মূর্ছনাসহ পদ, গান এবং মূর্ছনা (ক) "বিরচিতপদং", (খ) "স্বয়মধিকৃতাম্ তথা আত্মপ্রস্তুতাম্ মূর্ছনাম্" যক্ষপত্নী গান করতে উদ্যতা হয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি, কেননা অতিপ্রিয় পতীর গুণাবলীজড়িত স্মৃতি তাঁর মনে পড়ায় তিনি দুঃখে ও শোকে বিহ্বলা ও মূর্ছিতা হোয়ে পড়েছিলেন ("দয়িতগুণ-স্মৃতিজনিতমূর্ছাবশাদেব"—মল্লিনাথ)। তবে আগেই বলেছি যে, ঐ মূর্ছনা ও গানের প্রয়োগের পিছনে যক্ষপত্নীর কোন গোপন অভিপ্রায় ছিল এবং সে অভিপ্রায় সম্বন্ধে কবি নিজে কোন কথা না বোল্লেও মনে হয় যক্ষপত্নীর মনের কোনে এই বাসনাই লুকোনো ছিল যে, গোত্র ও নামাঙ্কিত গানের পদ (কথা) ও মূর্ছনার প্রয়োগে প্রিয়পতি যক্ষরাজ নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয়তমাকে স্মরণ করবেন এবং বারংবার মূর্ছনা-প্রয়োগের ফলে তাঁর গৃহ-প্রত্যাগমণের আশা আরো তীব্র হোয়ে উঠ্‌বে। তীব্র ইচ্ছা হোলেই কোন-না-কোন একটী উপায়ের পথ আবিষ্কৃত হয়। এই কল্পনার ছবিই বোধহয় যক্ষপত্নীকে গোত্র ও নামপুটিত গান করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। একথা অবশ্য টীকাকার মল্লিনাথই কল্পনা-চক্ষে দেখে বর্ণনা করেছেন, কবি কালিদাস বা উত্তরমেঘের

১৬। ভক্তিরত্নাকর (গৌড়ীয় মিশন সং), পৃঃ ২৬১—২৬২

নায়ক যক্ষ ও নায়িকা যক্ষী প্রকৃতপক্ষে কোন কথাই বলেন নি। তবে গান্ধর্বগান গন্ধর্ব কিন্নর প্রভৃতি জাতিদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, গান্ধারগ্রামকেও তাঁরা ভালবাস্‌তেন, গান্ধারগ্রামকে আশ্রয় ক'রে তাই যক্ষ ও গন্ধর্বেরা বিভিন্ন তান ও মূর্ছনার প্রয়োগে গান করতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞানী ও তত্ত্ববিদ্ টীকাকার মল্লিনাথ সে কথা জান্‌তেন এবং জান্‌তেন বোলেই ৭৬ শ্লোকের "রক্ত-কণ্ঠৈরুদ্‌গায়দ্ভিঃ" প্রভৃতি এবং ৯১ শ্লোকের "উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে" কথাগুলির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দেবগান অথবা দেবযোনিদের গানের সঙ্গে গান্ধারগ্রামের যোগসূত্র রচনা করেছেন—("দেবগানস্থ গান্ধারগ্রামত্বাত্তারতরং গায়দ্ভিঃ"। ৭৬ শ্লো'; এবং "দেবযোনিত্বাদ্‌গান্ধারগ্রামেণ গাতুকম্"।৯১ শ্লো')। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ৮৬ শ্লোকে গানের প্রয়োগ ছিল আভ্যুদয়িক এবং ৯১ শ্লোকে গান ও মূর্ছনার প্রয়োগ ছিল আভিচারিক ব্যাপারে। গানে ও মূর্ছনায় নাম ও গোত্রকে পুটিত (অঙ্কিত) করা তান্ত্রিক আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক এই উভয় ক্রিয়ারই অপরিহার্য নিয়ম। কিন্তু তাই বোলে অমর কবি কালিদাসের এ'দুটি শ্লোক ও মল্লিনাথের মন্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত করা মোটেই যুক্তিযুক্ত কারণ হবে না যে, কেবল গান্ধারগ্রামেরই প্রয়োগ হোত আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক ব্যাপারে, এবং যক্ষ কিন্নর ও গন্ধর্বদের কাছে গান্ধারগ্রামের প্রয়োগ একচেটিয়া থাকায় গান্ধারগ্রাম ও তার অনুশীলন পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্যে লুপ্ত হয়েছিল। আমরা আগেও উল্লেখ করেছি ও পরে আরো বিস্তৃতভাবে অনুশীলন করার চেষ্টা করব যে, গান্ধারগ্রাম ছাড়াও ষড্‌জ ও মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা ও বিভিন্ন জাতির তানগুলি আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক এই উভয় উদ্দেশ্যে গানে ব্যবহৃত হোত, অথচ অজ্ঞাত কোন কারণে মধ্যমগ্রামের বিলোপ হোলেও অতি উৎকৃষ্ট ষড্‌জগ্রামের অনুশীলন অক্ষত শরীরেই এখনো-পর্যন্ত মনুষ্যসমাজে বর্তমান আছে।

গান্ধার এবং অন্য দুটি গ্রাম-সম্বন্ধে সঙ্গীতমকরন্দে[১৭] নারদ একটী সুন্দর যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি দুটী শ্লোকের মাধ্যমে গান্ধারগ্রামের শ্রুতির পরিচয়ও দিয়েছেন। শ্রুতি সাতটী স্বরের আন্তর ব্যবধানের নির্দেশক। সাতটী স্বরের মধ্যে শ্রুতিস্থানের সংস্থানে ও পরিবর্তনে তিনটী গ্রামের রূপ সৃষ্টি হয়। ষড্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার-গ্রাম তিনটীর শ্রুতিসংস্থান যেমন,

১৭। সঙ্গীতমকরন্দ (বরোদা গাইকোয়াড় সং) ১।৫৪-৫৫

(১) ষড়্জগ্রাম—

স.............. ৪
রি..............৩
গ.............. ২
ম.............. ৪
প.............. ৪
ধ.............. ৩
নি..............২

এই স্বর-সংস্থান বর্তমান হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের বিলাবল ও দক্ষিণ-ভারতীয় কর্ণাটী-সঙ্গীতের শংকরাভরণম্ রাগ-রূপের সমান।

(২) মাধ্যমগ্রাম—

স.............. ৪
রি..............৩
গ.............. ২
ম.............. ৪
প.............. ৩
ধ.............. ৪
নি..............২

(৩) গান্ধারগ্রাম—

স.............. ৩
রি...... ... .. ২
গ....... .... ৪
ম.... .... ৩
প ৩
ধ. ৩
নি.... .... ৪

অর্থাৎ ষড়জগ্রামে শ্রুতি—	৪	৩	২	৪	৪	৩	২	=২২
মধ্যমগ্রামে " —	৪	৩	২	৪	৩	৪	২	=২২
গান্ধারগ্রামে " —	৩	২	৪	৩	৩	৩	৪	=২২

নারদ উল্লেখ করেছেন (১।৫৬),

প্রবর্তকঃ স্বর্গলোকে গ্রামোঽসৌ ন মহীতলে।
গান্ধারঃ শ্রুয়তে নিত্যং জরামরণবর্জিতঃ॥

গান্ধারগ্রামের মহিমা অতুলনীয়, তা নিত্য ও শাশ্বত এবং সেই গান্ধারগ্রামকে আশ্রয় করলে সাধকশিল্পী মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, অথবা গান্ধারগ্রামে যেভাবে স্বরের সংস্থান আছে তার আলাপে ও অনুশীলনে সাধক অমৃতত্ব লাভ করেন, আর এজন্যেই বোধহয় পরবর্তীকালে গান্ধারগ্রামের স্থান স্বর্গলোকে নির্দিষ্ট হয়েছে।

গান্ধারগ্রামের প্রসঙ্গে বায়ুপুরাণের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বায়ুপুরাণ ৫ম খৃষ্টাব্দে (5th Century A. D.) সংকলিত। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভাণ্ডারকর

প্রভৃতির মতে ৮ম খৃষ্টাব্দে (8th Century A. D.) রচিত; সুতরাং বায়ুপুরাণকে সঙ্গীতমকরন্দের সমসাময়িক ধরা যেতে পারে। মকরন্দকারের মতন বায়ুপুরাণকারও গান্ধারগ্রামের শ্রুতি অলঙ্কার প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। বায়ুপুরাণে (৮৬।৩৬), আছে

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামো মূর্ছ্নাস্ত্বেকবিংশতিঃ।

তিনগ্রামের পরিচয়ও পুরাণকার দিয়েছেন, অথচ পূর্ববর্তী নাট্যশাস্ত্রকার ভরত গান্ধারগ্রামের নামোল্লেখ করেন নি, তাই কোন কোন ঐতিহাসিক নাট্যশাস্ত্রকে গুপ্ত অথবা মৌর্যযুগে রচিত বলেন। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত সমীচীন কিনা বিচক্ষণ ঐতিহাসিকেরাই আবার বিচার করবেন।

বায়ুপুরাণকার (৮৬।৪১-৪৯) ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধারগ্রামের তানের পরিচয় দিয়েছেন,

গান্ধারগ্রামিকাংশ্চান্যান্ কীর্ত্যমানান্নিবোধত।
আগ্নিষ্টোমিকমাদ্যন্তু দ্বিতীয়ং বাজপেয়িকম্॥
তৃতীয়ং পৌণ্ড্রকং প্রোক্তং চতুর্থং চাশ্বমেধিকম্।
পঞ্চমং রাজসূয়ঞ্চ ষষ্ঠঞ্চক্রসুবর্ণকম্॥
সপ্তমং গোসবং নাম মহাবৃষ্টিকমষ্টমম্।
ব্রহ্মদানঞ্চ নবমং প্রাজাপত্যমনন্তরম্॥
নাগপক্ষাশ্রয়ং বিদ্যাদ্গোতরঞ্চ তথৈব চ।
হয়ক্রান্তং মৃগক্রান্তং বিষ্ণুক্রান্তং মনোহরম্॥
সূর্যক্রান্তং বরেণ্যঞ্চ মত্তকোকিলবাদিনম্।
সাবিত্রমর্দ্ধসাবিত্রম্ সর্বতোভদ্রমেব চ॥
সুবর্ণঞ্চ সুতন্দ্রঞ্চ বিষ্ণুবৈষ্ণুবরাবুভৌ।
সাগরং বিজয়ঞ্চৈব সর্বভূতমনোহরম্॥
হংসং জ্যেষ্ঠং বিজানীয়াত্তুম্বুরুপ্রিয়মেব চ।
মনোহরমযাত্র্যঞ্চ গন্ধর্বানুগতঞ্চ যঃ॥
অলম্বুষেষ্টশ্চ তথা নারদপ্রিয় এব চ।
কথিতো ভীমসেনেন নাগরাণাং যথা প্রিয়ঃ॥
বিকলোপনীতবিনতা শ্রীরাখ্যো ভার্গবপ্রিয়ঃ।
অভিরম্যশ্চ শুক্রশ্চ পুণ্যঃ পুণ্যারকঃ স্মৃতঃ॥

আগ্নিষ্টৌমিক, বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রক, আশ্বমেধিক, রাজসূয়, চক্রসুবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রান্ত, মৃগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, মত্ত কোকিলের স্বরের মতন মনোরম, সূর্যকান্ত, সাবিত্র, অর্দ্ধসাবিত্র, সর্বতোভদ্র, সুবর্ণ, সুতন্দ্র, বিষ্ণু, বৈষ্ণবর, সাগর, সর্বভূতের মনোরম বিজয়, তুম্বুরুপ্রিয় হংস, অলম্বুষ নারদাদি গন্ধর্বগণের প্রিয় ও ভীমসেন কর্তৃক প্রশংসিত অঘাত্র্য, বিকল, উপনীত, বিনত, ভার্গবের প্রিয় শ্রী, শুক্র ও পুণ্যপ্রদ পুণ্যারক, অভিরম্য এগুলি ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধারগ্রামের তান।

এ'ছাড়া বায়ুপুরাণে কতকগুলি মূর্ছনার নাম পাওয়া যায় যেগুলি সম্ভবত আভিচারিক কার্যের জন্যে প্রযুক্ত হোত, যেমন যাক্ষিকা, অহি, শকুন্তক, মন্দনী, অশ্বক্রান্তা প্রভৃতি। মাঙ্গলিক ও আভ্যুদয়িক কতকগুলি মূর্ছনার নামও পাওয়া যায়, যেমন গান্ধার বা গান্ধারী, উত্তরগান্ধারী, ষড়্জাখ্যা, দিব্যা, আয়তা, মন্দষষ্ঠা প্রভৃতি। আভিচারিক মূর্ছনা যাক্ষিকার অর্থ হোল: যক্ষীগণ পঞ্চম-স্বরের মূর্ছনা দ্বারা সাধুগণের মোহ উৎপাদন করত, এজন্যে মূর্ছনার নাম 'যাক্ষিকা'। 'অহি'-মূর্ছনা শ্রবণ করলে বিষধর সর্পগণও মুগ্ধ হোত। 'শকুন্তক'-মূর্ছনার প্রয়োগে কিন্নরগণ পক্ষীরবের অনুকরণ করত। 'মন্দিনী'-মূর্ছনা প্রযুক্ত হোলে ঋষিগণের মনও শিথিল হোয়ে পড়্ত। আবার আভ্যুদয়িক 'গান্ধার'-মূর্ছনা প্রযুক্ত হোলে পৃথিবীর স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি পেত। দিব্যা, আয়তা প্রভৃতি মূর্ছনার প্রয়োগে বিশ্বের কল্যাণ সাধিত হোত। কিন্তু মনে রাখ্তে হবে যে, এগুলি মোটেই গান্ধারগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আগ্নিষ্টোমিক, বাজপেয়িক, আশ্বমেধিক তানগুলি কিন্তু আভ্যুদয়িক ও সমাজের কল্যাণকর বোলেই মনে হয়, কেননা দত্তিল (খৃ: ২য় শতাব্দী) তাঁর 'দত্তিলম্' পুস্তকে (৩১ শ্লো°) উল্লেখ করেছেন,

অগ্নিষ্টোমাদিনামানস্ত উক্তা নারদাদিভিঃ।
দেবারাধনযোগেন তৎপুণ্যোৎপাদকা যতঃ॥

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ষোড়শী প্রভৃতি ষাড়্জগ্রামিক নিষাদবিহীন ষাড়ব তান এবং পুরুষমেধ, বজ্র, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতিকে ঋষভ ও পঞ্চম স্বর-বর্জিত ঔড়ব ষাড়্জগ্রামিক তান-রূপে পরিচয় দিয়েছেন। এ'ছাড়া তিনি ' মধ্যমগ্রামিক ষাড়ব ও ঔড়ব' তানেরও উল্লেখ করেছেন। টীকাকার সিংহভূপাল এই

তানগুলিকে পবিত্র যজ্ঞীয় তথা যজ্ঞে ব্যবহারের উপযোগী বলেছেন। সিংহভূপাল তাঁর সিদ্ধান্তের অনুকূলে পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীতসময়সার' থেকে প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন: "নহু তানানাং যজ্ঞানাং চ কথমেকত্র ব্যবহারঃ? উচ্যতে—একস্মিন্নপি তান উচ্চারিতেঽগ্নিষ্টো-মাদিযাগানামেকৈকস্ত ফলোপলব্ধে গায়কানাং যজ্ঞস্তানাদেব সিধ্যতি"। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সিংহভূপাল পার্শ্বদেবের যে প্রমাণবাক্যটী উদ্ধৃত করেছেন, ত্রিবান্দ্রম থেকে প্রকাশিত সঙ্গীতসময়সারের সংস্করণে তা মোটেই নাই, অথচ সিংহভূপালের ইঙ্গিত ও উদ্ধৃতিকে সহজে মিথ্যা বলার কোন উপায় নাই। কাজেই মনে হয়, সঙ্গীতসময়সারের অনেক অংশ নানা কারণে বর্তমানে লোপ পেয়েছে।

সঙ্গীতরত্নাকরের প্রথম অধ্যায়ের গ্রামমূর্ছনাক্রমতানপর্যায়ে ষাড়্‌জগ্রামিক ষাড়ব ২৮টী, মধ্যমগ্রামিক ২১টী এবং ষাড়্‌জগ্রামিক ঔড়ব ১১টী ও মধ্যমগ্রামিক ঔড়ব ১৪টী তান-প্রসঙ্গে টীকাকার কাল্লিনাথ উল্লেখ করেছেন—"শুদ্ধতানানাং অদৃষ্টফলসম্বন্ধং চ * * যজ্ঞানাম্ অভিধেয়ত্বং", "শুদ্ধতানানাং যজ্ঞফলসংবন্ধে", "কূটতানানাং তু কেবলং দৃষ্টিফলত্বেন" প্রভৃতি। তিনি শুদ্ধতান ও মূর্ছনাগুলির সম্বন্ধেও শ্রেয় তথা কল্যাণকর অদৃষ্টফলের প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি তান বল্‌তে শুদ্ধতান—"তানাঃ শুদ্ধতানাঃ" এবং "শ্রেয়সে" শব্দ বল্‌তে "অদৃষ্টফলায়" বলেছেন। কাল্লিনাথ অগ্নিষ্টোমাদির উল্লেখ ক'রে লিখেছেন,

> আগ্নিষ্টোমিকতানেন গীতং সাম শৃণোতি যঃ।
> স সর্বপাতকৈর্মুক্তো লোকাঞ্জয়তি দুর্জয়াম্ ॥
> * * * *
> প্রত্যহং সংধ্যয়োঃ স্তোত্রং নাকলোকং স গচ্ছতি ॥
> আগ্নিষ্টোমিকতানেন যৈর্নরৈঃ স্তূয়তে শিবঃ।
> তে ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ শিবসাজুয্যমাপ্নুয়ুঃ ॥

মোটকথা সামগীতিতে আগ্নিষ্টোমিক, জ্যোতিষ্টোমিক প্রভৃতি তান ব্যবহৃত হোত ও সেই ধরণের তানযুক্ত সামগান শ্রবণ করলে লোকে দুষ্কর্মজনিত যেকোন পাপ থেকে মুক্তি লাভ করত। আগ্নিষ্টোমিক প্রভৃতি তান কল্যাণোৎপাদক সুতরাং আভ্যুদয়িক। এখন আর সে-ধরণের গানের প্রচলন নাই। অনেকে সেই

ধরণের তানযুক্ত গানকে গান্ধারগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন। তবে আভ্যুদয়িক ব্যাপারের মতন আভিচারিক অনুষ্ঠানাদিও গানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, কেননা ষাড়্জগ্রামিক ঔড়ব ২১টী তানের মধ্যে মাঙ্গলিক কারীরী, শান্তিকৃৎ, পুষ্টিকৃৎ প্রভৃতি তানের মতন উচ্চাটন ও বশীকরণ তানাদিরও উল্লেখ আছে—"বৈনতেয়োচ্চাটনৌ চ বশীকরণসংজ্ঞকঃ"। শান্তিকৃৎ, পুষ্টিকৃৎ প্রভৃতি তানগুলি সামগানের সঙ্গে জড়িত থেকে যেমন মানুষের সমষ্টি ও ব্যষ্টি কল্যাণ আনয়ন করতো তেমনি উচ্চাটন ও বশীকরণ-সংজ্ঞক তানযুক্ত সামগানগুলি অকল্যাণও সাধন করতো সমাজের দিক থেকে।

শার্ঙ্গদেব মধ্যমগ্রামিক ঔড়ব তানের পরিচয় দিয়েছেন, যেমন শঙ্খচূড়, গজচ্ছায়া, রৌদ্রাখ্য, বিষ্ণুবিক্রম প্রভৃতি। এই তানগুলিতে ঋষভ ও ধৈবত স্বরের ব্যবহার থাকে না। আবার ভৈরব, কামদাখ্য, অষ্টকপালক, স্বিষ্টকৃৎ, বষট্কার, মোক্ষদ প্রভৃতি তানগুলি নিষাদ ও গান্ধার স্বর-বর্জিত এবং এ'গুলি কল্যাণকর। শার্ঙ্গদেব তাই পরবর্তী ১০ম—১১শ শ্লোকদুটীতে উল্লেখ করেছেন,

যদ্ যজ্ঞনাম। যস্তানস্তস্ম তৎফলমিষ্যতে ॥
গান্ধর্বে মূর্ছনাস্তানাঃ শ্রেয়সে শ্রুতিচোদিতাঃ।

এখানে বলা বাহুল্য যে, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী অথবা তার কিছু পরেকার গ্রন্থ বৃহদ্দেশীতে আগ্নিষ্টোমিকাদি ষড্জ ও মধ্যমগ্রামের ষাড়ব ও ঔডব তানগুলির উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেব হুবহু বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের অনুকরণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, মতঙ্গ মধ্যমগ্রামিক ঔডবতান হিসাবে "ভৈরবঃ কামদশ্চৈব" —ভৈরবের নামোল্লেখ করেছেন। এই ভৈরব কিন্তু রাগ নয়, তান, কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায—ঠিক তখনো আর্যসমাজে ভৈরব রাগ এবং এমনকি ভৈরবী রাগিণীর প্রচলন হয়নি। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অভিপ্রায় এই যে, তানগুলির নাম-অনুযায়ী তাদের প্রকৃতি ও ফলদানের শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। "গান্ধর্বে মূর্ছনাস্তানাঃ" কথাগুলি গন্ধর্বদের অতিপ্রিয় গান্ধারগ্রামের ও সেই গ্রামের অন্তর্গত মূর্ছনা ও তানের কথাকেই আপাতত স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য টীকাকার সিংহভূপাল 'গান্ধর্ব' বল্তে 'মার্গগান' বলেছেন—"গান্ধর্বে মার্গগানে"। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের অভিমত তাই, ভরতও গান্ধর্বকে "স্বরতালপদাশ্রয়ম্" তথা 'মার্গগান' বলেছেন। সিংহভূপালও গান্ধর্বকে বলেছেন মার্গগান। সিংহভূপাল গান্ধর্ব তথা মার্গগানের প্রসঙ্গে

উল্লেখ করেছেন—"শ্রেয়সেঽভ্যুদয়ায় নিঃশ্রেয়সার্থম্। ততশ্চ শুদ্ধমূর্ছনা-তানাদিপ্রয়োগস্য ধর্মত্বেঽপি সূচ্যতে, 'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ' ইত্যঙ্গীকারাৎ"।

এ'ছাড়া সঙ্গীতরত্নাকরের ৪র্থ অধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব যেখানে উল্লেখ করেছেন: "গান্ধর্বং গানমিত্যস্য" এবং "রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো গীতিমিত্যভিধীয়তে", অর্থাৎ এই কথাগুলিদ্বারা যেখানে গীতি ও গান্ধর্বগানের পার্থক্য দেখিয়েছেন সেখানে টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন: "তস্য গীতস্য গান্ধর্বং গানমিতি ভেদদ্বয়মুক্তং ভরতাদিভিঃ।* * যদ্গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে গীয়তে তচ্চ ন স্ববুদ্ধ্যা গীয়তে; কিং ত্বনাদিসংপ্রদায়াৎ। অনাদিমান্যো যঃ সংপ্রদায়ো গুরুশিষ্যপরম্পরয়া পরিজ্ঞানম্; * * শ্রেয়স্ ঐহিকসুখস্য স্বর্গাপবর্গরূপস্য হেতুঃ কারণম্ তদ্গান্ধর্বমিত্যভিধীয়তে"। ভরতও নাট্যশাস্ত্রে "গন্ধর্বাণাং চ যস্মাদ্ধি তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে"—যেহেতু গন্ধর্বেরা এই গান ভালবাসে ও তাদের প্রীতিকর সেজন্যে এর নাম 'গান্ধর্ব' এই কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দেবতাদেরও সেগুলি ইষ্ট—"অত্যর্থমিষ্টং দেবানাম্"। সুতরাং 'গান্ধর্বগান' বল্‌তে সামগানের পরই জাতিরাগ ও গ্রামরাগ প্রভৃতিকে বুঝায়—"গান্ধর্বং জাতিগ্রামরাগাদি পূর্বমুক্তম্"। 'গান' বল্‌তে কালিনাথ বলেছেন "দেশীগান"—"গানং তু দেশীত্যবগন্তব্যম্", আর 'গান্ধর্ব' বল্‌তে মার্গগান—"গান্ধর্বং মার্গঃ"। ভরতও একথা স্বীকার করেছেন তা বলেছি, তবে ভারতের সময়ে গান্ধর্বের তথা মার্গগানের সঙ্গে গান্ধারগ্রামের সংযোগ হয়তো ছিল না, কেননা সামগানের ব্যাপক অনুশীলন ও প্রচলন তখন সমাজ থেকে লোপ পেয়েছিল এবং গান্ধারগ্রামের প্রচলনও সুতরাং লুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু শার্ঙ্গদেব ও তাঁর পূর্ববর্তী মকরন্দকার নারদ জ্যোতিষ্টোম, আশ্বমেধিক প্রভৃতি তানের বিবরণ যা দিয়েছেন সে-সমস্ত তান গান্ধর্ব তথা মার্গগানেরই, কেননা "গান্ধর্বে মূর্ছনাস্তানাঃ" কথাগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাজেই ভরত ও মতঙ্গাদি গান্ধারগ্রামের প্রচলনকে বাদ দিলেও গান্ধারগ্রামিক প্রকৃতিযুক্ত তান ও মূর্ছনাগুলিকে মোটেই বাদ দিতে পারেন নি।

সঙ্গীতমকরন্দকার নারদও সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব রাগগুলির প্রভাব ও মহিমা বর্ণনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় পাদে (৩।৮০—৮৩)। তিনি উল্লেখ করেছেন, সাত স্বরযুক্ত সম্পূর্ণজাতির রাগগুলির অনুশীলন ও আলাপে দীর্ঘায়ু,

যশ, বুদ্ধি, ধন-ধান্যযুক্ত সম্পদ বা ফল লাভ হয়। ছয় স্বরযুক্ত ষাড়বজাতির রাগগুলির আলাপে শিল্পী সংগ্রামে জয়ী হন, রূপ-লাবণ্য লাভ করেন ও সকলে তাঁর গুণকীর্তন করে, আর পাঁচ স্বরযুক্ত ঔড়বজাতির রাগগুলির আলাপে ব্যাধি, ভয়, শোক ও শত্রু নাশ হয়। বিশেষ ক'রে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্মে ঔড়বরাগ গান করা হয়। যেমন,

আয়ুর্ধর্মযশোবুদ্ধিধনধান্যফলং ভবেৎ।
রাগাভিবৃদ্ধিসন্তানং পূর্ণরাগাঃ প্রগীয়তে॥
সংগ্রামরূপলাবণ্যবিরহং গুণকীর্তনম্।
ষাড়বেন প্রগাতব্যং লক্ষণং গদিতং যথা॥
ব্যাধিনাশী শত্রুনাশী ভয়শোকবিনাশনে।
ব্যাধিদারিদ্র্যসন্তাপে বিষমগ্রহমোচনে॥
কামডম্বরনাশে চ মঙ্গলং বিষসংজ্ঞতে।
ঔড়বেন প্রগাতব্যং গ্রামশাস্ত্র্যর্থকর্মণি॥

এ'ছাড়া শাস্ত্রনির্দেশ লঙ্ঘন ক'রে সঙ্গীতালাপ করলে যে সাধকের অত্যন্ত অকল্যাণ সাধিত হয় একথাও মকরন্দকার নারদ প্রকাশ করেছেন। মোটকথা নারদ মকরন্দে তান ও মূর্ছনাগুলির নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না করলেও সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব রাগগুলির গুণ ও মহিমা-বর্ণনার ভূমিকায় ঐ তান ও মূর্ছনাগুলিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য এখানে গান্ধারগ্রামের কোন কথা উল্লিখিত হয়নি।

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, একমাত্র ষড়্জগ্রামের আদর অক্ষুণ্ণ থেকে কেন গান্ধার ও মধ্যম গ্রামদু'টী সমাজ থেকে বর্তমানে অদৃশ্য হোল? মকরন্দকার নারদ তিনটী গ্রামের সম্যক পরিচয় দিলেও ষড়্জগ্রামের প্রাধান্যই স্বীকার করেছেন: "ষড়্জঃ প্রাধান্যমাপ্তবাদ্" (১।৬৩)। শার্ঙ্গদেবও তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে (১।৪।৬) ঠিক এ'কথারই উল্লেখ করেছেন। টীকাকার কালিনাথের চেয়ে সিংহভূপালের বিশ্লেষণ এ'বিষয়ে দীর্ঘ ও সুস্পষ্ট। সিংহভূপালের অভিমত এই যে, দত্তিল মতঙ্গ প্রভৃতি আচার্যেরা ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামদু'টীকে দেবকুলে উৎপন্ন বোলে অসাধারণ ধর্মসম্পন্ন বলেছেন। এ'ছাড়া ষড়্জ সকল স্বরের আদি ও প্রধান। সকল স্বরেরই একটী একটী ক'রে সংবাদী বা অমাত্য থাকে, তাই ষড়্জস্বরের বেলায় মধ্যম ও পঞ্চম এই দুটী স্বরই সংবাদী হয়। তাছাড়া মধ্যমস্বরের

কখনও লোপ হয় না, মধ্যম অবিলোপী সুতরাং অবিনাশীই থেকে যায়।[১৮] ষড়্‌জগ্রামেরও এ'ধরণের সুখ-সুবিধা ও সৌভাগ্য থাকায় তার অস্তিত্ব ও আদর সমাজে বেশী। তবে সিংহভূপাল তাঁর টীকায় তিনটী গ্রামের গ্রামত্ব প্রমাণ করার সপক্ষে ওকালতি করছেন সুস্পষ্টভাবে, অথচ কোন গ্রামের অপ্রচল কেন হোল সে-সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি; বরং গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "গান্ধারোঽপি স্বর্গলোকে স্বরাণামগ্রণীরাস্তো গ্রামব্যপদেশভাক্"।

তিনটী গ্রামের নাম ও মূর্ছনার ইঙ্গিত দিয়ে নারদীশিক্ষাকার নারদ সাতটী লৌকিক স্বরের নামোল্লেখ করেছেন,

> ষড়্‌জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
> পঞ্চমী ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ॥

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষাকার নারদ সামস্বর ও সামগানের কিছু-কিছু পরিচয় দিলেও আসলে লৌকিক দেশী ও মার্গ-সঙ্গীতের সকল-কিছুর পরিচয় দিতে উন্মুখ। অবশ্য ভরত ও মতঙ্গের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

স্বরগুলির দেবতা ও কুল এবং মূর্ছনাগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে নারদীকার আবার প্রথমে মূর্ছনার ব্যাপারে দেব, পিতৃ ও গন্ধর্ব এই তিনটী শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। পিতৃ, যক্ষ ও ঋষি-বংশেরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন। দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব অথবা দেবতা, পিতৃ ও অসুর বা যক্ষ এই তিনটী বংশের উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৫।১৬) আছে: "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ", অর্থাৎ মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও দেবলোক এই তিনটী লোক। পুনরায় বৃহদারণ্যকে (৫।২।১) আছে—"ত্রয়াঃ প্রজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্যমূষুঃ—দেবা মনুষ্যা অসুরাঃ"। দেবতা ও মানুষের এবং দেবতা ও অসুরের মধ্যে মিত্রতা ও সংঘর্ষের কথা বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের ইতিহাসে যথেষ্ট পাওয়া যায়। এমন কি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থান-পতনের সময়ে ব্রাহ্মণ ও যবনের অথবা প্রভু ও ভৃত্যের আধিপত্য

১৮। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, মধ্যমস্বর গ্রামে, মেলে বা ঠাটে অথবা রাগে অবিলোপী বা অবিনাশী হিসাবে শাস্ত্রে গণ্য হোলেও মধ্যম-বিলোপী বা মধ্যমস্বরবর্জিত রাগের বেলায় মধ্যমের অদর্শন ও অপ্রয়োগ অবশ্যই আছে। যেমন ভূপালী, প্রভাবতী, মোহন, বিভাস শংকরা হংসধ্বনি প্রভৃতি রাগে আরোহণে ও অবরোহণে মধ্যমস্বর বর্জিত। মনে হয়, মধ্যম প্রত্যেকটী রাগের পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ প্রকৃতির নির্দেশক বোলে তার অপরিহার্যতা ও প্রাধান্যকে ইঙ্গিত ক'রে শাস্ত্রকার গৌরবে মধ্যম-সম্বন্ধে অবিলোপী বা অবিনাশী কথার ব্যবহার করেছেন।

ও আনুগত্যের ধারাবাহিকতা মধ্যযুগের ইতিহাসকে কাহিনীমণ্ডিত করেছে। আধিপত্য ও ক্ষমতালাভের আকাঙ্ক্ষাই এ'সকল শ্রেণীর মধ্যে নিহিত। বৈদিক যুগেও দেবতাগণের মধ্যে ক্ষমতালাভের স্পৃহা যথেষ্ট ছিল, তাই দেবতা ও মানুষের, সভ্য মানুষের ও অসভ্য (?) অসুরদের ভিতর সংঘর্ষ হয়েছে অসংখ্যবার। ঐতিহাসিকেরাও তাই ভারতীয় সভ্যতার আলেখ্য আঁকতে গিয়ে ঐ প্রধান তিনটী শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। সঙ্গীতের সম্বন্ধেও তাই। সমাজবাসী সঙ্গীতগুণীরা সঙ্গীতের বেলায়ও সামাজিক প্রভাব ও পরিবেশকে অতিক্রম করতে পারেন নি, বরং ঐগুলির মারফতেই তাঁদের সঙ্গীতগোষ্ঠির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন।

নারদীকার বলেছেন, দেবতাদের সাতটী, পিতৃগণের সাতটী ও গন্ধর্বগণের সাতটী মূর্ছনা। এ-ছাড়া ঋষিদের সাতটী মূর্ছনাই লৌকিকের বা সাধারণ সমাজে প্রচলিত সাত মূর্ছনা ছিল, অর্থাৎ অনেকের মতে বৈদিক ও লৌকিক মূর্ছনা-সংখ্যাগুলি সমান। যেমন,

সংখ্যা	দেব	পিতৃ বা মনুষ্য	গন্ধর্ব
১	নন্দী	আপ্যায়নী	নন্দী
২	বিশালা	বিশ্বভৃতা	বিশালা
৩	সুমুখী	চন্দ্রা	সুমুখী
৪	চিত্রা	হেমা	চিত্রা
৫	চিত্রবতী	কপর্দিনী	চিত্রবতী
৬	সুখা	মৈত্রী	সুখা
৭	বলা	বার্হতী	বলা

এ'ছাড়া অসুর বা যক্ষদের মূর্ছনাও আছে এবং সেগুলি পিতৃগণের অনুযায়ী। শিক্ষাকার নারদ মূর্ছনাদের নাম সম্বন্ধে বলেছেন,

নন্দী বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রবতী সুখা।
বলা যা চাথ বিজ্ঞেয়া দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ॥
আপ্যায়নী বিশ্বভৃতা চন্দ্রা হেমা কপর্দিনী।
মৈত্রী বার্হতী চৈব পিতৃণাং সপ্তমূর্ছনাঃ॥

* * *

উপজীবন্তি গন্ধর্বা দেবানাং সপ্তমূর্ছনাঃ।
পিতৃণাং মূর্ছনা সপ্ত তথা যক্ষা ন সংশয়ঃ।
ঋষীণাং মূর্ছনা সপ্ত যাস্ত্বিমা লৌকিকাঃ স্মৃতাঃ॥

ঋষিদের সাতটী মূর্ছনা যেমন,

ষড়্জে—উত্তরমন্দ্রা	পঞ্চমে—হৃষ্যকা
ঋষভে—অভিরুদ্গতা	ধৈবতে—উত্তরায়তা
গান্ধারে—অশ্বক্রান্তা	নিষাদে—রজনী
মধ্যমে—সৌবীরা	

ঋষিদের সাতটী মূর্ছনা যে লৌকিক সাতটী স্বর তা আগেই উল্লেখ করেছি। এ'ছাড়া সাতটী লৌকিক স্বরের মধ্যে এক একটী স্বর দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও বিশ্বচরাচরকে প্রীত করে বা তাদের সুখদায়ক হয়। যেমন ষড়্জ মনোরঞ্জন করে দেবতাদের, ঋষভ ঋষিগণের, গান্ধার পিতৃগণের, মধ্যম গন্ধর্বগণের, পঞ্চম দেবতা, ঋষি ও পিতৃ এই তিনজনের, ধৈবত সমগ্র চরাচরের অথবা মনুষ্যের ও নিষাদ যক্ষগণের প্রীতি সম্পাদন করে।

নারদীশিক্ষার প্রথম অধ্যায়ে, তৃতীয় কণ্ডিকার প্রথমে বৈদিক ও লৌকিক দু'রকম গানের দশরকম গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং দশটী গুণ যথা, রক্ত, পূর্ণ, অলঙ্কৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, বিক্রুষ্ট বা বিকৃষ্ট, শ্লক্ষ্ণ, সম, সুকুমার ও মধুর। নারদীর ১—১১ শ্লোকগুলিতে গানের দশটী গুণের সার্থকতা দেখানো হয়েছে। শিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন: "গানস্য তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তদ্যথা রক্তং পূর্ণমলঙ্কৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লক্ষ্ণং সমং সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ"। এদের মধ্যে (১) 'রক্ত' হোল বেণু ও বীণার একত্রিত ধ্বনি বা স্বর, যা সকলকে আনন্দ দান করে—"তত্র রক্তং নাম বেণুবীণাস্বরাণামেকীভাবে

রক্তমিত্যুচ্যতে"। (২) 'পূর্ণ' বল্‌তে বুঝায় স্বর (মধ্যমাদি) ও শ্রুতির করণ বা পূরণ এবং ছন্দের পাদ ও অক্ষরের পরস্পর সংযোগে উচ্চারণ—"স্বরশ্রুতিপূরণাচ্ছন্দঃ পাদাক্ষরসংযোগাৎ পূর্ণমিত্যুচ্যতে"। (৩) 'অলঙ্কৃত' বল্‌তে বুঝায় কণ্ঠ থেকে নির্গত স্বরকে নিম্ন ও উচ্চ ক'রে উচ্চারণ—"উরসি শিরসি কণ্ঠযুক্তমিত্যলঙ্কৃতম্"। (৪) "প্রসন্ন" বল্‌তে বুঝায় কণ্ঠকে নিপীড়ন ক'রে গদগদধ্বনি বা শব্দ—"অপগতগদ্‌গদনির্বিশঙ্কং প্রসন্নমিত্যুচ্যতে"। (৫) 'ব্যক্ত' বল্‌তে বুঝায় শব্দ বা ধাতু ও প্রত্যয়যুক্ত এবং ছন্দ, রাগ, পদ ও স্বরসমূহের দ্বারা ধ্বনির অভিব্যক্তি—"পদপদার্থপ্রকৃতিবিকারাগমলোপ-কৃত্তদ্ধিতসমাসধাতুনিপাতোপসর্গস্বরলিঙ্গবৃত্তিবার্তিকবিভক্ত্যর্থবচনানাং সম্যগুপ-পাদনে ব্যক্তমিত্যুচ্যতে"। (৬) 'বিক্রুষ্ট' বা 'বিকৃষ্ট' বল্‌তে বুঝায় উচ্চ ক'রে উচ্চারণ করলে যেখানে পদের অন্তর্গত অক্ষরের স্পষ্টতা হয়, অব্যক্ত বা অস্পষ্ট হয় না এবং আসলে তার বা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করাকেই বিক্রুষ্ট বলে—"উচ্চৈরুচ্চারিতং ব্যক্তপদাক্ষরমিতি বিক্রুষ্টম্"। (৭) 'শ্লক্ষ্ণ' শব্দে বুঝায় দ্রুত, বিলম্বিত, উচ্চ, নীচ, প্লুত, সমাহার প্রভৃতির সম্পাদন। আসলে উচ্চ ও নিম্ন স্বরগুলির প্রকাশ। এ'ছাড়া দ্রুতই হোক আর ধীরে বা বিলম্বিতেই হোক সকল অবস্থায় স্বরগুলিকে সূক্ষ্ম ক'রে প্রকাশ করা—"দ্রুতমবিলম্বিত-মুচ্চনীচপ্লুতসমাহারং হেলতালোপনয়ানাদিভিরুপপাদনাদিভিঃ শ্লক্ষ্ণমিত্যু-চ্যতে"। (৮) 'সম' বল্‌তে বুঝায় স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহ ও অবরোহ প্রভৃতি বর্ণগুলিকে লয়ের সঙ্গে একীভূত করা—"আবাপনির্বাপপ্রদেশং প্রত্যন্তর-স্থানানাং সমাসঃ সমমিত্যুচ্যতে"। (৯) 'সুকুমার' বল্‌তে বুঝায় অব্যক্ত, অস্পষ্ট বা কণ্ঠ চেপে স্বর নির্গত না করা, পরন্তু উচ্চ, নীচ ও মধ্যস্থানে কণ্ঠের স্বরকে স্বচ্ছন্দগতিতে লীলায়িত করা। (১০) 'মধুর' বল্‌তে বুঝায় স্বভাবত সাবলীলগতিতে পদ ও অক্ষরের উচ্চারণ। এই উচ্চারণে কণ্ঠের স্বভাবসুন্দর মাধুর্য ও কমনীয়তা বজায় থাকে। তান এই দশটী গুণযুক্ত হোলে তবেই তাকে সম্মানের পদবী দেওয়া হয়। সঙ্গীতরত্নাকরে ৪র্থ প্রবন্ধাধ্যায়ের শেষের দিকে (৩৭৪-৩৭৮ শ্লোক) শার্ঙ্গদেবও গানের এই দশটী গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

ব্যক্তং পূর্ণং প্রসন্নং চ সুকুমারমলংকৃতম্।
সমং সুরক্তং শ্লক্ষ্ণং চ বিকৃষ্টং মধুরং তথা॥

দশৈতে স্যুগুর্ণা গীতে তত্র ব্যক্তং স্ফুটৈঃ স্বরৈঃ ॥
প্রকৃতিপ্রত্যয়ৈশ্চোক্তং ছন্দোরাগপদৈঃ স্বরৈঃ।
পূর্ণং পূর্ণাঙ্গগমকং প্রসন্নং প্রকটার্থকম্ ॥
সুকুমারং কণ্ঠভবং ত্রিস্থানোত্থমলংকৃতম্।
সমবর্ণলয়স্থানং সমমিত্যভিধীয়তে ॥
সুরক্তং বল্লকীবংশকণ্ঠধ্বন্যৈকতাযুতম্।
নীচোচ্চদ্রুতমধ্যাদৌ শ্লক্ষ্ণত্বে শ্লক্ষ্ণমুচ্যতে ॥
উচ্চৈরুচ্চারণাদুক্তং বিকৃষ্টং ভরতাদিভিঃ।
মধুরং ধূর্যলাবণ্যপূর্ণং জনমনোহরম্ ॥

নারদীশিক্ষায় 'ব্যক্ত' স্থানে 'রক্ত' আছে। মনে হয় ব্যক্ত শব্দটাই ঠিক।

গান বা গীতির দোষ ও গুণ বর্ণনা এবং তাদের বিশ্লেষণ শিক্ষাকার নারদ থেকে ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি সকল সঙ্গীতগুণীই করেছেন। গীতির দোষ সম্বন্ধে নারদ বলেছেন—শঙ্কিত, কম্পিত, কাকস্বর তুল্য কর্কশ, অত্যন্ত উচ্চ ও তীক্ষ্ণ, বিরস, ব্যাকুলিত প্রভৃতি হোলে গলার স্বর স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় না, সুতরাং শ্রুতিমধুরও হয় না। সঙ্গীতরত্নাকরে (৪।৩৭৯) শার্ঙ্গদেব তাই বলেছেন,

দুষ্টং লোকেন শাস্ত্রেণ শ্রুতিকালবিরোধি চ।
পুনরুক্তং কলাবাহ্যং গতক্রমপার্থকম্।
গ্রাম্যং সন্দিগ্ধমিত্যেবং দশধা গীতদুষ্টতা ॥

লোক বা শ্রোতা ও শাস্ত্র-কর্তৃক নিন্দিত, শ্রুতি ও কাল-বহির্ভূত, বারংবার কথিত, শিল্পসৌন্দর্যবিহীন, গ্রাম্য ও সন্দিগ্ধ স্বরযুক্ত গান নিন্দনীয়, কেননা এ'গুলি গানের পক্ষে দোষ হিসাবে গণ্য।

ষড়্জাদি সাত স্বরের বর্ণ এবং জাতিও নির্দিষ্ট হয়েছে। শাস্ত্রী যাজ্ঞবল্ক্যও তাঁর শিক্ষায় উদাত্তাদি তিন স্বরের জাতি-বর্ণাদির কল্পনা করেছেন। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ছন্দ ও স্বরের অধিদেবতা, বর্ণ ও বংশ প্রভৃতির কল্পনা বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে হয়েছিল। ঋগ্বেদে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে আদি-বর্ণ হিসাবে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ রঙের সন্ধান পাওয়া যায়। উপনিষদে প্রাণ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণেরও অধিদেবতা (presiding deity) কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের যুগে স্বর বা ছন্দের বর্ণ, দেবতা প্রভৃতির কল্পনা মোটেই নূতন ও বিস্ময়কর নয়। অনেক সময় বর্ণ

বা রঙের মাধ্যমে দেবতা, মনুষ্য ও অসুরদের ইঙ্গিত করা হয়েছে। পাতঞ্জল-যোগদর্শনে প্রতীকের (symbol) কল্পনা করা হয়েছে নির্গুণব্রহ্মকে লক্ষ্য করার জন্যে—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। প্রাচীন ইহুদীয় ও খৃষ্টান সাহিত্যেও বিভিন্ন প্রতীকের দ্বারা যীশুখৃষ্টকে বুঝানো হয়েছে। প্রতীকোপাসনা, অহংগ্রহ প্রভৃতি উপাসনা উপনিষদের জগতে নূতন নয়। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানও (Modern Science) শব্দের তথা বিভিন্ন কম্পন বা শব্দতরঙ্গের বর্ণ (colour) স্বীকার করেছে। সূর্যের সাতটী রঙ্ ইথারকণারই কম্পনের ফলস্বরূপ। সুতরাং সঙ্গীতশাস্ত্রীরা স্বরেও রঙ্ তথা বর্ণ এবং সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে বংশ, দ্বীপ, জাতি প্রভৃতির কল্পনা করেছেন।

শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন,

> পদ্মপত্রপ্রভঃ ষড়্‌জঋষভঃ শুকপিঞ্জরঃ।
> কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যমঃ কুন্দসপ্রভঃ॥
> পঞ্চমস্তু ভবেৎ কৃষ্ণঃ পীতকঃ ধৈবতঃ বিদুঃ।
> নিষাদঃ সর্ববর্ণ স্যাদিত্যেতাঃ স্বরবর্ণতাঃ॥

ষড়্‌জ পদ্মপত্রের মতন বর্ণযুক্ত, ঋষভ শুকপিঞ্জর, গান্ধার কনক বা স্বর্ণবর্ণ, মধ্যম কুন্দফুলের মতন বর্ণযুক্ত, পঞ্চম কৃষ্ণবর্ণ, ধৈবত পীতবর্ণ ও নিষাদ সকল বর্ণের সমন্বয়। মাণ্ডুকীশিক্ষাকার মণ্ডুকও সপ্তস্বরের এই ধরণের বর্ণ (রঙ্) স্বীকার করেছেন তা আলোচনা করেছি। জাতি-হিসাবে ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম ব্রাহ্মণ, ঋষভ ও ধৈবত ক্ষত্রিয় এবং গান্ধার ও নিষাদের মধ্যে গান্ধার বৈশ্য এবং নিষাদ বৈশ্য ও শূদ্র দুইই। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতি-নির্ণয়ের পিছনে শিক্ষাকারের একটী গোপন রহস্য লুকোনো আছে বোলে মনে হয়। টীকাকার ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চমের ব্রাহ্মণত্ব পদ লাভের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—উৎকর্ষ ও উৎকর্ষসামান্যই তার কারণ। তাঁর অভিমতে, পঞ্চমের উৎকর্ষ এবং ষড়্‌জ ও মধ্যমের উৎকর্ষসামান্য ও গ্রামত্ব হওয়ায়, অর্থাৎ যেজন্যে পঞ্চমস্বর উৎকর্ষবিশিষ্ট, ষড়্‌জ ও মধ্যমগ্রাম দুটী উৎকর্ষসামান্যবিশিষ্ট, সেজন্যে তারা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণত্বের সম্মান ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করা তাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত। ঋষভ ও ধৈবত শক্তিসম্পন্ন বোলে ('বলযোগাৎ') ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্বের সম্মান ও পদবী পাবার তারা অধিকারী, আর গান্ধার যেহেতু মধ্যমের উপর নির্ভর করে অথবা মধ্যম স্বর

থেকে গান্ধারের সৃষ্টি ("গান্ধারস্তু মধ্যমাদেব রোহাৎ বৈশ্যতা") সেজন্যে গান্ধার বৈশ্য এবং নিষাদ অবরোহণ-প্রকৃতিসম্পন্ন অর্থাৎ উচ্চগতি-বিশিষ্ট হওয়ায় বৈশ্য ও শূদ্র দুইই—"নিষাদস্তু অবরোহাৎ বৈশ্যত্বং শূদ্রত্বং চ প্রতিপদ্যতে"।

এ'ছাড়া ষড়্‌জাদির জাতিত্ব-নির্ণয়ের পিছনে যাজ্ঞবল্ক্য অথবা পাণিনীয়শিক্ষার আরো একটি ইঙ্গিত লুকোনো আছে। যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে—উদাত্তাদি তিনটী বৈদিক স্বর (অথবা স্থান) থেকে ষড়্‌জাদি লৌকিক সাত স্বরের বিকাশ হয়েছে—

উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ,
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ।

সুতরাং তদনুযায়ী আমরা পাই,
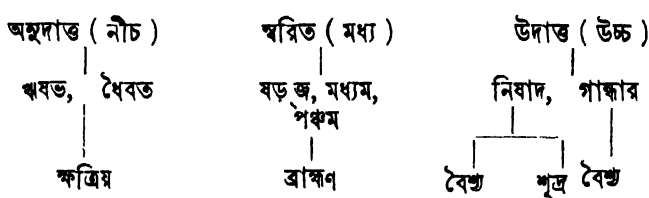
স্বরিত সমন্বয়কারী স্বর, তা থেকে অভিব্যক্ত ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম তিনটী স্বর। সমন্বয়কারী স্বর শান্তরসের ও সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। রসের মধ্যে শান্ত ও গুণের মধ্যে সত্ত্ব প্রধান, সুতরাং শান্তরস ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ স্বর 'স্বরিত' থেকে বিকশিত ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর তিনটীও জাতিতে প্রধান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-পদবী লাভ করার যোগ্য। এ'ছাড়া সাতস্বরের জন্মকাহিনী-সম্বন্ধে চিন্তা করলে দেখা যায়, ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম বা 'সমপ' স্বরতিনটী অতীব প্রাচীন, এদের বিকাশও অভিব্যক্তি-যুগের গোড়ার দিকে হয়েছিল। কোমল স্বরগুলির সৃষ্টি ও প্রচলন একেবারে গোড়ার বা প্রথম দিকের যুগে ছিল না, শ্রুতিস্বরগুলিকে অবলম্বন ক'রে ভরতের পরবর্তীযুগে কোমল স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। পণ্ডিত সোমনাথ তাঁর রাগবিরোধে এই 'সমপ' স্বর তিনটী সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—"কিং চ স্বভূবঃ সমপ" অথবা "সমপাঃ ষড়্‌জ-পঞ্চম-মধ্যমাঃ স্বস্মাদেব ভবন্তীতি স্বভূবঃ স্বপ্রকাশাঃ; নো তু কল্পিতাঃ"। 'সমপ' (ষড়্‌জ-মধ্যম-পঞ্চম) স্বর তিনটী যদি স্বয়ংপ্রকাশ ও প্রাচীন হয় তবে শ্রেণী-হিসাবেও তারা শ্রেষ্ঠ গণ্য হওয়া উচিত।

আমাদের মনে হয়, নারদীকার সকল দিক থেকে বিচার ক'রেই 'সমপ' স্বর-তিনটীকে ব্রাহ্মণ বলেছেন।

ঋষভ ও ধৈবতের পক্ষেও ক্ষত্রিয়ত্বের সম্মান লাভ করা যুক্তিযুক্ত, কেননা অনুদাত্ত স্বর গম্ভীর হওয়ায় সে বীর্য ও তেজের প্রকাশক। ক্ষত্রিয়ও বীরত্বের প্রতীক, সুতরাং অনুদাত্ত থেকে অভিব্যক্ত ঋষভ ও ধৈবত বীর্য ও শৌর্যের প্রকাশক হিসাবে ক্ষত্রিয়-রূপে গণ্য। উচ্চ স্বর উদাত্ত থেকে বিকশিত নিষাদ ও গান্ধার শূদ্র ও বৈশ্য-রূপে পরিগণিত, কারণ এদের প্রকৃতি তরল, স্বভাবে ও বিকাশে গাম্ভির্য নাই।

নারদীকার মধ্যম ও ষড্‌জ গ্রামদুটির পরিচয় দিয়েছেন ৩য় কণ্ডিকার ৭-৮ শ্লোকদুটীতে। মধ্যমগ্রামে গান্ধার-স্বরের প্রাবল্য তথা আধিপত্য থাকে, আরোহণ-অবরোহণক্রমে নিষাদের ব্যবহার হয় ও ধৈবতের সংস্পর্শ লাগে অল্প। ষড্‌জগ্রামেও গান্ধার বেশী লাগে ও নিষাদের ব্যবহার হয় অল্প, ধৈবত স্বর কম্পিতভাবে লাগে। এই প্রসঙ্গে মধ্যমরাগেরও উল্লেখ আছে। 'মধ্যমরাগ' মধ্যমগ্রাম থেকে উৎপন্ন গ্রামরাগ। এই রাগে কৈশিকশ্রুতির তথা কৈশিকনিষাদের ব্যবহার হয়। তাছাড়া শিক্ষাকার নারদ আরো গ্রামরাগের নামোল্লেখ করেছেন, যেমন কৈশিকমধ্যম, সাধারিত প্রভৃতি। এখানে আর একটী লক্ষ্য করার বিষয় যে, ভরতের পরবর্তীযুগে কোমল স্বরের প্রচলন যখন সমাজে হয়েছিল তখন ঋষভ, ধৈবত, নিষাদ ও গান্ধারের ভাগ্যেই তা সম্ভব হয়েছিল, ষড্‌জ ও পঞ্চম চিরদিনই থাকল অবিকৃত, মধ্যমে বিকার বা কোমলত্ব গুণ এলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হোল না, আর সেজন্যেই 'সমপ' স্বর তিনটী বর্ণ ও শ্রেণী-হিসাবে ব্রাহ্মণ বা প্রধান-রূপে গণ্য হোল।

কৈশিক, কৈশিকমধ্যম, মধ্যম প্রভৃতি গ্রামরাগগুলি জাতিরাগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এখানে প্রশ্ন এই যে, নাট্যশাস্ত্রে আমরা ঠিক 'গ্রামরাগ' এই কথাটী উল্লেখ পাই না, ভরত আঠারটী জাতিরাগেরই উল্লেখ করেছেন, সুস্পষ্টভাবে তিনি গ্রামরাগদের নামোল্লেখ বা তাদের পরিচয় দেন নি, অথচ নাট্যশাস্ত্রের পূর্ববর্তী গ্রন্থ নারদীশিক্ষায় গ্রামরাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদি বলা যায় যে, সম্ভবত নারদীশিক্ষায় সামান্যভাবে উল্লিখিত মধ্যমাদি গ্রামরাগগুলি প্রক্ষিপ্ত, অথবা নারদীশিক্ষা নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী সময়ে রচিত গ্রন্থ (?), কিন্তু একথা মনে করার কোন কারণ নেই, কেননা নানান্ দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে একথাই

রাগ বিলাবল

(বুন্দি-কলাশিল্প, খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)

[শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে]

হিন্দোলরাগ

(রাজপুত—১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ)

[শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে]

সত্য যে, নারদীশিক্ষা নাট্যশাস্ত্রের অন্ততঃ এক শতাব্দী আগে রচিত। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আঠারটি জাতিরাগের উল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জাতিরাগগুলি ভরতের সময়েই সৃষ্টি হয়েছিল। ভরত মাত্র তাদের ইতিকথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন সাধারণের পক্ষে জানার জন্যে, নচেৎ জাতিরাগের অস্তিত্ব ভরতপূর্ব যুগেও ছিল এবং একথা অনুমান করা সমীচীন হবে যে, জাতিরাগ থেকে উৎপন্ন গ্রামরাগদের অস্তিত্ব এবং প্রচলন নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময়ে এবং তাঁর পূর্বসমাজে অব্যাহত ছিল। কাজেই ভরতের ঠিক আগেকার গ্রন্থ নারদীশিক্ষায় জাতি ও গ্রামরাগদের যে উল্লেখ থাকবে এতে আর বিস্ময়কর ও বৈচিত্র্য কি।

নারদীশিক্ষায় উল্লিখিত 'কৈশিক'-রাগকে অনেকে মালবকৈশিকের ছদ্মবেশ বল্‌তে চান, কেননা বৃহদ্দেশীতে মালবকৈশিককেও মধ্যমগ্রাম থেকে সৃষ্ট বলা হয়েছে। তাঁরা আরো বলেন যে, কৈশিক বা কৈশিকীরাগের যখন মালবদেশে প্রচলন ছিল তখনি মালবের নামানুসারে কৈশিককে 'মালবককৈশিক' বা মালবদেশ থেকে উৎপন্ন কৈশিক বলা হোত। কিন্তু এ'রকম মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।[১৯] ভরত ২য়-৩য় খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর নাট্যশাস্ত্রে আঠারটী জাতিরাগের উল্লেখের প্রসঙ্গে কৈশিক বা কৈশিকী এবং ষড়্‌জকৈশিকী এই দুটী জাতি, জাতিগান বা জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য নারদীশিক্ষায় পাওয়া যায় যে, সঙ্গীতশাস্ত্রী ঋষি কশ্যপের মতে কৈশিক এবং কৈশিকমধ্যম এ'দুটী 'রাগ'। টীকাকার ভট্টশোভাকর এদের 'গ্রামরাগ' বলেছেন —"কৈশিকমধ্যমো গ্রামরাগো ভবতীতি"। ঋষি কশ্যপ ভরতেরও পূর্ববর্তী গ্রন্থকার, কেননা ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ঋষি কশ্যপের নামোল্লেখ করেছেন একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

'মালব' বা 'মালবী' নামে একটী প্রাচীন রাগেরও নাম প্রামাণিক সঙ্গীতগ্রন্থে পাওয়া যায়। জাতিরাগ 'কৈশিক' থেকে মালবকৈশিকরাগের উৎপত্তি একথা বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। মালবকৈশিক গ্রামরাগ ও মার্গরাগ দুইই। মালবদেশ থেকে অথবা মালব বা মালবীর সংমিশ্রণে মালবকৈশিকের সৃষ্টি মোটেই হয় নি ; কৈশিক বা কৈশিকী একটী ভিন্ন রাগ ও

১৯। আমরা পরে অন্যত্র মালবকৈশিক বা মালবকৌশিকরাগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

মালবকৈশিকও তা থেকে একটা আলাদা রাগ। ভরত, কোহল, কশ্যপ, দুর্গাশক্তি এঁরা সকলেই কৈশিকরাগের পরিচয় দিয়েছেন। মালবকৈশিকের মতন 'কৈশিক' নামাঙ্কিত আরো অনেক রাগ আছে, যেমন—ষড্‌জকৈশিক, ঠক্ককৈশিক, গৌড়কৈশিক, কৈশিকপঞ্চম, ভিন্নকৈশিক প্রভৃতি। বৃহদ্দেশীকার তাই উল্লেখ করেছেন—"বিভিন্নকৈশিকে হি" প্রভৃতি।

'কৈশিকমধ্যম' রাগের উল্লেখ বৃহদ্দেশীতেও পাওয়া যায়। যেমন মতঙ্গ বলেছেন—"শুদ্ধকৈশিকমধ্যমো রাগঃ ষড্‌জগ্রামসম্বন্ধঃ" (পৃ° ৮৬)। কিন্তু তিনি কৈশিককে আবার মধ্যমগ্রামের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত বলেছেন—"শুদ্ধকৈশিকো নাম মধ্যমগ্রামসম্বন্ধঃ"। নারদীতে কৈশিকমধ্যমকে স্পষ্টভাবে মধ্যমগ্রাম থেকেই উৎপন্ন বলা হয়েছে। বৃহদ্দেশীকার (পৃ° ৯৮) মালবকৈশিক সম্বন্ধে বলেছেন :

কৈশিকীজাতিসম্ভূতিঃ ষড্‌জাংশন্যাসসংযুতঃ।
দুর্বলো ধৈবতেন স্যাদ্ রাগো মালবকৈশিকঃ॥

অর্থাৎ মালবকৈশিক মধ্যমগ্রাম থেকে উৎপন্ন অথবা মধ্যমগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কৈশিকীজাতি থেকে উৎপন্ন, ষড়জ গ্রহ ও অংশ স্বর, ধৈবতের ব্যবহার অল্প, কাকলিনিষদের ব্যবহার, বিপ্রলম্ভে ও শৃঙ্গাররসে প্রয়োগ, বীর প্রভৃতি রসেরও প্রকাশ থাকবে, ষড্‌জাদি মূর্ছনা, আরোহী-বর্ণ, প্রসন্নমধ্যম অলংকার প্রভৃতি। শার্ঙ্গদেব গান বা ধ্যানের সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরের রাগবিবেকাধ্যায়েও ঠিক এই ধরণের মালবকৈশিকের রূপের পরিচয় দিয়াছেন,

চন্দ্রাভরণং হব নীলকণ্ঠমহিবলয়, ত্রিপুরহরং মৃগাঙ্কনয়নং,
গিরিনিলয়ং, নমত সদা মদনাঙ্গ হরম্।

মালবকৈশিক সম্পূর্ণজাতি এবং কৈশিক অথবা শুদ্ধকৈশিক ষাড়বজাতির রাগ, সুতরাং কৈশিক অথবা কৈশিকীকে মালবকৈশিকের অভিন্ন রূপ বা কৈশিকীরাগ মালবদেশের সংস্পর্শে এসে মালবকৈশিকরূপে পরিচিত এ'রকম মনে করার কোন কারণ নেই।

এ'ছাড়া নারদীর ৩য় কণ্ডিকার ৫ ১১ শ্লোকগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ৮ম শ্লোকে ষড্‌জগ্রাম, ৯ম শ্লোকে কৈশিক ও সাধারিত, ১০ম শ্লোকে কৈশিকমধ্যম, ১১শ শ্লোকে মধ্যমগ্রাম, ও ৫ম শ্লোকে মধ্যমরাগ ও ষাড়বের উল্লেখ আছে। এগুলি আসলে রাগ কিনা তার উল্লেখ নারদীতে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলেও বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ ৩২১ শ্লোকের অর্থে কশ্যপ ও ভরতের যে

দুটী প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয়। প্রমাণবাক্য দুটির ভেতর প্রথমটী কশ্যপের—

ষাড়বে মধ্যমগ্রামে পঞ্চমং ককুভস্তথা।
ষড়্জে সাধারিতশ্চৈব তথা কৈশিকমধ্যমঃ॥

দ্বিতীয়টী ভরতের, যদিও ভরত প্রামাণিক প্রাচীন গ্রন্থকার ব্রহ্মার মতবাদেরই নামোল্লেখ করেছেন,

মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
গর্ভে সাধারিতশ্চৈবাবমর্শে * * তু পঞ্চমঃ॥ প্রভৃতি

তবে কথা এই যে, কশ্যপের মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া কঠিন, কিন্তু মুদ্রিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এই শ্লোকগুলির কোন সন্ধান মেলে না। তবে একথা সত্য যে, মতঙ্গ কশ্যপ ও ভরতের নামে প্রমাণবাক্য দুটি উদ্ধৃত করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, ভরত ব্রহ্মার মতবাদকে যখন নজির-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন তখন ব্রহ্মার নিজস্ব একটি মতবাদ যে ছিল তা ভরতের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া মতঙ্গ ভরতের মতবাদের উল্লেখ ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, মধ্যমগ্রাম, ষড়্জগ্রাম, ষড়্জ, সাধারিত, পঞ্চম, কৈশিক, ষাড়ব, কৈশিকমধ্যম প্রভৃতি 'রাগ' তথা গ্রামরাগ। সুতরাং একথা সত্য যে, শুধুই নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময়ে নয়, নারদীশিক্ষাকার নারদের সময়েও ভারতীয় সমাজে রাগের সৃষ্টি ও রাগরূপের অনুশীলন'ছিল।

তৃতীয় কণ্ডিকার ১১শ শ্লোকে নারদীকার 'গান্ধর্ব' শব্দটীর পরিচয় দিয়েছেন শব্দগত অর্থের বিচার ক'রে। তিনি বলেছেন, 'গান্ধর্ব' বল্‌তে গান ও বেণুর্ সংমিশ্রণে যে সঙ্গীত—তাই: "গ-শব্দেন গানং লক্ষ্যতে, ধ-কারেণ ব-কারেন বৈণিকস্য প্রবাদনম্"। অবশ্য নৃত্যের ইঙ্গিত এখানে নাই, মাত্র গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে। 'গান'-শব্দে মার্গগান বা জাতিরাগ ও গ্রামরাগদের অনুশীলন, লৌকিক দেশীগানের নয়। বেণু ও বীণার ইঙ্গিত জাতিরাগ > গ্রামরাগ > রাগের প্রাচীনতাকেই লক্ষ্য কর্‌ছে।

'গান্ধর্ব' শব্দ বা বিষয়টী নিয়ে শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরের ৪র্থ প্রবন্ধাধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি 'গীতি' শব্দটীর পরিচয় দিয়ে গান্ধর্ব ও গানের প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন এবং গান্ধর্ব ও গানকে সমষ্টিভাবে 'গীতি' নামে অভিহিত করলেও গান্ধর্ব ও গান যে একই শ্রেণীর

সঙ্গীত নয়, সে-সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত করেছেন—"গান্ধর্বং গানমিত্যস্য ভেদদ্বয়মুদীরিতম্"। 'গান্ধর্ব' বল্‌তে বৈদিকোত্তর (সামগানের পরবর্তী) মার্গ-সঙ্গীত ও 'গান' বল্‌তে সর্বসাধারণের প্রীতিকারক দেশী-সঙ্গীত বুঝায়। শার্ঙ্গদেব তাই উল্লেখ করেছেন,

অনাদিসংপ্রদায়ং যদ্ গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতুস্তদ্‌গান্ধর্বং জগুর্বুধাঃ॥
যত্তু বাগ্গেয়কারেণ রচিতং লক্ষণান্বিতম্।
দেশীরাগাদিষু প্রোক্তং তদ্‌গানং জনরঞ্জনম্॥

টীকাকার কালিনাথ (পৃ° ২৭১) এ'সম্বন্ধে বলেছেন—"গন্ধর্বং মার্গঃ। গানং তু দেশীত্যবগন্তব্যম্"। গান্ধর্বকে বৈদিকত্বের কৌলিন্য ও সম্মান দেওয়া হয়, কারণ মার্গ-সঙ্গীত বৈদিক সঙ্গীতের মালমশলা ও নিয়ম-নীতি নিয়ে রচিত, শার্ঙ্গদেবও তাই "অনাদিসংপ্রদায়ং" শব্দটী গান্ধর্বের উদ্দেশে ব্যবহার করেছেন। "অনাদিসংপ্রদায়ং" বল্‌তে কালিনাথ বলেছেন: "গন্ধর্বস্য বেদবদপৌরুষেয়ত্বমিতি সূচিতং ভবতি"। টীকাকার সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন: "তস্য গীতস্য গান্ধর্বং গানমিতি ভেদদ্বয়মুক্তং ভরতাদিভিঃ"। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত প্রভৃতিও গান্ধর্ব ও গানের পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। পণ্ডিত সিংহভূপাল "অনাদিসংপ্রদায়ং" কথাটির অর্থ করেছেন: "গুরুশিষ্যপরম্পরয়া পরিজ্ঞানম্, তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্; শ্রেয়স ঐহিকসুখস্য স্বর্গাপবর্গরূপস্য হেতুঃ কারণম্"।

পণ্ডিত সিংহভূপালের টীকায় শ্লোকে অন্তর্নিহিত রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে বোলে মনে হয়। আমরা সাধারণতঃ বলি যে, বৈদিক সামগান আবৃত্তিমূলক (chanting), তাতে মেল, রাগ, গ্রহ, অংশ, মূর্ছনা প্রভৃতির বালাই ছিল না, কেননা তার সুচিন্তিত ও প্রমাণযোগ্য কোন ইতিহাস আমাদের চোখে এখনো-পর্যন্ত পড়েনি। কথাটী মোটেই সত্য নয়, কেননা লিখিত ইতিহাস না থাকলেই যে বস্তু বা ঘটনার অস্তিত্ব লোপ পাবে এটী চিন্তা করা সমীচীন নয়। বরং সিংহভূপালের "অনাদিমান্যো যঃ সংপ্রদায়ো গুরুশিষ্যপরংপরয়া পরিজ্ঞানম্, তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্" কথাগুলি ভেতর থেকে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, বৈদিকোত্তর মার্গ-সঙ্গীত সাম-সঙ্গীতের (সামগান) মালমশলা ও নিয়মকানুনকে ভিত্তি ক'রে রচিত

এবং সাম-সঙ্গীতের সঙ্গে মার্গ-সঙ্গীতের যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে বিধিবৎ অনুশীলনের মধ্যে। অবশ্য লোকপরম্পরায় কোন জিনিসের প্রবর্তন ও অনুশীলন হোলেই পরবর্তী ধারার কিছু-না-কিছু বা অধিকাংশভাবে পরিবর্তন ও সংযোজন হোয়ে থাকে সত্য, কিন্তু তাহলেও মূলরূপের বা মূলবস্তুর কখনই পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং একথা ঠিক যে, পরবর্তী মার্গ-সঙ্গীতে যদি আমরা মেল, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, মূর্ছনা প্রভৃতির ব্যবহারের উল্লেখ পাই তবে মার্গ-সঙ্গীতের পূর্বরূপ যে বৈদিক সাম-সঙ্গীত তাতে এ'সকলের ব্যবহার ছিল একথা অনুমান করতে পারি। আর তাহলে বৈদিকগান যে বর্তমান কালের মতন সঙ্গীতশ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ তাকেও ভরতোত্তর যুগের সঙ্গীতের কৌলিন্য ও পদবী আমরা দিতে পারি সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

নাট্যশাস্ত্রে ভরতও গান্ধর্বগানের পরিচয় দিয়েছেন এবং রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল সে-কথার উল্লেখ করেছেন। গান্ধর্বের পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন (২৮।৮): "গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্", অর্থাৎ স্বর, তাল ও পদ অথবা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অপর নাম 'গান্ধর্ব'। ভরতোত্তর কালে সঙ্গীতশাস্ত্রীরা সঙ্গীতের পরিচয় দিতে গিয়ে যেমন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়কে সঙ্গীত বলেছেন—"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে",[২০] নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও তেমনি গান্ধর্বের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—গান্ধর্বসঙ্গীত স্বর, তাল ও পদের আশ্রয়। কিন্তু তিনি প্রত্যেকটীকেই আবার গান্ধর্ব নামেও অভিহিত করেছেন—"গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্" (২৮।১২)। এই স্বর, তাল ও পদ বল্‌তে কি বুঝায় সে-সম্বন্ধে তিনি নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ের ১৪-১৮ শ্লোকগুলিতে বর্ণনা করেছেন।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন, গন্ধর্বদের প্রিয় বোলে বৈদিকোত্তর মার্গ-সঙ্গীত 'গান্ধর্ব' নামে পরিচিত। সেই গান্ধর্বগান দেবতাদের কল্যাণ ও প্রীতিকর ছিল—"অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ" (২৮।৯)। কিন্তু আসলে গান্ধর্ব-সঙ্গীতের মূল উৎস হোল গান, বীণা ও বংশ বা বেণু। 'গান' বল্‌তে বুঝায় বৈদিক সামগান। বীণা ও

২০। Cf. সঙ্গীতরত্নাকর ১।২১

বেণু[২১] বৈদিক বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন সঙ্গীত-সাহিত্যে সামগানকে বুঝাবার জন্যে কখনো কখনো 'বীণা' অথবা 'বেণু' (?) শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরাও স্বীকার করেছেন যে, বৈদিক গান থেকে মার্গ-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য 'গান' বলতে পরবর্তীকালে সর্বদাই দেশী-সঙ্গীতকেই বুঝিয়েছে, কেননা শার্ঙ্গদেব ও অন্যান্য পরবর্তী সঙ্গীতকারেরাও গান্ধর্বকে মার্গ ও গানকে দেশী সঙ্গীতের পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু "অস্য যোনির্ভবেদ্গানং" কথাগুলির ভেতর 'গানং' শব্দটী নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ব্যবহার করেছেন বৈদিক সামগানের পরিবর্তে। শিক্ষাকার নারদ ৪র্থ কণ্ডিকার প্রথম শ্লোকে গানকে 'দেশী'-পর্যায়ে ফেলেছেন দেখা যায় এবং 'বেণু' সেখানে দেশী-সঙ্গীতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

নারদীশিক্ষার পরবর্তী শ্লোকদুটি সঙ্গীত-জগতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কেননা নারদ এমন একটী সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈদিক ও লৌকিক সঙ্গীত-দুটীর মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছেন যা সঙ্গীতের ইতিহাস একটী মূল্যবান উপাদান ও চিরস্মরণীয় জিনিস। নারদ উল্লেখ করেছেন,

> য সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।
> যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ॥
> চতুর্থঃ ষড্‌জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ।
> ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥

সামগরা সামগান করতেন, তাতে তিন অথবা চার স্বরই থাকৃত না, পরন্তু পাঁচ, ছয়, ও সাত স্বরের সমাবেশ ছিল এ'বিষয় আমরা আলোচনা করেছি। নারদীশিক্ষাকার নিজেও স্বীকার করেছেন, যদিও শাখাভেদে গানে স্বরের বিভিন্ন সংখ্যা ব্যবহার হোত। সামপ্রাতিশাখ্যকার পুষ্পর্ষি সেকথা স্বীকার করেছেন। সামগানের সাত স্বর ছিল: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র,

২১। প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থে এবং ব্রাহ্মণাদি বৈদিক সাহিত্যে 'বেণু' ও 'বীণা' এই দুটী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। এক্ষণে গবেষণার বিষয় যে, এই দুটী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টী সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অনেকে বেণু বংশ বা বাঁশীকে (lute or pipe) প্রাচীনতার সম্মান দেন, আবার অনেকের মতে বীণাই আদি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র। সুপ্রাচীন সিন্ধু উপত্যকায় বেণু ও বীণা দু'রকম বাদ্যযন্ত্রই পাওয়া গেছে, সুতরাং এ'থেকে প্রমাণ হয় যে, আজ থেকে অন্ততঃ ৬০০০ হাজার বছর আগে বেণু ও বীণার প্রচলন ছিল। তবে প্রাচীন দুটী বাদ্যযন্ত্র বেণু ও বীণার মধ্যে কোন্‌টী বেশী প্রাচীন তা যে গবেষণার জিনিস আমরাও স্বীকার করি।

অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট। অন্যান্য সাত স্বরের নামও আমরা আগে আলোচনা করেছি। শিক্ষাকার নারদ বৈদিক ও লৌকিক এই দুটী শ্রেণীর গানের সাত স্বরের উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি লৌকিক গান নিয়ে যত বেশী আলোচনা করেছেন ততটুকু বৈদিক গান নিয়ে করেন নি, কিন্তু তাই বোলে তার অর্থ এই নয় যে, বৈদিকগানকে তিনি অবহেলা করেছেন। তাঁর সময়ে সমাজে লৌকিক গানের প্রচলন ও সমাদর বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৈদিকগান ছিল সীমাবদ্ধ যাজ্ঞিক সামগ-সম্প্রদায়ের ভেতর। আর একথা আমরা আলোচনা করেছি যে, দেশী-সঙ্গীতের প্রচলন বৈদিক যুগেও ছিল সাম-সঙ্গীতের পাশেপাশে, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ ও পরিচয় পাই বৈদিক অরণ্যেগেয়গান ও গ্রামেগেয়গানের মধ্যে। গ্রামেগেয়গানই পরে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত রূপ নিয়ে লৌকিক গান্ধর্বে ও গানে তথা মার্গ-সঙ্গীতে ও দেশী-সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একথাও সহজে অনুমান করা যায়, বৈদিক সাত স্বর প্রথমাদির সমসাময়িক লৌকিক সাত স্বর ষড়্জাদির প্রচলন ছিল। তবে একথা ঠিক যে, উভয়ের মধ্যে ঠিক কোন যোগসূত্র ছিল না, উভয়েই ছিল সমান্তরাল রেখার মতন প্রসারিত। নারদের কৃতিত্ব হোল সেই যোগসূত্রের রচনায় বা প্রতিষ্ঠায়। তিনি উভয়কেই গণ্য করেছিলেন সমগোত্রীয় হিসাবে। উভয়ের মধ্যে একটী মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন ক'রে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানী ক্ষেত্রকে চির-অব্যাহত রাখ্‌তে মনস্থ করেছিলেন। তাই বৈদিক ও লৌকিক এই দুটী শ্রেণীর সঙ্গীতের স্বরগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ বা উচ্চারণগত একটী সামঞ্জস্যের তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি 'বেণু' বল্‌তে লৌকিক সঙ্গীতকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন: সামগদের যেটী প্রথম স্বর, লৌকিকগানে সেটী মধ্যম স্বর, অর্থাৎ বৈদিকের প্রথম স্বরের কম্পনসংখ্যা ও ধ্বনির সাম্য আছে লৌকিকের মধ্যম স্বরের সঙ্গে। সেরকম দ্বিতীয়ের সঙ্গে গান্ধারের, তৃতীয়ের সঙ্গে ঋষভের, চতুর্থের সঙ্গে ষড়্জের, পঞ্চমের সঙ্গে ধৈবতের, ষষ্ঠের সঙ্গে নিষাদের ও সপ্তমের সঙ্গে পঞ্চমের স্বর ও উচ্চারণগত ঐক্য আছে। পরবর্তীকালে বেদভাষ্যকার সায়ণও একবার এই কল্যাণ-প্রচেষ্টায় ব্রতী হ'য়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উভয় শ্রেণীর স্বারগত ঐক্য ছিল অন্য রকম। তবে তাঁর নির্ণয়ের পিছনে কি ধরণের প্রামাণিক নজির ও যুক্তি ছিল তার কোন উল্লেখ তিনি করেন নি। নারদ ও সায়ণের স্বরনির্ণয় যেমন,

সংখ্যা	সামগানের স্বর	নারদ-নিরূপিত স্বর	সায়ণ-নির্ণিত স্বর
৭	ক্রুষ্ট	পঞ্চম	নিষাদ
১	প্রথম	মধ্যম	ধৈবত
২	দ্বিতীয়	গান্ধার	পঞ্চম
৩	তৃতীয়	ঋষভ	মধ্যম
৪	চতুর্থ	ষড্‌জ	গান্ধার
৫	মন্দ্র	ধৈবত	ঋষভ
৬	অতিস্বার্য	নিষাদ	ষড্‌জ

চারটী বেদেরই ছিল শাখা-প্রশাখা এবং তাদের মধ্যে রুচি, মন্ত্রের প্রয়োগ, গান ও কার্যকলাপভেদে মতভেদও সৃষ্টি হয়েছিল অনেক এবং হওয়াও স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, ঋগ্বেদের অনুগামীদের সঙ্গে সামবেদীদের, অথবা এক বেদের পথচারীদের সঙ্গে অন্য বেদের নিয়মপন্থীদেরও হয়েছিল মতের অনৈক্য। সামবেদীদের সামগান-সম্বন্ধে সে-রকম ঋগ্বেদীদের কাছে অনেক নিন্দা ও সমালোচনাই শোনা যায়। পরবর্তীকালে ঋগ্বেদ-অনুগামীদের কানে সামগান শোনাতো শৃগাল কুকুর পেচক ও গাধা প্রভৃতির ডাকের মতন। সামগানকে ঋগ্বেদীরা কান্নার সুরের মতন, অথবা পূতিগন্ধযুক্ত বলতেও পশ্চাদপদ হোত না। আপস্তম্বধর্মসূত্রকার তাঁর গ্রন্থের ১০ম খণ্ডের ১৯—২৯ শ্লোকগুলিতে একথারই উল্লেখ করেছেন এবং টীকাকার পণ্ডিত হরদত্ত মিশ্র তাঁর 'উজ্জ্বলা' ব্যাখ্যায় আরো পরিষ্কারভাবে তা প্রকাশ করেছেন। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ ও গণ্ডোগোলেব কাহিনী সকল যুগের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। আপস্তম্বধর্মসূত্রকার বলেছেন,

(ক) "শ্বগর্দভনাদাস্সলাবৃক্যেকস্বকোলূকশব্দাস্স´বৈ বাদিতশব্দা রোদন-গীতসামশব্দাশ্চ"।১৯

আচার্য হরদত্ত উজ্জ্বলায় এই সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন: "* * স এবায়ং বিকৃতঃ প্রযুক্তঃ। একস্বকঃ একচরস্সৃগালঃ। উলূকো দিবাভীতঃ। এতেষাং চ শব্দাঃ। বাদিতানি বাদিত্রাণি বীণাবেণুমৃদঙ্গাদীনি। তেষাং চ সর্বে শব্দাঃ রোদনশব্দা গীতশব্দাস্সামশব্দাশ্চ, এতে শ্রূয়মাণা অনধ্যায়স্য হেতবঃ।" (খ) আপস্তম্বকার আবার ২০-শ সূত্রে উল্লেখ করেছেন: "শাখান্তরে চ সাম্নামনধ্যায়ঃ"। উজ্জ্বলাকার লিখেছেন: "বেদান্তরস্য সকাশে সাম নাধ্যেয়ম্, 'গীতিষু সামাখ্যা'। তদ্যোগাদ্বেদবচনস্সামশব্দ ইত্যন্যে"।[২২] এখানে 'শাখান্তরে' অর্থে 'অন্যশাখা' তথা 'ঋগ্বেদ' ('বেদান্তরস্য')। সামগানে 'বাদিত্রাণি'—বাদ্যযন্ত্র হিসাবে 'বীণাবেণুমৃদঙ্গাদীনি'—বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গাদির ব্যবহার হোত, কিন্তু ঋগ্বেদীদের কানে তা সুমধুর না হোয়ে কর্কশ বোধ হোত, রোদনের শব্দের ন্যায়, শৃগাল উলূক বা পেচক, (গ) 'ছর্দয়িত্বা স্বপ্নান্তম্' (২২ শ্লোঃ)—বমনের ন্যায়, (ঘ) 'পূতিগন্ধঃ' (২৪ শ্লোঃ)—দুর্গন্ধযুক্ত, (ঙ) 'শুক্তং চাত্মসংযুক্তম্' (২৫ শ্লোঃ)—উদ্গার-শব্দের মতন মনে হোত এবং এই নিন্দনীয় সামগান হোলে তাদের (ঋগ্বেদীদের) বেদাধ্যয়ন স্থগিত থাকৃত অকল্যাণজনক লক্ষণের জন্যে।

অবশ্য মনে রাখ্‌তে হবে যে, সামগান-সম্বন্ধে এ'রকম বিরূপ মন্তব্য সৃষ্টি হয়েছিল ঋগ্বেদীদের ভেতর—চতুর্বর্ণের মধ্যে যখন কর্মবিভাগের বেশ কড়াকড়ির ভাব ছিল এবং ধর্মসূত্রকার আপস্তম্ব নিজেই তার পরিচয় দিয়েছেন—"সর্ববর্ণানাং সাধারণবৈশেষিকা ধর্মাঃ" (২৫।২।১০।১) শ্লোকে এবং হরদত্ত মিশ্র আরো পরিষ্কার কোরে বলেছেন—"অধ্যয়নাদয়ঃ ত্রয়াণাং, অধ্যাপনাদয়ো ব্রাহ্মণস্য, যুদ্ধাদয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য, কৃষ্যাদয়ো বৈশ্যস্য, শুশ্রূষা শূদ্রস্য". ব্রাহ্মণ্যযুগের গোঁড়ামির পদার্পণ ঘটেছে তখন ভারতীয় আর্যসমাজে, নচেৎ সামগানের মতন পবিত্র গানকে এভাবে বিদ্রূপের চক্ষে কখনই ঋগ্বেদীরা অথবা বেদের অন্যান্য শাখাসেবীরা দেখ্‌তেন না। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্যে বৈদিক গান সামগানের মহিমা ও মাধুর্য কোনদিনই ভারতবর্ষের কেন, বিশ্বের ইতিহাসে ম্লান হবে না, ম্লান করাও ধর্মসূত্রকার ঋষি আপস্তম্বের উদ্দেশ্য নয়।

২২। Cf. 'আপস্তম্বধর্মসূত্রম্' (উজ্জ্বলাখ্যব্যাখ্যয়া হরদত্তমিশ্রবিরচিতয়া সহিতম্, *Bibliothica Sanskrita—No. 15*, মহিশূর, ১৮৯৮), পৃ ১৬—১৭

তিনি কেবল ক্রমবিবর্তমান সমাজের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গিরই নিদর্শন দিয়েছেন। নচেৎ "খগর্দভনাদাস্" প্রভৃতি শ্লোকগুলির মারফতে সপ্তস্বর ও অলংকারযুক্ত বৈদিক সামগানের কোন-কিছু রহস্যেরই উদ্‌ঘাটন করা হয় নি কিংবা তার বিকাশের ইতিহাসে কোন আলোকপাত করাও সম্ভব হয় নি।

এরপর শিক্ষাকার নারদ সামস্বর ও লৌকিক স্বর এ'দুটার মধ্যে ধ্বনিগত ঐক্য দেখিয়ে ষড়্‌জাদি সাত স্বরের বিকাশের বা জন্মকাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন পশুপক্ষীদের ধ্বনির অন্তিম সূক্ষ্মরেতে ষড়্‌জাদি সাত স্বরের বিকাশ রয়েছে। যেমন,

ষড়্‌জং বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভন্তি চর্ষভম্।
অজাবিকে তু গান্ধারং ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলা বক্তি পঞ্চমম্।
অশ্বস্তু ধৈবতং বক্তি নিষাদো বক্তি কুঞ্জরঃ॥

নারদের এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রাণবায়ু শরীরের বিভিন্ন সন্ধিস্থানকে অতিক্রম করার সময় ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি বা স্বর সৃষ্টি করে। ষড়্‌জাদি স্বরও বাতাসের দ্বারা আহত হোয়ে শরীরের ভেতর থেকে নির্গত হয়। পরবর্তীকালে অনুসন্ধিৎসু সঙ্গীতসাধকগণ ষড়্‌জাদি স্বরের ধ্বনিগত সাম্য পশুপক্ষীদের স্বরের মধ্যে পেয়েছিলেন ও সেই ধ্বনি বা স্বরসাম্য লক্ষ্য ক'রেই সাত স্বরের সৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতির প্রজা পশুপক্ষীদের নামের যোগসূত্র রচনা করেছেন। মাণ্ডুকীশিক্ষা আলোচনার সময়েও আমরা এ'কথার উল্লেখ করেছি। সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীদের পর্যবেক্ষণপ্রণালীকে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায়। বিজ্ঞানের রীতি ও কর্তব্য হোল : জাগতিক সকল জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কারণকে নির্ণয় করা আর চাক্ষুষ বা প্রত্যক্ষরূপ পর্যবেক্ষণ ও অনুমাণই তাদের সিদ্ধান্তের পক্ষে মাধ্যম। তাঁরা নিশ্চয়ই পশুপক্ষীদেব ধ্বনির অন্তিম স্বরের সঙ্গে ষড়্‌জাদি সাত স্বরের ধ্বনিসাদৃশ্য ও সাম্য অনুভব করেছিলেন ও সেই অনুভব করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়েই তাঁদের গ্রন্থে সে-তত্ত্ব স্বীকার করেছেন।

অন্যান্য শিক্ষাকারের মতন নারদ আবার কণ্ঠ থেকে ষড়্‌জের, শির থেকে ঋষভের, নাসিকা থেকে গান্ধারের, উরু থেকে মধ্যমের, উরু, শির ও কণ্ঠ এই তিন স্থান থেকে পঞ্চমের, ললাট থেকে ধৈবতের ও সর্বসন্ধি থেকে নিষাদের

উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছেন। নারদের বর্ণনার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে কিনা শরীরবিজ্ঞানবিদেরা তা নির্ণয় করবেন, তবে আমাদের কাছে আপাতত এটা কল্পনা বোলেই মনে হয়। নারদীশিক্ষার ৪র্থ কণ্ডিকার ৭-১২ শ্লোকগুলিতে নারদ সাতস্বরের জন্মরহস্যের যে পরিচয় দিয়েছেন তাকেই অনেকটা বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি, যদিও ললাট থেকে ধৈবতের সৃষ্টিকথা একটু অসম্ভব বোলে মনে হয়। মাণ্ডুকীশিক্ষাকারও নারদীর এ-বর্ণনা সমর্থন করেছেন।

শিক্ষাকার নারদ (পৃ: ৪০৮) উল্লেখ করেছেন,

> নাসাং কণ্ঠমুরস্তালুজিহ্বাদন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ।
> ষড়্ভিঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ॥
> বায়ুঃ সমুত্থিতো নাভেঃ কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ।
> নর্দত্যৃষভবদ্‌যস্মাৎ তস্মাদৃষভ উচ্যতে॥
> বায়ুঃ সমুত্থিতো নাভেঃ কণ্ঠশীর্ষসমাহতঃ।
> নাসা গন্ধাবহঃ পুণ্যো গান্ধারস্তেন হেতুনা॥
> বায়ুঃ সমুত্থিতো নাভেরুরোহৃদিসমাহতঃ।
> নাভিং প্রাপ্তো মহানাদো মধ্যমত্বং সমশ্নুতে॥
> বায়ুঃ সমুচ্ছ্রিতো নাভেরুরোহৃৎকণ্ঠশিরোহতঃ।
> পঞ্চস্থানোত্থিতস্যাস্য পঞ্চমত্বং বিধীয়তে॥
> ধৈবতং চ নিষাদং চ বর্জয়িত্বা স্বরদ্বয়ম্।
> শেষাৎ পঞ্চস্বরাংশ্চান্যান্ পঞ্চস্থানোচ্ছ্রিতান্ বিদুঃ॥৭—১২

নাসা, কণ্ঠ, উর, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছ'টী স্থানে বাতাস আহত হোয়ে স্বর সৃষ্টি ক'রে বোলে তার নাম 'ষড়্জ'। বায়ু নাভি থেকে উত্থিত হোয়ে কণ্ঠ ও শীর্ষে আঘাত করায় ঋষভ বা বৃষের মতন ধ্বনি উত্থিত হয় বোলে তার নাম 'ঋষভ'। নাভিদেশ থেকে বাতাস উত্থিত হোয়ে কণ্ঠ ও শীর্ষদেশে আহত হয় এবং সেজন্যে বিচিত্র পবিত্র গন্ধের সৃষ্টি করে বোলে সে-ধ্বনির নাম 'গান্ধার'। নাভি থেকে বাতাস উত্থিত হোয়ে উর ও হৃদয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু নাভি থেকে ধ্বনির সৃষ্টি হওয়ার জন্যে মহানাদ বা গভীর শব্দ হয়, সেই শব্দের নাম 'মধ্যম'। বায়ু নাভিদেশ থেকে উঠে নাভি, উর, হৃদয়, কণ্ঠ, শির এই পাঁচস্থানে আহত হওয়ায় শব্দের নাম 'পঞ্চম'।

ধৈবত ও নিষাদ দুটী স্থান ব্যতীত আর পাঁচটী স্থানে আহত হোয়ে স্বর সৃষ্টি করে।

নারদীশিক্ষাকার সাতটী লৌকিক স্বরের দেবতা এবং ঋষিদেরও নামোল্লেখ করেছেন। দেবতা ও ঋষিরা স্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ষড্‌জ ও ঋষভের অধিপতি অগ্নি, গান্ধারের সোম বা চন্দ্র, মধ্যমের বিষ্ণু, পঞ্চমের নারদ এবং ধৈবত ও নিষাদের তুম্বুরু। অধ্যাত্ম-ভূমি ভারতবর্ষে সমস্ত জিনিসকেই পবিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়, অধিপতি হিসাবে দেবতার কল্পনা ঐ পবিত্রতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

নারদীর পঞ্চম কণ্ডিকা আরম্ভ হয়েছে 'দারবী' ও 'গাত্রবীণা'-র প্রসঙ্গ নিয়ে। শিক্ষাকার নারদ এই দুটী ছাড়া তাঁর গ্রন্থে অন্য কোন রকম বীণার নামোল্লেখ করেন নি। এই বীণা-দু'টীর ভেতর 'গাত্রবীণা' সামগানে ব্যবহৃত হোত। যেমন,

> দারবী গাত্রবীণা চ দ্বে বীণে গানজাতিষু।
> সামিকী গাত্রবীণা তু তস্যাঃ শৃণুত লক্ষণম্ ॥
> গাত্রবীণা তু সা প্রোক্তা যস্যাং গায়ন্তি সামগাঃ।
> স্বরব্যঞ্জনসংযুক্তা অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠরঞ্জিতা ॥

নারদীশিক্ষার পরবর্তী সময়ে ভরতও তাঁর নাট্যশাস্ত্রে 'চিত্রা' ও 'বিপঞ্চী' এই দু'টী বীণার নামোল্লেখ করেছেন—"দ্বাভ্যামপি বীণাভ্যাং গানে বা বাদনে বাপি"। 'চিত্রাবীণা' সপ্ততন্ত্রীবিশিষ্ট ও 'বিপঞ্চবীণা' ন'টীতন্ত্রীযুক্ত। 'চিত্রাবীণা' বাজাবার নিয়ম অঙ্গুলি দিয়ে ও 'বিপঞ্চীবীণা' কোণ (plectrum) দিয়ে বাজানো হোত। যেমন,

> সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপঞ্চী নবতন্ত্রিকা।
> বিপঞ্চী কোণবাদ্যা স্যাৎ চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা ॥

খৃষ্টীয় ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত নারদের সঙ্গীতমকরন্দে (পৃ: ২২) প্রায় উনিশটী বীণার নামোল্লেখ আছে,

> কচ্ছপী কুব্জিকা চিত্রা বহন্তী পরিবাদিনী।
> জয়া ঘোষাবতী জ্যেষ্ঠা নকুলীষ্ঠেতি কীর্তিতা ॥
> মহতী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী রৌদ্রী কূর্মী চ রাবণী।
> সারস্বতী কিন্নরী চ সৌরন্ধ্রী ঘোষকা তথা ॥

অর্থাৎ কচ্ছপী, কুব্জিকা, চিত্রা, বহন্তী (?), পরিবাদিনী, জয়া, ঘোষাবতী, জ্যেষ্ঠা, নকুলী, মহতী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মী, রৌদ্রী, কূর্মী, রাবণী, সারস্বতী, কিন্নরী, সৌরন্ধ্রী, ঘোষকা প্রভৃতি। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে এগারো রকম বীণার নামোল্লেখ করেছেন,

তন্ত্রেদাস্বেকতন্ত্রী স্যান্নকুলশ্চ ত্রিতন্ত্রিকা।
চিত্রা বীণা বিপঞ্চী চ ততঃ স্যান্মত্তকোকিলা ॥
আলাপিনী কিন্নরী চ পিনাকীসংজ্ঞিতা পরা।
নিঃশঙ্কবীণেত্যন্যাশ্চ শার্ঙ্গদেবেন কীর্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রিকা, চিত্রা, নকুল, বীণা, বিপঞ্চী, আলাপিনী, কিন্নরী, মত্তকোকিলা, নিঃশঙ্কবীণা ও পিনাকী।[২৩] তন্ত্রে বীণার উল্লেখ ক'রে ডাঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার তাঁর সঙ্গীতের সাহিত্যক্রমপঞ্জিকার প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"Of the 32 Yamalatantras, some treat music and the passages are worth quotation. Among the Sakteyatantras, Uddisamahodayam is valuable and in it we find a succinct description of 16 musical instruments. * *. Of the 32 Yamalatantras, the 9th. Kalatantra, treats Rasa, Bhava, Natya and Kamasastra, and the 19th. Vinatantra, embraces the whole field of music." [২৪]

যামলতন্ত্রে বীণা সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়েছে,

চতুর্বিধানাং বীণানাং লক্ষণং তন্ত্রিলক্ষণম্।
কিন্নরস্বরযন্ত্রাদিলক্ষণং মেললক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ বার রকম বীণার লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এ'ছাড়া 'উড্ডীশমহামন্ত্রোদয়'-তন্ত্রে ষোলটী অধ্যায়ে ষোলরকম বাদ্যযন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই ষোলরকম যন্ত্রের নাম—তালনিলয়, সল্লরি, পতন, মণ্ডল, ভেরিবিম্ব, হিমিল, থুথুক, মিথকথা, ডমরু, মুরব, অঙ্গুলিস্ফোট, বীণা, আলমনি, রাবণহস্তক, উষ্ণন্ত, ঘোষাবতী, ব্রহ্মক প্রভৃতি। এই প্রত্যেকটী যন্ত্রের আবার বিভিন্ন শ্রেণী বা রূপের পরিচয় পাওয়া যায়।[২৫]

২৩। Cf. (ক) 'সঙ্গীতরত্নাকর' (পুণা সং), পৃ° ৪৮০; (খ) মীরা মিত্র: *Musical Instruments of India* (প্রবন্ধ)—The Sunday *Hindusthan Standard,* Octo. 5, 1952, p. III.

২৪। Cf. *A History of Classical Sanskrit Literature* (1937), p. 841.

২৫। Cf. ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার উল্লেখ করেছেন: "Uddisamahamatrodaya appears

আগম বা তন্ত্র প্রভৃতি সাহিত্যে অথবা দর্শনে সঙ্গীত ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের যে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সে-সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন পুরাণ, আগম ও তন্ত্রে 'গান্ধর্ব' বা সঙ্গীত-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত শ্রীসংহিতায়ও সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। শৈব, পঞ্চরাত্র, শক্তি ও যামলতন্ত্র প্রভৃতিতে এবং উড্ডীনতন্ত্রের ১৮শ অধ্যায়ে ১৮ রকম বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। ৩২ রকম যামল-তন্ত্রের কয়েকটীতে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

"Various Puranas, Agamas and Tantras are devoted for Gandharva. * * Sri-Samhita is referred to by Abhinavagupta to treat of Gandharva at length. Regarding tantras of Saiva, Pancharatra, Sakteya and Yamala, only a portion ot Uddisatantra is available, which has 18 chapters on 18 kinds of musical instruments and it perhaps dealt with whole science. Yamalatantras are 32 in number and several of them of unusual size are devoted to *Gandharva.* These works were once available in Benaras in the library of Kavindracharya Sarasvati and the 32nd Tantra is now extent which gives in 8000 verses contents of all the then known works in Sanskrit." ২৬

১৯ সংখ্যক যামলতন্ত্রটীর নাম 'বীণাতন্ত্র'। বীণাতন্ত্রে উল্লেখ আছে,

একোনবিংশং বীণাখ্যতন্ত্রং লক্ষপ্রমাণকম্।
নাদব্রহ্মানন্দসিদ্ধির্যেন সিদ্ধ্যতি বৈ নৃণাম্॥

*   *   *   *

চতুর্বিধানাং বীণানাং লক্ষণং তন্ত্রিলক্ষণম্।
কিন্নরস্বরযন্ত্রাদিলক্ষণং মেললক্ষণম্॥
ষড়্গীতাদিপ্রকথনমুৎপত্তিস্থানবর্ণনম্।
এবমাদীনি কীর্ত্যন্তে যস্মিন্ তন্ত্রে সহস্রশঃ॥

১৮ সংখ্যক 'কুণ্ডীশ্বরতন্ত্র' এবং ২৮ সংখ্যক 'ত্রোতালতন্ত্র' নাট্য ও বাদ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। যেমন,

to have been a work devoted to the rituals of worship of Siva under the name of Uddisa. As usual with such works * * dealing elaborately with musical instruments, 16 in number in 16 separate chapters".
—*HCSL.*, p. 842.

২৬। Cf. *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society*, Vol. III, July 1928, pp 26—27.

ত্রোতালনামকং তন্ত্রমষ্টাবিংশং সলক্ষকম্।
যস্মিন্ ভরতসর্বস্বং সাক্ষাচ্ছিবমুখোদ্গতম্।
লক্ষণং তালভেদানামঙ্গুষ্ঠোন্মানলক্ষণম্।
মার্গক্রিয়াঙ্গজাতীনাং কলাগ্রহলয়োদ্ভবঃ॥
বাদিসপ্ততালানাং তদ্ভেদানাং চ লক্ষণম্।
বৈনায়িকানামৈশানাং বাগ্‌ভবানাং চ লক্ষণম্।
অন্যেষাং তালকোটীনাং শিবাগমভুবাং তথা।
বিধাত্রিভিন্নলীলানাং যস্মিন্ তন্ত্রে প্রকীর্ত্যতে॥

মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি উল্লেখ করেছেন: "These Yamalatantras are in Kavindra's list, which is not a product of imagination." এ'ছাড়া আরো অনেক গ্রন্থে বীণার বিচিত্র রূপ ও নাম পাওয়া যায় যেগুলি ভারতীয় সঙ্গীতসমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে বিকাশ লাভ করেছিল। সঙ্গীতরত্নাকরের ভাষ্যে ও 'সঙ্গীতরাজ' গ্রন্থে রাণা কুম্ভ বা কুম্ভকর্ণও বংশ তথা বেণুবাদ্যের উল্লেখ করেছেন।[২৭] শিক্ষাকার নারদ মাত্র দুরকম বীণার উল্লেখ করেছেন তা আগেই বলেছি। তিনি দু'রকম বীণা— দারবী ও গাত্রবীণার অনুশীলনের রীতিও বর্ণনা করেছেন। যেমন,

হস্তৌ সুসংযুক্তৌ ধার্যৌ জানুভ্যামুপরিস্থিতৌ।
গুরোরনুকৃতিং কুর্যাদ্ যথাজ্ঞানমতির্ভবেৎ॥
প্রণবং প্রাক্-প্রযুঞ্জীত ব্যাহৃতীস্তদনন্তরম্।
সাবিত্রীং চানুবচনং ততো বৃত্তান্তমারভেৎ॥
প্রসার্য চাঙ্গুলীঃ সর্বা রোপয়েৎ স্বরমণ্ডলম্।
ন চাঙ্গুলীভিরঙ্গুষ্ঠমঙ্গুষ্ঠেনাঙ্গুলীঃ স্পৃশেৎ॥

তারপর কিভাবে মাত্রা-অনুযায়ী হস্ত সঞ্চালন করা উচিত নারদ তারও বর্ণনা দিয়েছেন। ঋক্ ও সাম গান করতে গেলে কিভাবে সময়ের ব্যবধান অনুসরণ করতে হবে তাও উল্লিখিত হয়েছে যে, স্বরোচ্চারণ করার সময়ে

২৭। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি উল্লেখ করেছেন, সঙ্গীতশাস্ত্রী স্বাতি বলেছেন যে, বৈদিক যুগে প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল 'মর্দল' এবং স্তোত্রগানের যুগে মৃদঙ্গ, পণব, দর্দুর প্রভৃতি যন্ত্রের প্রচলন হয়। কিন্তু এ'-সিদ্ধান্ত কতটুকু সমীচীন তা বিচারের বিষয়। মোটকথা বৈদিক যাগযজ্ঞের পর পঞ্চরাত্র এবং শৈবাগম-নির্দিষ্ট সত্র ও অনুষ্ঠানগুলিতে গানের সঙ্গে বিভিন্ন বীণা ও বাদ্যের প্রচলন ছিল। বরং বৈদিক যুগে বীণা, বেণু, দুন্দুভি, কর্করি, বক্রী, শঙ্খ প্রভৃতি ছিল প্রধান বাদ্যযন্ত্র।

শরীরের কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হবে না। গান-অভ্যাসের সময় দ্রুতমাত্রার ব্যবহার হবে, প্রয়োগের সময় মধ্যমাত্রা এবং শিষ্যকে শিক্ষা দেবার সময় বিলম্বিত মাত্রা ব্যবহৃত হবে।

পূর্বে-কথিত বীণার প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিক্ষাকার নারদ দু'রকম বীণার নামোল্লেখ ও বিবরণ দিয়েছেন, অথচ বীণার প্রচলন ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সাহিত্যের যুগে বিশেষভাবে ছিল। ঐতরেয়-আরণ্যকে (৩।২।৫) বীণার বিবরণ সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে, যদিও কত রকমের বীণা তখন ছিল তার কোন উল্লেখ নেই। ঐতরেয়-আরণ্যকে উল্লিখিত আছে : "অথ খল্বিয়ং দৈবীবীণা-ভবতি, তদনুকৃতিরসৌ মানুষী-বীণা ভবতি। যথাস্যাঃ শিরঃ এবমমুষ্যাঃ শিরঃ, যথাস্যা উদরমেবমমুষ্যা অম্ভণম্। যথাস্যৈ জিহ্বা এবমমুষ্যৈ বাদনম্, যথা অস্যাস্তন্ত্রযঃ এবমমুষ্যা অঙ্গুলয়ঃ। যথাস্যাঃ স্বরা এবমমুষ্যাঃ স্বরাঃ, যথাস্যাঃ স্পর্শ এবমমুষ্যাঃ স্পর্শাঃ, যথা হ্যেবেযং শব্দবতী তর্দ্মবতী এবমসৌ শব্দবতী তর্দ্মবতী, যথা হ্যেবেয়ং লোমশেন চর্মণাঽপিহিতা ভবতি এবমসৌ লোমশেন চর্মণাঽপিহিতা। লোমশেন হ স্ম বৈ চর্মণা পুরা বীণা অপিদধতি। স যো হৈতাং দৈবীং বীণাং বেদশ্রুতবদনো ভবতি, ভূমিপ্রাঽস্য কীর্তির্ভবতি যত্র কবচার্যা বাচো ভাষন্তে বিদুরেনং তত্র ইতি"।

সামপ্রাতিশাখ্যে সঙ্গীত আলোচনার সময় আমরা সাঙ্খ্যায়নগৃহ্যসূত্র, জৈমিনীযব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ প্রভৃতি থেকে নজির তুলে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, বেদ ও ব্রাহ্মণের যুগে নৃত্য ও গানের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। 'কাণ্ডবীণা' ছিল বংশে নির্মিত। পিচ্ছোরা বা পিচ্ছোলা, কর্করি, অলাবু, ঐশিকি, অপঘাতলিকা, কাশ্যপী বা কচ্ছপীবীণা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। সাঙ্খ্যায়নকার বলেছেন, বীণার শরীর বা অবয়বটী তৈরী হোত কাঠে, লাল ষাঁড়ের চর্মে থাকৃত আবৃত বীণার নীচের অংশ, বাইরের দিকে থাকৃত কেশগুচ্ছ, পিছনের দিকে দশটী ছিদ্র থাকৃত এবং প্রত্যেকটী ছিদ্রে দশটী ক'রে তন্ত্রী সংযুক্ত থাকত, আর তন্ত্রী, তাঁত বা তারগুলি তৈরী হোত মুঞ্জা বা দূর্বাঘাসে। উদ্‌গাত্রী পত্রসহ বাঁশের খণ্ড দিয়ে তন্ত্রী বা তারগুলোতে আঘাত করতেন, হাতের বা অঙ্গুলির দ্বারা কখনো স্পর্শ করতেন না। তবে উদ্‌গাত্রী ঠিকঠিকভাবে নিজে কখনো বীণা বাজাতেন না, তিনি তন্ত্রী স্পর্শ ক'রে একজন পুরোহিত বা ব্রাহ্মণকে বাজাতে

বল্‌তেন। এরই নাম 'শততন্ত্রীবীণা'। পরবর্তীকালে এবং বর্তমানেও এটী দক্ষিণভারতে 'কাত্যায়নীবীণা' নামে পরিচিত। ডাঃ কালাণ্ড বলেছেন, দাসীরাও নাকি বীণা বাজাতো। বৈদিক শততন্ত্রীবীণার মতন 'সন্তূর' নামে একটী বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র এখনো কাশ্মীরে প্রচলিত আছে। কাশ্মিরী-বীণাটীতে আটটী ক'রে তন্ত্রী প্রত্যেক স্বরের জন্যে নির্দিষ্ট। ৭টী শুদ্ধ+৫টী কোমল মোট ১২টী স্বরের জন্যে ১২×৮=৯৬টী তন্ত্রী এবং চারটী প্রধান তন্ত্রী বীণাকাণ্ডে সংযোজিত, মোট একশোটী তন্ত্রী বা তারের সমাবেশ কাশ্মিরী-বীণাটীতে পাওয়া যায়। দুটী ছোট কাঠি দিয়ে যন্ত্রটী বাজানো হয়। বৈদিক শততন্ত্রী-বীণাই ভূস্বর্গবাসী কাশ্মিরীদের ভেতর এখনো পূর্বরূপ কিছু পরিবর্তিত ক'রে নিজেকে বজায় রেখেছে কিনা ইতিহাস তার প্রমাণ দেবে। বৈদিক যুগে 'ঔদুম্বরী'-বীণা যে উদুম্বর কাঠে তৈরী হোত তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যজমানী বা পুরোহিত-পত্নীরাই যজ্ঞে গানের (সামগান) সঙ্গে-সঙ্গে ঐ ঔদুম্বরী-বীণা বাজাতেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, বেদে বংশে নির্মিত 'ক্ষোণী'-বীণা এবং 'কর্করি' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের মতন যজুর্বেদ ও অথর্ববেদেও বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় আমরা পাই। বীণা, বেণু, শঙ্খ ও আঘাতী নামে খঞ্জনীবিশেষ ছিল তখনকার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। মৃদঙ্গেরও প্রচলন ছিল, কেননা দুন্দুভি, ভূমিদুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ অথর্ববেদে আছে (অথর্ব° ৫।২০।১ ; ৫।২০।৫ ; ৫।৩১।৭ ; ৬।৩৮।৭ ; ৬।১২৬।৩ ; ১২।১।৪১)। আচার্য সায়ণ অথর্ববেদের ৬।১২৫।১২ মন্ত্রের ভাষ্যে বৈতানসূত্র ৬।৪ থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন: "তথা মহাব্রতে অনেন তৃচেন ভূমিদুন্দুভিং তাড়য়েৎ। তদুক্তং বৈতানে"। মহাব্রতযজ্ঞে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনের সমাবেশ থাকৃত তা আগেই উল্লেখ করেছি। এ'ছাড়া আপস্তম্ভধর্মসূত্রের (১।৩।১৯) উজ্জ্বলাব্যাখ্যায় হরদত্ত মিশ্র উল্লেখ করেছেন: "বাদিত্রাণি বীণাবেণুমৃদঙ্গাদীনি"। 'আদীনি' বল্‌তে বৈদিক সমাজে আরো অনেক বদ্যযন্ত্রের নিশ্চয়ই প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের মতন অথর্ববেদেও (৪।৩৭।৫) "যত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি"—'কর্করি' বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সায়ণ বলেছেন—"কর্কর্যঃ বাদ্যবিশেষাঃ"। অথর্বে (৪।৬।৪) 'বক্রা' বা ধনুর্যন্ত্রেরও উল্লেখ আছে।

সুতরাং বীণার প্রচলন অতীব প্রাচীন। বেণু বা বংশের প্রচলনও বড় কম প্রাচীন নয়। তবে উভয়েই সমসাময়িক কিনা তা গবেষণার বিষয়। বর্তমানে

প্রচলিত 'তানপুরা' এবং 'সেতার'-ও বীণাশ্রেণীভুক্ত। তানপুরার আসল নাম 'তুম্বুরুবীণা'। সঙ্গীতশাস্ত্রী ব্রহ্মার শিষ্য তুম্বুরু নাকি এই বীণাযন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন বোলে তাঁর নামানুসারে নামকরণ হয়েছে 'তুম্বুরুবীণা'। কালে তুম্বুরু 'তানপুরা' শব্দে পরিণত হয়েছে। 'সেতার' যন্ত্রটী সম্বন্ধেও তাই। সেতারও নিছক ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র, বিদেশ থেকে আমদানী করা নয়। অনেকের মতে সেতার (পারস্য শব্দ 'সে' = তিন, 'তার'—তন্ত্রী, তিন তারযুক্ত) যন্ত্রটী পারস্য থেকে আমীর খস্রু-কর্তৃক ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়েছে। এইচ এ. পপ্‌লে তাঁর *The Music of India* বইয়ে এই মন্তব্যই করেছেন। তিনি বলেছেন,

"The invention of the sitar is commonly credited to the famous singer Amir Khusru of the court of Sultan Ala-u-din in the fourteen century. It is probably of Persian origin" (p. 107).

অবশ্য মাননীয় পপ্‌লে তাঁর বিবৃতিতে 'সম্ভবত' ('probably') শব্দটী ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁর মন্তব্য বা ধারণাকে আমরা গ্রহণ করতে নারাজ, কেননা পারস্য শব্দ 'সে' বা 'তিন' তারযুক্ত 'সেতার'-যন্ত্রটীর তিনটী তার বা তন্ত্রী থেকে কিভাবে ও কি প্রয়োজনে সাতটী তারে বা তন্ত্রীতে ক্রমবিকশিত হোল তার কোন প্রমাণযোগ্য ইতিহাস আমরা এখনো পাইনি। তাছাড়া আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতীয় সমাজে সাত-তারযুক্ত চিত্রাবীণার প্রচলন ছিল এবং ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এর নামোল্লেখ করেছেন। সাতটী তারযুক্ত বীণার উল্লেখ বৌদ্ধজাতকেও (খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক) আছে। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে এবং তার আগে নারদ তাঁর সঙ্গীতমকরন্দে 'ত্রিতন্ত্রী'-বীণার নামোল্লেখ করেছেন। মকরন্দকার নারদ একতন্ত্রী, দ্বিতন্ত্রী নকুল, ত্রিতান্ত্রিকা প্রভৃতি বীণারও উল্লেখ করেছেন। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, আমীর খস্রু পারস্যদেশ থেকে ভারতবর্ষে তিন-তারযুক্ত সেতার-বাদ্যযন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন তাহলেও একথা ঠিক যে, এমন-কিছু নতুন জিনিসের তিনি প্রবর্তন করেন নি, কেননা তিনতারযুক্ত সেতার যে ভারতীয় বীণা 'ত্রিতন্ত্রিকা'-র অনুকরণ নয় তাই বা কে বলতে পারে ? আমাদের মনে হয়, বর্তমানে প্রচলিত সাত-তারযুক্ত সেতার ভারতীয় চিত্রাবীণারই অভিন্ন রূপ। ইমন বা ইয়ামন, তুরস্কগৌড় তুরস্কতোড়ী, হিজাজ্ প্রভৃতি রাগের অবদানের মতন[২৮] সেতার-

২৮। প্রকৃতপক্ষে ইমন বা ইয়ামন, তুরস্ক, হিজাজ্, ফোরদস্ত প্রভৃতি শব্দগুলি আরবিক ও পারসীক। কিন্তু একথা আবার সত্য যে, অন্ততঃ 'ইমন' বা 'ইয়ামন' রাগটী

যন্ত্রটীকেও ভারতীয় সমাজে আরবিক ও পারসীক উপাদান হিসাবে চিন্তা করার কোন কারণ নেই।

বীণার প্রসঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞানী ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল উল্লেখ করেছেন: "একতন্ত্রী ও ত্রিতন্ত্রিকা বীণার নাম থেকে বুঝা যায় যে, এগুলি একটি তার ও তিনটী তারের যন্ত্র। নকুলবীণা দুতারের যন্ত্র, চিত্রা সপ্ততন্ত্রী,

যে নিছক পারস্যদেশীয় ও আমীর খসরু-কর্তৃক ভারতে আমদানী করা হয়েছিল মুসলমান রাজত্বের আমলে তার নির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তারপর পারস্যের মোকাম, গুষা প্রভৃতিতেও 'ইমন' রাগটীর' কোন উল্লেখ নেই, বরং রাগ-হিসাবে 'ইস্ফাহান' প্রভৃতির উল্লেখ ও প্রচলন আছে। প্রামাণিক প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতগ্রন্থেও 'ইমন' রাগ বা রাগিণীটীর উল্লেখ নেই, আর 'তুরস্ক' শব্দটীকে যদি তুর্কী বা Turkey-রই অভিন্ন রূপ-হিসাবে গণ্য ক'রে তুরস্কতোড়ী, তুরস্কগৌড় প্রভৃতি রাগগুলির বনামে ভারতীয় সঙ্গীতে পারস্য তথা মুস্লীম-প্রভাবের আধিপত্যকে স্বীকার করা যায় তবে সে-প্রভাব বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী কিছু পরে) সময়েই প্রথম ঘটেছিল বলা যায়, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেবের সময়ে নয়। ভারতবর্ষে ও পারস্যে বা আরবে পারস্পরিক প্রভাবই পড়েছিল একথা স্বীকার করতে হবে। রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ 'ডন্ সোসাইটি'-র প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ 'ডন্'-পত্রিকায় (—Vide *The Dawn Magazine*, Vol. XIV, No. 6, June 1911, *Old Series*, pp, 89—96) *The Civilization of Northern India : A Contribution to the Study of Hindu-Moslem Relations—II* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: "Here the mingling of Hindu and Muhammedan has been even more intimate than in the case of architecture or painting. The classical Music of Northern India, both vocal and instrumental, is in the hands of hereditory musicians, Hindu as well as Muhammedan, who follow the same system and principles, and sing or play the same songs and tunes and on the same instruments. The system is essentially based on the old Hindu system of Music, but modified to a large extent by the grafting on it of Persian elements, a process which was first systematically carried out by the celebrated Amir khusrau, poet and musician, who flourished at Delhi at the Court of the Khiliji and Tughlak monarchs. Even the names of some of the *Rags* and *Raginis* now in use, such for example as *Iman-Kalyan* (ইমন-কল্যাণ) bear evidence of this process, *Iman* (ইমন), a Persian word, being the name of a Persian tune which was grafted on an old Hindu *Rag* which bore the Sanskrit name *Kalyan* (কল্যাণ)"। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কল্যাণ-শ্রেণীভুক্ত অথবা কল্যাণরাগের ভিন্নরূপ (অনেকের মতে আমীর খসরু নাকি ভারতীয় রাগ কল্যাণকে অনুকরণ ক'রে নকল কল্যাণ 'ইমন'-রাগের সৃষ্টি করেছিলেন) 'ইমন' নামটী পারসীক হোলেও ইমন যে পারসীক মোকাম, শোভা, গুষা প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত তা ঐতিহাসিক নজির দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন তা বলেছি। পরে এই গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে মুসলমান যুগে সঙ্গীতের আলোচনার সময় আমরা এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

বিপঞ্চী নবতন্ত্রী। * * চিত্রা ও বিপঞ্চী সম্ভবত আমাদের সেতার ও সুরশৃঙ্গার। 'চিত্রা' শব্দের সঙ্গে পাশ্চাত্য 'সিথারা' (cithara) এবং পরবর্তীকালে পারসীক 'সেতারা' শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করার যোগ্য। কিন্নরীবীণার বর্ণনা থেকে মনে হয়, আধুনিক উত্তর ভারতীয় দুইটি তুম্বাযুক্ত বীণ্‌ ও কিন্নরীবীণা একই বস্তু। পিনাকীবীণার বর্ণনা থেকে মনে হয়, পিনাকী আধুনিক এসরাজের পূর্বরূপ হবে"।[২৯]

অবশ্য ডাঃ অমিয়বাবু সেতার থেকে 'সিথারা' (cithara) ও পারস্যদেশ থেকে আমদানী 'সেতারা' বা 'সেতার' কিছুটা ভিন্ন হোলেও তুলনার (comparison) উল্লেখ করেছেন। সিথারার ঠিক ঠিক উচ্চারণ কিথারা (kithara)—গ্রীসদেশের প্রিয় যন্ত্র। সিথারা বা সিথারযন্ত্র (cither or cithara) ইংলাণ্ডেও আদরণীয়। রবার্ট ইলিঙ্‌ উল্লেখ করেছেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই যন্ত্রটী পাশ্চাত্যে বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো। তিনি আরও বলেছেন, লিউট্ (lute) জাতীয় যন্ত্র ("an instrument somewhat similar to the lute") ১৪শ-১৭শ খৃষ্টাব্দে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হোত।[৩০] সিথারকে তিনি জিথার (zither) হিসাবে ভুল করতে নিষেধ করেছেন। সেতারের সঙ্গে রবার্ট ইলিঙ্‌-বর্ণিত জিথারের কতকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়, কেননা জিথারকে তিনি বলেছেন ব্যাভেরিয়া, সিরিয়া, টয়বোলের জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।[৩১] কিন্তু শ্রদ্ধেয় কার্ল গ্রেইরিঞ্জার 'কিথারা'-যন্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে বরং বর্তমান সেতারের অনেকটা ঐক্য পাওয়া যায়। কিথারা (অনেকে সিতারাও বলেন) আসলে গ্রীকজ্ঞানী হোমারের সময়ে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র। হোমারের সময়ে কিথারায় সাতটী তার সংযুক্ত ছিল; পরবর্তীকালে গ্রীসের শিল্পীরা তাকে এগারটী তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রে পরিবর্তিত করেছিলেন। স্পার্টার গুণীরা নাকি পরে চারটী তারকে আবার বাদ দিয়ে কিথারাকে সাতটী তার-যুক্তই রেখেছিলেন। শ্রদ্ধেয় কার্ল গ্রেইরিঞ্জার তাই উল্লেখ করেছেন,

"The Kithara, too, did not stop at the seven strings of Homer's time, but might have as many as eleven, although this increase in the

২৯। ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল: 'প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা' (বিশ্বভারতী সং), পৃ° ৯
৩০। রবার্ট ইলিঙ্‌ (R. Illing): *A Dictionary of Music* (1950), p. 26.
৩১। Ibid., p. 318.

number of strings met with much resistence on the part of the tradition-minded Greeks; it is reported by Timotheus of Meletos that the authorities of constructive Sparta simply cut off four of the newly added strings of his Kithara".[৩২]

ডাঃ বার্ণেট উল্লেখ করেছেন, পীথাগোরাসের সময়ে বীণায় (lyre) সাতটী তারের প্রচলন ছিল এবং তাকে যে পরে আটটী তারে পরিণত করা হয়েছিল সম্ভবত তার এমন-কিছু প্রমাণ নেই ("In the time of Pythagoras the lyre had seven strings and it is not probable that the eighth was added later as the result of his discoveries")।[৩৩]

ভারতীয় যন্ত্রের উপাদানপূর্ণ বিস্তৃত ইতিহাস এখনো রচিত হয়নি। বাদ্যযন্ত্র আগে কি কণ্ঠসঙ্গীত আগে সৃষ্টি হয়েছিল এ'নিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ভেতর মতভেদ যথেষ্ট আছে। শ্রদ্ধেয় পার্শি বাক্ (Percy C. Back) তাঁর *A History of Music* বইয়ে সঙ্গীত তথা দেশী-সঙ্গীতের উৎপত্তির আগে বাদ্যযুগের সৃষ্টি বলেছেন।[৩৪] এফ্. জে. ক্রোয়েষ্টের (F. J. Crowest) মতে, বাদ্য তথা যন্ত্রের প্রচলন কিছু কম দু'শো বছর আগের—"Instrumental music as we know it, is of comparatively modern date—little more than two hundred years old."[৩৫] কিন্তু এঁদের দু'জনের সিদ্ধান্তকেই আমরা গ্রহণ করতে অক্ষম। আমাদের মতে, বাদ্যযন্ত্রের অনেক আগে সঙ্গীত তথা কণ্ঠসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছিল ও সেরকম হওয়াই স্বাভাবিক। ক্রোয়েষ্ট যে বাদ্যযুগের বয়স কিছু কম দু'শো বছর নির্ধারণ করেছেন তা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ও অযুক্তিকর। শ্রদ্ধেয় কার্ল গ্রেইরিঞ্জার পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রগুলির আবিষ্কারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন ও তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাদ্যযন্ত্রগুলির বিবরণ দেবারও চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপে বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসের বয়স কমপক্ষে ২৫,০০০ বছর ধরা যেতে পারে। অবশ্য তিনি প্রস্তরযুগ (Stone Age) থেকে বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাসের সূচনা বলেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"The history of musical instruments may be traced back in Europe for

৩২। Cf. কার্ল গ্রেইরিঞ্জার: *Musical Instruments* (1945), p. 59.
৩৩। ডাঃ বার্ণেট: *Greek Philosophy, Thales to Plato* (1943), pp. 45—46.
৩৪। Cf. বাক্: *A History of Music* (1930), p. 75.
৩৫। Cf. ক্রোয়েষ্ট: *The Story of Music* (1902), p. 152.

some 25,000 years. As far back as the early Stone Age man learned how to cut teeth in a bone and produce a rasping noise by rubbing it against a rough surface. * * In the later Stone Age man began to use clay in the construction of musical instruments. He made clay drums shaped like a cup or an hour-glass and even provided with eyelet-holes for the lacing of the skin."৩৬

শ্রদ্ধেয় কার্ল গ্রেইরিঞ্জার ইউরোপের যন্ত্র-সঙ্গীতের ইতিহাসের কথা বলেছেন, কিন্তু ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার ভার ভারতবাসীর হাতে। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার ও সেখানকার প্রস্তরযুগের ব্যবধানের দিক থেকে যন্ত্র-সঙ্গীতের ইতিহাসের বয়স নিরূপণ করেছেন আনুমানিক ২৫,০০০ বছর তা আগেই বলেছি। অবশ্য ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস আরো প্রাচীন, যদিও কোন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এখনো ভারতীয় সভ্যতার বয়স ২৫,০০০ হাজার বছর বল্‌তে সাহস পাচ্ছেন না। পরিপূর্ণভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার সম্পন্ন হোলে ভারতের সুপ্রাচীনতার ইতিহাসকে প্রত্যক্ষভাবে যে আমরা বিশ্বসভ্যতার শীর্ষদেশে দেখব সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মোটকথা নানান্ দিক থেকে বিচার ক'রে দেখলে একথাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র 'সেতার' বা 'সেতারা' চিত্রাবীণারই অভিন্নরূপ, অথবা একথাও অনুমান কেন, সিদ্ধান্ত করা সমীচীন যে, চিত্রাবীণাকে অনুকরণ ক'রেই সেতার যন্ত্রটী ভারতের জলবায়ুতে জন্মলাভ করেছিল, পারস্য অথবা অপর কোন দেশ থেকে ভারতে তাকে আমদানী করা হয় নি। বরং একথা সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব নয় যে, পারস্যের 'সেতারা' ও গ্রীসদেশের 'কিথারা' (Kithara) ভারতীয় সেতারের পূর্বরূপ চিত্রাবীণার ছাঁচে বা অনুকরণে সৃষ্টি হয়েছিল; কেননা শ্রদ্ধেয় কার্ল গ্রেইরিঞ্জার বলেছেন, কিথারা (Kithara) প্রাচীন গ্রীসিয় সভ্যতার অবদান এবং ঐ বাদ্যযন্ত্রটী আমদানী হয়েছিলো এজিয়েন অধিবাসীদের মারফতে এসিয়া মাইনর থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"Of the many instruments the names of which have been handed down from the musical culture of Greece, there stand out three alone which have had a decisive influence on the history of music: The Lyra, the Kithara and the Aulos. * * * The Lyra was brought by the Hellenes when they migrated into Greece from the north of the Balkan Peninsula and Hungary. The Kithara came from Asia Minor *via* the

৩৬। কার্ল গ্রেইরিঞ্জার: *Musical Instruments* (1945), pp. 54—55.

islands of the Algean. Instruments of the Aulos type were employed by Egyptians, Jews, Hittites, Elamites and Assyrians, so that Greece could hardly avoid adopting this instrument of the ancient East."[৩৭]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের 'Asia Minor', 'from the East', 'from near East' অথবা 'of the ancient East' প্রভৃতি কথাগুলির ব্যবহারের পিছনে সাধারণতঃ ভারতবর্ষকে অস্বীকারের দৃষ্টিই পাওয়া যায় একথা আমরা অবতরণিকায় এবং অন্যত্রও[৩৮] আলোচনা করেছি, কিন্তু ভারত বরাবর স্বাধীন থাকলে বোধ হয় সুস্পষ্ট ও সোজাসুজিভাবে সকলে ভারতভূমির নামই উল্লেখ করতেন। তবে পাশ্চত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীতের প্রসঙ্গে ভারতবর্ষকেই তার প্রেরণাকেন্দ্র অথবা জন্মস্থান বোলে স্বীকার করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ 'the dawn of civilization was in India'—ভারতভূমিতেই সভ্যতার অরুণোদয় প্রথমে হয়েছিল একথা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন এবং এ'সম্বন্ধে আমরা আগে উল্লেখও করেছি। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস এখনো-পর্যন্ত রচিত হয় নি এবং সেদিক থেকে পাশ্চাত্য দেশ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রণী। স্বর্গীয় স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর "যন্ত্রকোষ" নামে বাংলায় ও *Hindu Musical Instruments* (1912) নামে ইংরেজীতে দু'খানি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান তাদের মধ্যে নেই এবং তারা এখন অপ্রকাশিত। ক্যাপ্টেন সি. আর. ডে *The Music and Musical Instruments of Southern India and Deccan.* (1891), এ. এইচ. ফক্স-ষ্ট্র্যাঙগয়েজ *The Music of Hindosthan* (1914), এইচ. এ. পপ্‌লে *The Music of India* (1921) প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের কিছু-কিছু বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তাও বিস্তৃত ও ঐতিহাসিক ধারায় লিখিত নয়। তাই ভবিষ্যতে সত্যিকারের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস প্রকাশিত হোলে আমরা দেখ্‌ব যে, কিথারার (Kithara) মতন আরো অনেক বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের যোগসূত্র বাঁধা আছে।

এই মন্তব্যের উদাহরণ-রূপে আমরা ক্যাপ্টেন ডে (Captain Day)-র অভিমত এখানে কিছু উল্লেখ করলাম। তিনি বলেছেন, কয়েক শত বছর

৩৭। কার্ল্ জ্যাক্সের: *Musical Instruments* (1945), pp. 57—58

৩৮। *Cf.* প্রজ্ঞানানন্দ : 'রাগ ও রূপ' (১৩৫৫), পৃঃ ৪৪

আগে মুসলমান অভিযানের সময় অনেক আরব ও পারস্যের বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় সমাজে প্রবর্তিত হয়েছিলো। কিন্তু ভারতের অধিবাসীরা অত্যন্ত রক্ষণশীল জাতি, তাই গত দু'হাজার বছর আগেকার যে-সব বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে পাই তাদের অনেকগুলি এখন রূপ পরিবর্তন না ক'রেই ভারতীয় সঙ্গীতসমাজে প্রচলিত রয়েছে। তিনি অজণ্টা, অমরাবতী, সাঁচী প্রভৃতি গিরিগুহার চিত্রকলায় কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শনের প্রমাণ দিয়েছেন। ৬৪০ বছর আগে চীনা-পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ্‌ও সেই বাদ্যযন্ত্রগুলি দেখে তাঁর বিবরণে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সাঁচীর ভাস্কর্যে একরকম বীণা (harp) দেখা যায়, যার সাদৃশ্য রোমীয় টিবের (Tibae) সঙ্গে মেলে। অমরাবতীর ভাস্কর্যে ১৮ জন নারীর একত্র সমাবেশ দেখা যায়, তারা একটী বাদ্যযন্ত্র (Drum) ও শঙ্খ বাজাচ্ছে। কুয়ানুনের (Quanun) মতন দুটী বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং সেগুলি অসীরিয় বীণার (Assyrian harp) মতন দেখ্‌তে। আর একটী বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন মেলে যেটীর বিবরণ সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু অসীরিয় ও ইজিপ্টের ভাস্কর্যে নমুনা মেলে। সেই বাদ্যযন্ত্রটী বীণার (হার্পের) মতন দেখতে। আফ্রিকায় সেটীকে 'সাঙ্কো' (Sancho) বলে।[৩৯]

তিনি আরো বলেছেন যে, পারস্যবাসীরা 'কুয়ানূন' (Quanun) নামে একটী যন্ত্র এখনও ব্যবহার করেন যার সাদৃশ্য শততন্ত্রীযুক্ত ভারতীয় 'কাত্যায়নী'-বীণার সঙ্গে পাওয়া যায়। তাঁর অভিমত যে, ঐ কুয়ানূনই পরে পারস্যে 'সান্তির' (Santır), সিতার বা সেতার বাদ্যযন্ত্রে রূপায়িত হয়।[৪০] ভারতে মুসলমান যুগে রবাব, সারেঙ্গী, সরোদ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন পাওয়া যায়। রবাবের মতন 'রেবেক' (Rebec) নামে একটী যন্ত্র ইউরোপে প্রচলিত ছিল। মূরেরা (Moors) আবার ইউরোপ থেকে ঐ বাদ্যযন্ত্রটীর স্পেনে প্রচলন করে। প্রবাদ যে, মূরেরা রেবেক বাদ্যযন্ত্রটীর সন্ধান পেয়েছিল

৩৯। অনেকগুলি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ছদ্মবেশে ভারতেতর দেশে বিভিন্ন নাম নিয়ে এখনো প্রচলিত রয়েছে।—Vide স্যার এস্. এম্. ঠাকুর: '(ক) *Short Notice of Hindu Musical Instruments* (1912), pp. III—VIII ; (খ) 'যন্ত্রকোষ' এবং (গ) মীরা মিত্র: *Musical Instruments of India* (প্রবন্ধ)—The Hindusthan Standard, Octo. 5, 1952, p. III.

৪০। পারস্য 'সান্তির', কাশ্মিরী 'সন্তুর' ও ভারতীয় 'সেতার' একই বাদ্যযন্ত্র কিনা কে বল্‌তে পারে। রূপের পরিবর্তন তো যন্ত্রগুলিতে হওয়াই স্বাভাবিক।

এস্‌রাজ
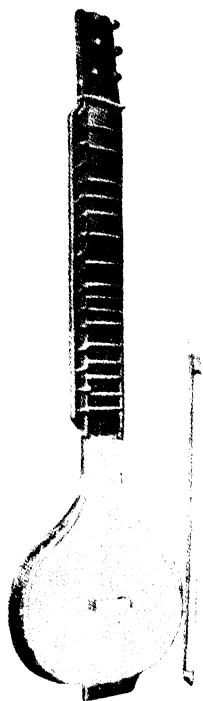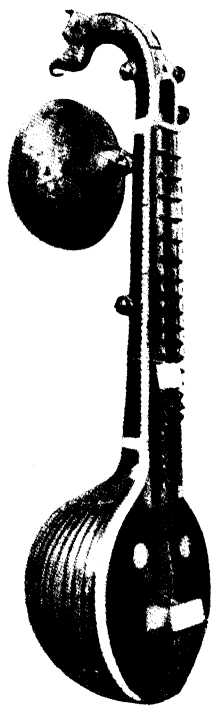
বীণা (দক্ষিণ-ভারতীয়)
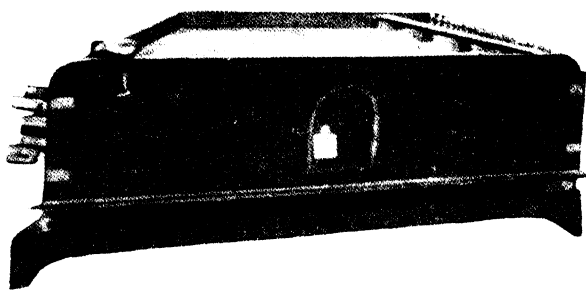
কাত্যায়ন বা কাত্যায়নী-বীণা

কাত্যায়নী-বীণা
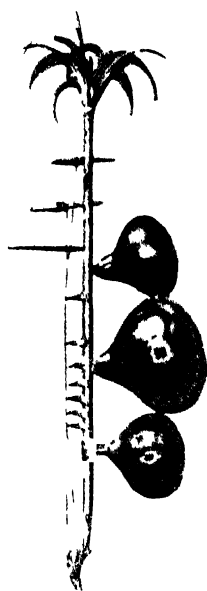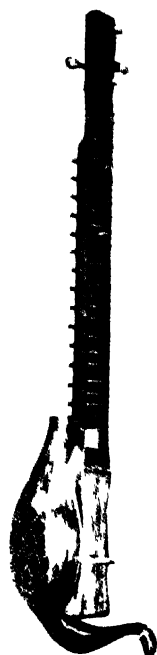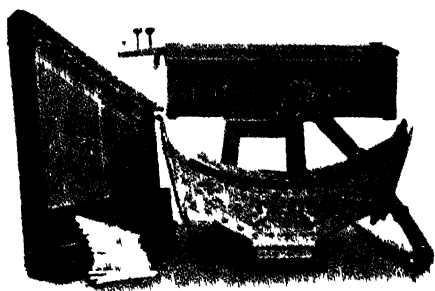
আরবে ও পারস্যে। কিন্তু ভারতবর্ষে 'রেবেক' বা 'রবাব' 'বীণ্' হিসাবে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। ক্যাপ্টেন ডে. এ'সম্বন্ধে বলেছেন,

"Here again the Aryan origin is evident, the Rabab being, according to old Sanskrit works, a form of Vina. And it is still popular in the North of India and Afghanistan."

এ'ছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে, দুটীপর্দাযুক্ত যন্ত্রসঙ্গীত ভারত থেকেই প্রাচ্যের অপরস্থানে ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র আমদানী হয়েছি এবং পারস্যে, আরবে ও ইজিপ্টে যে দুটীপর্দাযুক্ত প্রাচীন 'ওবে' (Oboe)-যন্ত্রটী ব্যবহৃত হয় সেটীর জন্মস্থান সম্ভবত (?) ভারতবর্ষে। এ'ছাড়া ব্যাগপাইপের (Bagpipe) জন্মস্থান পূর্বদেশেই। ক্যাপ্টেন ডে. আবার তাই উল্লেখ করেছেন,

"Most of the early musical instruments remain still in use. Since the time of Muhammedan invasion, about a thousand years ago, some Arabian and Persian instruments have been adopted and have become almost naturalised. * * * The pepoles of India have always been conservative in their tastes and in nothing do we find this were evident than in their music and musical instruments. Descriptions of them are found in many of the old Sanskrit treatises, and show that the forms of the instruments now in use, have altered hardly at all during the last two thousand years ; old paintings and sculptures, such as those of Ajanta, prove this even more conclusivey. There are many musical instruments to be found among the sculptures existing upon various old cave temples and ancient Buddhist topes and stupas in different part of India. * * * The *rebec* once popular in Europe was a form of the *rebab*, brought to Spain by the Moor, who in turn had derived it from Persia and Arabia * * * Instruments with double reeds appear to have been originally brought from India, and the double reed is found in the primitive *oboes* used there as well as in Persia, Arabia and Egypt. * * * Indeed the bagpipe would itself seen to have an Eastern origin, * *,"[৪০]

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রও অমরাবতী, সাঁচী প্রভৃতির ভাস্কর্যে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

"Nor are they wanting at Sanchi, Amaravati, and Bhuvanesvara.

৪০। *Cf. The Musical Instruments of Southern India and Daccan* (1891), pp. 99—104.

Sceans representing corcerts are very common at all the three places, but the number and variety of instruments in use in these parties appear, however, to have been extremely limited. * * Of the first class, harps of two kinds are shown at Sanchi and Amaravati. But none are to be seen at Bhuvanesvara, and, indeed, no stringed instrument seems to have been in use there except the *Vina.* The Amaravati harp is in appearance very like the ancient Egyptian instrument, but it was held on the lap in a horizontal position, whereas the latter, when in use, was kept in an upright position on the ground, or on a stool. The Amaravati guitar shown on the stone in the Museum of the Asiatic Society, has a sounding board at the lower end, seven keys, but no bars. The *Kalpa-Sutra* of Katyayana notices harp with a hundred strings, but what it was like I cannot say. Monochords, Bichords, and Trichords are largely described in text books."[৪১]

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র কথাপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "The *Kalpa-Sutra* of Katyayana notices a harp with a hundred strings, * * ।" 'সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে সঙ্গীত' আলোচনায় আমরা 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ' (৮।১২)[৪২] থেকে শততন্ত্রীবীণার নামোল্লেখ ও বর্ণনা দিয়েছি এবং উল্লেখ করেছি যে, পরবর্তীকালে শততন্ত্রী-বীণার নাম হয় 'কাত্যায়নী-বীণা' (পৃ° ১৪৮)। প্রকৃতপক্ষে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে বিভিন্ন তন্ত্রীযুক্ত বীণার মতন শততন্ত্রীবীণারও প্রচলন ছিল সামগ-সম্প্রদায়ের ভেতর। ঋগ্বেদেই (১।৮৫।১০) 'বাণ' অর্থাৎ শততন্ত্রীবিশিষ্ট বীণার উল্লেখ আছে—"ধমন্তো-বাণং মরুতঃ * *"। আচার্য সায়ণ এর ভাষ্যে বলেছেন—"বাণং শতসংখ্যাভিস্তন্ত্রীভি-যুক্তং বীণাবিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্তঃ"। ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে তো এর উল্লেখ আছেই। পরবর্তীকালে মনীষী কাত্যায়ন তাঁর কল্পসূত্রে এ'বীণাটীর উল্লেখ করেছেন ("বাণেন শততন্তুনা", ১৩।৩৩) তখনকার সমাজে প্রচলন করার অথবা বিশেষভাবে প্রচলিত থাকার জন্যে। অনেকে মনীষী কাত্যায়নকে বৈদিক শততন্ত্রীবীণার পরবর্তী-প্রবর্তক বলেন এবং তাঁরই নামানুসারে বীণাটীর নাম হয় 'কাত্যায়ন' বা 'কাত্যায়নী'-বীণা। কাত্যায়ন নিজে স্বর ও স্বরশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী

৪১। Cf. (ক) *Antiquities of Orissa*, Vol. I. (খ) *Indo-Aryans* (Cal., 1881), Vol. I, pq, 283—284.

৪২। Cf. ডাঃ কালাণ্ড: *Panchavimsa-Brahmana* (Asiatic Society of Bengal. Cal., 1931), p. 88.

ছিলেন, কেননা ঋষি বসিষ্ট, পরাশর প্রভৃতির নামাঙ্কিত 'বাসিষ্ঠী'-শিক্ষা, ও 'পরাশরী'-শিক্ষার মতন 'কাত্যায়নী-শিক্ষাও'[৪৩] সে-কথার সাক্ষ্য দেয়। কাত্যায়নীশিক্ষার ব্যাখ্যা করেছেন জয়ন্ত-স্বামী এবং এই শিক্ষার টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে (ক) "কাত্যায়নমহর্ষিণা যৎস্পষ্টতরা কারিকা প্রতিপাদিতা", (খ) "ইতি জয়ন্তস্বামিনির্মিতব্যাখ্যানযুতা মহর্ষিকাত্যায়নপ্রণীতা শিক্ষা সমাপ্তা"। সুতরাং শিক্ষার কারিকাগুলি মনীষী কাত্যায়নের রচিত বোলেই মনে হয়। কাত্যায়ন উদাত্তাদি বৈদিক স্বর-তিনটীর প্রকৃতি, প্রয়োগ ও উচ্চারণপ্রণালী-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, কিন্তু লৌকিক মার্গ ও দেশী-সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। কাত্যায়ন শিক্ষাশাস্ত্রে পারদর্শী থাকায় বৈদিক সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল বুঝা যায় এবং সেদিক থেকে বৈদিক যুগের অপ্রচলিতপ্রায় 'বাণ' বা 'শততন্ত্রী'-বীণাকে পুনরায় বৈদিকোত্তর (কল্পসূত্রের) যুগে প্রবর্তন করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক এবং তাঁরই নামানুসারে শততন্ত্রীবীণার নাম 'কাত্যায়নী-বীণা' হওয়া যুক্তিযুক্ত।

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ ক'রেও লিখেছেন,

> "At Sanchi the large war drum is common The ceiling of the Muktesvara porch has several scenes of concerts, in most of which the central figure is represented singing to the accompaniment of a *dholaka* and cymbals. * * The conch-shell scarcely deserves to be reckoned as a musical instrument, but as it was so used, and is common at Bhuvanesvara, it is necessary to name it."[৪৪]

অমরাবতীর ভাস্কর্যে যে হার্প বা বীণাটী পাওয়া যায় সেটী দেখ্‌তে অনেকটা অরফিউসের হার্পের মতন : একটী নারী উপবিষ্ট হোয়ে বীণাযন্ত্রটী কোলে রেখে দুটী হাতের সাহায্যে বাজাচ্ছে। সাঁচী ও অমরাবতীর আর একটী ভাস্কর্যেও এরকম আর একটী বীণা দেখা যায় এবং সেখানে একটী নারী কোলের ওপর বীণাটী রেখে দু'হাতে বাজাচ্ছে। এই

বীণাটীতে সাতটী চাবি বা কাণ[৪৫] ("seven keys, but no bars")

৪৩। Cf. 'শিক্ষাসংগ্রহঃ' (কাশী চৌখাম্বা সং ১৮৯৩), পৃ° ৪৬

৪৪। Cf. *Indo-Aryans* (1881), Vol. I, pp. 284, 285, 289.

৪৫। সাতটী চাবি বা কাণ থাকায় সাতটী তন্ত্রী অথবা তার থাকাও স্বাভাবিক বোলে মনে হয়

সংযুক্ত আছে। বীণাটাকে দেখ্‌তে অনেকটা খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে শিল্পী মেলোজ্জো-দা-ফোর্লির (Melozzo-da-Forli) অঙ্কিত এক স্বর্গীয় কিন্নরীর লিউট (Lute) বা বীণার মতন। ফোর্লির ছবিটী রোমে ভাটিকান্ মিউজিয়ামে এখনো রাখা আছে।[৪৬] এ'ছাড়া ঐ বীণাটী শিল্পী বার্তোলোম্মেও বিবরিণি (Bartolommeo Vivarini, 1474 A. D.) অঙ্কিত কিন্নরীর একটী ম্যাণ্ডোলার মতনও দেখ্‌তে। সেই ম্যাণ্ডোলাটী ভেনিসের মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে।[৪৭]
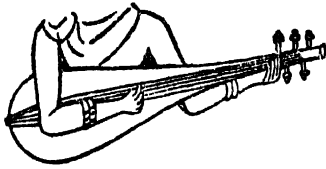
সুতরাং ভারতীয় বীণার প্রচলন ভারতেই শুধু কেন, বাণিজ্যিক ব্যাপারের মাধ্যমে বিবর্তিত রূপ নিয়ে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক।

মাননীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সাঁচীর ভাস্কর্যে একটী বাদকদলের বর্ণনাও দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

"At Sanchi there is a corps of musicians dressed in kilts, and wearing sandals, tied to the leg by crossed bands, very much in the same way in which the ancient Grecians fastened their sandals. Nothing similar to them has anywhere else been noticed in India"[৪৮]

সাঁচীর এই বাদকদলের মধ্যে বেণু, শিঙ্গা ও বিভিন্ন রকমের মৃদঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাদকদলের মধ্যে সজীবতার লক্ষণও বেশ সুস্পষ্ট। এ'ছাড়া খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর কোনারকের সূর্য-মন্দিরের বিভিন্ন নর্তক, নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন অতুলনীয়। কোনারকে জগমোহনের কয়েকটী মৃদঙ্গবাদ্যরতা নারীমূর্তি যেন সত্যই জীবন্ত। তাদের একটীর মাথায় যুগল-

৪৬। Cf. কার্ল গ্রেইরিঞ্জার: *Musical Instruments* (London, 1945), পুরোভাগের চিত্র দ্রঃ।

৪৭। Ibid., p. 76, plate XII.

৪৮। Cf. *Indo-Aryans* (1881), Vol. I. pp. 223—224.

টিকটিকি ও বিড়ালের মতন মুখ, বামহস্ত মৃদঙ্গের ওপর ন্যস্ত ও দক্ষিণহস্ত মৃদঙ্গে আঘাত করার জন্যে উদ্যত। মূর্তিটার ভাব, গতি ও মাধুর্যের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন সুস্পষ্ট। অপর একটা নারী মূর্তিও মৃদঙ্গবাদ্যরতা এবং ভিন্ন একটা নারীমূর্তির দু'হাতে করতাল। এ'ছাড়া নৃত্য-ছন্দায়িতা ও বাদ্যরতা আরও অসংখ্য নারীমূর্তি আছে।[৪৯]
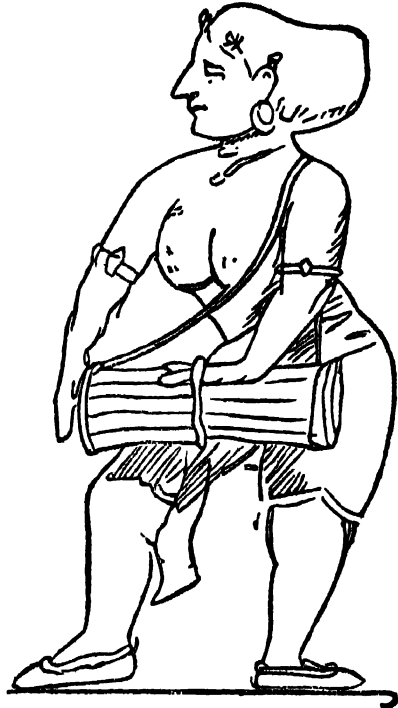
সঙ্গীতের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় আবুল ফজলও (Abul Fazl-I-Allami) তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে[৫০] আলোচনা করেছেন। তিনি বীণা হিসাবে কিন্নরীবীণা, স্বরবীণা, অমৃতিবীণা, স্বরমণ্ডল, রবাব, সারেঙ্গী ও ভিন্ন ভিন্ন মৃদঙ্গ, করতালাদির উল্লেখ করেছেন। এ'ছাড়া স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর *Music by Various*

৪৯। টি. জি. অরবমুথন (T. G Aravamuthan) *Pianos in Stone* প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন: খৃষ্টপূর্ব ২য় শতকে ভারতবর্ষে যেমন কোন কোন প্রাসাদে স্তম্ভশ্রেণী থাকতো এবং সেগুলি বাদ্যযন্ত্র-হিসাবে ব্যবহৃত হোত, ইজিপ্টেও তাই। ভারতবর্ষে প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদে স্তম্ভশ্রেণী সাজিয়ে পিয়ানোর সৃষ্টি করা হোত এবং সাতটা স্বরের তাতে প্রতিধ্বনি শোনা যেতো। দেব-মন্দিরের নাট্যমণ্ডপেও ঐ ধরণের প্রস্তরের পিয়ানোর মতন বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিজয়নগর-রাজ্যে হম্পিতে 'পম্পপতি-ঈশ্বর' মন্দিরে ঐ ধরণের একটা প্রস্তরের বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে—"In such a temple as that to PampapatiI-svara at Hampit,—the Vijayanagara Capital,—in which 'there are musical pillars all along the courtyard' * *" তিনেভেল্লীতে শ্রীনেল্লাইঅপ্পর-মন্দিরেও ঐ ধরণের একটা প্রস্তরে নির্মিত পিয়ানো যন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে। এ'ছাড়া দাক্ষিণাত্যে আল্বর্-তিরু নগরীতে একটা দেবমণ্ডপেও ঐ বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে। মাননীয় অরবমুথন্ তাই লিখেছেন: "Perhaps an investigation will unravel the bases of music as practised

Authors নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীদের লিখিত অনেক বাদ্যযন্ত্রের নামোল্লেখ করেছেন।

একথা সত্য যে, জল-ও স্থলপথে বাণিজ্যিক ব্যাপারে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সেদিক থেকে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, মুসলমান রাজত্বের আমলে এবং বিশেষ ক'রে ১৪শ খৃষ্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীনের সময়ে পারস্য প্রভাবের কথা ছেড়ে দিলেও তারো আগে থেকে ভারতের বিচিত্র উপাদান যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনি ভারতের মধ্যেও অনেক জিনিস আমদানী হওয়া স্বাভাবিক। বাণিজ্যিক সম্পর্কের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের সাথে পৃথিবীর অপরাপর দেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। সেদিক থেকে 'সেতার' প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পারস্য থেকে আমদানী হওয়া স্বাভাবিক একথা চিন্তা না ক'রে বরং আরব, পারস্য ও এমন কি সমগ্র পাশ্চাত্যদেশ ভারতের কাছ থেকে ঐ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের সন্ধান ও ধারণা পেয়েছিল একথা ভাবা মোটেই অসমীচীন নয়। কেননা আমরা ইতিহাসের মারফতে জান্‌তে পারি যে, আরব ও পারস্যের অনেক মনীষী ও সংগীতগুণী বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা দর্শনে তাঁরা বিমুগ্ধ হয়েছিলেন।[৫১]

in the days of the Vijayanagar rulers".—Vide (a) *The Journal of the Music Academy*, Madras, Vol. XIV, 1943, Parts I—IV, pp. 109--116; (b) *The Hindu* (Madras), August, 6, 1939 (An Article on this subject by Mr. P. Sambamurti.) ।

৫০। Cf. *Ain-i Akbari*, Vol. III (Calcutta, 1948, translated into Eng, by Colonel H. S. Jarret and revised and further annotated by Sir Jadu Nath Sarkar.), pp, 268—271.

৫১। Cf. (ক) ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়: *Indian Shipping* (1912), pp. 121-122.
(খ) ম্যাক্‌ক্রিণ্ডিল্: *Ancient India*, p. 121.
(গ) ডাঃ ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্: *Early History of India*, pp. 404-405.
(ঘ) স্বামী অভেদানন্দ: *India and Her People* (1905-6), pp. 216—250
(ঙ) এ্যালেন ডানিয়েলু: *Introduction to the Study of Musical Scales* (1943), pp. 93—94.
(চ) ডাঃ হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার: *Ship-building and Maritime Activity in Bengal*—'The Dawn Magazine', 1911, *Old*

গ্রীসের মনীষী পীথাগোরাস যে ভারতে এসেছিলেন ও ভারতের বিচিত্র শিক্ষাদীক্ষা গ্রীসীয় সমাজে প্রবর্তন করেছিলেন একথা ঐতিহাসিক-মাত্রেই জানেন। ডাঃ ফার্মার (*Dr. Henry George Framar*) তাঁর *A History of Arabian Music* (1929) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত বা বাদ্যযন্ত্রের বেলায় আরব ও পারস্য যেমন রোমীয় চার্চ ও পীথাগোরাসের কাছে অনেকাংশে ঋণী, তেমনি ভারতবর্ষের কাছেও তাদের ঋণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, অল্-মশূদী বা আবুল হাসান (Al-Masudi or Abul-Hasan) 'আক্‌বর্-অল্-জমান্', 'মুরূজ্-অল্-ধহব', 'কিতাব-অল্-অওসাৎ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ আরব ঐতিহাসিক; তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব তাঁর ওপর প্রভূত পরিমাণে পড়েছিল। ডাঃ ফার্মার এই বিষয়ের উল্লেখ ক'রে তাই লিখেছেন,

"Al-Mas'udi (d. *ca.* 957) or Abu'l-Hasan * *. He was born at Bagdad in the last years of the third century of the *Hijra.* ** He again penetrated India, journeying from there, possibly by the Deccan, to Ceylon, Madagascar and to the coast of 'Uman. It is not improbable that he travelled as far as the Malay-archipelago and the seaboard of China. * * It is in the *Muruj-al-dhahab* (Medows of Gold) that we find a section devoted to the early history of Arabian music, * * and he tells us in his *Muruj-al-dhahab*, that in his other books he dealt 'fully with the question of music, the various kind of musical instruments (*malahi*), dances, rhythms (*turaq*, sing, *turqa*) and notes (*nagham*)', as well as 'the kinds of instruments used by the Creeks, Byzantnies, Syrians, Nabataeans, and the people of Sind, India, Persia, etc.'" ৫২

কাজেই আরব ও পারস্যের সঙ্গীতে যে অন্যান্য দেশের মতন ভারতীয় সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ হওয়া সম্ভব একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

পরিশেষে উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না যে, সেতারযন্ত্রটী যে নিছক

Series, Vol. XIV, No. 1, pp. 1-9, 21-28, 41-46, 57-62, 73-81, 117-124, 129-132.

(ছ) ডাঃ ভি. স্মিথ্: *Commerce of the Ancients*, Vol. II, p. 404.

৫২। ডাঃ ফার্মার: *A History of Arabian Music* (1929), pp. 165—166.

ভারতীয় এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাই আমরা আরো অনেক সঙ্গীতজ্ঞান-কুশলীর কাছ থেকে। দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতগুণী শ্রদ্ধেয় হুলুগুর কৃষ্ণাচার্য বলেছেন,

"The ancient Vina was called *Saptatantri*, as it had seven strings. The present Setar is a corrupt form of Saptatara or Sat-tara as it too has the same number of chanting strings. The Vina had some other names too, i.e, 'Chitra' with seven strings and 'Vipanchi' with nine strings. The corrupt forms of Chitra are Citara, Sitara and then Sitar. Chitra became Sitara and Saptatara became Setar, both meaning the same."[৫৩]

পাশ্চাত্য সঙ্গীততত্ত্ববিদ্ কার্ট সাচ্‌সও এই মতের পক্ষপাতী। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত বই *The Rise of Music in the Ancient World* বইয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রসঙ্গে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন,

"* * the only stringed instrument in the arched harp ; therefore the classical *Vina*, so often mentioned in poetry and musical theory, must in antiquity have been a harp before the name passed to the present tube *zither* and eighteen other instruments at the end of the first thousand years A.D. The sound-board of leather, mentioned in several ancient sources, confirms this statement."[৫৪]

এই ধরণের আরো অনেক ঐতিহাসিক ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে যে-সব থেকে প্রমাণিত হবে যে, সেতার, বেহালা, রবাব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলি বিদেশ থেকে মোটেই আমদানী করা নয়, পরন্তু ভারতবর্ষই তাদের জন্মভূমি। শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীও 'বেহালা' বাদ্যযন্ত্রটীর প্রসঙ্গে এই ধরণের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন,

"এমন হইলে বেহালা যে, আমাদের ভারতবর্ষীয় যন্ত্র, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; তবে কালক্রমে জাতিভেদ ও অভিরুচিভেদে অবয়ব ভিন্ন এবং নাম ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রীজ সাহেব-কৃত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় বেহালার প্রথম সৃষ্টিকাল নির্ণয় নাই। পূর্বোক্ত ধনুর্যন্ত্রাদি বিষয়ক গ্রন্থকার এফ. জে. ফেটিস্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন : 'There is nothing in the West which has not come from the East' ; অর্থাৎ ইউরোপখণ্ডে এমন কিছুই নাই যাহা আসিয়া (এসিয়া—

৫৩। Cf. হুলুগুর কৃষ্ণাচার্য : *Introduction to the Study of Bharatiya Sangit-Sastra*—The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. I, January 1930, No. 1, p. 12

৫৪। *Cf.* কার্ট সাচ্‌স : *The Rise of Music in the Ancient World* (1944), p. 163.

প্রাচ্যদেশ) হইতে না আসিয়াছে। এতো প্রমাণসত্ত্বে বেহালাকে আমাদের (ভারতের) যন্ত্র বলিয়া কেন না স্বীকার করি?"[৫৫]

নারদীশিক্ষার ৭ম কণ্ডিকায় নারদ সামস্বর হিসাবে প্রথমাদির আঙ্গিক ব্যবহার ও তাদের শ্রুতি প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

ক্রুষ্টস্য মূর্ধনি স্থানং ললাটে প্রথমস্য তু।
ভ্রুবোর্মধ্যে দ্বিতীয়স্য তৃতীয়স্য চ কর্ণয়োঃ॥
কণ্ঠস্থানং চতুর্থস্য মন্দ্রস্যোরসি তূচ্যতে।
অতিস্বারস্য নীচস্য হৃদিস্থানং বিধীয়তে॥

শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ আমাদের কাছে সাধারণত বিস্ময়ের বস্তু বোলেই মনে হয়, কেননা ক্রুষ্টস্বরের স্থান মূর্দ্ধায়, ললাটে প্রথমের প্রভৃতি কথাগুলি বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে ঠিক মিল খায় না। মনে হয়, সামগ-সম্প্রদায় তাঁদের গানে মাত্রা বা ছন্দ রক্ষা করার জন্যে শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্বরগুলির স্থান কল্পনা করেছিলেন। শ্লোকগুলির যথাযথ অর্থ করলে দেখা যায় যে, ক্রুষ্টস্বরের স্থান মূর্দ্ধায় বা মস্তকে, প্রথমের ললাটে, দ্বিতীয়ের ভ্রূমধ্যে, তৃতীয়ের কর্ণে, চতুর্থের কণ্ঠে, মন্দ্রের উরদেশে ও অতিস্বার্যের হৃদয়ে। স্বরের স্থানগুলি অবশ্য কল্পিতই। বেদগানের সময় স্বরগুলির প্রয়োগ বা উচ্চারণের সময় হস্তের দ্বারা নির্দিষ্ট ঐ স্থানগুলি স্পর্শ করার নিয়ম আছে, উদ্দেশ্য—মনে হয় স্থানগুলির নির্দেশ দ্বারা স্বরের বা স্বরোচ্চারণের যাথার্থ প্রমাণ করা। এ'ছাড়া স্বরগুলির উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে অঙ্গুলি-নির্দেশেরও নিয়ম আছে। যেমন,

অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তমে ক্রুষ্টোহঙ্গুষ্ঠে প্রথমঃ স্বরঃ।
প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারঋষভস্তদনন্তরম্॥
অনামিকায়াং ষড়্জস্তু কনিষ্ঠিকায়াং চ ধৈবতঃ।
তস্যাধস্তাচ্চ যোহন্যাস্তু নিষাদং তত্র বিন্যসেৎ॥

অঙ্গুষ্ঠের উত্তমদেশে ক্রুষ্টস্বরকে স্থাপন করতে হয়। এই 'স্থাপন' বল্‌তে বুঝ্‌তে হবে 'নির্দেশ' বা সংকেত, যেমন অঙ্গুষ্ঠে প্রথম স্বর, প্রভৃতি। কিন্তু অঙ্গুলিস্থাপনেও শিক্ষাগুলিতে মতভেদ আছে এবং মতভেদের কারণ বৈদিক শাখার অনুবর্তী অনুষ্ঠান-ব্যাপারে সম্প্রদায়ভেদ। বেদের এক একটী শাখা যেমন ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার স্বর সামগানে ব্যবহার করতো তেমনি অঙ্গুলিতে স্বর-যোজনার

৫৫। *Cf.* 'সঙ্গীতসার' (২য় সংস্করণ, ১২৮৬ সাল), পৃ° ৬৭

রীতিও সামগদের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন ছিল।[৫৬] মাণ্ডুকীকার স্বরশাস্ত্রবিদ্ মণ্ডুক অঙ্গুলিতে স্বর-স্থাপনার একটু ভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

বাহ্যাঙ্গুষ্ঠং তু ক্রুষ্টং স্যাদ্ অঙ্গুষ্ঠে মধ্যমঃ স্বরঃ।
প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারো মধ্যমায়াং তু পঞ্চমঃ॥
অনামিকায়াং ষড়্জস্তু কনিষ্ঠায়াং তু ধৈবতঃ।
তস্যাধস্তাত্তু যোঽন্যঃ স্যান্নিষাদ ইতি তং বিদুঃ॥

নারদীশিক্ষায় পঞ্চমস্বরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মাণ্ডুকীশিক্ষা মধ্যমাঙ্গুলিতে পঞ্চমস্বরকে স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছে। মাণ্ডুকীতে তেমনি আবার ঋষভ স্বরকে বর্জিত করা হয়েছে। এ'ছাড়া নারদীশিক্ষা প্রথমস্বরকে স্থাপন করেছে অঙ্গুষ্ঠে, কিন্তু মাণ্ডুকীতে দেখা যায়—অঙ্গুষ্ঠে স্থাপিত হয়েছে মধ্যমস্বর। এই স্থাপন বা নির্দেশের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সম্প্রদায়ভেদ তা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এ'ছাড়া আর একটী বিষয় এখানে লক্ষ্য করার জিনিস যে, নারদী ও মাণ্ডুকীশিক্ষা উভয়েই বৈদিক ও লৌকিক স্বরগুলির পারস্পরিক কোন স্বাতন্ত্র্য বজায় না রেখে বরং তাদের একসঙ্গে মিশ্রিত ক'রে ফেলেছে, যেমন মূর্দ্ধা, ভ্রু, কর্ণ প্রভৃতি স্থানে স্বর-নির্দেশের প্রসঙ্গে নারদীশিক্ষা নিছক বৈদিক প্রথমাদি স্বরেরই উল্লেখ করেছে, আর মাণ্ডুকীশিক্ষা করেছে লৌকিক স্বরগুলির উল্লেখ। এর কারণ একটু রহস্যপূর্ণ, কেননা একথা বেশীরভাগ

৫৬। মন্ত্র, প্রয়োগ, গোত্র, বেদ, রুচি প্রভৃতি ভেদে যে বিভিন্ন বৈদিক শাখাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কাণ্বশাখার শুক্লযজুর্বেদের প্রসঙ্গে আচার্য সায়ণ তাঁর ভাষ্য-ভূমিকায় বলেছেন: তৈত্তিরীয়াখ্য কৃষ্ণযজুর্বেদ ও কাণ্বশাখার শুক্লযজুর্বেদের মধ্যে পার্থক্য এলো কেন? প্রার্থক্য সৃষ্টি হবার কারণ মন্ত্রপাঠবিশেষ ও প্রয়োগবিশেষ—"তথাপি মন্ত্রপাঠবিশেষৈঃ প্রয়োগবিশেষৈর্মহান্ ভেদঃ। স চানুষ্ঠাতৃভেদেন ব্যবস্থিতবিষয়ত্বায় বিকল্প্যতে * *"। তিনি পুনরায় বলেছেন: "এবং সতি যাজ্ঞবল্ক্যেন প্রবর্তিতাঃ শুক্লযজুর্বিষয়াঃ শাখাঃ পঞ্চদশ সংপদ্যন্তে", অর্থাৎ একমাত্র শুক্লযজুর্বেদেরই পনেরটী শাখা সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেগুলি হোল: "কাণ্বাঃ। ১। মাধ্যন্দিনাঃ। ২। শাপেয়াঃ। ৩। স্তাপায়নীয়াঃ। ৪। কপালাঃ। ৫। পৌণ্ড্রবৎসাঃ। ৬। আবটিকাঃ। ৭। পরমাবটিকাঃ। ৮। পারাশর্যাঃ। ৯। বৈধেয়াঃ। ১০। বৈনেয়াঃ। ১১। ঔধেয়াঃ। ১২। গালবাঃ। ১৩। বৈজবাঃ। ১৪। কাত্যায়নীয়াশ্চেতি। ১৫॥" ('শুক্লযজুর্বেদকাণ্বসংহিতা',—পণ্ডিত মাধবশাস্ত্রী-সংপাদিত, চৌখাম্বা সং, কাশী, সংবৎ ১৯৬৫)। এ'ছাড়া কৃষ্ণযজুর্বেদ, সামবেদ প্রভৃতির মধ্যেও বিচিত্র শাখা ছিল। নারদীশিক্ষায় "কঠকালাপপ্রবৃত্তেষু তৈত্তিরীয়াহ্বারকেষু চ" প্রভৃতির উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি। সুতরাং বেদপাঠ, বেদগান, বেদমন্ত্রের প্রয়োগ প্রভৃতির ব্যাপারে বৈদিক স্বর-গুলির উচ্চারণ ও অঙ্গুলি প্রভৃতিতে স্বর-স্থাপন বা সংকেত-প্রদর্শনেও মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং হওয়াও স্বাভাবিক।

ক্ষেত্রে সত্য যে, নারদী ও মাণ্ডুকী উভয় শিক্ষাকারের সময়ে বৈদিক স্বরের ব্যাপক প্রয়োগ সমাজ থেকে লোপ পেয়েছিল, কাজেই সকল রকম নির্দেশের সময়ে উভয় শিক্ষা লৌকিক স্বরেরই উদাহরণ দিতে পারত, কিন্তু তারা তা করে নি। কাজেই মনে হয় যে, বৈদিক স্বরের প্রয়োগ ও প্রচলন শিক্ষার যুগেও সমাজে মন্থর হয় নি, অথচ সমাজের প্রবৃত্তি তখন দ্রুত পরিবর্তনের দিকে ছুটে চলেছিলো এবং সেই সন্ধিক্ষণেই উভয় শিক্ষাকার আবির্ভূত হয়েছিলেন। কেননা "প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারঃ" প্রভৃতি কথাগুলির উল্লেখের পরই আবার তাঁরা লিখেছেন—"ক্রুষ্টেন দেবা জীবন্তি প্রথমেন তু মানুষাঃ" প্রভৃতি। কোন্ কোন্ প্রাণী কোন্ কোন্ স্বরকে আশ্রয় ক'রে বেঁচে থাকে সেই সকল স্বরের উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা কেবল বৈদিক প্রথমাদি স্বরেরই উল্লেখ করেছেন, লৌকিকের কোন প্রসঙ্গ তুলেন নি। শ্রুতি-নির্ধারণের বেলায়ও তাই। তাঁরা প্রথমাদি স্বরের ও সঙ্গে-সঙ্গে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী স্থান-স্বরেরও মাত্র শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। নারদীকার বলেছেন, ক্রুষ্টস্বরকে আশ্রয় ক'রে দেবতারা বেঁচে থাকেন। তারপর প্রথমস্বরে মানুষ, দ্বিতীয়ে পশুরা, তৃতীয়ে গন্ধর্ব ও অপ্সরারা, চতুর্থে পিতৃপুরুষ ও অণ্ডজপ্রাণীগণ, মন্দ্রে পিশাচ, অসুর ও রাক্ষসেরা এবং অতিস্বার-স্বরে স্থাবর ও জঙ্গম সকলে জীবন ধারণ করে। এখানে সামিক স্বরে বিশ্বচরাচর বেঁচে থাকে, লৌকিকে নয়, একথাই সুস্পষ্টভাষায় নারদীকার উল্লেখ করেছেন—"সর্বাণি খলু ভূতানি ধার্যতে সামিকৈঃ স্বরৈঃ"। কিন্তু এ'প্রসঙ্গে একটী বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, "দেবা জীবন্তি" অথবা "চতুর্থস্বরজীবিনঃ" প্রভৃতি কথাগুলির যথার্থ অন্তর্নিহিত অর্থ কি তা ঠিক-ঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন, কেননা শিক্ষাকারেরা রূপক কথার বা ভাবের মাধ্যমে সামিক স্বর ও প্রাণীদের মধ্যে একটী সম্পর্কের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন—যা আমাদের পক্ষে সত্যই দুর্বোধ্য হয়েছে। এমন কি টীকাকার ভট্টশোভাকরও এই শ্লোকগুলির ওপর যথাযথভাবে আলোকসম্পাত করতে না পারায় তিনি পাঠকের অনুধাবনশক্তির ওপরই অর্থ-নিরূপণের ভার ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাহলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত কোন-না-কোন অর্থ ও ভাব অবশ্যই আছে—যা অনুশীলনী বৃত্তির অভাবে আমাদের কাছে সুগম নয়।

কিন্তু আমরা নারদীর "অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তমে ক্রুষ্টোহ্যঙ্গুষ্ঠে প্রথমঃ স্বরঃ" প্রভৃতি

শ্লোকগুলি থেকে একটী ঐতিহাসিক উপাদানের ইঙ্গিত পাই এবং সেই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে খৃষ্টীয় ১ম থেকে ৩য় শতাব্দীর গুণী নন্দিকেশ্বর-প্রণীত 'অভিনয়দর্পণ' ও ভরত-লিখিত 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থদুটীতে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর গ্রন্থকার শার্ঙ্গদেবও তাঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে নন্দিকেশ্বর ও ভরতকে সকল বিষয়ে অনুসরণ করেছেন।

নৃত্যে ও নাট্যে বা অভিনয়ে 'মুদ্রা' একটী অপরিহার্য বস্তু। 'মুদ্রা' শব্দের অর্থ—'যা আনন্দ দান করে' ('মুদম্ আনন্দং রাতি দদাতি')। 'মুদ্রা' রস ও ভাবের প্রকাশক। তবে নৃত্যে বা নর্তনে কেবল অঙ্গাভিনয়ের ভেতর দিয়েই ভাব ও রসের অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু নাট্যে বাচিক অভিনয়ই প্রধান, আঙ্গিক তার সহকারী। মোটকথা হস্তাঙ্গুলির বিভিন্ন সন্নিবেশই মুদ্রার বাহ্যিক রূপ। গ্রীবা, চক্ষু, ভ্রূ, পদদ্বয়, বক্ষ, বাহুদ্বয়, কটি, জঙ্ঘা প্রভৃতির বিচিত্র গতিও রস এবং ভাবের প্রকাশক। আচার্য নন্দিকেশ্বর নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে ভাব-প্রকাশের মাধ্যমগুলির পরিচয়-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

> আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
> চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
> যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
> যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥ [৫৭]

'মুখের দ্বারা গান, হাতের দ্বারা গানের অর্থ, চক্ষুর দ্বারা ভাব, পদদ্বয়-দ্বারা তালের প্রকাশ করা উচিত। যেখানে হস্ত সেখানেই চক্ষু বা দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি, যেখানে মন সেখানেই ভাব ও যেখানে ভাব সেখানেই রসের অভিব্যক্তি হয়'। মোটকথা রসকে পরিবেশন করার জন্যে ভাবের, ভাবকে রূপায়িত করার জন্যে মনের, মনকে ক্রিয়াশীল করার জন্যে চক্ষু বা দৃষ্টির এবং দৃষ্টিকে প্রাণবান করার জন্যে হস্ত তথা হস্ত-সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। 'মুদ্রা' প্রতীক হিসাবে মানুষের আন্তর ভাব ও রসকে বাইরের জগতে প্রকাশ করে। এই মুদ্রার উদ্ভাবন বা সৃষ্টি হয়েছিল বৈদিক যুগে। সামগ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যুগে যখন বিভিন্ন স্বর-সন্নিবেশ ক'রে সামগান করতেন তখনই মুদ্রার প্রয়োগ হোত ছন্দ বা তাল ও ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে।

৫৭। Cf. 'অভিনয়দর্পণ' (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত, ১৩৪৪), পৃঃ ১৯-২০

নারদীশিক্ষাকারের ইঙ্গিত আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে—"অঙ্গুষ্ঠোত্তমে ক্রুষ্টো" প্রভৃতি শ্লোকে ক্রুষ্ট বা লৌকিক পঞ্চম-স্বর অঙ্গুষ্ঠের মধ্যমপ্রদেশে, প্রথম তথা মধ্যম-স্বর অঙ্গুষ্ঠে, দ্বিতীয় বা গান্ধার প্রাদেশে তথা তর্জনীতে ('প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারঃ'), মধ্যমায় তৃতীয়-স্বর অথবা ঋষভ, অনামিকায় চতুর্থ-স্বর বা ষড়্‌জ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে অতিস্বার্য বা নিষাদের সন্নিবেশ হবে।[৫৮] সামবিধানব্রাহ্মণের ভাষ্যে সায়নাচার্য স্বর-সন্নিবেশের ক্রম একটু ভিন্ন রকমের দিয়েছেন। যেমন,
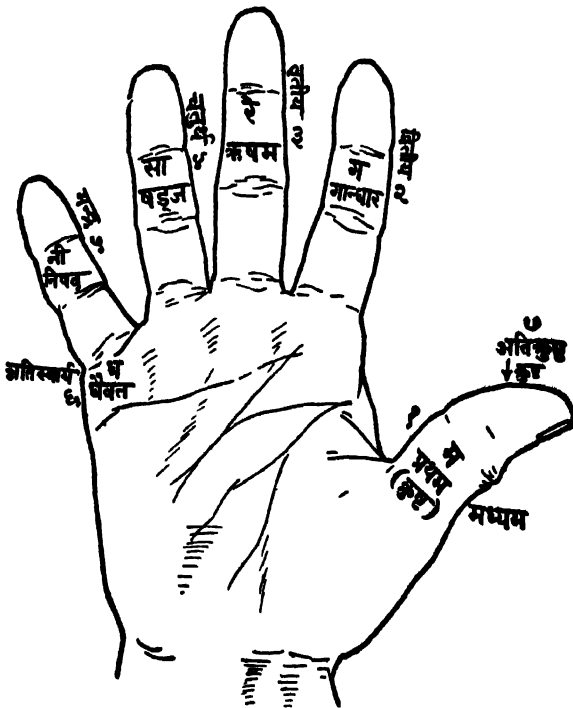
(১) প্রত্যেকটী অঙ্গুলিতে স্বর-সংস্থান

৫৮। Cf. প্রজ্ঞানানন্দ: 'রাগ ও রূপ' (১৩৫৫), পৃ ৫৫-৫৭

(২) স্বর-অনুযায়ী অঙ্গুলি-প্রদর্শন (সামগানের গাত্রবীণা)

একথা সত্য যে, মুদ্রার আবিষ্কার-কর্তা নন্দিকেশ্বর, কোহল, যাষ্টিক বা নাট্যশাস্ত্রার ভরত কেউই নন, বৈদিকযুগে সামগ ব্রাহ্মণেরাই মুদ্রার উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁদের প্রতিভার অবদান দিয়ে। নন্দিকেশ্বর কেবল 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থেই নয়, তাঁর সুবৃহৎ 'নন্দিকেশ্বরসংহিতা' এবং 'ভরতার্ণব' গ্রন্থদুটীতেও মুদ্রার আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় শিল্পাচার্য আনন্দ কুমার-স্বামী তাঁর সুবিখ্যাত *The Mirror of Gestures* (London) গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের পরে ইন্দ্র-নন্দিকেশ্বর সংবাদে ভরতার্ণবের উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটী হোল : দৈত্য-নর্তক নটশেখরের সঙ্গে নৃত্যের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্যে ইন্দ্র নন্দিকেশ্বরের কাছে নৃত্যকলা শিখ্‌তে ইচ্ছা করেছিলেন। নন্দিকেশ্বর তাই চারহাজার শ্লোকবিশিষ্ট 'ভরতার্ণব' গ্রন্থখানি রচনা ক'রে ইন্দ্রকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইন্দ্র ঐ বিস্তৃত গ্রন্থ আয়ত্ত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। নন্দিকেশ্বর তখন ইন্দ্রকে উপদেশ দেবার জন্যে 'ভরতার্ণব' গ্রন্থকে সংক্ষেপে অর্থাৎ ক্ষুদ্র কলেবরে পরিণত বা পরিবর্তিত ক'রে 'অভিনয়দর্পণ' গ্রন্থখানি রচনা করেন। ডাঃ কৃষ্ণমাচারি, ডাঃ রাঘবন প্রভৃতির অভিমতও অনেকটা তাই। পুনার ভাণ্ডারকাব ওরিয়েণ্টল ইন্‌ষ্টিটিউটে 'ভবতার্ণব' নামে হাতেলেখা একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোন কোন মনীষীর অভিমত যে, সেটী নাকি অভিনয়দর্পণ-প্রণেতা নন্দিকেশ্বরের রচিত নয়। সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্য যে, কোহল, নন্দিকেশ্বর, ভরত প্রভৃতি পরবর্তী আচার্যেরা বৈদিক সামগদের হস্ত তথা অঙ্গুলি-সন্নিবেশের বা মুদ্রার নিদর্শনকে অনুসরণ ক'রেই তাঁদের গ্রন্থে বিচিত্র আঙ্গিক বিকাশের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

সামস্বরের সন্নিবেশক চিত্রের দ্বিতীয়টীর মধ্যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ হস্তকরণ দুটীই পরবর্তীকালের পতাক, অর্ধচন্দ্র ও অনেকটা হংসপক্ষ মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যে মেলে। বৈদিকযুগের সামগ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি অনুসারে মুদ্রার প্রচলন ছিল, অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, 'মুদ্রা' শব্দটী তাঁরা ভাষায় ও লিখনে ব্যবহার না ক'রে কেবল করণ-অনুসারেই প্রয়োগ করেছিলেন।

মুদ্রার পরিচয় দিতে গিয়ে নন্দিকেশ্বর তাঁর অভিনয়দর্পণের 'হস্তভেদাঃ' পর্যায়ে অসংযুত (single) ও সংযুত (double বা combined) হস্তলক্ষণ অথবা মুদ্রার পরিচয় দিয়েছেন—"অসংযুতাঃ সংযুতাশ্চ হস্তদ্বেধা নিরূপিতা"। 'অসংযুত' হস্তলক্ষণের ভেদ-সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন,

পতাকস্ত্রিপতাকোঽর্দ্ধপতাকঃ কর্তরীমুখঃ।
ময়ূরাখ্যোঽর্দ্ধচন্দ্রশ্চ অরালঃ শুকতুণ্ডকঃ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ কটকামুখঃ।
সূচী চন্দ্রকলা পদ্মকোশঃ সর্পশিরস্তথা॥
মৃগশীর্ষঃ সিংহমুখঃ কাঙ্গুলশ্চালপদ্মকঃ।
চতুরো ভ্রমরশ্চৈব হংসাস্যো হংসপক্ষকঃ॥
সন্দংশো মুকুলশ্চৈব তাম্রচূড়স্ত্রিশূলকঃ॥
ইত্যসংযুতহস্তানামষ্টাবিংশতিরীরিতা॥[৫৯]

পতাক, ত্রিপতাক, অর্দ্ধপতাক, কর্তরীমুখ, ময়ূর, অর্দ্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ডক, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, চন্দ্রকলা, পদ্মকোশ, সর্পশির, মৃগশীর্ষ, সিংহমুখ, কাঙ্গুল, অলপদ্মক, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপেক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড় ও ত্রিশূল এই ২৮ প্রকার অসংযুত হস্তলক্ষণভেদ।

নাট্যশাস্ত্রে ২৪ রকম লক্ষণভেদের উল্লেখ আছে এবং সেগুলি হোল: পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্দ্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ বা খটকামুখ, সূচী, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, লাঙ্গুল (কালাঙ্গুল?), উৎপলপদ্ম বা অলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, ঊর্ণনাভ, তাম্রচূড়—

পতাকস্ত্রিপতাকশ্চ তথা বৈ কর্তরীমুখঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রো হ্যরালশ্চ শুকতুণ্ডস্তথৈব চ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ কটকামুখঃ।
সূচ্যাস্যঃ পদ্মকোশশ্চ তথা বৈ সর্পশীর্ষকঃ॥
মৃগশীর্ষঃ পরো জ্ঞেয়ো হস্তাভিনয়যোক্তৃভিঃ।
লাঙ্গুলোৎপলপদ্মশ্চ চতুরো ভ্রামরস্তথাঃ॥
হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ সন্দংশো মুকুলস্তথা।
ঊর্ণনাভস্তাম্রচূড়শ্চতুর্বিংশদিমে করাঃ॥[৬০]

৫৯। Cf. (ক) 'অভিনয়দর্পণ', (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সংপাদিত), ৮৯—৯২
(খ) রাজেন্দ্র-শংকর: *Symbolism of Mudras in Hindu Dancing* (—The Four Arts Annual, 1935), pp. 39—44.

৬০। Cf. (ক) 'নাট্যশাস্ত্র', (কাশী, ১৯২৯), ৯।৪—৭
(খ) 'সঙ্গীতরত্নাকর', (পুণা সং) ৭।৮০—৮২

নান্দকেশ্বরের মতে ২৮ প্রকার 'অসংযুত' ও ২৩ প্রকার 'সংযুত' হস্তকরণ বা মুদ্রা

১। পতাক, ২। ত্রিপতাক, ৩। অর্দ্ধপতাক, ৪। কতরীমুখ, ৫। ময়ূর, ৬। অর্দ্ধচন্দ্র, ৭। অরাল, ৮। শুকতুণ্ড, ৯। মুষ্টি, ১০। শিখর, ১১। কপিত্থ, ১২। কটকামুখ, ১৩। সূচী, ১৪। চন্দ্রকলা, ১৫। পদ্মকোশ, ১৬। সর্পশীষ।
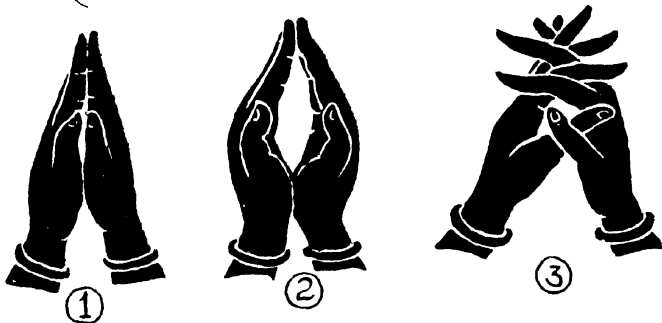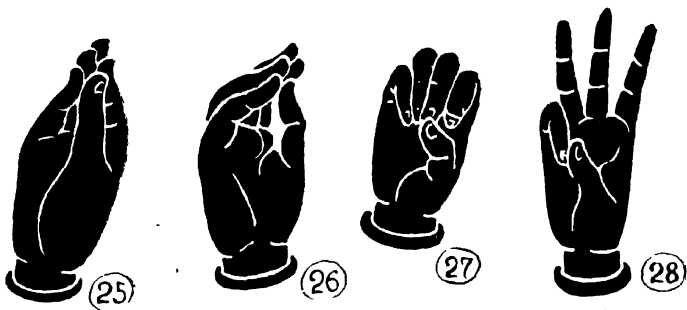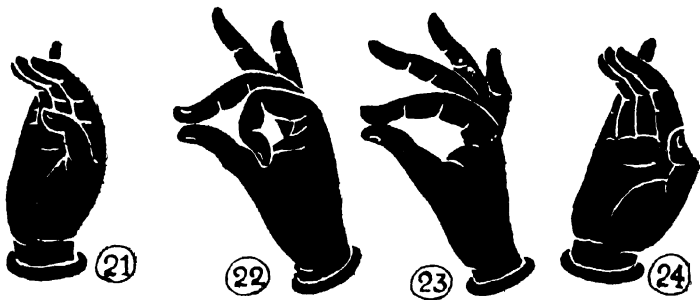
১৭। মৃগশীর্ষ, ১৮। সিংহমুখ (পার্শ্ব), ১৯। কাঙ্গুল, ২০। অলপদ্ম, ২১। চতুর (পার্শ্ব),
২২। ভ্রমর, ২৩। হংসাস্য, ২৪। হংসপক্ষ, ২৫। সন্দংশ, ২৬। মুকুল,
২৭। তাম্রচূড়, ২৮। ত্রিশূল। ১। অঞ্জলি, ২। কপোত, ৩। কর্কট।
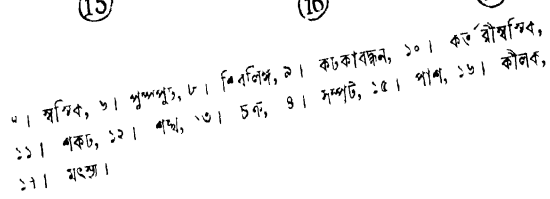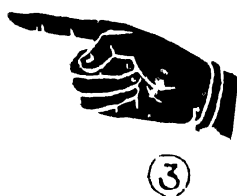
৪। স্বস্তিক, ৬। পুষ্পপুট, ৮। শিবলিঙ্গ, ৯। কটকাবর্দ্ধন, ১০। কর্তরীস্বস্তিক, ১১। শকট, ১২। শঙ্খ, ১৩। চক্র, ১৪। সম্পুট, ১৫। পাশ, ১৬। কীলক, ১৭। মৎস্য।

১৮। কূর্ম, ১৯। ববাহ, ২০। গরুড, ২১। নাগবন্ধ, ২২। খট্বা, ২৩। ভেরুণ্ড।
১। ব্যাঘ্র, ২। ঊর্ণনাভ। নাট্যশাস্ত্র ৯।১২০), ৩ বাণ (নাট্যশাস্ত্র ৯।১২১),
৪। অর্দ্ধসূচী, ৫। কটক, ৬। পল্লী।

এদের মধ্যে 'পতাকহস্ত' মুদ্রায় অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে প্রসারিত ও অঙ্গুষ্ঠটি কুঞ্চিত অবস্থায় থাকে। নাট্যশাস্ত্রে এই মুদ্রাটির বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য আছে। অভিনয়দর্পণে আছে—"অঙ্গুল্যঃ কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠঃ সংশ্লিষ্টাঃ প্রসৃতা যদি, স পতাককরঃ" (৯৩ শ্লো') এবং নাট্যশাস্ত্রে আছে—"কুঞ্চিতশ্চ তথাঙ্গুষ্ঠঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ" (৯।১৮)। নাট্যশাস্ত্রকারের মতে, পতাকলক্ষণে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ মিলিতিভাবে প্রসারিত ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত থাকে। আবার সঙ্গীতরত্নাকরে (৭।১০৪-১১০) বলা হয়েছে, অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিতভাবে তর্জনীমূলে সংলগ্ন হবে ও অপর অঙ্গুলিগুলি মিলিতভাবে প্রসারিত থাকবে এবং সঙ্গে-সঙ্গে করতলও প্রসারিত হবে। প্রত্যেকটী হস্তলক্ষণের আবার ব্যবহারিক প্রয়োগ বা বিনিয়োগ আছে সেগুলি ভাবের পরিচায়ক ও রসের দ্যোতক।

সংযুতহস্তের লক্ষণভেদ সম্বন্ধে অভিনয়দর্পণকার উল্লেখ করেছেন,

অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকস্তথা ॥
ডোলাহস্তঃ পুষ্পপুট উৎসঙ্গঃ শিবলিঙ্গকঃ।
কটকাবর্দ্ধনশ্চৈব কর্তরীস্বস্তিকস্তথা ॥
শকটঃ শঙ্খচক্রে চ সম্পুটঃ পাশাকীলকৌ।
মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ গরুড়ো নাগবন্ধকঃ ॥
খট্বা ভেরুণ্ড ইত্যতে সখ্যাতাঃ সংযুতাঃ করাঃ।
ত্রয়োবিংশতিত্যুক্তাঃ পূর্বর্গৈর্ভরতাদিভিঃ ॥[৬১]

অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, ডোলা (হস্ত), পুষ্পপুট, উৎসঙ্গ, শিবলিঙ্গ, কটকাবর্দ্ধন, কর্তরী, স্বস্তিক, শকট, শঙ্খ, চক্র, সম্পুট, পাশ, কীলক, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, গরুড়, নাগবন্ধ, খট্বা ও ভেরুণ্ড। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ২৩ প্রকার হস্তলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় আনন্দ কুমার-স্বামী *The Mirror of Gestures* বইয়েও এদের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন।[৬২] অনেকের মতে,

৬১। (ক) Cf. 'অভিনয়দর্পণ', (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সংপাদিত) ১৭২—১৭৫; (খ) নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ৯।১১—১৭, ১৮৪—২০৯; (গ) 'সঙ্গীতরত্নাকর' (পুণা সং), ৭।৯৭—১০০, ১০১—১০৩; (ঘ) রাজেন্দ্র-শংকর: *Symbolism of Mudras in Hindu Dancing* (—The Four Arts Annual 1935), pp. 39.

৬২। ডাঃ আনন্দ কুমার-স্বামী তাঁর *The Relations of Art and Religion in India* প্রবন্ধে প্রতীক ও মুদ্রা-সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "Religious symbolism in Indian

২৭, আবার কারো মতে ৩০ প্রকার সংযুত-হস্তলক্ষণ। ভট্ট অভিনবগুপ্ত অসংযুত ও সংযুত লক্ষণগুলির মিলিত সংখ্যা বলেছেন ৬৭ প্রকার, কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের মতে সর্বসমেত ৬৪ রকম হস্তলক্ষণ। মোটকথা মুদ্রার সংখ্যা, লক্ষণ ও প্রয়োগব্যাপারেও মতভেদের অন্ত নেই এবং বিভিন্ন রুচি থাকার জন্যে ভেদ হওয়া স্বাভাবিক আমরা স্বীকার করি।[৬৩]

হস্তলক্ষণগুলির ঋষি, বংশ এবং বর্ণও কল্পিত হয়েছে এবং ভারতবর্ষের মতন অধ্যাত্মভূমিতে এ'রকম কল্পনার সার্থকতা আছে তা আমরা আগেও উল্লেখ করেছি। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন: "বেদমন্ত্রের সহিত এ-বিষয়ে ইহাদিগের যথেষ্ট সাম্য আছে"।[৬৪] প্রকৃতপক্ষে বেদের ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তাৎপর্যের সঙ্গে হস্তলক্ষণগুলির সাম্য ও সাদৃশ্য আছে বোলেই বৈদিক উপাসনায় এবং তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতিতে মুদ্রাগুলি সসম্মানে আসন লাভ করেছে। দেবতাদের পূজাপদ্ধতিতে মুদ্রা বা হস্তলক্ষণগুলিও ভাব ও রসের পরিবেশক। মুদ্রাগুলি পূজায় সাধকের মনোভাবের প্রকাশক বা প্রতীক। সাধক বা পূজকগণ বৈদিক কাল থেকে যাগযজ্ঞ থেকে আরম্ভ ক'রে আজ-পর্যন্ত সকল রকম পূজায় এবং হোমানুষ্ঠান প্রভৃতিতে মুদ্রাগুলি ব্যবহার ক'রে আসছেন ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যম বা বাহক হিসাবে। সুতরাং মুদ্রাগুলির সৃষ্টি বৈদিক যুগেই হয়েছে এবং এদের পেছনে শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে-সঙ্গে অধ্যাত্ম-সম্পদও নিহিত আছে।

art is of two kinds, the concrete symbolism of attributes, and the symbolism of gesture, sex, and physical peculiarities. The symbolism of gesture includes the various positions of the hand known as *mudras* ; of physical peculiarities the third eye of Siva or the elephant-head of Ganesa are instances. The subject of sex-symbolism is generally misinterpreted, but, in fact, this imagery drawn from the deepest emotional experiences is a proof both of the power and truth of the art and the religion. India had not feared either to use sex-symbols in its religious art, or to see in sex itself on intimation of the Infinite (*Cf*). Brihadaranyaka Up., 4. 3. 21, also 1. 4. 3-4)."—Vide *The Proceedings of the International Congress for the History of Religions* (1908), part II, p. 71.

৬৩। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত 'অভিনয়দর্পণ' (১৩৪৪), পৃ: ৬৭—৬৮ দ্রষ্টব্য।

৬৪। 'অভিনয়দর্পণ' (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত), পৃ: ৪৩

মুদ্রার উৎপত্তি ও রূপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বিচিত্রভাবে আলোচনা করেছেন। জিন্ পৃজিলাস্কি (Jean Przyluski) বলেছেন: 'মুদ্রা' শব্দটীর উল্লেখ বৈদিকোত্তর সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং এর সাধারণ অর্থ 'শীলমোহর'। হিন্দীভাষায় 'মুদ্রা' ও 'মুদ্রা' দু'রকম শব্দই দেখা যায়। খস্‌ভাষায় শীলমোহরের নাম 'মুন্‌রো' *(Munro)*, এবং সিন্ধিভাষাতে বলে 'মুন্দ্রী' *(Mundri)*। তিনি বলেছেন, মুদ্রার উৎপত্তি কখন্ থেকে ও কেমন ক'রে হোল তা নিশ্চয় ক'রে বলা যায় না। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সামগানের হস্ত ও অঙ্গুলি-সংকেত থেকেই মুদ্রার সৃষ্টি ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে হয়েছে। এফ. হোমেলের (F. Hommel) অভিমত যে, অসিরীয় ভাষা 'মুসরু' (*Musaru*) থেকে 'মুদ্রা'-শব্দটীর উৎপত্তি হোয়ে থাকবে, কেননা মুসরুর অর্থ 'লেখা' বা 'শীলমোহর'। 'মুসরু' শব্দ থেকে 'মুদ্রা' শব্দটী সৃষ্টি হয়েছে এভাবে—মুসরু>মুজ্‌রা>মুদ্রা। পালিভাষায় মুদ্রাকে বলা হয় 'মুদ্দা'। কিন্তু জাঙ্‌কার (Junker), লুডার্স (Luders) প্রভৃতি মনীষীরা হোমেলের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করেছেন।

বর্তমান হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গালা, কানারি প্রভৃতি ভাষায় 'মুদ্রা' শব্দের অর্থ 'টাকা' বা 'শীলমোহর'। হিন্দুস্থানীতে মুদ্রাকে মোহরও বলে। অধ্যাপক লুডার্স বলেছেন, খোটানে মুদ্রা তথা টাকার নাম 'মুর' এবং তা থেকেই 'মুদ্রা'-শব্দের সৃষ্টি হয়েছে বোলে মনে হয়। পাশ্চাত্য মনীষীরা বৈদিক সামগানের প্রয়োগ ও প্রকাশভঙ্গী সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেন নি বোলেই মনে হয়।

জিন্ পৃজিলাস্কি আবার বলেছেন, মাঙ্গলিক ধর্মানুষ্ঠানে অথবা আভিচারিক কোন কর্মে 'মুদ্রা'-শব্দে হস্তভঙ্গী বুঝায় এবং একথা ঠিকই। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন: "নর্তনকলায় যে-সকল হস্তভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সাধারণত সেগুলিকে মুদ্রা নামে অভিহিত করা হয়। কেবল নর্তন ও নাট্যাভিনয় কেন, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনাতেও এই প্রকার দেবপ্রীতিকর নানারূপ হস্তভঙ্গী (মুদ্রা) ও দেহভঙ্গী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নর্তনমুদ্রা ও উপাসনা-মুদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূপভেদ থাকিলেও উভয়ের মূলস্বরূপে কোন পার্থক্য নাই। মূলতঃ এই উভয় শ্রেণীর মুদ্রাই সাঙ্কেতিক মূকভাষা মাত্র"।[৬৫] জিন্ পৃজিলাস্কি কেবল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে মুদ্রার

৬৫। Cf. 'অভিনয়দর্পণ' (পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-সংপাদিত), ভূমিকা, পৃ ৷/০

উপযোগিতার কথা বলেছেন, কিন্তু কি হিন্দু ও কি বৌদ্ধ উভয় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেই সর্বদা মুদ্রার প্রচলন আছে। অধ্যাপক ফিনোট (L. Finot) বলেছেন: 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ আছে[৩৩] এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে মণ্ডল, মন্ত্র, পূজা ও মুদ্রা এই চারটীর প্রয়োগ অপরিহার্যভাবে আছে। পূজার অপরিহার্য অঙ্গরূপেও মুদ্রার ব্যবহার হয়।

শৈব ও বৈষ্ণবদের অনুষ্ঠানেও মুদ্রার ব্যবহার আছে। অধ্যাপক পৃজিলাস্কি বলেছেন: 'রামপূজাসরণি' গ্রন্থে ও বিশেষভাবে 'নারদপঞ্চরাত্র' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ২৪ রকম মুদ্রার উল্লেখ আছে। সেগুলি সেই সময়ে সন্ধ্যানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হোত। তিনি আরও বলেছেন যে, বৈদিক যুগেও মুদ্রার ব্যববহার অবশ্যই ছিল, কেননা বৈদিক সাহিত্যগুলিই তার প্রমাণ। তিনি বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য (১।১২১) ও পাণিনীয়শিক্ষার উল্লেখ ক'রে মন্তব্য করেছেন: "Going back to the Vedic times, however, one finds the word and the gesture on one plane, and being given the same magical or religious importance"। বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যে ও পাণিনীয়শিক্ষায় 'হস্তেন' শব্দের উল্লেখ হস্তভঙ্গীরই প্রকাশক। যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যেও মুদ্রার তথা হস্তভঙ্গীর উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়।

'মুদ্রা' অর্থে তন্ত্রে দেবতা-পত্নী দেবীকেও বুঝায়। মাননীয় ফিনোট এ'সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

"*Mudra*—or more usually *maha-mudra*—has in the Tantras, besides the ordinary sense, that of *woman*, when a woman is associated to the rites. For instance, in the *abhiseka* the master and desciple both have their *mudra*, and, however discreet the expression may voluntarily be, the context does not leave any doubt upon the part which these feminine assistants play. Vajravarahi is given the name of *maha-mudra*, in quality of Heruka's First Wife (*agramahisi*). —(V. S. *Mulamantra*, p. 61)."

সুতরাং 'মুদ্রা' শব্দের দ্বারা টাকা, মোহর বা শীলমোহর ও হস্তভঙ্গীর মতন দেবী তথা দেবতা-পত্নীকেও বুঝায়। এ'ছাড়া তন্ত্রে পঞ্চমুদ্রার মধ্যে চালকড়াই-ভাজাকেও মুদ্রা বলে। পরিশেষে পণ্ডিত পৃজিলাস্কি বলেছেন,

"The study of the word *mudra* in fact, shows the permanence of the

৩৩। Cf. 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প', ৩২—২৪ অধ্যায়।

tendencies which have ruled the first manifestations of Buddhist art, and through it very different of the political, economical and religious life of India may be linked together."[৬৭]

আসলে জিন্ পৃজিলাস্কি মুদ্রা কখন্ থেকে প্রচলিত হোল তার কোন সঠিক বিবরণ দিতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রার উৎপত্তি বৈদিক যুগেই হয়েছিল এবং আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিচিত্র যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও সামগানে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক বা দ্যোতক হিসাবে সামগানকারীরা যে সকল হস্তভঙ্গী ব্যবহার করিতেন তাদের থেকেই মুদ্রার সৃষ্টি হয়েছে।

মুদ্রার মতন নাটক বা নাট্যানুষ্ঠান এবং সঙ্গীতের স্বরলিপিপদ্ধতির সৃষ্টিও বৈদিক যুগে হয়েছে। ঋগ্বেদের ১০-ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে পুরূরবা ও তাঁর পত্নী উর্বশীর মধ্যে কথোপকথন; আবার ১০-ম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে ইন্দ্র ও সরমা-নাম্নী কুক্কুরীর উপাখ্যান, ঋগ্বেদের ১০-ম মণ্ডলের ১৬১ সূক্তে ত্বষ্টাদেবের ছদ্মবেশে ঋতুগণের গৃহে গমন ও তাদের প্রতি সম্ভাষণ, পুনরায় ঐ ১০-ম মণ্ডলের ১০ম সূক্তে যম ও তাঁর ভগ্নী যমীর মধ্যে কথোপকথন প্রভৃতি ঘটনায় ও অনুষ্ঠানে নাটকের বীজই নিহিত আছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে শুনঃশেপের আখ্যান, ইক্ষ্বাকুবংশজাত বেধার পুত্র হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান প্রভৃতি থেকেও ক্রমে নাটকের বিকাশ ভারতীয় শিল্পী-সমাজে সম্ভব হয়েছে।[৬৮]

স্বরলিপি-সম্বন্ধেও তাই, তবে উন্নত আকারের স্বরলিপির ও তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ হয়েছিল বৈদিক যুগেরও অনেক পরে ও এমন কি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী 'সঙ্গীতরত্নাকর'-প্রণেতা শার্ঙ্গদেবেরও পরে। বৈদিক মন্ত্রগুলিতে স্বরের যে চিহ্ন বা স্বর-সংকেত পাওয়া যায় তা মাত্র উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটী বৈদিক স্বরের। তবে বৈদিক স্বরের স্বরচিহ্নও নানান্ রকমের ছিল; শাখাভেদে তাদের প্রয়োগ ও গানের প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। স্বরের চিহ্ন বা স্বরলিপির অনুযায়ী উচ্চারণভঙ্গী যেমন পৃথক পৃথক

৬৭। Vide *Indian Culture*, Vol. II, April, 1936, pp. 715—719. Cf also (ক) এইচ., লুডার্স: Die sakischen Mura, SBPAW., XXXIX, p. 742, (খ) *The Pali Text Society's English-Pali Dictionary* SV. *mudda.* and *muddika,.* (গ) *Mahavastu*, II, p. 96.

৬৮। এই 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে নাট্যশাস্ত্রের আলোচনার সময় এ'সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

হয়েছিল তেমনি ভাষায় অর্থেও প্রার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ঋগ্বেদের স্বরোচ্চারণ-রীতিকে সামবেদসংহিতা, অথর্ববেদসংহিতা, তৈত্তিরীয়সংহিতা, বাজসনেয়ি-সংহিতা প্রভৃতিতে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বাজসনেয়িসংহিতার মধ্যে স্বরচিহ্নে কিছু-কিছু প্রার্থক্যও আছে। ঋগ্বেদের স্বরচিহ্নে বা স্বরলিপিতে উদাত্ত স্বরের কোন চিহ্ন নাই এবং তার কোন কারণও বুঝা যায় না, সুতরাং অনুদাত্ত ও স্বরিতের মধ্যবর্তী অক্ষরে কোন চিহ্ন বা সংকেত না থাকলেও তাকে উদাত্ত হিসাবে গণ্য করতে হয়। শতপথব্রাহ্মণের স্বর-লিপিপদ্ধতিও আবার সামান্য পৃথক।[৬৯]

সামগানে স্বরের মাত্রা ও বিভাগ,

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
মূ র্ধা নং দি বো অ র তিং পৃ থি ব্যা।

১ — স্বরিত, ২ — উদাত্ত এবং ৩ — অনুদাত্ত। এটী 'আজ্যদোহম্'-সামের নিদর্শন। আজ্যদোহম্-সামের পাঠ যেমন,

২র ২র ২র ২র ৩ ৪র ৫ ২র ১র
হাউ, হাউ, হাউ। আ জ্য দো হম্। ৩। মূ র্ধা নংদাই।
২ ১ ২ ৩ ৪ ৫
বা S ৩ অর। তিং পৃ থি ব্যাঃ॥

'র' শব্দের দ্বারা স্বরকে দীর্ঘ (অধিকক্ষণ স্থায়ী) হিসাবে বুঝতে হবে। সামবেদসংহিতার উত্তরার্চিকের ১৬শ অধ্যায়ের একটী মন্ত্রে (৩য়) স্বর-নির্দেশের নিদর্শন যেমন,

৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩
ভদ্রোভদ্রয়াসচমানআগাৎ
১ ২ ২ ২ ৩ক ২র ৩ ২
স্বসারঞ্জারোঅভ্যেতিপশ্চাৎ।
৩ ১র ২র ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১
সুপ্রকেতৈর্দ্যুভিরগ্নির্বিতিষ্ঠন্
২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ১ ২
রুশদ্ভির্বর্ণৈরভিরামমস্থাৎ॥

৬৯। Cf. 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' (৩য় সংখ্যা, সন ১৩৭২, পৃ° ১২১—১৩৬ এবং ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩৭২, এবং ১৪৪—১৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত 'বৈদিক ভাষার স্বরের সুর' ধারাবাহিক প্রবন্ধ) দ্রষ্টব্য।

'আজ্যদোহম্'-সামকে বর্তমান লৌকিক স্বরের সাহায্যে প্রকাশ করার রীতি—

২র ২র ২র ২র৩ ৪র ৫ ২র৩ ৪র ৫
হাউ, হাউ, হাউ। আজ্য দো হম্। আজ্য দো হম্।
সা-সা, সা-সা, সা-সা। সা-নি ধ-প স-নি ধ- প।

২র৩ ৪র ৫ ২র ১র ২ ১
আজ্য দো হম্। মূর্ধা নং দা ই। বাS ত অ র।
সা-নি ধ- প সা-রি S রি রি রি সাS নি রি রি

২ ৩ ৪ ৫
তি পৃ থি ব্যাঃ।
সা নি ধ প।

এই সামে ২৭টী পর্বন্ বা সাঙ্গীতিক অংশ আছে। এদের মধ্যে ৭টীকে মাত্র স্বর-সংকেত দিয়ে এখানে দেখানো হোল। 'আজ্যদোহম্'-সাম সর্বদাই ২ সংখ্যা তথা উদাত্ত স্বর দিয়ে আরম্ভ হয়। প্রথমে প্রণব (ওঁ) আরম্ভ করতে হয়—"প্রণবং প্রাক্ প্রযুঞ্জীত"। লৌকিক স্বর প্রয়োগ করলে এই 'আজ্যদোহম্'-সামে ৪টী অথবা ৫টী স্বর—সা রি নি ধা পা (—সা রি নি ধা পা) ব্যবহৃত করা যেতে পারে। অনেকের মতে, সামগানে মাত্র তিনটী স্বরের ব্যবহার হয় এবং সেই লৌকিক (অবশ্য বর্তমান কালে) স্বর তিনটী হোল নি সা রি। অনেকে নি সা রি গা মা অথবা নি সা রি গা মা পা স্বরেরও ব্যবহার করেন। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতগুণী এম. এস. রামস্বামী আয়ার নারদীর (পৃঃ ৩৯৫) "সামসু ত্র্যন্তরম্"—'সামগানে তিনটী স্বরের অন্তর বা ব্যবধান থাকা উচিত' এই প্রমাণ অনুসারে 'গা রি সা' স্বর তিনটীর ব্যবহার করেছেন। যেমন,

সাস সাস সাস সা । স রি গা রিসা সা গা রি স গ স
হাউ হাউ হাউ বা । অ গ্নি মী লে পু রো হি তং দে বে

গরি গ স গরি সগরি সাস সাস সাস সা ।
যু নি থি মাং আহং হাউ হাউ হাউ বা ।

সা গা রি রসগরি স গ রি ।
য জ্ঞ স্য দেবা—মৃ ত্বি জম্ ।

এন. এস. রামচন্দ্রম্ পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রীর পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে "অগ্নিমীলে—" মন্ত্রটীর বা সামগানের স্বরলিপির আকার দিয়েছেন তিনটি মাত্র স্বরের সাহায্যে। যেমন,

নি- সা সা রি রিসা নি সা রি সা নি সা রি নি সা নি
অগ্ নি মী — লে পু রো হি তম্ যজ্ঞ স্য — দে ব মৃ
সা সা রি
ত্বি জম্ —

কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে যে, সামগানের স্বরগুলির গতি নিম্নদিকে, অর্থাৎ অনুদাত্ত বা খাদ (মন্দ্র) স্বরের দিকে আরোহণক্রমে হয়, যেমন রি সা নি, রি সা নি ধা, রি সা নি ধা পা প্রভৃতি। তাই সামিক ক্রুষ্টাদি স্বরের বেলায় সামতন্ত্রকার বলেছেন—"ক্রুষ্টাদয়ঃ উত্তরোত্তরং নীচা ভবন্তি"। শুধু তাই নয়, ৭টী কারণে সামগানের স্বরগুলি নিম্ন তথা মন্দ্রের দিকে লীলায়িত হয়। পণ্ডিত এম. এস. রাম স্বামী আয়ার এই ৭টী কারণের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "Six reasons to prove that the *Yamas* were in the descending order :

(a) যঃ সামগানাম্ etc.—*Naradi-Siksa.*

(b) ক্রুষ্টাদয়ঃ উত্তরোত্তরং নীচা ভবন্তি।—*Samatantra.*

(c) তেষাং দীপ্তিজোপলব্ধিঃ—*Taittiriya-pratisakhya*, XXIII, 14.

(d) The fact that in Vocal Music (which *Samagana* has wholly been) the telling notes are necessarily high.

(e) The fact that the *Samagana* is sung even today in a downward course.

(f) The very nature of a seed (not excluding the seed of music) is to sprout first, downward, and then, shoot up."

লৌকিক স্বরের গতি বৈদিক স্বরের বিপরীত, অর্থাৎ আরোহগতিতে উচ্চ (তারস্বরের) দিকে, যেমন নি সা রি, নি সা রি গা, নি সা রি গা মা, নি সা রি গা মা পা প্রভৃতি।[১০]

১০। Cf. (ক) এম. এস. রাম-স্বামী আয়ার: *Samagana* (—Journal of the Music Academy, Vol. V, 1934), pp. 2—16; (খ) লক্ষ্মণ-শংকর ভট্ট দ্রাবিড়

ঋক্‌সংহিতায় স্বরচিহ্ন বা স্বর-সংকেত যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা আগেই উল্লেখ করেছি। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির শীর্ষে (মাথায়) সরা দাড়ি এবং নীচে রেখা দিয়ে স্বরোচ্চারণপ্রণালী দেখানো হয়েছে। যেমন,

স্তুবোসাবাংবরুণমিত্ররাতির্গবাংশতাপৃক্ষ্যামেষুপজ্রে

শ্রুতরথেপ্রিয়রথেদধানাঃ সন্তঃ পুষ্টিংনিরুন্ধানাসো অগ্মন্ ॥ ১।২।৭

অথবা—

স্তুবে | সা | বাম্ | বরুণ | মিত্র | রাতিঃ | গবাম্ | শতা | পৃক্ষয়ামেষু | পজ্রে |

শ্রুতহরথে | প্রিয়হরথে | দধানাঃ | সন্তঃ | পুষ্টিম্ | নিহরুন্ধানাসঃ | অগ্মন্ ॥

এর পর শিক্ষাকার নারদ সূক্ষ্ম-অন্তরস্বররূপ শ্রুতির প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং তাও মাত্র সামিকস্বরগুলির। শ্রুতির প্রচলন ঔপনিষদিক যুগেই আমরা পাই এবং তা আগে উল্লেখিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ২য় প্রপাঠকে হিংকার, প্রস্তাব, আদি, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন এই সাতটী ভক্তি বা বিভাগের উল্লেখ আছে। এই সাতটী ভক্তিতে অক্ষরের সমষ্টি বাইশটী। ছান্দোগ্য উপনিষদে (২।১০।২-৪) উল্লিখিত হয়েছে —"তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি"। এই বাইশটী অক্ষর সূক্ষ্ম-স্বরোচ্চারণের প্রতীক-বিশেষ এবং এগুলিই যে পরে বাইশটী সূক্ষ্মস্বরে বা শ্রুতিতে (শ্রবণযোগ্য স্বরে) রূপায়িত হয়নি তা কে বলতে পারে? সূক্ষ্মস্বর কম্পনেরই সমষ্টি। কম্পনের প্রসঙ্গ তুলে অসংখ্য সূক্ষ্মস্বরের অস্তিত্ব আমরা পাই, কেননা বর্তমান পাশ্চাত্য নির্ধারণপ্রণালীর মারফতে আমরা জানি যে, ষড্‌জাদি সাত স্বরের সমষ্টি কম্পন-সংখ্যা = ২৩৮০, এবং প্রত্যেকটী স্বরের কম্পন-সংখ্যা হোল = সা—২৪০, রি—২৭০, গা—৩০০, মা—৩২০, পা—

(সামবেদী): *The Mode of Singing Sama-Gana* (—The Poona Orientalist, Vol. IV, April—July, 1939), pp. 1—21; (গ) ডব্লিউ জে. হেণ্ডার্স: *Early History of Singing*, pp. 38, 87; (ঘ) সূর্যকান্ত শাস্ত্রী-সম্পাদিত *Rikiantra*, p. 18; (ঙ) ব্লুমফিল্ড: *Religion of the Veda*, p. 39; (চ) *Descriptive Catalogue of the Madras Govt. Oriental Manuscript Library*, Vol. I, pt. I, pp. 3—4, 77—78.

৩৬০, ধা—৪৪০, নি—৪৫০, তারার সা—৪৮০। অবশ্য এই কম্পন-সংখ্যার পিছনেও মতভেদ আছে এবং ব্যবধানও অতি সামান্য। কিন্তু এ'সকল কম্পন কানে শোনা যায় না, তাই সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা 'শ্রুতি' বা শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্মস্বরগুলিকে স্থূল সাতটী স্বরের কারণ হিসাবে গণ্য করেছেন। তাঁরা সাতটী স্বরের ব্যবধানে (অন্তরে) বাইশটী শ্রবণযোগ্য স্বরেরও পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা নির্ধারণ করেছেন যে, ষড়্জে চারটী শ্রুতি আছে, অর্থাৎ নিষাদ থেকে ষড়্জের ব্যবধানে পাওয়া যায় চারটী শ্রুতির বিকাশ, ঋষভে আছে তিনটী, গান্ধারে দু'টী, মধ্যমে চারটী, পঞ্চমে চারটী, ধৈবতে তিনটী ও নিষাদে দুটী শ্রুতি। এই বাইশটীর বেশী শ্রুতিরও কল্পনা করা যায়, কিন্তু সেগুলিকে শোনা যায় না, তাই শাস্ত্রকারেরা বাইশটীমাত্র শ্রুতিকেই সাতস্বরের অন্তরে সূক্ষ্ম ও শ্রবণযোগ্য স্বর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শাস্ত্রকারেরা তাদের কবিত্বপূর্ণ নাম, বর্ণ, দেবতা প্রভৃতিরও নির্ণয় করেছেন[৭১] ভারতীয় সঙ্গীতের বিচারপ্রণালী ও বিকাশভঙ্গ সত্যই অপূর্ব।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময় থেকে (খৃ° ২য়-৩য় শতাব্দী) আজ-পর্যন্ত আমরা লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের শ্রুতি নিয়ে অনুশীলন করি। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ষড়্জ ও মধ্যম এই গ্রামদুটীর পরিচয় দেবার সময়ে প্রত্যেকটী গ্রামের শ্রুতি-সংখ্যার উল্লেখ করেছেন—"অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি। তত্রাশ্রিতা দ্বাবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ। যথা, তিস্রোদ্বে চ চতস্রশ্চ চতস্রস্তিস্র এব চ, দ্বে চতস্রশ্চ ষড়্জাখ্যে গ্রামে শ্রুতিনিদর্শনম্" (২৮।২২)। ভরত এই শ্রুতিগুলিকে বীণার তারের দৈর্ঘ্য-পরিমাপের মাধ্যমে নির্ণয় করেছেন। প্রত্যেকটী স্বরের শ্রুতি-সংখ্যার নির্ধারণপ্রণালীও তিনি উল্লেখ করেছেন,

ষড়্জশ্চতুঃ শ্রুতির্জ্ঞেয় ঋষভস্ত্রিঃশ্রুতিঃ স্মৃতঃ।
দ্বিশ্রুতিশ্চাপি গান্ধারো মধ্যমশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ॥
চতুঃশ্রুতিঃ পঞ্চমঃ স্যাৎ ত্রিঃশ্রুতির্ধৈবতস্তথা।
দ্বিশ্রুতিস্তু নিষাদঃ স্যাৎ ষড়্জগ্রামে স্বরান্তরে॥

ভরত শ্রুতিগুলির নামোল্লেখও করেছেন। কিন্তু ভরতের আগে সামিক স্বরের শ্রুতি-নির্ণয়-ব্যাপারে নারদীকারের পরিচয় আমাদের কাছে একটু ভিন্ন রকমের ও অসঙ্গত বোলেই মনে হয়। শ্রুতিপ্রসঙ্গে শিক্ষাকার নারদ বলেছেন, বিশেষজ্ঞ

৭১। Cf. প্রজ্ঞানানন্দ: 'রাগ ও রূপ' (১৩৫৫), পৃ° ৬৯—৭১

আচার্যেরা মাত্র 'দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা' এই পাঁচটী শ্রুতির নাম উল্লেখ করেছেন,

দীপ্তায়তা করুণানাং মৃদুমধ্যময়োস্তথা,

শ্রুতীনাং যো বিশেষজ্ঞো ন স আচার্য উচ্যতে।

দীপ্তাদি পাঁচটী শ্রুতিই সামিক প্রথমাদি সাতটী স্বরে লীলায়িত, যেমন—মন্দ্রস্বরে দীপ্তাশ্রুতি, দ্বিতীয়ে দীপ্তা, চতুর্থে দীপ্তা, অতিস্বার্যে করুণা, তৃতীয়ে করুণা ও ক্রুষ্টে করুণা। কেউ কেউ দ্বিতীয় স্বরে মৃদু, মধ্যা ও আয়তা শ্রুতিগুলির উল্লেখ করেন,

দীপ্তা মন্দ্রে দ্বিতীয়ে চ প্রচতুর্থে তথৈব তু।

অতিস্বারে তৃতীয়ে চ ক্রুষ্টে তু করুণা-শ্রুতিঃ॥

শ্রুতয়োঽন্যা দ্বিতীয়স্থ মৃদুমধ্যায়তাঃ স্মৃতাঃ।

শিক্ষাকার নারদ দীপ্তা প্রভৃতি শ্রুতির লক্ষণ এবং তাদের সার্থকতার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শিক্ষাকারের এই উল্লেখ বা পরিচয় আমাদের কাছে কিছু বিস্ময়ের বস্তু হোয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা ঠিক তাঁর পরেই ভরত সুপরিকল্পিতভাবে বাইশটী শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন, অথচ নারদীকার পাঁচটী শ্রুতির বেশী কোন শ্রুতির নামোল্লেখ করেন নি। লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের শ্রুতি-সম্বন্ধেও নারদ কোন কথা বলেন নি। বিষয়টী আমাদের কাছে এজন্যে রহস্যাবৃত, কেননা আমাদের বিশ্বাস যে, বাইশটী শ্রুতির প্রচলন ভরতপূর্বযুগে তো ছিলই এবং নারদীকারের সময়েও ছিল।

এর পর শিক্ষাকার নারদ উদাত্তাদি স্বর, মাত্রা এবং ক্ষৈপ্র, তৈরবিরাম প্রভৃতি বৈদিক অন্যান্য স্বর-সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। 'মাত্রা' সম্বন্ধে নারদ বলেছেন—"নিমেষকালা মাত্রা স্যাদ্বিদ্যুৎকালেতি চাপরে", অর্থাৎ কারো মতে নিমেষকাল ও অন্যমতে বিদ্যুৎ-চমকের কালকে 'মাত্রা' বলে।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, এর পরে নারদীশিক্ষার মধ্যে যতটুকু আলোচনা আছে তা বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয় বোলে আমরা সে-সবের অনুশীলন থেকে বিরত হলাম।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট : প্রথম

ভারতীয় সঙ্গীত : তার মিশ্রণ ও বিস্তার

আমরা এই গ্রন্থে "আর্য ও অনার্য-সঙ্গীতের মিশ্রণ" সম্বন্ধে (পৃ° ২১-২৭) অবতরণিকায় সামান্যভাবে আলোচনা করেছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর (ক) *Non-Aryan Contribution to Aryan Music*[১] প্রবন্ধে, (খ) *Ragas and Raginis* গ্রন্থে[২], (গ) লেখকের 'রাগ ও রূপ' গ্রন্থের ভূমিকায়,[৩] (ঘ) 'সঙ্গীত-বিশ্বভারতী' নামক সভাপতির অভিভাষণ[৪] প্রভৃতিতে এবং ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি তাঁর সুচিন্তিত *On the Duffusion of Indian Music in Ancient Times* প্রবন্ধে[৫] এ' বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিষয় ও আলোচনাটী অবশ্য নূতন নয়, বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের সময় (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর কিছু পরে, কারো কারো মতে খৃষ্টীয় ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দী, আবার কেউ কেউ বলেছেন মাত্র 'early period') থেকে 'সঙ্গীতরত্নাকর'-প্রণেতা শার্ঙ্গদেবের (খৃষ্টীয় ১২১০—১২৪৭ শতাব্দী) পর্যন্ত এটীর প্রসঙ্গ চলে আসছে, তবে কেউই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঘটনা বা বিষয়ের পূর্বপর আলোচনা করার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে আর্য-সঙ্গীত তথা মার্গসঙ্গীতে অনার্য-সঙ্গীতের মিশ্রণে ভারতীয় সঙ্গীত কতটুকু লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে-সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া উচিত। আর সেজন্যেই বিশেষভাবে ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চির "Which have occured to me as a student of history" কথাগুলিকে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত। আর্য ও অনার্য জাতিদের মিশ্রণ ভারতবর্ষের শুধু নয়, বিশ্বের ইতিহাসে নূতন নয় এবং সকল স্থানে

১। Cf. *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Poona.

২। Cf. *Ragas & Raginis* (Nalanda Publications, Bombay, 1, 1948), pp. 70—76.

৩। Cf. প্রজ্ঞানানন্দ : 'রাগ ও রূপ' (১৩৫৫), 'ভূমিকা', পৃ° ৮—১৮

৪। Cf. *Jhankar Music Circle*-এর ইং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মুখ্য সভাপতির অভিভাষণ, পৃ° ৬—৭

৫। Cf. সঙ্গীতের পত্রিকা *Uttramandra*, Vol. I, March, 1940, pp. 21—26.

মিশ্রণের পরিণতি সমাজের শরীরে নূতন শক্তি ও প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কথার মাধ্যমে উল্লেখ করলে বলা যায়ঃ "কিন্তু ভারত সঙ্গীতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের আর্য-সঙ্গীত অনার্যজাতির নানা 'দেশওয়ালী' বা 'দেশী' সঙ্গীত হইতে প্রচুর পরিমাণে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহার বৃহৎ কলেবর সুপুষ্ট করিয়াছে। যে-কোনও সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রত্যেক কৃষ্টির ঋণ নানা বিজাতীয় সভ্যতার উপকরণ আত্মসাৎ করিয়া পরিবর্দ্ধিত সম্পূর্ণ কৃষ্টি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অত্যন্ত বিরল। সুতরাং আর্য-সঙ্গীত যদি অনার্য-সঙ্গীত হইতে নূতন রস বা উপাদান আত্মসাৎ করিয়া, পরিপাক করিয়া তাহাকে আর্য-সঙ্গীতের বিশিষ্ট রূপে রূপান্তরিত ও পরিণত করিয়া থাকে তাহাতে আর্য-সঙ্গীতের শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার দুর্বলতার পরিচয় নহে"।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ যেমন তার সকল জিনিসের বিনিময় দিয়ে অপরাপর দেশকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে, ভারতবর্ষও তেমনি নিজেকে সুসমৃদ্ধ করেছে অপরাপর দেশ ও জাতিদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প ও দর্শন প্রভৃতির উপাদান নিয়ে। তবে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষই তার মান ও গৌরবকে সমুন্নত ক'রে রেখেছে। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চিও তাই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের উল্লেখ ক'রে বলেছেনঃ

"India borrowed even in pre-Mahomedan times from the neighbouring countries those elements of culture which were essential for the development of her own civilisation and had also helped them whenever necessary in developing their own. In fact, in these matters, exchange was of vital importance for the development of civilisation."

ভারতীয় সঙ্গীতের জগতেও মিশ্রণের কাহিনীর অভাব নাই। ভারতীয় আর্য-সঙ্গীত যেমন নিজের কলেবরকে পরিপুষ্ট করেছিল দেশ ও বিদেশের অনার্য-সঙ্গীতের উপাদানকে আত্মসাৎ ক'রে, অপরাপর দেশের সঙ্গীতকেও তেমনি দিয়েছিল তার প্রেরণা। শ্রদ্ধেয় ডাঃ বাগ্‌চি উল্লেখ করেছেন, মুসলমান অভিযানেরও অনেক আগে ভারতীয় সঙ্গীতসেবীরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গীতের সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এর সাক্ষ্য দান করে হুয়েন সাঙের ভ্রমণকাহিনী। খৃষ্টীয় ৬৩০ থেকে ৬৪৪ শতাব্দী পর্যন্ত চৈনিক ভ্রমণকারী হুয়েন সাঙ্ ছিলেন ভারতের অধিবাসী

হোয়ে। তিনি রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সভায় কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভাস্করবর্মণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি জান্‌তে পারেন মহাচীনের রাজা টিস্‌-ইনের সংবাদ। ভাস্করবর্মণ হুয়েন-সাঙ্‌কে এমন খবরও দিয়েছিলেন যে, ভারতের অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কিছুদিন থেকে মহাচীনের রাজা টিস্‌-ইনের বিজয়-কাহিনীর সঙ্গীত (খৃষ্টীয় ৬৩৬ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত) শোনা গেছে। ডাঃ বাগ্‌চি লিখেছেন: "The song referred to, was the song of the victory of the Chinese prince over a rebel general in 619 A. D. and it was already known in India before 636 A. D. when Bhaskaravarman met Hiuan Tsang"। ডাঃ বাগ্‌চি এ'থেকে অনুমান করেন যে, আসামের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে ও ভারতের উত্তর-পূর্বপ্রান্তে একসময়ে চীনা-সঙ্গীত বেশ প্রসার লাভ করেছিল।

ভারতবর্ষে চীনা-সঙ্গীতের প্রবেশ ও প্রসারতা মোটেই বিস্ময়ের জিনিস নয়। তবে একথা ঠিক যে, বিশেষ ক'রে চীন ও জাপানের সঙ্গীত তাদের উপাদান ও পুষ্টির জন্যে ভারতীয় আর্য সঙ্গীতের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। খৃষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের সময়েই ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম (Indian Buddhism) ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ভারত ও মধ্যএশিয়ার দেশগুলিতে শুধু কেন, পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশের মধ্যে একটী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বা যোগসূত্র রচনা করেছিল। ডাঃ বাগ্‌চি এর প্রসঙ্গে বলেছেন: "During the early centuries of the Christian era they (Kucheans and the peoples of Central Asia) had accepted Indian Buddhism and many traits of Indian culture along with it."[৬] জাপানে শিল্প ও সঙ্গীতের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালিদাস নাগও উল্লেখ করেছেন: "Buddhism, of course, was the principal source of inspiration, and the Buddhist decorative designs are found inlaid on the sandal-wood *Vina* or lute called *Biwa* in Japanese"।[৭] জাপানের সঙ্গীতপদ্ধতি যে ভারতবর্ষের কাছেই একমাত্র

৬। Cf. *On the Diffusion of Indian Music in Ancient Times*, p. 23.
৭। Cf. *India and the Pacific World* (1941), p. 250.

ঋণী, ভারতবর্ষ থেকেই সঙ্গীতের ধারা ও উপাদান যে সোজাসুজিভাবে জাপানে অথবা চীনের মাধ্যমে জাপানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল একথা মনীষী অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভিও তাঁর সুবিখ্যাত *Lumbini Orchestra* নামক নিবন্ধে প্রমাণ করেছেন ("The importation of musical modes into Japan was proved by the Prof. Sylvain Levi in his paper on the *Lumbini Orchestra.*")।

চীনদেশ ও জাপান যে ভারতবর্ষের কাছে তাদের সঙ্গীত বিকাশের জন্যে ঋণী ডাঃ বাগ্‌চি এবং অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ও তার নজির দিয়েছেন ফরাসীর মনীষী সিলভ্যাঁ লেভির নামোল্লেখ ক'রে। ডাঃ বাগ্‌চি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন : "Further research will one day reveal that many elements of Indian music have been preserved in China and Japan. In this connection I should quote from a letter which the late Prof. Sylvain Levi wrote to me in 1925 from Japan :

I can soon send you a Sanskrit stanza which I have restored from a faulty Chinese transcription, and also the music or the song, as preserved in the temple of Horiyuji. I had a very successful visit to that temple. I even passed a night there. The abbot of monastery, Taki Join, is a teacher of the Vijnanavada philosophy and can sing in a magnificient voice the ancient Buddhist songs. He can also sing the old Buddhist musical airs which were brought from China in ancient times. I have taken a notation of the airs and reconstructed the songs. India is going to get back one of its ancient melodies of not later than 8th century A. D."[৮]

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ও উল্লেখ করেছেন : "কিন্তু আর্য-সঙ্গীত যেমন ঋণ গ্রহণ করেছে, দানও দিয়েছে মুক্তহস্তে। প্রায় এশিয়ার নানা স্থানে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমি তিন বৎসর পূর্বে চীনদেশে চুংকিং সহরে চীনে থিয়েটারে অনেক পরিচিত ভারতের রাগ-রাগিণীর এবং তালের ব্যবহার শুনে এলুম। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Sylvain Levi প্রমাণ করেছেন যে, খৃষ্টীয় সাত শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গীত-

৮। কিন্তু এর পর ডাঃ বাগ্‌চি উল্লেখ করেছেন : "The sudden death of Prof. Levi has removed the possibility of the publication of these notes."

পদ্ধতি চীনদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল"। জাপানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সম্রাট শোমুর রাজত্বকালে (৭২৬—৭৪৮ খৃষ্টাব্দ) চন্দনকাষ্ঠে নির্মিত 'বিওয়া'-র মতন বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল এবং সেই বীণায় ঝিনুকের বিচিত্র রকমের ফুল ও পাখীদের প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকত। সেটাকে দেখতে ছিল সপ্ততন্ত্রী-বীণার মতন ("Entire scenes are sometimes represented on a seven-stringed harp with its surface and backside all lacquered black and inlaid with gold and silver plates cut into figures of exquisite workmanship")[১]। 'বিওয়া' (*Biwa*) ভারতীয় 'বীণা'-র (*Vina*) অভিন্নরূপ এবং তা' সাতটী তারযুক্ত চিত্রবীণারই অনুকরণ মাত্র।

ডাঃ বাগ্‌চি আরও উল্লেখ করেছেন, চীনের ইতিবৃত্ত পড়লে জানা যায়, চীনদেশে 'টস্-এও' (Ts'ao) নামক ব্রাহ্মণবংশেই বিশেষভাবে সঙ্গীতের অনুশীলন হয়েছিল এবং তা' বংশপরম্পরা প্রসার লাভ করেছিল। সেই বংশের উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন মিএ্যাও-টা (Miao-ta) এবং তিনি খৃষ্টীয় ৫৫০-৫৭৭ শতাব্দে চীনদেশে গমন করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে চীনে সঙ্গীত এত ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল যে, চীনসম্রাট কাও-সু (Kao-tsu, 581—595 A. D.) আইনের দ্বারা সঙ্গীতানুশীলন বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করতে সমর্থ হন নি। তাঁর উত্তরাধিকারী য়্যাঙ্-টি (Yaug-ti) আবার সঙ্গীতের এমনই পক্ষপাতী ও অনুরাগী ছিলেন যে, তিনি 'পো-মিঙ-টা' (Po Ming-ta) পদ্ধতিতে অনেকগুলি রাগ

১। Cf. *India and the Pacific World* (1941), pp. 230—231.

২। কুচি প্রদেশ (Kucha) সম্বন্ধে ডাঃ বাগ্‌চি উল্লেখ করেছেন: "Kucha was the most important of the northern kingdoms played the same role as that Khotan in the diffusion of Buddhism. From the 2nd century B. C. till the beginning of the IIth century A. D., the Chinese historians have taken notice of the country and in different epochs of its history admitted its importance. * * The greatest monastery of Kucha, so much praised by the Chinese writers, was named, according to Chinese evidence, after the famous monastery of Gandhara founded by Kaniska." —Vide *Indian Civilisation in Central Asia* (—The Four Arts Annual 1935, p. 172).

রচনা ক'রে চীনা-সমাজে প্রবর্তন করেছিলেন। ডাঃ বাগ্‌চি এই স্যাঙ-চিকে ইন্দো-কুচীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত বোলে অনুমান করেন, কারণ মধ্যএসিয়ার উত্তরাঞ্চলে কুচিপ্রদেশ ছিল প্রসিদ্ধ এবং কুচিরা অত্যন্ত সঙ্গীতের ভক্ত ও সাধক ছিল। তারা ভারতীয় সঙ্গীত-সাধকদের মতন প্রকৃতির উপাসক ছিল। প্রকৃতির সামগ্রী ও ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তারা সঙ্গীতের স্বর (রাগ) রচনা করত—যেমন প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত-সাধকেরা পশুপক্ষীর কলতানে তাঁদের সাঙ্গীতিক সাত স্বরের ঐক্য নিরীক্ষণ করেছিলেন।[১০]

চীনে সঙ্গীতানুরাগ ও সঙ্গীতের অনুশীলন অবশ্য বেশীই ছিল। চীনে সঙ্গীতের জলসার আয়োজন হোত, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে শিল্পীরা সেই জলসায় যোগদান ক'রে প্রত্যেকের ও প্রত্যেক দেশ এবং সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতেন, চীনের সম্রাটই সঙ্গীতশিল্পীদের নির্বাচন ক'রে আমন্ত্রণ জানাতেন। খৃষ্টীয় ৫৮১ শতাব্দীর একটী ঘটনা: চীনসম্রাটের পক্ষ থেকে সঙ্গীতের জলসার আয়োজন করা হোলে ভারতবর্ষ, কচ্ছ, বুখারা, সমরকন্দ, খাশগড় এবং তুরুস্কের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সঙ্গীতশিল্পীরা যোগদান ক'রে তাঁদের নিজেদের নিজেদের সঙ্গীত-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। জাপান ও কম্বুজ, কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া থেকেও কণ্ঠ ও যন্ত্রশিল্পীদের দল তাতে যোগদান করেছিলেন। তা'ছাড়া ইন্দো-কুচির সঙ্গীত ছিল চীনসম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়; তাই খৃষ্টীয় ৫৬০-৫৭৮ শতাব্দীতে কুচির একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুজীবকে তিনি সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ডাঃ বাগ্‌চি বলেছেন, চীনদেশের ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, কুচির শিল্পী সুজীব ভালভাবে গীটার বাজাতে জানতেন, আর জানতেন সাতটী স্বরগ্রামে ও গমকে লীলায়িত ক'রে গান করতে। তিনি উল্লেখ করেছেন:

"He is also reported to have said that *'his father who was famous in the West as a musician had learnt the music through a tradition transmitted through generations, that there were seven kinds of systems and that the degrees in these seven systems when compared mysteriously concord.'* The Chinese record that enumerates the names of the seven degrees :

1. *So-t'o-li*—even tone
2. *Ki-tche*—long tone

১০। Cf. প্রজ্ঞানানন্দ: 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', পৃ° ৩১

3. *Sha-tche* (Sadja)—Simple and straight tone
4. *Sha-heou-Kia-lam*, (Sahagrama)—Consonant tone
5. *Sha-la*—Consonant harmonious tone
6. *Pan-chen* (Panchama)—Fifth tone
7. *Sen* (*heou*)-*li-she*—Tone of the bull (Rishabha)."[১১]

এই সাত স্বরগ্রাম বা স্বর ভারতবর্ষ থেকেই চীনদেশ গ্রহণ করেছিল। ডাঃ বাগ্‌চি তাঁর *Indian Civilisation in Central Asia* প্রবন্ধেও চীনের সাতস্বরকে 'ভারতবর্ষীয়' বোলে উল্লেখ করেছেন :

"The music of the country (Kucha) much appreciated in China from the 4th to the 8th century A. D. reveals its *Indian origin*, as the names of some of its seven notes are given as *Sadja* (3), *Panchama* (6), *Vrisa* (7) and *Sahagrama* (4)."[১২]

চীনদেশে সঙ্গীত যে বিপুলভাবে প্রসার লাভ করেছিল তা এই 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-র অবতরণিকায় 'চীনদেশে সঙ্গীতের বিকাশ' পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। খৃষ্টপূর্ব ৩য়—২য় শতক থেকেই চীনে সঙ্গীত বিকাশ লাভ করেছিল। শ্রদ্ধেয় ডাঃ কালিদাস নাগ চীন ও এসিয়ার সাংস্কৃতিক জাগরণের আলোচনা-প্রসঙ্গে চীন ও জাপানের সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : রাজা ফু-শির (King Fu-Hsi) রাজত্বকালে (2852—2738 B. C.) বীণার ("music of the lute") বিশেষ প্রচলন ছিল। রাজা শিন্‌-নাঙের (Shin-nung) সময়েও (2737—2705 B. C.) তন্ত্রী ও তারের যন্ত্রের ("stringed instruments") বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। রাজা হুয়াঙ্‌-টি (King Huang-Ti, 2704—2595 B. C.) নিজে সঙ্গীতের স্বর, রিড্‌ অর্গ্যান, ঘণ্টা ("discovered musical notes, the reed organ, bells") প্রভৃতি আবিষ্কার করেছিলেন। রাজা য়্যাও (King Yao, 2357—2258 B. C.) সঙ্গীতে চর্মনির্মিত বাদ্যযন্ত্রের প্রবর্তন ক'রে চীনের সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন ("enriched the music by introducing drums")। রাজা সান্‌ (King Shun, 2258—2206

১১। Cf. *On the Diffusion of Indian Music in Ancient Times*, pp. 24-25.

১২। Cf. (ক) *The Four Arts Annual* 1935 (Managing Editor, Haren Ghose), pp. 167—173 ; (খ) 'ভারত ও মধ্যএসিয়া', পৃঃ ৭০—৭৪

B. C.) সঙ্গীতে বাঁশী ও ঘণ্টা বাদ্যযন্ত্রের প্রবর্তন ও সঙ্গীতের সংস্কার-সাধন করেছিলেন ("introduced and improved * * flutes and bells".)[১৩]

এ'ছাড়া চীনাদের সঙ্গীতে ইন্দো-কুচীয় সঙ্গীতের ২১টি স্বর বা রাগ ("airs of the Indo-Kuchean music") এখনো-পর্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হোয়ে আস্‌ছে। ডাঃ বাগ্‌চি তাদের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

"There are twenty names : 1. Ten thousand years (Japanese Banzai), 2. Hair pins (?), 3. The meeting of the 7th night, 4. The woman of jade taking round a cup, 5. The throwing of stones that prolong life, 6. The immortal saint that kept back the guest, 7. Throwing the bottle, 8. The eightfold chignon on the dancing cloth, 9. The boat of the dragon, 10 The fighting cocks, 11. The competition of flowers, 12. Shan shan (?), 13. Return to the old palace, 14. The flower of long life, 15. The twelve hours, 16. The sound of the diamond, 17. The dance of p'o-kia-eul, 18. The dance of the small god, 19. The supreme wisdom, 20 The salt of kashgar."

'ভারতীয় সঙ্গীত : তার মিশ্রণ ও বিস্তার' এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা আর্য-সঙ্গীতে অনার্য-সঙ্গীতের মিশ্রণে ভারতীয় সঙ্গীতের কলেবর যে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছে তা উল্লেখ করেছি এবং তার প্রসারতা চীন ও জাপানের সঙ্গীতকে প্রাণ ও নবচেতনা দিয়েছিল তার পুনরায় আলোচনা করেছি। এক্ষণে আর্য-সঙ্গীতে আভীর, কাম্বোজী, তুরুষ্ক, আর্মেনিয়ান, দ্রাবিড়, পুলিন্দ, কিরাত, বাহ্লীক, শবর, অন্ধ্র প্রভৃতি অনার্যজাতির (?) সঙ্গীত মিশ্রিত হোয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করেছিল একথা বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ ও মতঙ্গোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গ 'ভাষাগীতি' যে দেশী ও বিদেশী তথা আর্য ও অনার্য-সঙ্গীতের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল একথা নিজেই স্বীকার করেছেন—"সংকীর্ণা চ মতা নিত্যং জ্ঞেয়া বৈদেশসম্ভবা"।[১৪] 'বৈদেশসম্ভবা' শব্দগুলি দ্বারা বিদেশ থেকে উৎপন্ন একথাই বুঝা যায়। তুরুষ্কতোড়ী, শক-মিশ্রিত পোট্ট, টক্ক, বোট্ট, তুরুষ্কগৌড়, কর্ণাটগৌড়, আভীরী, কাম্বোজী প্রভৃতি রাগনাম থেকে বুঝা যায় যে এগুলি আর্যভিন্ন রাগ। কিন্তু দ্রাবিড়, অন্ধ্র, তুরুষ্ক বা তুরস্ক প্রভৃতি জাতিরা আর্যভিন্ন হোলেই যে অনার্য তথা অসভ্য নামে অভিহিত

১৩। Cf. *India and the Pacific World* (1941), pp. 148—149, 230—231, 250.

১৪। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ১২২

হবে এমন কোন কথা নেই, কেননা তাদেরও নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা ছিল এবং সেজন্যেই তারা অন্ততঃ অসভ্য নামে অভিহিত হবে না এবং ঐ বিষয়ে আমরা অবতরণিকায় আলোচনা করেছি। তবে আভীরীরাগ জাতি অথবা দেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে—"আভীরীদেশসম্ভবা" (বৃহদ্দেশী, পৃ° ১২১), কিংবা কিন্নরগণ-কর্তৃক গীত—"কিন্নরৈরপি গীয়তে" (বৃহদ্দেশী, পৃ° ১২১) এ' সব কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কতকগুলি রাগ যে বিদেশ ও আর্য-নামাঙ্কিত জাতিভিন্ন অন্য জাতি থেকে ভারতীয় সমাজে আমদানী হয়েছিল একথা সকলেই স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

"* * the melodies derived their names from the ancient tribes inhabiting various parts of India. Thus the Sakas, the Pulindas, the Abhiras, the Savars, and the Bhairavas (Bhiravas) appear to have but their names to the following ragas : Saka-raga (with variants called Saka-tilaka, Saka-misrita), Pulindi-raga, Abhiri, Saverika (Saveri) and Bhairava-raga. * * Gurjari may, have come from the ancient tribes known as the Malavas, the Andhras, and the Gurjaras respectively. * * Bhotta, a very early melody, may have come from the region of Thibet (Bhotta), just as Gandu (Eastern Bengal) * *."[১৫]

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, তুরুস্কতোড়ী, কর্ণাটগৌড়, তুরুস্কগৌড়, ঠক্ককৈশিক বা টক্ককৈশিক, মহারাষ্ট্রগুর্জরী, সৌরাষ্ট্রগুর্জরী, দ্রাবিড়গুর্জরী, দক্ষিণগুর্জরী প্রভৃতি রাগগুলির অর্থ এই নয় যে, তুরুস্কদেশ থেকে তোড়ী বা কর্ণাটদেশ থেকে গৌড়, টক্ক থেকে কৈশিক, মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড় বা দক্ষিণ তথা দাক্ষিণাত্য থেকে গুর্জরীর আমদানী ভারতীয় সমাজে হয়েছিল, পরন্তু এর অর্থ হোল—তোড়ীর ও গৌড়ের প্রচলন যেমন আর্য-সঙ্গীতে ছিল, তেমনি তুরস্কেও ছিল, কিংবা একই গুর্জরীরাগ মহারাষ্ট্রে, সৌরাষ্ট্রে, দক্ষিণে ও দ্রাবিড়জাতিদের ভেতর প্রচলন ছিল, তাদের প্রকাশে বৈচিত্র্য ও গঠনে সামান্য বিভিন্ন হোলেও আসল রূপের মধ্যে ঐক্য ও সাম্য ছিল এবং সেদিক থেকে ভারতীয় আর্য-সমাজ তোড়ী, গৌড়ী ও গুর্জরীকে সমাদরে গ্রহণ ক'রে নিজেদের সঙ্গীতভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। ডাঃ বাগ্‌চি প্রায় একথাই স্বীকার করেছেন: "*Turuska-*

১৫। (a) *Ragas and Raginis* (1948), pp. 72-74 ; (b) প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত 'রাগ ও রূপ'-এর ভূমিকা, পৃ° ৮-১২, (c) *Non-Aryan Contribution to Aryan Music* (—Aanals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona).

todi and *Turuska-gauda* certainly did not mean *Todi* and *Gaudi* as sung by the Turuskas or Turks but Tukish airs which were similar to Indian airs and could thus be easily affiliated to them".

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীরা রাগনামের উচ্চারণে ও লিখনে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তিও দেখিয়েছেন, কেননা কোন জায়গায় 'বোট্ট', আবার কোন জায়গায় 'ভোট্ট' নামের উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহদ্দেশীতে ৮৫ পৃষ্ঠায় (ত্রিবান্দ্রম্ সং) মতঙ্গ লিখেছেন 'হর্মাণপঞ্চম' ("শকাখ্যঃ ককুভস্তথা হর্মাণপঞ্চমঃ"), আবার ১০০ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন "ভম্মাণপঞ্চম" ("শুদ্ধমধ্যমিকাজাতের্ভবেদ্ ভম্মাণপঞ্চমঃ")। তাছাড়া 'তস্যার্থঃ' বোলে ভম্মাণপঞ্চমকে তিনি "মধ্যমগ্রামঃসম্বন্ধঃ" প্রভৃতি বলেছেন। বৃহদ্দেশীর ৮৫ পৃষ্ঠায় 'হর্মাণপঞ্চম' 'সাধারণ'-শ্রেণীর অন্তর্গত রাগ এবং গ্রামরাগও বটে, আবার ১০০ পৃষ্ঠায় তাকে গ্রামরাগহিসাবে মধ্যমগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু মধ্যমগ্রামের রাগ বর্তমান সমাজে সম্পূর্ণ অচল। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর সঙ্গীতগুণী শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরের ২য় রাগবিবেকাধ্যায়ের ১৯০ শ্লোকে 'ভম্মাণ'-শব্দের পরিবর্তে 'ভম্মাণী' রাগের উল্লেখ করেছেন—"পঞ্চমস্ত বিভাষা সভম্মাণী মন্দ্রষড়্জভাক্"। এক্ষণে হর্মাণ, ভম্মাণ ও ভম্মাণী রাগনামগুলিতে অক্ষর ও উচ্চারণগত পার্থক্য আছে এবং সেজন্যে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের রাগনামের যাথার্থ্য-সম্বন্ধে পরবর্তী শাস্ত্রী ও শিল্পীদের কাছে সন্দেহ আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ডাঃ বাগচি সমস্যাটীর উত্থাপন ক'রে তার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন, যেটিকে আমরাও সমীচীন বোলে মনে করি। ডাঃ বাগচি উল্লেখ করেছেন, ভোট্ট, ভোট্ট বা ভোট যেমন তিব্বতেরই নামান্তর, হার্মাণ, ভম্মাণ বা ভম্মাণী তেমনি আরমেনিয়ার নামান্তর, কেননা অপরাপর বিদেশী জাতির ও বিশেষ ক'রে মধ্যএসিয়ার ইরাণীদের মতন আর্মেনিয়ানরাও ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাপারে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিল এবং সেদিক থেকে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপাদান নিজেদের দেশে বয়ে নিয়ে যাওয়া আর্মেনিয়ানদের পক্ষে অসম্ভব নয়। তিনি বলেছেন,

"Of the other names, Coksa is unknown but Botta * * may be connected with the Indian names of Tibet, Bhota (Bhautta, Bhotta)

which however does not occur either in Sanskrit inscriptions or texts before the 7th century A. D. The other name, *Harmana* seems to be of great interest. Matanga mentions it only once as Harmana * * but in another place as *Bhammana* * *. Sangitaratnakara mentions it as *Bhammani*. * * It seems that Harmana (Prakrit—Hammana) was the correct form of the name and Bhammana came into being through the mistake of scribes, '*h*' being similar to '*bh*', in North Indian script. Even Harmana is unknown, but it is not quite unresonable to suggest a connection of this name with the ancient name of Armenia—*Armina*."

'বোট্ট'-রাগের জন্ম ভোট বা ভুটান তথা তিব্বত থেকে হয়েছে একথার মীমাংসা না হয় করা গেল, কিন্তু 'ঠক্ক' বা 'টক্ক' রাগের মীমাংসার বিষয়ে একটু গণ্ডোগোল দেখা দেয় সঙ্গীতশাস্ত্রী ও ঐতিহাসিকদের কাছে। ঠক্ক বা টক্ক ও বোট্ট রাগ যে এক নয় তা মতঙ্গই উল্লেখ করেছেন তাঁর বৃহদ্দেশীতে (পৃ° ১০৫)। ঠক্ক বা টক্করাগকে মতঙ্গ বেশ প্রাচীনতা ও প্রধানত্বের সম্মান দিয়েছেন। এমন কি টক্ক যে আদিরাগ সে'কথাও তিনি "টক্করাগে দশধে" প্রভৃতি শ্লোকের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন। টক্করাগ অন্যান্য রাগের সঙ্গেও তার মিতালী পাঠিয়েছিল, যেমন ঠক্ককৈশিক প্রভৃতি। 'পোট্ট'-রাগ টক্করাগ থেকে ভিন্ন। টক্করাগ "লক্ষ্মীপ্রীতিকরত্বাৎ"—লক্ষ্মীদেবীর প্রীতির কারণ। টক্করাগকে যদি 'টক্ক' বা 'টক্ক' নামক অনার্য জাতির অবদান হিসাবে গণ্য করি তবে আর্যদেবী লক্ষ্মীর তা কিভাবে প্রীতিকারক হোতে পারে তাও বিচারের বিষয়, অথবা বলতে হয়—প্রথমে শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী (Corn-goddess) লক্ষ্মী ছিলেন অনার্যদের উপাস্যা, পরে আর্যগোষ্ঠীভুক্ত হয়েছিলেন। কিংবা অনেকে টক্কজাতিকে পরবর্তীকালে মিশ্রিত ও সংস্কৃত আর্যজাতি হিসাবে গণ্য করেন, কাজেই এমন হোতে পারে যে, অনার্য টক্কজাতি পরবর্তী যুগে আর্যজাতির সঙ্গে মিশ্রিত হবার ফলে আর্য-কৌলিন্য লাভ করেছে ও পরে আর্যদেবী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাদের রাগকে সম্পর্কযুক্ত করেছিল। কাজেই 'আর্য ও অনার্যের মিশ্রণ' শব্দটীকে সাবধানে বিচার ক'রে আমাদের দেখা উচিত। টক্কজাতির টক্করাগ এখন সমাজে 'টংকী' বা 'টংক'-রাগ-রূপে পরিচিত কিনা কে জানে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন : "সিন্ধুনদীর তীরবর্তী এট্-টক (At-tock, At-tak) সহর ছিল তাহাদের (টক্কজাতির) ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের আর একটি কেন্দ্র। পরে তাহাদের

কোন কোন শাখা ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু গণ-গত নাম তাহারা এখনও রক্ষা করিতেছে। এই গণের আধুনিক নাম 'টংক্' (Tonks or Tanks)।" সুতরাং টক্কজাতির অবদান টক্করাগ যে বর্তমানে 'টংক' নামে পরিচিত তাও এমন-কিছু অভাবনীয় বা অসম্ভব ব্যাপার নয়। আভীরী রাগ আবার আভীরজাতির দান। সে'রকম দক্ষিণ-কোশল ও উড়িষ্যাবাসী শাবর-জাতি শাবেরী বা সাবেরী রাগ সৃষ্টি করেছিল। সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি নিয়ে আলোচনা ও অনুশীলন করলে জাতীজ ও দেশজ রাগগুলির সত্যিকারের ইতিহাস ও তাৎপর্য সাধারণ সমাজে প্রকাশিত হবে। রাগ-রাগিণীদের সাধনার পিছনে তাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধান হিসাবে গণ্য হোলেও ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উপযোগিতাকেও অবহেলা করলে চলবে না। আলো ও ছায়ার মধ্যে যেমন মিতালী আছে, সঙ্গীতের ব্যবহারিক (practical) ও ঔপপত্তিক (theoretical) অংশ দুটীর মধ্যেও তেমনি মৈত্রীর বন্ধন সর্বদাই আছে। বিশেষ ক'রে ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি ও অনুসন্ধানের অভাবে আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক মূল্যবান সামগ্রী আজ বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যেতে বসেছে। ব্যবহারিক সাধনার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞানের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসাই একমাত্র ভারতীয় সঙ্গীতের মতন গভীর ও সুবিশাল শিল্প বা বিদ্যার রহস্যভেদ করতে সক্ষম হবে।

পরিশিষ্ট : দ্বিতীয়

শিক্ষাকার ও সঙ্গীতমকরন্দকার নারদ

নারদ দেবর্ষি, মুনি, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋগ্বেদের ঋষি ও গন্ধর্ব এতগুলি নামে পরিচিত। ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, আঠারটী পুরাণ, উপপুরাণ, দেবী-ভাগবত ও ভাগবত প্রভৃতিতে নারদকে আমরা 'মহাতেজা', 'মুনি' 'গন্ধর্ব' বা বীণা-বহনকারী ঋষি বোলেই উল্লিখিত দেখি। বিশেষ ক'রে পুরাণগুলিতে নারদের চরিত্র আরও বিচিত্র। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ১৯ সূক্তে দেখা যায়, ইন্দ্র দেবতা, আর কণ্বগোত্রীয় ঋষি নারদ ইন্দ্রের স্তব ক'রে ৩৩টি মন্ত্রের রচয়িতা-রূপে পরিচিত। আজকাল অনেক পণ্ডিতের অভিমত যে, ঋগ্বেদের ঐ নারদকেই পরে রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণগুলির অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে। মনে হয়, এ'কথা মিথ্যা নয়। অনেকের মতে আবার নারদ নিছক একজন 'mythical person'। তবে মতভেদ বা অভিমত যাই হোক না কেন, রামায়ণে দেখা যায় : "নারদ পর্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ"[১], "নারদস্তু মহাতেজা"[২], ইত্যাদি বোলে নারদের প্রশংসা করা হয়েছে। নারদ সেখানে ঋষি। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে (৪৬ শ্লো°) নারদকে "গন্ধর্বরাজ" বলা হয়েছে। যেমন, ভরতের আগে আগে গায়ক, বাদক ও অপ্সরারা যাচ্ছেন আর তাঁদের ভেতর প্রধান ছিলেন নারদ ও তুম্বুরু : "নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ * *। এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ ॥"[৩] মহাভারতের আদিপর্বে (৬৫ শ্লো°) দেখা যায়, কশ্যপের পত্নী মুনির গর্ভে নারদ জন্মগ্রহণ করেছেন ও তাঁর ভাগিনেয়ের নাম 'পর্বত'।[৪] মহাভারতের অনুশাসনপর্বে নারদ (৪ শ্লো°) আবার বিশ্বামিত্রের পুত্র। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে নারদকে একেবারে গন্ধর্ব-পঙ্‌ক্তির অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছে, যেমন,

> ততো হাহাহূহূশ্চৈব নারদস্তুম্বুরুস্তথা।
> উপগায়িতুমারব্ধা গান্ধর্বকুশলা রবিন্ ॥
> ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারগ্রামত্রয়বিশারদাঃ।

১। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ২০ সর্গ ৫ শ্লো°। ২। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ২০ সর্গ ২৭ শ্লো°।

৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১০৬-তম অধ্যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও নারদকে "গন্ধর্ব" বোলে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন "নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা"—নাট্যশাস্ত্র ১।৫১

৪। নারদপঞ্চরাত্র, ১ম রাত্র ১ম অ° ৫৮-৫৯ শ্লোক°।

হাহা, হুহু, তুম্বুরু এঁরা গন্ধর্বদের ভেতর প্রধান। নারদকেও সে প্রধানদের অন্যতম বোলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতের ৬ স্কন্ধে (১৫ শ্লো°) নারদ যে পূর্বজন্মে উপবর্হন নামে একজন গন্ধর্ব ছিলেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, তুম্বুরু প্রভৃতির মতন নারদও গান্ধর্ব-সঙ্গীতে বিচক্ষণ ও তিনগ্রামে বিশারদ ছিলেন। বৃহন্নারদীয়পুরাণে "নারদেন গীতং" কথা দু'বার বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে "গীতং" অর্থে 'কথিতং'—'সঙ্গীত' নয়। বায়ুপুরাণে নারদকে ষোলজন মৌনেয় গন্ধর্বদের ভেতর অন্যতম বলা হয়েছে। নারদ ও পর্বতকে আবার মহর্ষি কশ্যপের পুত্র আখ্যাও দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে পর্বত ছিলেন নারদের ভাগিনেয়। ভাগবতে নারদ হলেন বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। বৈষ্ণবদের প্রামাণিক গ্রন্থ নারদপঞ্চরাত্রের রচয়িতা ছিলেন 'ঋষি' নারদ। 'নারদপঞ্চরাত্র' একখানি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতন্ত্র। তাতে শুকদেবের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বেদব্যাস 'ভগবান' ও 'যোগীন্দ্র' নারদকে নিজের আচার্য রূপে স্বীকার করেছেন[৫] এবং নারদ যে সেখানে জীবন্মুক্তদের মধ্যে একজন এ'কথাও পঞ্চরাত্রকার স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ, নারদ ও শম্ভুকে প্রণাম ক'রে 'মুনি' নারদকে মহাদেবের শিষ্য[৬] এবং ব্রহ্মার পুত্র[৭] বোলে সম্বোধনও করেছেন দেখা যায়। অহির্বুধ্ন্যসংহিতায় নারদ, শিব, দুর্বাসা ও ভরদ্বাজ মুনিরা সকলে একত্র হয়েছেন উল্লেখ আছে। নারদ সেখানে সকলেরই প্রশংসার পাত্র, কেননা অসুর কালনেমির সঙ্গে বিষ্ণুর যুদ্ধ হবার সময়ে বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের শক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে ও সঙ্গীতশাস্ত্রে কোথাও কোথাও নারদ 'গন্ধর্ব' বোলে পরিচিত হোলেও বেশীর ভাগ জায়গায় 'মুনি' নামেই উল্লিখিত হয়েছেন, যেমন "নারদো মুনিবব্রবীৎ।"[৮] কিন্তু এ'সকল ইতিহাস ও উপাখ্যানের কথা নিয়ে অনুশীলন কার স্থান ঠিক এই আলোচনা নয়।

৫। নারদপঞ্চরাত্র, ১ম রাত্র ১ম অ° ১।৩১ শ্লোক'।

৬। ঐ ঐ ১।৪২ „

৭। ঐ ঐ ১।১০ „

৮। এটি মতঙ্গ-প্রণীত বৃহদ্দেশীর শ্লোক। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ ছাড়াও ভারত, দত্তিল, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব, অহোবল ও দামোদর এঁরা সকলেই নারদকে 'মুনি' ও 'মহাত্মন্' বোলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হোল সঙ্গীতশাস্ত্রের ভেতর 'মকরন্দ' গ্রন্থখানি যিনি রচনা করেছেন আর বেদের শিক্ষাসমুচ্চয়ের ভেতর 'নারদীশিক্ষা' যিনি প্রণয়ন করেছেন এই দু'জন নারদ ঠিক একই অথবা ভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাই আলোচনা ক'রে দেখা। আর সেজন্যে নারদ আসলে 'historical person' কিনা সে-সবের মীমাংসা করার দায়িত্বও এখানে নেবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে একথা ঠিক যে, 'মকরন্দ'-কার ও 'শিক্ষা'-কার এই দু'জন নারদের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য অথবা 'historical existence' অবশ্যই ছিল।

সঙ্গীতমকরন্দের* সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলাঙ্ শিক্ষাকার ও মকরন্দকার এই দু'জন নারদ এক অথবা পৃথক কিনা এ'নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন: "It is difficult to say anything with certainty about Narada's life and time"। শিক্ষাকার নারদের প্রসঙ্গও তিনি তুলেছেন। 'সঙ্গীতমকরন্দ' গ্রন্থটি আবার 'বেদ' নামে একজন পণ্ডিতের রচনা এ'ধরণের মতও প্রচলিত আছে, কিন্তু শ্রদ্ধেয় তেলাঙ্ মহাশয় বেদকে মকরন্দের রচয়িতা হিসাবে স্বীকার করেন নি। তা' ছাড়া গ্রন্থকর্তা নামে প্রচলিত নারদ একজন—কি দু'জন এ'সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত তিনি ঠিক করতে পারেন নি। তবে তিনি বলেছেন যে, সঙ্গীতমকরন্দ শার্ঙ্গদেবের রচিত সঙ্গীতরত্নাকরের অনেক আগেকার বই, কেননা রত্নাকরের অনেক জায়গায়ই মকরন্দ থেকে শ্লোক প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

ডাঃ ভি. রাঘবন তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ *Later Sangita Literature* প্রবন্ধে এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন, তাঞ্জোর-গ্রন্থাগারের ক্যাটালগে ও বিকানীর ক্যাটালগে 'বেদ' প্রণীত একখানি মকরন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থে পরিষ্কারভাবেই নাকি দেওয়া আছে: "ইতি শ্রীসঙ্গীতমকরন্দে বেদকৃতৌ নৃত্যাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ"।—(Vide *Tanjore Burnell Cat.*, p. 60 (a), *Bek.*, *Cat.* p. 520, No iii এবং *S. R. Bhandarkar's Cat. of MS.* in Rajputana and Central India, 1904-5 to 1905-6, p. 54)।

* । গাইকোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত।

এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ঐ ক্যাটালগ অফ্ ম্যানুস্ক্রিপ্টেই উল্লিখিত আছে: "স জয়তি মকরন্দ * * শ্রীশাহস্ত প্রবীণস্ত মুদে বেদেন নির্মিতঃ"। কিন্তু বরোদা থেকে প্রকাশিত মকরন্দের সংস্করণে আছে: "ভগবন্নারদো মুনিরব্রবীৎ" এবং "ইতি শ্রীনারদকৃতৌ সঙ্গীত-মকরন্দে * *"। শ্রদ্ধেয় ডাঃ এম. কৃষ্ণমচারিয়ারও তাঁর *History of Classical Sanskrit Literature* পুস্তকের ৮৩১ পৃষ্ঠায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি সঙ্গীতমকরন্দের সময় নির্দিষ্ট করেছেন 11th century A.D. এবং বেদ-প্রণীত মকরন্দের সময় নির্ণয় করেছেন "early in 17th century A. D."। শ্রদ্ধেয় তেলাঙ্ মকরন্দের সময় নিরূপণ করেছেন "Between 7th to 11th century A. D"। অধ্যাপক ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার বেদকে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পুত্র শ্রীসাহাজীর সভাকবি বোলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীসাহাজী মহারাষ্ট্র-সমাজে 'মকরন্দভূপ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন, এই উপাধি থেকে "সঙ্গীতমকরন্দ" নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, কেননা গ্রন্থকার বেদ হয়তো মহারাষ্ট্রপতি শ্রীসাহাজীর নামের সম্মান রাখ্বার জন্যেই তাঁর সঙ্গীতগ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'সঙ্গীতমকরন্দ'। শ্রদ্ধেয় তেলাঙ মহাশয়ের এ'সম্বন্ধে যুক্তি হোল এই যে, সঙ্গীতরত্নাকরে "নারদো মুনিঃ", "নারদোঽব্রবীৎ" প্রভৃতি কথাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, মকরন্দে গান্ধার-গ্রামের উল্লেখ আছে এবং শার্ঙ্গদেব যখন ঐ গান্ধারগ্রামের কথা আলোচনা করেছেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছেন: "গান্ধারগ্রামমাচষ্টে তদা তং নারদো মুনিঃ"। শ্রদ্ধেয় তেলাঙ্ সুস্পষ্টভাবে তাই বলেছেন, রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতমকরন্দ থেকে গান্ধারগ্রামের শ্রুতিসংস্থান ও নামের তালিকা হুবহু নকল করেছেন এবং তাই এর প্রমাণপঞ্জীও তিনি উভয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেখিয়েছেন।[১০] কাজেই রত্নাকরে "তদা তং নারদো মুনিঃ" কথাগুলিতে শার্ঙ্গদেব মকরন্দকার নারদকে যে লক্ষ্য করেছেন এ'কথাই স্বীকার কর্তে হবে। ডাঃ রাঘবন এ'সম্বন্ধে বলেছেন: "Scholars opine that Narada referred to as holding the *Gandharagram*,

১০। মকরন্দ ১।৫৪-৫৬ শ্লোকগুলির সঙ্গে রত্নাকরের "যথা ত্রিশ্রুতিঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলির সম্পূর্ণ মিল আছে।

is the author of the *Sangitamakaranda* which has that *Grama*."[১১]

কিন্তু দেখা যায়, শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে যে গান্ধারগ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন তার বর্ণনা মকরন্দের সঙ্গেই মেলে, নারদীশিক্ষার সঙ্গে নয়। নারদীতে গান্ধার-গ্রামের কোন শ্রুতির বিভাগ করা হয়নি, সেখানে শ্রুতির নির্দেশ করা হয়েছে একমাত্র সামস্বরেরই। তা'ছাড়া সামস্বরের পাঁচটী শ্রুতিকে অবলম্বন ক'রে প্রথমে মকরন্দকার বাইশ শ্রুতির বিভাগ ও নামকরণ করেছেন, যেমন সিদ্ধা, প্রভাবতী, কান্তা ইত্যাদি। রত্নাকরকারও সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছেন শ্রুতি-বিভাগের বেলায়, তবে নামকরণের সময় কিছু পার্থক্য দেখিয়েছেন। এখন লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মকরন্দ যে শ্রুতিভাগ করেছে লৌকিক স্বরের "ষদা ধ-স্ত্রিশ্রুতি ষড়্জে মধ্যমে তু চতুঃশ্রুতিঃ" ইত্যাদি বোলে, তার সঙ্গে রত্নাকরের শ্রুতি-বিভাগেরই ঠিক মিল পাওয়া যায়।

শুধু তাই নয়, গান্ধারগ্রামের সাতটি মূর্ছনাকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শার্ঙ্গদেব মকরন্দকার নারদকেই অনুসরণ করেছেন, কেননা ষড়্জগ্রামের মূর্ছনা-গুলির বর্ণনারীতি বেশ ভিন্ন। নারদীকার স্বরগুলিকে আবার আরোহণক্রমে বর্ণনা করেছেন, আর নাট্যশাস্ত্রকার ভরত করেছেন অবরোহণগতিতে। বৃহদ্দেশী, মকরন্দ, রত্নাকর ও এমন কি ভরতের সমসাময়িক দত্তিলও অবরোহণক্রমে ঐ ষড়্জগ্রামের সাতটি মূর্ছনার নামোল্লেখ করেছেন। গান্ধারগ্রামের কথা দত্তিল, ভরত, মতঙ্গ ও শার্ঙ্গদেব এঁরা কেউই বিশেষ-কিছু বলেন নি। নাট্যশাস্ত্রে ভরত "অথ দ্বৌ গ্রামৌ" কথা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন, তাতে গান্ধারগ্রামের কোন অন্তর্ভুক্তি নাই। দত্তিল[১২] ও তারপর মতঙ্গ বরং গান্ধারগ্রাম যে পৃথিবী লোকে লোপ পেয়েছে, স্বর্গেই তার একমাত্র প্রচলন সে'কথা বলেছেন। মোটকথা মকরন্দে ও রত্নাকরে গান্ধারগ্রামের মূর্ছনাগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রত্নাকর পুরোপুরিভাবে মকরন্দকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন,

১১। Vide *The Journal of the Music Academy* (1932), Vol. III, Nos. 1 & 2, p. 16.

১২। দত্তিল যে ভরতের সমসাময়িক সে' কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, কেননা ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ১।২৬ শ্লোকে কোহল ও দত্তিলের নামোল্লেখ করেছেন : "শাণ্ডিল্যং চাপি বাৎস্যং চ কোহলং দত্তিলং তথা"। দত্তিলের নাম ভরত 'দত্তিল' বোলেই উল্লেখ করেছেন। তবে দত্তিল বা দত্তিল ভরতের সমসাময়িক হোলেও তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।

(১) মকরন্দে—

সংরা বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রাবতী শুভা।[১৩]

আলাপা চেতি গান্ধারগ্রামে স্যুঃ সপ্তমূর্ছনাঃ॥

(২) রত্নাকরে—

নন্দা বিশালা সুমুখী চিত্রা চিত্রাবতী সুখা।

আলাপা চেতি গান্ধারগ্রামে স্যুঃ সপ্তমূর্ছনাঃ॥

এ'ছাড়া মকরন্দের সঙ্গে রত্নাকরের পাঠের মিল অনেক স্থানে পাওয়া যায়। যেমন, মকরন্দকার উল্লেখ করেছেন: "সামবেদাদিদং গীতং তচ্ছগ্রাহ পিতামহঃ * * হি সাধনম্" (১।১৮ ২৪), সঙ্গীতরত্নাকরেও ঠিক তাই পাওয়া যায়, কেবল পার্থক্য আছে: মকরন্দকারের 'তচ্ছগ্রাহ' শব্দটার পরিবর্তে শার্ঙ্গদেব বলেছেন 'সংজগ্রাহ'। শুধু তাই নয়, রত্নাকরের পদার্থসংগ্রহরূপ প্রথম অধ্যায়ের ২৫-৩০ পর্যন্ত শ্লোকগুলিও ঠিক মকরন্দেরই অনুরূপ। তারপর নারদীশিক্ষা, দত্তিল, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী, মকরন্দ ও রত্নাকর এসব গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, ১৮ রকম জাতি সম্বন্ধে দত্তিল ও ভরত যা বলেছেন, নারদীশিক্ষা ও মকরন্দের সঙ্গে তার মিল থাকলেও নারদীতে অন্ততঃ যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, শার্ঙ্গদেব যদি হুবহু সেগুলিকেই অনুসরণ করতেন তাহোলে প্রথমেই তিনি রত্নাকরের অবতরণিকায় বৃহদ্দেশী বা মকরন্দের অনুযায়ী আহত ও অনাহত নাদ, প্রাণবায়ুরূপী অগ্নি, বাদী, সম্বাদী, বর্ণ ও রস এসবের কথা উল্লেখ করতেন না।[১৪] কাজেই এসব দিক থেকেও আমাদের অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে যেখানে নারদের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে প্রায়ই মকরন্দ-কারের কথা বলতে চেয়েছেন।

এবার আমরা সঙ্গীতমকরন্দ থেকে কিছু-কিছু কথা উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব যে, মকরন্দকার নারদ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকার নারদই কিনা—না ভিন্ন। যেমন মকরন্দকার বলেছেন,

(ক) "সঙ্গীতকো নারদ" (১।২)। প্রথমেই দেখা যায়, মকরন্দকার

১৩। 'শুভা'-মূর্ছনার জায়গায় শার্ঙ্গদেব বলেছেন 'সুখা' এই যা প্রভেদ।

১৪। অবশ্য সাত স্বরের বর্ণ, জাতি, কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে নারদীশিক্ষাকারও আলোচনা করেছেন। রাগ ও রাগিণীদের ভাগ ও নির্দিষ্ট নামের কোন উল্লেখ না থাকলেও নারদীশিক্ষা 'রাগ' শব্দ এক জায়গায় ও তৎপরবর্তী ভরত তিন জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

"ব্রহ্মা তালধরো হরিশ্চ পটহী" ইত্যাদি বোলে সঙ্গীতের কৌলিন্য ও প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তারপর "শম্ভোর্নৃত্তকরস্য" ইত্যাদি শ্লোকের প্রসঙ্গে "সঙ্গীতকো নারদঃ" শব্দগুলি থাকায় একথাই বুঝ্‌তে হবে যে, এই নারদই শিক্ষাকার নারদ। এই নারদকে এমন কি নাট্যশাস্ত্রকার ভরত পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, যেমন—"নারদাদ্যাশ্চ গন্ধর্বা নাট্যযোগে নিয়োজিতাঃ" (১।৫১), যদিও নারদ সেখানে মুনি বা ঋষির পরিবর্তে 'গন্ধর্ব' রূপে পরিচিত। তা'ছাড়া ভরতের সমসাময়িক নন্দিকেশ্বরও তাঁর 'অভিনয়-দর্পণ' গ্রন্থে (১।১১) নারদের নাম উল্লেখ করেছেন—"জহার নারদাদীনাম্।" মকরন্দকার এই রকম ক'রে ১।১৮ শ্লোকেও "তদ্গীতঃ নারদায়ৈব" কথাগুলি উদ্ধৃত ক'রে সেই আদি-নারদের (নারদীশিক্ষাকারের) কথাই বলেছেন।

(খ) "নারদেন কৃতম্" (১।৩)। এখানে নারদ বল্‌তে মকরন্দকারকেই বুঝ্‌তে হবে। মকরন্দকার নিজের নাম এ'রকমভাবে অনেক জায়গায়ই উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থে রচয়িতার নিজের নাম উল্লেখ করার রীতি বরাবরই এ'ধরণের ছিল। নাট্যশাস্ত্রেও আমরা দেখি: "তৎ ভরতং নাট্যকোবিদম্" (১।২), "মুনীনাম্ ভরতো মুনিঃ" (১।৬)। সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেবও এই রীতি অনুসরণ করেছেন; যেমন: "প্রচুরতরবিবেকঃ শার্ঙ্গদেবোঽয়মেকঃ" (১।১০), "নির্মথ্য শ্রীশার্ঙ্গদেব সারোদ্ধারমিমং ব্যধাৎ" (১।২১), প্রভৃতি।

(গ) "নারদাদিভিঃ" (১।৯৮)। এই নারদ মকরন্দকার কিনা তা আলোচনা ক'রে দেখার বিষয়। মকরন্দের ১।৯৭-৯৮ শ্লোক চারটি আবার হুবহু দত্তিলের ১।৩০-৩১ শ্লোক চারটির অনুরূপ, যদিও সামান্য তাদের ভেতর পাঠভেদ দেখা যায়। সুতরাং তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মকরন্দকার নারদ দত্তিলকেই অনুসরণ করেছেন। অথবা নারদীশিক্ষার গ্রন্থকার ও মকরন্দের রচয়িতাকে যাঁরা একই লোক বল্‌তে চান তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, দত্তিলই প্রকৃতপক্ষে শ্লোক-চারটি সঙ্গীতমকরন্দ থেকে ধার করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা আমরা দেখি না, কেননা নারদীকার ও মকরন্দকার যদি ভিন্ন ভিন্ন লোক না হোয়ে একই ব্যক্তি হন তবে দু'টি গ্রন্থের আলোচনা ও বিষয়বস্তুর ভেতর এতো প্রার্থক্য থাকবে কেন? আমরা জানি যে, উরঃ, কণ্ঠ ও শির এই তিন জায়গা থেকে মন্দ্র, মধ্য ও তার (উচ্চ) স্বরের উৎপত্তি হয়। উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত স্বর, বা আর্চিক, গাথিক, সামিক

প্রভৃতি বৈদিক গান নিয়ে শিক্ষাকার নারদ যতটুকু ও যেভাবে আলোচনা করেছেন সেভাবে আর কোন সঙ্গীত গ্রন্থকার করেন নি—একমাত্র অন্যান্য শিক্ষাগ্রন্থকার ছাড়া। তারপর নারদী যেভাবে কেবল সাত স্বরেরই দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও গন্ধর্বাদির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের নামোল্লেখ করেছেন সে-রকম—এমন কি নাট্যশাস্ত্র, দত্তিল, বৃহদ্দেশী, মকরন্দ কিংবা রত্নাকর প্রভৃতি কোন গ্রন্থই এই নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় নি। নারদীতে সামগানের নির্দেশ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। নারদীর তুলনায় অপরাপর শিক্ষা যেমন, যাজ্ঞবল্ক্য, গোতমী, লোমশী ও এমন কি অথর্ববেদীয় মাণ্ডুকীও ততবেশী আলোচনা করেনি। নাট্যশাস্ত্রের কথা তদ্রূপই। গানের কত রকমের গুণবৃত্তি—এদের নির্ণয় করতে গিয়ে নারদী বলেছে—"দশবিধা" প্রভৃতি।[১৫] যাজ্ঞবল্ক্য বা অপরাপর শিক্ষায় এ' সকলের কোন আলোচনা নেই। নাট্যশাস্ত্রের কথাও তাই, তবে নাট্যশাস্ত্র, দত্তিল প্রভৃতি গ্রন্থ মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা এই চারটী গীতিলক্ষণের নামোল্লেখ করেছে।[১৬] বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ ভরতকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মকরন্দে এ'সবের কিছুরই উল্লেখ নেই।

তারপর নাট্যশাস্ত্রে ভরত 'রাগ' এই শব্দটী তিন জায়গায় উল্লেখ করেছেন। দত্তিল ও ভরত এবং ভরতের পরবর্তী মতঙ্গ পর্যন্ত "জাতয়োরষ্টাদশঃ" শব্দগুলিতে ১৮ রকম জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন। রামায়ণেও জাতিগানের উল্লেখ আছে। তবে একথা ঠিক যে, দত্তিল ও ভরত এঁরা 'জাতিরাগ' কি রকম ও কি কি রসে তাদের গাইতে হয় সে'সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মকরন্দে তার ঠিক বিপরীত। মকরন্দকার রাগের কথা তো বলেছেনই, তা' ছাড়া রাগের স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকত্বও নির্ণয় করেছেন। বৃহদ্দেশীতে 'রাগ' সম্বন্ধে যতটুকু অস্পষ্টতা ছিল, মকরন্দে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে একথাই বলা যায়। কাজেই এ'থেকে সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হবে না যে, মকরন্দকার শুধু নারদীকারেরই নয়, পরন্তু ভরত ও বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গেরও অনেক পরবর্তী।

(ঘ) "নারদস্তুম্বুরুশ্চৈব" (১।৩৭)। এখানে আর একটি সমস্যা আমাদের

১৫। "গানস্য তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তদ্যথা রক্তং পূর্ণমলংকৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লক্ষ্ণং সমং সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ।"—নারদী ১।৩।১

১৬। নাট্যশাস্ত্র ২৯।৭৬-৭৭

সামনে এসে দাঁড়ায়, কেননা মকরন্দকার যে-নারদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন তিনি মকরন্দকার নারদ মোটেই নন। নারদ ও তুম্বুরুর নাম প্রায় একসঙ্গেই সর্বত্র পাওয়া যায়। দত্তিল থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই তুম্বুরুর নামের সঙ্গে নারদের নামোল্লেখ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণের সকলগুলিতেও তাই। কাজেই এই নারদ কোন প্রবীণ নারদ কিংবা নারদীকার নারদ কিনা বলা দুরূহ।

এ'ছাড়া মকরন্দে আরও এক জায়গায় (২।১৯) আছে: "চণ্ডী ব্যালশ্চ শার্দুলো নারদস্তুম্বুরুস্তথা।" মকরন্দকার ভরত ও নন্দিকেশ্বরের নামও উল্লেখ করেছেন; যেমন ১।৭৪ শ্লোকে তিনি "ভরতেন চ চর্চিতাঃ" বলেছেন,[১৭] আর সঙ্গীতাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৮-২০ শ্লোকগুলিতে আবার স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন,

> হরির্ব্রহ্মা হরিশ্চৈব মতঙ্গঃ কশ্যপো মুনিঃ।
> বিশ্বকর্মা হরিশ্চন্দ্রো ভরতঃ কমলাত্মকঃ॥
> চণ্ডী ব্যালশ্চ শার্দুলো নারদস্তুম্বুরুস্তথা।
> বায়ুর্বিশ্বাবসুঃ শৌরিরাঞ্জনেয়োঽঙ্গদস্তথা॥
> ষন্মুখো ভৃঙ্গিদেবেন্দ্রঃ কুবেরঃ কুশিকো মুনিঃ।
> মাত্রাগুপ্তো[১৮] রাবণশ্চ সমুদ্রশ্চ সরস্বতী॥

এখানে দেখা যাচ্ছে, মকরন্দকার সঙ্গীতের প্রধান প্রধান আচার্যদের নাম করতে গিয়ে মতঙ্গ, কশ্যপ, ভরত, ব্যাল, নারদ, তুম্বুরু এঁদের কথাও বাদ দেন নি। মতঙ্গ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পরবর্তী আচার্য। মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী' রচনা করার সময়ে স্বীকারই করেছেন যে, রাগের (জাতিরাগভিন্ন) বিভাগ একমাত্র তিনিই প্রথমে করেছিলেন। মকরন্দে রাগ-রাগিণীদের মূর্তি পরিস্ফুট, সুতরাং মকরন্দকার রাগ-রাগিণীদের বিভাগের রীতি যে মতঙ্গের কাছ থেকে পেয়েছিলেন একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

শুধু তাই নয়, আরও এক কথা এই যে, নারদীকার ও মকরন্দকার যদি একই লোক হন তবে মকরন্দকার নারদ ভরত, মতঙ্গ, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু কিংবা

১৭। নন্দিকেশ্বরের নাম মকরন্দকার "নন্দিকেশ্বরকল্পিতম্" বোলে তাঁর গ্রন্থের নৃত্যাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

১৮। এর শুদ্ধপাঠ 'মাতৃগুপ্ত'-ই হবে।

মাতৃগুপ্ত এই সকল পরবর্তী গ্রন্থকারদের নামোল্লেখ করেছেন কেন? অধ্যাপক এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার তাই স্পষ্টভাবে বলেছেন: "Bharat follows the views of Narada in Samasvara * * *. Siksha is an ancient work entitled to priority over the extent *Natyasastra*". মাননীয় ষ্ট্রাঙ্‌গয়েজও নারদীশিক্ষাকে "undated" বোলে তাকে প্রাচীনতার সম্মান দেখিয়েছেন।[২০] সুতরাং নারদীশিক্ষা যদি নাট্যশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীন হয় এবং মকরন্দকার ভরত ও এমনকি ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকার মতঙ্গের নাম আচার্যদের তালিকায় উল্লেখ ক'রে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন তখন এ' কথাই নিঃসংশয়ে বলা অসঙ্গত হবে না যে, মকরন্দকার নারদ শিক্ষাকার নারদের অনেক পরবর্তী গ্রন্থকার ও সঙ্গীতগুণী, আর সেজন্যেই "নারদস্তুম্বুরুস্তথা" শ্লোকে মকরন্দকার শিক্ষাকার নারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

কশ্যপের কথাও তাই। মকরন্দকার নারদ "কশ্যপো মুনিঃ" বোলে আচার্য হিসাবে কশ্যপের নাম উল্লেখ করেছেন তা আগেই বলেছি। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে কিন্তু এই কশ্যপের নাম সাত বার করা হয়েছে। কশ্যপ নাট্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে বই লিখেছিলেন, তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর সে' সব বই এখনও ছাপা হয়েছে কিনা জানি না। মোটকথা বৃহদ্দেশীতে মতঙ্গ কশ্যপের নাম করেছেন, আর মতঙ্গ মকরন্দকারেরও আগেকার বা সমসাময়িক আচার্য, কেননা মকরন্দকার মতঙ্গের নাম নিজেই করেছেন; সুতরাং এ' থেকে সিদ্ধান্ত করা কঠিন হবে না যে, মকরন্দকার নারদ শিক্ষাকার নারদ মোটেই নন। আঞ্জনেয়ের কথা বিচার করলেও ঐ একই সিদ্ধান্ত করতে হবে।

(ঙ) "নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ" (৩।৭)। এখানে দেখা যায় যে, "লোকপিতামহঃ ব্রহ্মা"—যিনি ভারতের নাট্যশাস্ত্রে 'দ্রুহিনো' ও 'ব্রহ্মা' নামে উল্লিখিত, তিনি নাট্য ও সঙ্গীতের আদিকর্তা সে' কথা ভারত ও তৎপরবর্তী গ্রন্থকারেরা যেমন শার্ঙ্গদেব, অহোবল প্রভৃতি একবাক্যে স্বীকার করেছেন।[২১] কাজেই পিতামহ ব্রহ্মা যদি নারদের বিষয় অবগত থাকেন ও সেই নারদ যদি মকরন্দকারই হন তাহলে মকরন্দকার নারদ অবশ্যই ব্রহ্মার সমসাময়িক হবেন এ'কথা মেনে নিতে হবে। কিন্তু তা মোটেই সমীচীন নয়,

২০। Cf. ডাঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার: *History of Classical Sanskrit Literature.*

২১। "সামবেদাদিং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ।"—সঙ্গীতরত্নাকর ১।২৫

কেননা ভরত নিজেও ব্রহ্মার কথা উল্লেখ করেছেন, আর মকরন্দকার তাঁর গ্রন্থে তিন বার অন্ততঃ ভরতের নাম প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন। কাজেই এটাই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে—"নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা" কথাগুলির ভেতর এই নারদ অবশ্যই পূর্ববর্তী নারদই হবেন, তা তিনি শিক্ষাকারই হন বা অন্য কোন প্রাচীন নারদই হন; মোটকথা তিনি মকরন্দকার নারদ নন। তারপর একথাও সত্য যে, নারদ একজন মাত্র ছিলেন না, নারদ নাম নিয়ে বহু মনীষী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কাজেই নারদের নামাঙ্কিত যে-কোন গ্রন্থ দেখলেই যে সনাতন একজন নারদই সবার গ্রন্থকর্তা হবেন এই সিদ্ধান্তের কোন সার্থকতা নেই।

তারপর আরও কয়েকটি বিষয় আলোচনা ক'রে দেখলে দেখা যায়, মকরন্দকার অন্ততঃ শিক্ষাকার নারদ মোটেই নন। তার একটি কারণ হোল এই যে, মকরন্দকার 'সঙ্গীত কাকে বলে?' বলতে গিয়ে দু'জায়গায় বলেছেন: "গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয় সঙ্গীতমুচ্যতে"; অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমবেত রূপই 'সঙ্গীত'। কিন্তু নারদী, দত্তিল, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী কোন গ্রন্থই এইভাবে 'সঙ্গীত' শব্দের মাধ্যমে গীতিকলার পরিচয় দেয় নি। এরা সকলেই ব্যবহার করেছে 'গীতি' 'গান' ও 'গন্ধর্ব' শব্দগুলি। তবে নাট্যশাস্ত্রে গীত, বাদ্য ও নাট্য এ' তিনটির একসঙ্গে উল্লেখ আছে। মনে হয় 'সঙ্গীত' শব্দটির বীজ ও ধারণা পরবর্তী সঙ্গীতগ্রন্থকারেরা ভরতের গীত, বাদ্য ও নাট্য কথাগুলির ভেতর থেকেই পেয়েছেন। তারপর সঙ্গীতের গ্রন্থ যতগুলি অন্ততঃ আজকাল ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে মকরন্দের ভেতরই সুস্পষ্টভাবে 'সঙ্গীত' শব্দটির ব্যবহার এবং নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত রূপ সঙ্গীতে এ' ধরণের পরিচয় পাওয়া যায়। মকরন্দের পরে আর সমস্ত গ্রন্থই মকরন্দকে অনুসরণ করেছে। শার্ঙ্গদেব তো বটেই। সুতরাং বলা যায় যে, 'সঙ্গীত' শব্দটি মাত্র আমদানী হয়েছে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর ভেতর, অর্থাৎ মকরন্দকার নারদের সময়ে। নারদীকার নারদ, ভরত, মতঙ্গ এঁরা মকরন্দকারের চেয়ে অনেক প্রাচীন, এঁরাও 'সঙ্গীত' শব্দটি তাঁদের গ্রন্থে ব্যবহার করেন নি, অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, রামায়ণকার দু'বার 'সঙ্গীত' শব্দটি তাঁর রামায়ণে ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ হোল: রত্নাকরের টীকাকার সিংহভূপাল তাঁর সুধাকর-

টীকায় "গ্রামমূর্ছনাক্রমতান" নামক অধ্যায়ে রত্নাকরের ৩৭ শ্লোকের ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্যে নারদের একটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন এবং সেটি হোল,

আর্চিকো গাথিকশ্চৈব সামিকশ্চ স্বরান্তরঃ।

*   *   *

সংপূর্ণঃ সপ্তভিশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গীতয়োক্তৃভিঃ ॥

এখন সহজেই জিজ্ঞাসার বিষয় হোতে পারে যে, এই নারদ কে? কেননা সিংহভূপাল যখন নারদের কথা নজির হিসাবে উল্লেখ করেছেন তখন স্বীকার করতেই হবে যে, এই নারদ সঙ্গীত-জগতের একজন প্রামাণিক ব্যক্তি। তারপর নারদের রচিত বোলে যতগুলি বইয়ের নাম[২২] আমরা পাই তার ভেতর নারদীশিক্ষার (১।২।৩) শ্লোকগুলি হোল এই,

আর্চিকং গাথিকং চৈব সামিকং চ স্বরান্তরং।
কৃতান্তে স্বরশাস্ত্রাণাং প্রযোক্তব্যং বিশেষতঃ ॥
একান্তরস্বরো হ্যক্ষু গাথাসু দ্ব্যন্তরঃ স্বরঃ।
সামসু ত্র্যন্তরং বিদ্যাদেবতাবৎ স্বরতোস্তরম্ ॥

এখানে তুলনা করলে দেখা যায়, টীকাকার সিংহভূপাল যে শ্লোকগুলির প্রমাণ দিয়েছেন তাদের ভেতর প্রথম "আর্চিকং গাথিকং" লাইনটির মাত্র মিল আছে, বাকি কোথাও আর মিল পাওয়া যায় না। তারপর ঔড়ব, ষাড়ব বা সম্পুর্ণের কথাও নারদীশিক্ষাকার যেভাবে বলেছেন, সিংহভূপাল তেমনটি বলেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বেদের শাখাভেদে স্বর-সংখ্যার পরিবর্তন হোত।[২৩] কাজেই বলা যায়, সিংহভূপাল তাঁর প্রামাণিক শ্লোকগুলি ঠিক 'নারদীশিক্ষা' থেকে উদ্ধার করেন নি, করেছেন 'মকরন্দ' থেকে। কিন্তু মকরন্দেও আবার পাঠভেদ আছে, কেননা মকরন্দের সঙ্গীতাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে যেখানে "গীতদোষাঃ" প্রভৃতি বলা হয়েছে সেখানেই (৫৩-৫৫ শ্লোকে) গ্রন্থকার বলেছেন: "ষাড়বৌড়বসংপূর্ণরাগাঃ স্যুস্ত্রিবিধাস্তথা", কিন্তু আর্চিকাদির নামগন্ধ তিনি করেন নি। কাজেই এ'থেকে অনুমান করা যেতে পারে

২২। (১) নারদীশিক্ষা, (২) রাগনিরূপণ, (৩) পঞ্চমসারসংহিতা। এদের ভেতর 'নারদীশিক্ষা' ও কিছুদিন আগে 'রাগনিরূপণ' ছাপা হয়েছে। কিন্তু 'রাগনিরূপণ' বইটি সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট বক্তব্য আছে, কেননা তার গোড়ার বেশী অংশই রত্নাকর থেকে ধার নেওয়া হয়েছে বোলে আমাদের বিশ্বাস।

২৩। নারদীশিক্ষা (কাশী সং), পৃ. ৩৯৭—৩৯৮

যে, সিংহভূপাল নারদীকার ও মকরন্দকার থেকে ভিন্ন একজন নারদের কথা উদ্ধৃত করেছেন। অবশ্য সেই তৃতীয় নারদের কোন গ্রন্থই আমরা এখনও পর্যন্ত পাই নি। তবে এটি সম্ভবপর যে, নারদীর বা মকরন্দের পাঠে যথেষ্ট অদল-বদল হয়েছে এবং তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।[২৪]

কিন্তু একথা ঠিক যে, প্রমাণের উদ্ধৃতি যে কোন বই থেকেই দেওয়া হোক না কেন, নারদ তাঁর নারদীতে আর্চিকাদি স্বরের কথা বলেছেন, কিন্তু মকরন্দকার নারদ এ'সবের আলোচনা মোটেই করেন নি, করেছেন কেবল "ষাড়বৌড়বসং-পূর্ণরাগঃ স্যাস্ত্রিবিধাঃ" এই তিনটির উল্লেখ ক'রে। এখন যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, নারদীকার ও মকরন্দকার এক ও অভিন্ন লোক তাহলেও অনায়াসে সংশয় উঠতে পারে যে, একই লোকের সিদ্ধান্তে ও প্রতিপাদ্য বিষয়ে এত বৈষম্য দেখা যায় কিভাবে? কাজেই হয় বলা যায় যে, নারদীশিক্ষা বইখানি রচনা করার সময়ে দেশের সমাজ ও রুচি যে-রকমের ছিল, 'মকরন্দ' গ্রন্থ রচনার সময়ে দেশের রুচি ও অবস্থা তা থেকে অনেক পরিবর্তিত হয়েছিল, আর সেজন্যেই নারদ আর্চিকাদি স্বরের কথা শিক্ষার যুগে আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু মকরন্দের সময়ে তা করার কোন সার্থকতাই ছিল না। কিন্তু এ'সব যুক্তিও আবার সমীচীন নয়, কারণ নারদীতে বিষয়-বস্তু ও আলোচনার পদ্ধতির সঙ্গে মকরন্দকারের প্রকাশভঙ্গির মোটেই মিল পাওয়া যায় না। সুতরাং নানান্ দিক থেকে সংক্ষেপে বিচার ক'রে দেখলে আমরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হব যে, নারদীশিক্ষাকার নারদ ও সঙ্গীতমকরন্দকার নারদ সম্পূর্ণ দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ ক'রে তাঁরা তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[২৫]

২৪। এর প্রমাণও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। কারণ মূল রত্নাকরে অথবা কালিনাথ ও সিংহভূপালের টীকায় মাঝে মাঝে যেখানে মকরন্দ থেকে বিষয়-বস্তু উদ্ধৃত ক'রে দেখানো হয়েছে সেখানে এটি সত্য যে, মূল ও উদ্ধৃতির ভেতর যথেষ্ট পাঠভেদ আছে।

২৫। ডাঃ রাঘবন্ এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন আলোচনা না করলেও স্বীকার করেছেন: "We have at least two Naradas, one the author of the *Siksha* and the other, the author of the *Sangita-Makaranda*."—Vide *Journal of the Music Academy* (Madras), Vol. III, p. 16.

পরিশিষ্ট ঃ তৃতীয়

নারদীয় রাগনিরূপণ

অনেকের মতে, শিক্ষাগ্রন্থ ছাড়া নারদ আরও দু'খানি সঙ্গীতের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং সে' দু'খানি হোল : 'পঞ্চমসংহিতা' বা 'পঞ্চম-সারসংহিতা' ও 'রাগনিরূপণ'। কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রত্যেকটী গ্রন্থের রচয়িতা নারদ পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক, কাজেই সেদিক থেকে নারদ চারজন : (১) নারদীশিক্ষাকার, (২) মকরন্দকার, (৩) পঞ্চমসংহিতাকার ও (৪) রাগনিরূপণকার। কেননা এই চারটী গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেকটীর রাগ-রাগিণীদের বিভাগ ও বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ্যালেন ডানিয়েলু (Alian Danielou) তাঁর *Northern Indian Music* (1949) গ্রন্থে The Different Naradas (পৃ° ২৩-২৪) পর্যায়ে আলোচনা ক'রে ঐ সমস্ত গ্রন্থের রচয়িতা-হিসাবে মোটামুটি ভিন্ন ভিন্ন নারদই সিদ্ধান্ত করেছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের প্রার্থক্য হোল : তিনি যেখানে 'probably' বা 'সম্ভবত' শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে আমাদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেছেন : "One the author of the *Naradiya Shiksha*, is 'probably' the earliest writer * * who in turn are quoted by later Naradas, the authors of the *Sangita Makaranda* and the *Chatrarimshachhata Raganirupanam*. * * * The *Panchama Sanihita* and *Narada Samhita* are 'probably' the work of the later Narada (Narada II), the author of the *Sangita Makaranda*"। তবে সঙ্গীতগুণী ডানিয়েল যেখানে 'পঞ্চম-সংহিতা' ও 'নারদসংহিতা'-র রচয়িতাকে ২য় নারদ (Narada II) হিসাবে মকরন্দকার নারদের রচনা-কর্তৃত্বাধীন বলেছেন সেখানে তিনি বিষয়-বিচার ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান দেননি বোলেই আমাদের বিশ্বাস।

নারদীশিক্ষার রচনাকাল মোটামুটি খৃষ্টীয় ১ম—২য় শতাব্দীর ভেতর এবং মকরন্দকার নারদ তাঁর সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেছিলেন খৃষ্টীয় ৭ম—১১শ শতাব্দীর

কোন সময়ে, অন্ততঃ 'মকরন্দ'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলাঙ্‌ যা স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতগুণী কক্স্‌ ষ্ট্রাঙ্‌গয়েজ নারদীশিক্ষার সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে একবার বলেছেন—"* * write the 'undated' *Narada-siksa,* whose system shows a considerable advance on that of the *Natyasastra* * *;"[২৬] আবার অন্যত্র বলেছেন—"The treatise which purports to record the doctrines of Narada, the *Narada-siksa,* is probably of late date * *"।[২৭] এই 'late date' বল্‌তে তিনি খৃষ্টীয় ১ম শতক বলেছেন এবং এটা যুক্তিসঙ্গতও।

মকরন্দকার নারদ সম্বন্ধেও আমরা মাননীয় ষ্ট্র্যাঙ্‌গয়েজের সঙ্গে একমত, কেননা গ্রন্থের আলোচনা ও বিচারভঙ্গিকে তুলনা ক'রে দেখ্‌লে এ'কথাই মনে হয় যে, নারদীকার ও মকরন্দকার নারদ মোটেই অভিন্ন লোক নন এবং আগেই তা আমরা উল্লেখ করেছি। ডাঃ রাঘবনের অভিমতও তাই, কেননা তিনি বলেছেন: "We have at least two Naradas, one, the author of the *Siksa* and the other, the author of the *Sangita-Makaranda*" (Vide *The Journal of the Music Academy,* Vol III, 1932, p. 16)। মকরন্দের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলাঙ্‌ সঙ্গীতমকরন্দের সময় নির্দেশ কর্‌তে গিয়ে তাঁর অবতরণিকায় বলেছেন: 'Narada, the author of *Sangita-Makaranda* lived sometime in the interval between Matrigupta A. D. 550 and Sharangadeva A. D. 1210-1247, that is, he must have lived between the 7th and 11th centuries"। ডাঃ রাঘবনও মকরন্দের সময় 7th century বোলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এন্‌. এস্‌. রামচন্দ্রনের অভিমতও প্রায় তাই; তিনি বলেছেন: নারদের কাল "later than the 9th century A. D."; কিন্তু তিনি নারদীশিক্ষা সম্বন্ধে অবিচার করেছেন বল্‌তে হবে, কেননা তিনি নারদীর সময় নির্দেশ করেছেন 10-12th century A. D."—যা মোটেই সমীচীন নয়।

'রাগনিরূপণ' বইখানি ছাপা হয়েছে আর্যভূষণ প্রেস থেকে মাত্র ১৯১৪ সনে

২৬। Cf. *The Music of Hindosthan* (1914) p. 74.
২৭। Ibid., p. 75.

(১৮৩৬ শকে) এবং এখন তার প্রকৃত নাম "নারদীয়ম্ চত্বারিংচ্ছশতরাগ-নিরূপণম্"।[২৮] বইখানি আরম্ভ হয়েছে নাদাত্মক ব্রহ্মরূপী ও চিদ্রূপ সদাশিবকে বন্দনা ক'রে। যেমন,

শ্রীমদ্ব্রহ্মপরং সদাশিবময়ং চিদ্রূপমাদ্যং সমং।
মায়াতীতমমেয়মক্ষরমুদারাকারমব্যাহতম্॥
তেজঃ পদ্মভবাদ্যগোচরমজং বেদ্যং ত্রয়ীমৌলিভি-
র্ধ্যায়েৎ সন্ততসন্তরঙ্গসরণৌ নাদাত্মকং বিশ্রুতম্॥

নারদমুনি যে রাগনিরূপণের গ্রন্থকর্তা, একথা তিনি 'কুরুতে নারদো মুনি', 'রাগা নারদেন সমাহিতাঃ', 'নারদেন প্রকীর্তিতাঃ', 'মুনীন্দ্রৈঃ', 'মুনের্মতে' ইত্যাদি শব্দগুলি দিয়ে বুঝিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই নারদী-শিক্ষাকার নারদ বা মকরন্দকার কিনা?—সে'কথা কোথাও উল্লেখ করেন নি। কোন কোন বিষয়বস্তুর শেষে আবার আছে 'ইতি নারদীয়ে সপ্তস্বর-জ্ঞানম্' (পৃঃ ৪), 'ইতি নারদীয়ে গমকাঃ' (পৃঃ ৫), 'ইতি নারদীয়ে গণপ্রকরণম্' (পৃঃ ৬) ইত্যাদি ও একেবারে শেষে বলা হয়েছে—'ইতি শ্রীনারদীয়ে চত্বারিংশচ্ছতরাগনিরূপণং সংপূর্ণম্'। এই সকল শব্দ বা কথাগুলি গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন, কি সম্পাদক মহাশয় নিজে সংযুক্ত করেছেন তাও ঠিকভাবে বলা দুরূহ। মোটকথা 'নারদ' এই শব্দ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে ইনি কোন্ নারদ এর ইঙ্গিত বইয়ের কোথাও দেওয়া নেই।

গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অন্য সব নানান্ সঙ্গীতের গ্রন্থ মন্থন ও বেশ পরিষ্কারভাবে বিচার ক'রে তিনি এই 'রাগনিরূপণ' বইখানি সংক্ষেপে লিখেছেন। এ'ছাড়া তিনি ঐ সকল গ্রন্থকারদের নাম উল্লেখ ক'রে তাঁদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এখানে আমাদের বিচারের বিষয় এই যে, সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব যেভাবে ও যে-রীতিতে প্রাচীন গ্রন্থকর্তাদের নামোল্লেখ করেছেন (১ম অঃ, ১৫-১৭ শ্লোঃ) বা মকরন্দে নারদ যে-প্রণালীতে প্রাচীন গ্রন্থকারদের নাম উল্লেখ করেছেন, রাগনিরূপণকার সেই রীতি মোটেই অনুসরণ

২৮। ডাঃ রাঘবন্ লিখেছেন, তাঞ্জোর লাইব্রেরীতেও নারদের নামে যে আর একখানি সঙ্গীতের বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে, তার নাম 'চত্বারিংচ্ছশতরাগনিরূপণম্'। কিন্তু সাধারণতঃ সকলে একে 'রাগনিরূপণ' বোলে থাকেন।

করেন নি। তা' ছাড়া রত্নাকরকার ও মকরন্দকার দু'জনেই 'নারদ-তুম্বুরু' (রত্নাকর ১।১৬) ও 'নারদস্তুম্বুরুস্তথা (মকরন্দ, ২।১৯) বোলে তুম্বুরুর যেখানেই নাম করেছেন সেখানেই নারদের নাম উল্লেখ করেছেন। রাগনিরূপণেও তুম্বুরুর উল্লেখ আছে ('তুম্বুরুশ্চা—'), কিন্তু নারদের নাম বাদ পড়েছে, বা পাণ্ডুলিপিতেই নষ্ট হোয়ে গেছে বোলে আমাদের অনুমান।

সঙ্গীতের কথা, মার্গ-দেশীর ভেদ ও কেমন ক'রে মার্গ ও দেশী গান দুটির সৃষ্টি সামবেদ থেকে হোল, যে গীত বা গান পিতামহ ব্রহ্মা আবিষ্কার করলেন তার আত্মা থেকে নাদের উৎপত্তি ; মন্দ্র, মধ্য ও তারের এবং শ্রুতি থেকে সাত স্বরের উৎপত্তি প্রভৃতির কথা হুবহু রত্নাকর ও মকরন্দের অনুরূপ রাগনিরূপণে উল্লেখ করা হয়েছে, পাঠেরও বিন্দুমাত্র ভেদ নেই বলা যায়। যেমন রাগনিরূপণের ৮ থেকে ১৮ শ্লোকগুলির রত্নাকর ও মকরন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল আছে। তারপর রাগনিরূপণ উল্লেখ করেছে : "যো মার্গিতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ" (১।৯), এই 'ভরত' নাট্যশাস্ত্রকার ছাড়া অন্য কেউ নন। তা'ছাড়া গ্রন্থকর্তাদের নামের তালিকায়ও ভরতের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একথা ঠিক যে, রাগনিরূপণকার নাট্যশাস্ত্র-গ্রন্থকার ভরতের নাম জানতেন, তা' না হোলে গ্রন্থের ভিতর কখনই তিনি ভরতের নাম উল্লেখ করতেন না। কিন্তু নারদীশিক্ষায় ভরতের নামের কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখন যদি বলা যায়, নারদীশিক্ষার সময়ে ভরতের জন্ম হয়নি, অথবা নারদীশিক্ষা রচনা করার সময়ে নারদ ভরতের নাম উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নি, তাহলেও সে'কথা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় ; কেননা দেখা যায়, নারদীয় ভাষা ও লিখনভঙ্গি রাগনিরূপণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা'ছাড়া রাগনিরূপণের ভাষা খুবই আধুনিক বোলে আমাদের ধারণা। ভরতের কথা ছেড়ে দিলেও রাগনিরূপণকারের উল্লেখ থেকে পরিষ্কারই বোঝা যায় যে, তিনি ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকারদের বিষয়ও ভালভাবে জানতেন।

আরও একটি বিচারের বিষয় যে, রাগনিরূপণকার নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবায়ে সঙ্গীতের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন, অথচ শিক্ষাকার কেন, শিক্ষাকারের পরবর্তী দত্তিল, ভরত ও এমন কি মতঙ্গের সময়েও 'সঙ্গীত' শব্দটী তদানীন্তন সমাজে আবিষ্কৃত বা প্রচলিত হয় নি। শিক্ষাকার নারদ, দত্তিল ও ভরত প্রভৃতির সময়ে 'গান', 'গীত' ও 'গান্ধর্ব' শব্দগুলির মাত্র প্রচলন ছিল।

মূর্ছনার লক্ষণে রাগনিরূপণকার নারদীর চেয়ে মকরন্দকেই বেশী অনুসরণ করেছেন বলা যায়, প্রভেদ কেবল 'ষড়্জ' ও 'ষড়্জে' শব্দ দুটীতে।[২৯] তবে রত্নাকরের সঙ্গেও তার বেশ মিল আছে। সাত স্বরের ময়ূর, চাতক, অজ এসব পশুপক্ষীদের গলার স্বরের বা শব্দের সঙ্গে যে ঐক্য আছে তার উল্লেখও নারদী (পৃঃ ৪০৭), মকরন্দ (১।১৩) ও রত্নাকরের (৩।৪৬) বর্ণনার সঙ্গে মেলে।

তারপর 'গায়নলক্ষণ'-এর প্রসঙ্গ ওঠে। এই লক্ষণের বর্ণনা তাঁর ৩য় প্রকীর্ণাধ্যায়ে ১৩-২৩ শ্লোকে 'গায়নদোষ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, মকরন্দ ৪র্থ অধ্যায় ৪৮-৫৯ শ্লোকগুলিতে 'গীতদোষাঃ' পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু রাগনিরূপণকার নারদ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথকৃভাবেই তাদের উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর ভাষায় আধুনিকতার ছোঁয়াচ বেশ স্পষ্টই থেকে গেছে।

এর পর প্রশ্ন ওঠে রাগ-রাগিণীদের নাম ও ধ্যানের কথা নিয়ে। রাগ-রাগিণীদের নামকরণ ও ধ্যান-বর্ণনার প্রসঙ্গে রাগনিরূপণকারের লিখনভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে আধুনিক। রাগ-রাগিণীদের ধ্যানের কথা যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডুকী, লোমশী ও নারদী প্রভৃতি শিক্ষা থেকে আরম্ভ ক'রে দত্তিল ও ভরত এঁরা কেউই উল্লেখ করেন নি। তবে একথা ঠিক যে, নারদীশিক্ষা ও নাট্য-শাস্ত্রের কয়েক জায়গায় 'রাগ' শব্দ ব্যবহার করা হোলেও রাগ ও রাগিণী—এ'রকম পুরুষ ও স্ত্রী-ভেদ তাদের মধ্যে ছিল না। শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে রাগের 'আলাপন' ও 'আলপ্তি' শব্দ দুটীতে স্ত্রী-পুরুষভেদের ইঙ্গিত করেছেন এবং সেই নিয়ে টীকাকার মল্লিনাথও ব্যাকরণ ইত্যাদির প্রমাণ দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, "ঘঞর্থ আবির্ভাবঃ সত্ত্বপরিণামরূপো মূর্তিধর্মঃ পুংস্থেন দৃষ্ট ইতি ঘঞন্তস্য পুংলিঙ্গতা। ক্তিন্নর্থাস্তিরোভাবো রজঃ পরিণামরূপো মূর্তিধর্মঃ স্ত্রীত্বেন দৃষ্ট ইতি ক্তিন্নন্তস্য স্ত্রীলিঙ্গতা।" এখানে সত্ত্ব ও রজঃ এই দু'টী গুণের আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ে বিচার করা হয়েছে। কিন্তু এ'রকম বিচারের ভঙ্গি মতঙ্গও তাঁর বৃহদ্দেশীতে স্পষ্ট ক'রে গ্রহণ করেন নি। বৃহদ্দেশীকার বলেছেন জাতিগান এবং তাদের বর্ণনা ও নিয়ম-কানুনের কথা। তাতে 'রাগ' ও 'রাগিণী' শব্দ দুটী ব্যবহার না ক'রে 'রাগ' শব্দেরই

২৯। নারদীশিক্ষা, পৃঃ ৪০০, মকরন্দ ১।৫৭ ও রত্নাকর ৪।৯—১২ দ্রষ্টব্য। যেখানে রাগনিরূপণে 'হরিণা' শব্দ বলা হয়েছে, রত্নাকরে সেখানে 'হরিণাশ্বা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নারদীও 'হরিণাশ্বা' শব্দ ব্যবহার করেছে এবং এই নামই মনে হয় ঠিক।

মাত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, রাগের নামের শেষে বিভক্তির জন্যে সেটা পুরুষ কি স্ত্রী, তা সহজেই ধরা যায়। যেমন মতঙ্গ গীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

প্রথমা শুদ্ধগীতিঃ স্যাদ্ দ্বিতীয়া ভিন্নকা ভবেৎ।
তৃতীয়া গৌড়িকা চৈব রাগগীতিশ্চতুর্থকা ॥ ২৮৭

আবার "গীতয়ঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়াঃ" প্রভৃতির উল্লেখ ক'রে মতঙ্গ "শুদ্ধা, বেসরা, গৌড়া, সাধারিতা" এই সকল "-া"-অন্ত (আকারান্ত) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ' বিষয়ে ভরত, যাষ্টিক ও দুর্গাশক্তির অভিমতও একই রকমের। কাজেই এরা যে 'গীত' নয়—"গীতি", সুতরাং স্ত্রীবাচক—একথা অন্ততঃ ব্যাকরণের মারফতে বুঝা যায়।

পুনরায় দেখা যায় যে, "এতে রাগাঃ" এই বহুবচনান্ত শব্দ ব্যবহার ক'রে মতঙ্গ রাগের নাম ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন: "শকাখ্য. ককুভস্তথা হর্মাণপঞ্চমঃ। রূপসাধারিতশ্চৈব তথা গান্ধারপঞ্চমঃ॥" এখানে ককুভ ও হর্মাণপঞ্চম প্রভৃতি এখনকার তালিকানুযায়ী স্ত্রীবাচক "রাগিণী"-র পর্যায়ভুক্ত হোলেও মতঙ্গ এদের বিভক্তিতে আকারান্ত বা ইকারান্ত কোন বিভক্তিরই ব্যবহার করেন নি, বরং বলেছেন "রাগাঃ।" তাহ'লেই দেখা যায় যে, একদিকে তিনি যেমন "হিন্দোলকস্তু বিজ্ঞেয়ো" বোলে হিন্দোলরাগের পরিচয় দিয়েছেন, অপর দিকে তেমনি "গান্ধারী রক্তগান্ধারী" শব্দে 'রাগ' অর্থে ইকারান্তবাচক 'রাগিণী'-র কথা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া এই লক্ষণ আরও স্পষ্ট যেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন: "সৈন্ধবী ঠক্করাগজা" (পৃঃ ১১০) ইত্যাদি শ্লোকগুলি। সেখানে 'ঠক্ক' যে 'রাগ' আর 'সৈন্ধবী' সেই রাগ থেকে উৎপন্ন, সুতরাং 'রাগ' শব্দবাচক হোলেও 'ই'-কারান্ত 'স্ত্রী'-বাচক, একথা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই নানান্ দিক থেকে বলা যায় মতঙ্গ শব্দের শেষে বিভক্তি যোগ ক'রেই স্ত্রী ও পুরুষভেদ দেখিয়েছেন, যদিও 'রাগিণী' ও 'রাগ' এই শব্দই সকলের সম্বন্ধে তিনি সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। মনে হয় 'রাগ' ও 'রাগিণী' এ' ধরণের স্পষ্ট ব্যবহার শার্ঙ্গদেবের (১২১০-১২৪৭ শতাব্দী) সময় বা পর থেকেই সমাজে প্রচলিত হয়েছিল।

'সঙ্গীতসময়সার'-এর গ্রন্থকার পার্শ্বদেবের সময়েও ঠিক তাই, কেননা পার্শ্বদেবও স্পষ্ট ক'রে তাঁর গ্রন্থে কোথাও 'রাগিণী' শব্দটী ব্যবহার করেন নি,

সকল জায়গায় বরং 'রাগ' শব্দই উল্লেখ করেছেন। পার্শ্বদেব জৈন-সম্প্রদায়ের ও সোমেশ্বরের (১১৩১ শতাব্দী) পরেকার সম্ভবতঃ ১১৬৫-১৩৩০ শতাব্দীর গুণী। সঙ্গীতরত্নাকরকার শার্ঙ্গদেবকেও ঐ একই সময়ের গ্রন্থকার বলা যায়, অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, শার্ঙ্গদেব তাঁর রত্নাকরে কোথাও পার্শ্বদেবের নাম উল্লেখ করেন নি। কেবল পরবর্তী টীকাকার সিংহভূপাল (প্রায় খৃ° ১৩৩০ শতাব্দী) জায়গায় জায়গায় পার্শ্বদেবের নাম উল্লেখ করেছেন। পার্শ্বদেবের নিজের কথাও তাই; তিনিও শার্ঙ্গদেবের নাম সঙ্গীতসময়সারের কোথাও উল্লেখ করেন নি। তবে পার্শ্বদেব দত্তিল, মাতঙ্গ, কাশ্যপ, তুম্বুরু প্রভৃতির নাম আচার্য হিসাবে তাঁর 'সময়সারে' উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক একথা কিন্তু ঠিক যে, পার্শ্বদেবের সময়ে 'রাগিণী' শব্দের উল্লেখ না থাকলেও তিনি তাঁর সঙ্গীতসময়সারের ১।১০৮ শ্লোকে বলেছেন: "যথা ভৈরব-জাতায়া ভৈরব্যা অংশক পুনঃ"। বর্তমানে ভৈরবকে আমরা 'রাগ' ও ভৈরবীকে 'রাগিণী' বোলেই জানি, আর এটাও ঠিক যে, ভৈরবী ভৈরবের স্ত্রী অর্থে রাগিণী। এ'ছাড়া আর একটী লক্ষ্য করার বিষয় যে, পার্শ্বদেব ভৈরব, বসন্ত, শ্রীরাগ ইত্যাদির কথা উল্লেখ ক'রে তার পরেই আবার বরাটি, মালবশ্রী ধন্যাসী, গুর্জরী প্রভৃতি রাগের কথাও বলেছেন। গুর্জরীকে এখন আমরা রাগিণী বোলেই জানি, কিন্তু পার্শ্বদেব বলেছেন—"রাগোঽয়ং করুণে রসে"। কাজেই বোঝা যায়, পার্শ্বদেবের সময়ে 'রাগিণী' এই শব্দের পরিবর্তে বিভক্তির ইঙ্গিতই প্রধান ছিল এবং বিভক্তির অনুযায়ী রাগগুলির পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবদুটীর নির্ধারণ করা হোত।

কিন্তু 'রাগনিরূপণ' গ্রন্থে এ'সকলের অস্পষ্টতা মোটেই নেই, কেননা নিরূপণকার নারদ রাগের তালিকা উপস্থাপন করার সময়ে যেমন বলেছেন: "শ্রীরাগশ্চ বসন্তশ্চ পঞ্চমো ভৈরবস্তথা,"[৩০] রাগিণীর বেলায়ও তেমনি উল্লেখ করেছেন: "গোড়ী কেলাহলী তথা। আন্ধালী দ্রাবিড়ী মালুকৌশিকী" প্রভৃতি। তারপর "শ্রীরাগস্য স্ত্রিয়ঃ," "তেষাং স্ত্রিয়ঃ" বা "অথ শ্রীরাগস্য কুমার-লক্ষণানি" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও প্রাচীন গ্রন্থকারদের বইয়ে পাওয়া যায় না। রাগনিরূপণে রাগবংশাবলীর পরিচয় দিতে গিয়ে নারদ বলেছেন,

৩০। সঙ্গীতদর্পণের "শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরব পঞ্চমস্তথা" প্রভৃতির সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে।

শ্রীরাগশ্চ বসন্তশ্চ পঞ্চমো ভৈরবস্তথা।
কৌশিকো মেঘরাগশ্চ নটনারায়ণস্তথা ॥
হিন্দোলো দীপকশ্চৈব হংসকশ্চ যথাক্রমম্।
দশৈতে পুরুষা রাগা নারদেন সমাহিতা ॥

দশটী রাগ এবং প্রত্যেকটী রাগের পাঁচটী ক'রে রাগিণী, সুতরাং ১০×৫=৫০টী রাগিণী। এ'ছাড়া প্রত্যেকটী রাগের আবার চারটী ক'রে কুমার বা পুত্র। এই সকল কুমারদের আবার চারটী ক'রে ভার্যা। সুতরাং রাগনিরূপণকার নারদ পুরোদস্তরভাবে সংসার পাতিয়ে পৃথিবীতে রাগলোক তথা স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছেন বলা যায়।

রাগ-রাগিণীদের ধ্যানের কথাও তাই। রাগনিরূপণকার "অথ রাগ-বংশাবলী লিখ্যতে" ও তারপর রাগদের নাম করবার সময় বলেছেন: "অথ শ্রীরাগঃ ধ্যানম্", "গৌড়ীধ্যানম্", "কোলাহলীধ্যানম্"। ধ্যান ও রূপের প্রচলন সত্য কথা বল্‌তে কি—অত্যন্ত আধুনিক, আর এদিক্ থেকে আমরা 'সঙ্গীতদর্পণ'-কার দামোদরের (১৬২৫ খৃষ্টাব্দ) কৃতিত্বকেই সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে থাকি। রাগনিরূপণকারকে দেখা যায়—তিনি তাঁর গ্রন্থে যেন হুবহু দামোদরকেই নকল করেছেন। যেমন ভৈরবরাগের ধ্যানের বেলায় দর্পণকার পণ্ডিত দামোদর বলেছেন,

গঙ্গাধরঃ শশিকলা-তিলকস্ত্রিনেত্রঃ, সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী, শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ ॥[৩১]

ভাষায় মিল না থাক্‌লেও বর্ণনা ও রূপসৃষ্টির সাদৃশ্য বজায় রেখে রাগ-নিরূপণকার ভৈরবরাগ সম্বন্ধে বলেছেন,

ভস্মাঙ্গলিপ্তাবয়বঃ সুগাত্রো, ভালস্থলে শোভিতশীতরশ্মিঃ।
ত্রিশূলহস্তো বৃষভাধিরূঢ়ঃ, স ভৈরবো যঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥[৩২]

এ'ছাড়া ভৈরবীর ধ্যানটিতে মিল আরও বেশী। যেমন দর্পণকার পণ্ডিত দামোদর বলেছেন,

৩১। সঙ্গীতদর্পণ ২।৩৩

৩২। রাগনিরূপণ, পৃঃ ১৩। এ'ছাড়া সঙ্গীতমহোদধির "স চন্দ্রহাসঃ কলকং দধানা, বিষদ্ধ-কণ্ঠঃ শশিবদ্ধচূড়ঃ" ইত্যাদি কথাগুলির সঙ্গেও অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

স্ফটিকচরিতপীঠে রম্যকৈলাসশৃঙ্গে, বিকচকমলপত্রৈরর্চয়ন্তী মহেশম্।
করতলধৃতবীণা[৩৩] পীতবর্ণায়তাক্ষী, সুকবিভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরবত্রী ॥[৩৪]

রাগনিরূপণকার অবিকল এই একই রকমের ধ্যানের বর্ণনা করেছেন। কেবল শেষ লাইনটিতে সামান্য একটু ভেদ দেখিয়েছেন "সুরমুনিগদিতেয়ং" বোলে। মোট-কথা, সকল দিক্ থেকে বিচার ক'রে দেখ্‌লে একথাই নিঃসংশয়ে বল্‌তে আমরা বাধ্য হব যে, যদিও তাঞ্জোর লাইব্রেরীর ক্যাটালগে 'রাগনিরূপণ' বইখানির উল্লেখ পাওয়া যায়, তবুও তার ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গিতে আধুনিকতার ছাপই ষোলআনা আছে। তারপর এ'কথাও ঠিক যে, রাগনিরূপণের গ্রন্থকার নারদ ও নারদীশিক্ষার নারদ মোটেই অভিন্ন ব্যক্তি নন। মকরন্দকার নারদ থেকেও তিনি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। আর যদিও ধ'রে নেওয়া যায় যে, রাগনিরূপণকার নারদ একজন ঐতিহাসিক লোক, তাহলেও একথা আমরা বল্‌তে বাধ্য হব যে, ইনি নারদী ও মকরন্দ—এই দু'টী বইয়ের গ্রন্থকার নারদ থেকে সম্পূর্ণ তৃতীয় একজন নারদ। নচেৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে দেখ্‌লে আমরা বল্‌ব যে, 'রাগনিরূপণ' বইখানি আসলে একটি সংগ্রহগ্রন্থেরই অন্তর্গত। পরবর্তীকালের অজ্ঞাতনামা কোন গ্রন্থকার সকল বই থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ ক'রে[৩৫] নূতন এই বইখানি রচনা করেছিলেন ও "নারদীয়" গ্রন্থনামের দ্বারা প্রামাণিক নারদের নামেই তাঁর রাগনিরূপণকে চালাতে চেয়েছেন—কেবল নিজের নাম-যশের আকাঙ্খাকে লুকানোর জন্যে। প্রাচীনত্বের দাবী রাখার চাতুর্যকেও তিনি বাদ দিতে পারেন নি, আর সে'জন্যেই সৌজন্যের ও প্রামাণ্যের চাহিদাকে বজায় রাখ্‌তে গিয়ে জায়গায় জায়গায় তিনি "কুরুতে নারদো মুনি", "রাগা নারদেন সমাহিতাঃ" কথাগুলিরও ব্যবহার করেছেন।

নারদের 'পঞ্চমসংহিতা' বইখানি সম্বন্ধেও তাই। পঞ্চমসংহিতায় রাগ-রাগিণীগুলির নাম ও বিভাগ নারদী, মকরন্দ অথবা রাগনিরূপণ এ'সকল কোন গ্রন্থের সঙ্গেই সাদৃশ্য নাই। সংহিতাকার নারদ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর সঙ্গীতশাস্ত্রী, কেননা তার পাণ্ডুলিপিতে তারিখ আছে—১৩৬২ শক, অর্থাৎ ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ।

৩৩। পাঠভেদ—"করধৃতঘনবাত্তা"।

৩৪। সঙ্গীতদর্পণ ২।৪৮

৩৫। একথা তিনি স্বীকারও করেছেন এই বলে: "সমাহৃত্যাত্রসঙ্গীতশাস্ত্রাণি বিবিধানি চ। সম্যগ্বিচার্য সংক্ষেপাৎ কুরুতে নারদো মুনিঃ ॥" ১।২

পঞ্চমসংহিতার মতে, রাগ ৬টা ও রাগিণী ৬×৬=৩৬টা। রাগ—মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট এবং রাগিণী—

মালব— ধানশী (বা ধানসী), মালসী (মালশ্রী), রামকিরী, সিন্ধুড়া, আসাবরী ও ভৈরবী।

মল্লার— বেলাবলী, পূর্বী, কানাড়া, মায়ুরী, কোড়া ও কেদারিকা।

শ্রী— গান্ধারী, গৌরী, সুভগা, কুমারিকা, বেলওয়ারী ও বৈরাগী।

বসন্ত— তুড়ী (তোড়ী), পঞ্চমী, ললিতা, পটমঞ্জরী, গুঞ্জরী (গুর্জরী), বিভাস।

হিন্দোল—মাধবী, দীপকা, দেশকারী, পাহিড়া (পাহাড়ী ?), বরাড়ী, মারহাটি।

কর্ণাট— নাটিকা, ভূপালী, গয়ড়া (?), রামকেলী, কামোদী ও কল্যাণী।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এখানে ভৈরবরাগের কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু রাগনিরূপণকার ভৈরবকে 'রাগ' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তারপর রাগনিরূপণকার নারদ যেমন রাগের হাটে মেলা সৃষ্টি করেছেন স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধু প্রভৃতিদের নিয়ে, পঞ্চমসংহিতাকার নারদ সেদিক থেকে জাঁকজমক বা কোন আড়ম্বরের সজ্জাই করেন নি। তবে 'পঞ্চমসংহিতা' বা 'পঞ্চমসারসংহিতা' এবং 'রাগণিরূপণ' বই দুটীর মধ্যে আধুনিকতার চিহ্ন থাকলেও 'রাগনিরূপণ' বইখানি আরো আধুনিক বোলে আমাদের মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

1. Abhedananda, Swami:
   (a) *Mystery of Death* (1953).
   (b) *Science of Psychic Phenomena* (1946).
   (c) *An Introduction to the Philosophy of Panchadasi* (1948).
   (d) *India And Her People* (1905-6).
2. Abul Fazal-I-Allami:
   Ain-I-Akbari (1948), Vols. II & III trans. by Colonel H. S. Jerrett, revised by Sir Jadunath Sarkar.
3. Acharya, P. K.:
   (a) *Principle Of Indian Architecture.* (The Cultural Heritage of India R. K. Mission, Vol. III).
   (b) *The Origin Of Hindu Temple.* (Indian Culture, Vol. I, July, 1934).
   (c) *Indian Architecture.* (Indian Culture, Vol. I, July, 1934).
   (d) *Architecture Of Manasara,* Vols. III & V.
4. *ATHARVA-VEDA-SAMHITA,* Vols. I-IV (with Sâyana's Commentary, Bombay 1895) edited by Shankar Pândurang Pandit.
5. *ATHARVA-VEDA-SAMHITA,* (Harvard Oriental Series, Vol. VII, 1905), edited and translated by William Dwight Whitney.
6. *AITAREYA-ARANYAKA,* (Oxford, 1909), edited by Prof. A B. Keith.
7. Aiyar, M. S. Ramswami:
   (a) *The Question Of Grâmas* (Journal of the Royal Asiatic Society for Great Britain and Ireland 1936).
   (b) *Sâmagâna,* (The Journal of the Music Academy, Madras Vol. V. 1934, No. 1-4).
8. Aiyanger, C. R. Srinivasa:
   The Cultural Aspect Of Indian Music and Dancing (The Cultural Heritage of India R. K. Mission, Vol. III).

9. ALEXANDER WOOD:
The Physics Of Music, (1945).

10. *APASTAMBA-DHARMASUTRA*, (with Haradatta's Ujjvala) —Edited by A. Mahadeva Sâstri and Panditaratnam K. Rangâchârya (Govt. Oriental Library Series, *Bibliotheca Sanskrita* No. 15, Mysore, 1898).

11. *ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA* (*New Imperial Series*), Vol. XLVII.

12. ARNOLD, DR. SIR THOMAS:
The Legacy Of Islam (1931).

13. *ARSEYA-BRAHMANA*, (Calcutta, 1861), edited by A. C. Burnell.

14. *ATHARVA-VEDA-PRATISHAKHYAM*—Edited by Visva-bandhu Vidyârthi Shâstri. (Punjab University, Samvat 1352).

15. BACHARACHI, A. L.:
(a) *British Music Of Our Time* (Pelican Series 1946).
(b) *Musical Companion* (1949).

16. BAGCHI, DR. PROBODH CHANDRA:
(a) *Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India* (Calcutta University, 1927).
(b) *Indian Civilization in Central Asia* (The Four Arts Annual, 1935).
(c) *On the Diffusion of Indian Music in Ancient Times* (Uttaramandrâ, Vol. I, March, 1940).

17. BANERJI, RAKHALDAS:
(a) *History of Orissa*, Vols. I & II.
(b) *Eastern Indian School of Medeaval Sculpture* (Archaeological Survey of India, *New Imperial Series*, Vol. XLVII, 1937).

18. BARUA, DR. BENI MADHAV:
(a) *Art as Defined in The Brâhmanas* (—Indian Culture, Vol. I, July, 1934).
(b) *Asoka and His Inscriptions* (1946), Pts. I & II.

19. BASU, PRACHYAVIDYARNAVA NAGENDRA NATH:
The Archaeological Survey of Mayurbhanja, Vol. I (—The Mayurbhanja State, 1911).

20. Beal, Rev. Samuel:
An Examination of Chinese Buddhist Books (—International Congress of Orientalist, London, 1876).

21. Bhandarkar, Dr. D. R.:
(a) *Notes on Ancient History of India* (—Indian Culture, Vol. I, July, 1934).
(b) *Foreign Elements in the Hindu Population* (—Indian Antiquiry, Vol. XL., 1931).

22. Bhandarkar, Dr. R. G.:
(a) *Collected Works of R. G. Bhândârkar,* Vols. I & II, 1928.
(b) *The Nâsik Cave Inscriptions* (—International Congress of Orientalists, *Second Session,* London, 1876).

23. Bhattacharya, Benoytosh:
(a) *The Indian Buddhist Iconography* (Oxford University Press, 1924).
(b) *Introduction to the Sâdhanamâlâ,* Vol. I (1925) & Vol. II (1923). —The Gaekward's Oriental Series, 26, 41.

24. Bhatkhende, Pandit Visnu Narayana:
(a) *A Short Historical Survey of the Music of Upper India* (Bombay, 1924).
(b) *A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems of the 15th, 16th, 17th & 18th, Centuries* (Bombay).

25. Bishan Swarup:
Konârka (1919).

26. Blom, Eric:
Music in England (Pelican Series, 1930).

27. Bloomfield, Prof.:
(a) *Vedic Concordance* (—Harvard Oriental Series, 1906).
(b) *Religion of the Veda.*

28. Bouquet, Dr. A. C.:
Comparative Religion (Pelican Series, 1950).

29. Breasted, James Henry:
A History of Egypt (London, 1951).

30. BUCK, PERCY C.:
History of Music (Benn's Series, 1930).

31. BUDGE, SIR E. A. W.:
Baralam and Yewasef (London, 1923).

32. BURNELL, A. C.:
(a) *Notes on Sâmavidhâna-Brâhmana* (1873).
(b) *Introduction to Arseya-Brâhmana* (1876).

33. BURNET, DR.:
Greek Philosophy, Thales to Plato (1943).

34. CALAND, DR. W.:
Panchavimsa-Brâhmana (English Translation, Calcutta, 1931).

35. CALVOCORESSI, M. D.:
A Survey of Russian Music (Pelican Series, 1944).

36. *CAMBRIDGE HISTORY OF INDIA*, Vol. I (Cambridge, 1922).

37. CARLETON P.:
Burried Empires (London, 1937).

38. CHAKLADER, DR. HARAN CHANDRA:
Ship-building and Maritime Activity in Bengal (—The Dawn Magazine, 1911, Old Series, Vol. XIV, No. 1.).

39. CHANDA, RAI BAHADUR RAMAPROSAD:
(a) *Mediaeval Indian Sculpture.*
(b) *Sind Five Thousand Years Ago* (—Modern Review, Vol. LII).
(c) *The Indus Valley in the Vedic Period* (—The Memoirs of the Archaeological Survey of India, No 31, Calcutta, 1926).
(d) *Survival of the Prehistoric Civilization of the Indus Valley* (—Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 41, Calcutta, 1929).
(e) *Indo-Aryan Races* (Rajshahi, 1916).

40. CHAPPELL:
History of Music.

41. CHATTERJI, B. R.:
Indian .Cultural Influence in Cambodia (Calcutta University).

42. CHATTERJEE, DR. SUNITI KUMAR:
   (a) *Non-Aryan Elements in Indo-Aryan* (—Journal of the Greater India Society, Cal.).
   (b) *Dravidian Origins and the Beginnings of Indian Civilization* (—Modern Review, Dec. 1924).
43. CHIANG YEE:
   The Chinese Eye.
44. CHILDE, V. GORDON:
   (a) *New Light on the most Ancient East* (London, N. Y., 1934).
   (b) *What Happened in History* (Pelican, 1950).
   (c) *The Aryans* (London, 1926).
45. CLEMENTS, E.:
   Introduction to the Study of Indian Music (London, 1913).
46. COOMERASWAMY, DR. A. K.:
   (a) *Dance of Siva* (Bombay, 1948).
   (b) *Introduction to Indian Art* (Madras, 1923).
   (c) *The Part of Art in Indian Life* (—The Cultural Heritage of India, Ramakrishna Mission, Vol. III).
   (d) *The Mirror of Gestures* (London).
   (e) *Elements of Buddhist Iconography* (1935).
   (f) *The Relations of Art and Religion in India* (—The Proceedings of the International Congress for the Histroy of Religions, 1908).
47. CROWEST, F J.:
   The Story of Music (London, 1902).
48. COUNT OKAKURA:
   The Ideals of the East (1903).
49. DANIELOU, ALIAN:
   (a) *Introduction to the Study of Musical Scales* (1943).
   (b) *Northern Indian Music* (1949).
50. DAS, ABINASH CHANDRA:
   Rigvedic India (Calcutta, 1927).
51. DASGUPTA, DR. SURENDRA NATH:
   A History of Indian Philosophy, Vols. I & II.
52. DAVIS RHYS:
   Buddhism.

53. *DAWN MAGAZINE, THE* (—Founded by Satish Chandra Mukherjee), Vol. XV, Old Series, No. 6, June, 1911.

54. DAY, C. R.:
The Music and Musical Instruments of Southern India and Deccan (London, 1891).

55. DEVAL, K B.:
(a) *The Hindu Musical Scale and the Twenty-two Shrutis* (Poona, 1910).
(b) *Theory of Indian Music as Expounded by Somanâth* (—The Sanskrit Research, Jan. & April, 1916).

56. DIKSHIT, RAI BAHADUR K. N.:
Prehistoric Civilization of Indus Valley (Madras, 1939).

57. DUTT, DR ROMESH CHANDRA:
History of Civilization in Ancient India (London, 1893).

58. DUTT, DR BHUPENDRA NATH:
(a) *Vedic Funeral Customs and Indus Valley Culture* (—Man in India, Vols. XVI & XVII, Octo-Dec., 1936 & March-June, 1937).
(b) *FORWARD to the Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus*, Vol. I (1946).

59. ELIOT, GEORGE:

60. *ENCYCLOPAEDIA BRITANICA* (8th & 9th Editions), Vol. XXIV.

61. FARMAR, DR. H. G.:
(a) *A History of Arabian Music* (London, 1929).
(b) *The Music and Musical Instruments of the Arab* (edited by Dr. Farmar, London, 1915).
(c) *The Arabian Influence on Musical Theory* (London, 1925).

62. FERGUSSON, JAMES:
History of Indian and Eastern Architecture (1876), Vols. I & II.

63. FOX-STRANGWAYS, A. H.:
(a) *The Music of Hindostan* (Oxford, 1914).
(b) *The Hindu Scale* (Leipzic, 1907-8).
(c) *The Gândhâra-grâma* (—Journal of the Royal Asiatic Society for Great Britain and Ireland, 1935).

64. FOWKE, FRANCIS:
An Extract of a Letter on the Vinâ.
65. FRENCH, Col. P. T.:
Catalogue of Indian Musical Instruments (—Tagore's 'Music by Various Authors').
66. FYZEE-RAHAMIN, ATIYA BEGAM:
The Music of India (London, 1925).
67. GANGULY, MONOMOHON:
Orissa and Her Remains—Ancient and Mediaeval (1935).
68. GANGULY, PROF. O. C.:
(a) *Râgas and Râginis* (1948).
(b) *Non-Aryan Contribution to Aryan Music* (—Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Vol. XV, 1934).
69. GARDNER, P.:
Greek Influence on the Religions Art of North India (—The Proceedings of the International Congress for the History of Religions, 1908).
70. GARNET, LUCY M. J.:
Mysticism and Magic in Turkey (1912).
71. GREIRINGER, KARL:
Musical Instruments (edited by W. F. H. Blandford, London, 1945).
72. GHOSE, DR. BATA KRISHNA:
(a) *Aspects of Pre-Pâninean Sânskrit Grammar* (—B. C. Law Volume, Pt. I, 1945).
(b) *The Aryan Problem* (—The History and Culture of the Indian People: The Vedic Age, Vol. I, 1951).
73. GHOSE, AJIT:
The Seven Wonders of Indian Art (—Hindusthan Standard, Pooja Annual, 1951).
74. GHOSE, DR. MONOMOHAN:
(a) *Prâtisâkhyas and Vedic Sâkhâs* (—Indian Historical Quarterly, Vol. XI, Dec., 1935).
(b) *The Nâtyasâstra and Bharatamuni* (—Indian Historical Quarterly, Vol. VIII, June, 1932).
(c) *The Nâtyasâstra* (of Bharata Muni)—Translated

into English, Vol. I (—Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1951).
(d) *Abhinaya-Darpan of Nandikeswar* (Translated into Eng. and Annoted).

75. GOLDSTUKER, PROF.:
Pânini: His Place in Sanskrit Literatures (London, 1861).
76. *GRIHYASUTRAS OF ASHAVALAYANA, SANKHYANA, GOBHOLA, APASTAMBA, LATYAYANA, ETC.*—Vide H. Oldenberg: 'Sacred Book of the East Series', Vols. XXIX-XXX.
77. GUHA, B. S.:
New Light on the Indus Valley Civilization (—Science and Cuture, Calcutta).
78. GULIK:
The Lore of the Chinese Lute.
79. HAVELL, E. B.:
(a) *The Ideals of Indian Art* (London, 1920).
(b) *The Himâlayas in Indian Art* (London, 1924).
(c) *Indian Sculpture and Painting* (London, 1908).
(d) *The Ancient and Mediæval Architecture of India.*
80. HAUG, MARTIN:
(a) *Aitareya-brâhmana of the Rigveda.*
(b) *On the Interpretation of the Veda* (—The International Congress of Orientalists, London, 1876).
81. HERAS, H.:
Further Excavation at Mohanjo-daro (—New Review, Calcutta).
82. *HISTORY AND CULTURE OF THE INDIAN PEOPLE: THE VEDIC AGE* (1951), Vol. I, (Edited by Dr. R. C. Majumder).
83. HOPKINS, E. O.:
Epic Mythology (Strassburg, 1915).
84. ILLING, ROBERT:
A Dctionary of Music (1950).
85. *INDIAN CULTURE*, Vol. IV, Oct., 1937.
86. *INDIAN CULTURE*, Vol. II, April, 1936.
87. *INDIAN ANTIQUIRY*, (1894).
88. *INDIAN HISTORICAL QUARTERLY*, Vol. XII,

89. *INDIAN HISTORICAL QUARTERLY*, Vol. XI, Dec., 1935. Dec., 1935.

90. *INDIAN HISTORICAL QUARTERLY*, Vol. VIII, March, 1932.

91. JONES, SIR WILLIAM:
On the Musical Modes of the Hindoos (Calcutta).

92. *KATYAYANA-SRAUTA (OR KALPA)—SUTRA* (with a Commentary by Karkâchârya)—Edited by Vyâkaranâchârya Pandit Madanmohan (Pâthaka (*Chowkhamba Sanskrit Series,* Nos. 68-80, 92, 98, 132, Benares, 1908).

93. *KAUSITAKI-BRAHMANA* (Calcutta, 1861), Edited by E. B. Cowell. .

94. KEITH, PROF. A. B.:
(a) *Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads* (Harvard Oriental Series, 1925).
(b) *The Vedic Mahâvrata* (—The Proceedings of the Third International Congress for the History of Religions, 1908).
(c) *The Sanskrit Drama* (Oxford, 1924).
(d) *Pânini and the Veda* (—Indian Culture, Vol. II, April, 1936).
(e) *The Aryans and Indus Valley Civilization* (—Ojha Volume, Section I).

95. KRISHNAMACHARIAR, DR. M.:
A History of Classical Sanskrit Literature (Poona, 1937).

96. KRISHNA RAO, H. P.:
The Indian Music Journal, Vols. I & II (1912-13).

97. KRISHNACHARYA, HULUGUR:
Introduction to the Study of Bhâratiya Sangit-Sâstra (—The Journal of the Music Academy, Madras, Vol. I, Jan., 1930).

98. LAHA, DR. B. C.:
(a) *B. C Law Volume,* pt. I (1945).
(b) *Buddhistic Studies* (1931).
(c) *The Vangas* (—Indian Culture, Vol. I, July, 1934).
(d) *Tribes in Ancient India* (1943).

99. LAKSMAN-SWARUP, DR.:
(a) *Nighantu and the Nirukta* (1921).
(b) *The Rigveda and Mohenjo-daro* (—Indian Culture, Vol. IV, Onto, 1937).
(c) *Proceedings on the All-India Oriental Conference*, Vol. VIII.

100. LANE, E. W.:
Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians (1896).

101. LAW, DR. N. N.:
Mohenjo-daro and the Indus Civilisation (—Indian Historical Quarterly, Vol. VIII).

102. LIANG CHI CHAO:
The Kinship between Chinese and Indian Cultures.

103. MAC-CRINDLE:
Ancient India.

104. MACDOWELL, E.:
Critical and Historical Essays (London, 1912).

105. MACKEY, E. J. H.:
(a) *Further Excavations at Mohenjo-daro,* Vols. I & II (Delhi, 1938).
(b) *The Indus Civilization* (London, 1935).

106. MACKDONELL, PROF. A. A.:
(a) *Sanskrit Literature.*
(b) *Vedic Mythology* (Strassburg, 1897).
(c) *Buddhist Religious Art* (—The Proceedings of the International Congress for the History of Religions, pt. II, 1908).

107. *MAHAVASTU,* Vol. II.

108. MAHIRCHAND, BHIRUMAL:
Mohenjo-daro (Karachi, 1933).

109. MAJUMDAR, NANI GOPAL:
Explorations of Sind (—Memoirs of Archæological Survey of India, No. 48, Delhi, 1934).

110. MAJUMDAR, DR. R. C.:
Champa.

111. MALCON, SIR JOHN:
History of Persia.

112. MARSHALL, SIR JOHN:
Mohenjo-daro and the Indus Civilisation, Vols. I-III (London, 1931).

113. MAX MUELLER, PROF.:
(a) *Indian Philosophy* (1912).
(b) *Ancient Sanskrit Literature* (London, 1890).
(c) *Introduction to the Rigveda-Prâtisâkhya* (1896)—Translated into English By Dr. B. K. Ghose (—Indian Historical Quarterly, Vol. III, Sept., 1928).
(d) *Sacred Book of the East*, Vols. I & II (Translated by George Bühler, 1898).
(e) *Gifford Lectures* (1889).

114. MITRA, HARIDAS:
Sadasiva-Worship in Early Bengal: A Study in History, Art and Religion (—The Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XXIX, 1933).

115. MITRA, SREEMATI MIRA:
Musical Instruments of India (—Hindusthan Standard, 5th Octo. Sunday Number, 1952).

116. MITRA, RAJENDRALALA:
(a) *Antiquities of Orissa*, Vols. I & II.
(b) *Indo-Aryans*, Vols. I & II (Calcutta, 1881).

117. MOOKHERJEE, DR. RADHA KAMAL:
(a) *Hindu Civilization* (2nd edition, 1950).
(b) *Indian Shipping* (1912).

118. MUIR, J.:
Original Sanskrit Texts, Vol. I.

119. MUKHERJEE, PROBHAT KUMER:
Indian Literature in China and the Far East (1931).

120. NAG, DR. KALIDAS:
(a) *India and the Pacific World* (Calcutta, 1941).
(b) *Chinese Sculpture and Pictorial Traditions* (—Mohâbodhi Journal, Octo., 1938).

121. NARASIMHACHARY, V. V.:
The Early Writers on Music (—Journal of Music Academy, Madras, 1930, Vol. I, No. 2 & Vol. II, No. 2).

122. *NIRUKTA OF YASKA* (with the Commentary of Durgâchâyra), Poona, 1921-26 and edited by V. K. Rajavade.

123. *NIRUKTA*—Translated into English by Dr. L. Swarup, Vols. I & II (Lahore).

124. *NOTES ON THE TAITTIRIYA-PRATISHAKHYA* (with a Commentary, Tribhâsyaratna, 1868)—Edited by William D. Whitney.

125. O'LEARY, DE LACY:
Arabic Thought and Its Place in History.

126. *PALI TEXT SOCIETY'S ENGLISH-PALI DICTIONARY.*

127. PANCHAMA-SAMHITA OF NARADA (—Asiatic Society of Bengal MS. No. 5040).

128. PARRSONS, EDWARD ALEXANDER: *The Alexaderian Library* (—Cleaver-Hume Press Ltd., 1952).

129. PARRY, DR. C. HUBERT H.:
The Evolution of the Art of Music (1923).

130. PATERSON, J. D.:
on the Grâmas or Musical Scales of the Hindus.

131. PERCY BROWN:
(a) *Indian Architecture* (2nd edition, Bombay).
(b) *Indian Paintaing* (—Heritage of India Series).
(c) *Visualised Music* (—Young Men of India, May, 1918).

132. PETRIE, SIR FLINDERS:
(a) *Mahenjo-daro* (—Ancient Egypt, London).
(b) *Religion and Concience in Ancient Egypt* (London, 1929).

133. PIGGOT, STUART:
(a) *A New Prehistoric Ceramic from Beluchistan* (—'Ancient India'—Bulletin of the Archæological Survey of India, No. 3, Jan., 1947).
(b) *The Chronology of Prehistoric North-West India* (—Bulletin of the Archæological Survey of India, No. 1, Jan., 1946).
(c) *Prefistoric India* (Pelican Series, 1950).

134. PLUMPTRE, REV. E. H.:
Music of the Bible (—The Bible Educator, Vol. I).

135. POPLEY, H. A.:
The Music of India (—The Heritage of India Series, 1921).

136. PRAJNANANANDA, SWAMI:
The Forgotten Chapter of Indian Music (—Hindusthan Standard, Pooja Annual, 1950).

137. PRAN NATH, DR.:
(a) *The Scripts of the Indus Valley Seals* (Illustrated), Pts. I & II (—Indian Historical Quarterly, Vol. VII, *Supplementary*, pp. 1-52, and Vol. VIII, *Supplementary*, pp. 1-32).
(b) *Sumero-Egyptian Origin of the Aryans and the Rigveda* (—Journal of the Benares Hindu University, Benares).

138. PRZYLUSKI, DR. JEAN:
Mudrâ (—Indian Culture, Vol. II, April, 1936).

139. PUSALKAR, DR.:
Indus Valley Civilization (—The History and Culture of the Indian People: The Vedic Age, Vol. I, 1951).

140. *QUARTERLY JOURNAL OF THE ANDRA HISTORICAL RESEARCH SOCIETY, THE*, Vol. III, 1928.

141. RADHAKRISHNA, SIR S.:
(a) *Eastern Religion and Western Thought* (2nd edition, 1940).
(b) *Indian Philosophy*, Vols. I & II (1940).
(c) *India and China.*

142. RAMACHANDRA, N. S.:
The Râgas of Karnâtic Music (Madras, 1938).

143. RAGHAVAN, DR. V.:
Some Names in Early Sangit Literatures (—The Journal of the Music Academy, Madras, Vols. III, 1952, Nos. 1 & 2, 3 & 4; Vol. IV, 1933, Nos. 1-4).

144. RAJENDRA-SHANKAR:
Symbolish of Mudrâs in Hindu Drancing (—The Four Arts Annual, 1935).

145. RAO, GOPINATH:
Hindu Iconography (Travancore, 1924).

174. TAGORE, SIR S. M.:
(a) *Indian Music by Various Authors*, Pts. I & II (2nd., 1882).
(b) *Short Notices of Hindu Musical Instruments* (Calcutta, 1912).
(c) *Universal History of Music* (Calcutta, 1896).
(d) *The Seven Principal Musical Notes of the Hindus with their Presiding Deities* (Calcutta, 1892).
(e) *Hindu Music* (Calcutta, 1875).
(f) *The Musical Scales of the Hindus* (Calcutta, 1884).

175. *TAITTIRIYA-BRAHMANA* (Calcutta, 1855)—Edited by R. L. Mitra.

176. TOD, LIENT COL., JAMES:
Music (—Annals and Antiquities of Rajasthân, Vol. I).

177. TYAGISHANANDA, SWAMI:
General Introduction to the Chândyogya Upanishad (—Vedânta Keshari, Mylapore, Madras).

178. *VAJASANEYA-SAMHITA* (London, 1852)—Edited by Prof. A. Weber.

179. *VAMSA-BRAHMANA* (Mangalore, 1873)—Edited by A. C. Burnell.

180. VATS, M. S.:
Excavations at Harappa, Vols. I & II (1928).

181. VENKATESVARA, S. V.:
(a) *Indian Culture Through Ages*, Pt. I (1928).
(b) *The Antiquities of Harappa and Mohenjo-daro* (—The Aryan Path, 1930).
(c) *Proto-Indian Culture* (—The Cultural Heritage of India, Ramakrishna Mission, Vol. III).

182. WEBER, PROF A.:
History of Indian Literature (London, 1882).

183. WHEELER, R. E. M.:
Harappa 1946: The Defences and Cemetry, R. 37 (—'Ancient India'—Bulletin of the Archaeological Survey of India, No. 3, Jan., 1947).

184. WILLARD, CAPTAIN N. AUGUSTUS:
A Treatise on the Music of Hindostan, (Calcutta, 1834).

185. WILSON, ANNE C.:
A Short Account of the Hindu System of Music (London, 1904).

186. WINTERNITZ, DR. M.:
History of Indian Literature (English Translation by Mrs. S Ketkar), Vols. I & II (Calcutta University, 1927).

187. WOOLY, C. L.:
(a) *Ur of the Chaldees* (London, 1929).
(b) *The Sumerians* (1928).
(c) *Digging of the Past* (Pellican Series).

188. WOOD, PROF. J. H.:
Introduction to the Yoga-System (—Harvard Oriental Series).

189. ZIMMER, PROF. H.:
Myths and Symbols in Indian Art and Civilization (New York City, 1946).

১৯০। **অহোবল, পণ্ডিত :** (ক) 'সঙ্গীতপারিজাত'—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ-সংপাদিত (কলিকাতা, ১৯৩৬)।
(খ) 'সঙ্গীতপারিজাত'— (হিন্দী-অনুবাদসহ) —সঙ্গীত-কার্যালয়, হাথরাস্, ইউ পি.।

১৯১। **আর্ষেয়ব্রাহ্মণ** (চতুর্থ বা অনুব্রাহ্মণ)—পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত (কলিকাতা, ১৮৯২)।

১৯২। **ঐতরেয়ব্রাহ্মণ**—সায়ণাচার্য-কৃত ভাষ্য-সহিত (*Bibliotheca Indica*, New Series, No. 878)—পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত (কলিকাতা, ১৮৯৬)।

১৯৩। **ঐতরেয়ব্রাহ্মণ** (বঙ্গানুবাদ)—পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-অনূদিত (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা)।

১৯৪। **উপাধ্যায়, পণ্ডিত বলদেব :** 'বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ' (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ)।

১৯৫। **গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার :** 'রাগ-রাগিণীর নাম-রহস্য' (—'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা', প্রকাশক—আর. বি. দাস এণ্ড কোং, কলিকাতা ; ১১শ বর্ষ, ১৩৪১ ; বৈশাখ-চৈত্র)।

১৯৬। গ্যাড্ গিল : 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' (বোম্বাই, ১৯০৪)।

১৯৭। 'গোপথব্রাহ্মণম্'—পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য-সংপাদিত (প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা, ইং ১৮৯১)।

১৯৮। গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন : 'সঙ্গীতসার' (কলিকাতা, ১২৮৬ সাল)।

১৯৯। ঘোষ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ : 'অদ্বৈতসিদ্ধি', ১ম খণ্ড (কলিকাতা)।

২০০। চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ : 'বৃহত্তর ভারত' (—'প্রবাসী'-পত্রিকা, ১৩৩২ সাল, ১ম সংখ্যা)।

২০১। চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার : 'বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর' (—'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩২ সাল)।

২০২। চন্দ, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ : 'মূর্তি ও মন্দির' (১৯২৪)।

২০৩। 'ছান্দোগ্য উপনিষৎ'—(ক) দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-অনূদিত (কলিকাতা)।

(খ) ঐ, বসুমতী সাহিত্য-মন্দির সংস্করণ (কলিকাতা)।

(গ) ঐ, ডাঃ স্যার গঙ্গানাথ ঝাঁ-কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত (Poona, *Oriental Book Agency*, 1942)।

২০৪। ঠাকুর, স্যার সৌরীন্দ্রমোহন :

(ক) 'সঙ্গীতসার' (কলিকাতা)।

(খ) 'যন্ত্রকোষ' (কলিকাতা)।

২০৫। ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর : 'যজ্ঞকথা' (—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা)।

২০৬। 'তৈত্তিরীয় উপনিষৎ'—পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অনূদিত (কলিকাতা)।

২০৭। দত্ত, রমেশচন্দ্র : 'ঋগ্বেদসংহিতা' (২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৯)।

২০৮। দত্তিল : 'দত্তিলম্' (ত্রিবান্দ্রম সং, ১৯৩০)।

২০৯। 'দৈবতব্রাহ্মণম্' (বা ষড়্বিংশব্রাহ্মণম্)—সায়ণাচার্য-কৃত ভাষ্য-সহিতম্, পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য-সংপাদিত, (কলিকাতা, ১৮৮১)।

২১০। নন্দিকেশ্বর : (ক) 'অভিনয়দর্পণ'—পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী-অনূদিত ও সংপাদিত (কলিকাতা, ১৩৪০ সাল)।

(খ) ঐ, ইংরেজী সংস্করণ—ডাঃ মনোমোহন ঘোষ-অনূদিত ও সংপাদিত (*Calcutta Sanskrit Series*, Calcutta)।

২১১। নারদ: (ক) 'নারদীশিক্ষা'—ভট্টশোভাকর-রচিত টীকা সহিত (কাশী সং, ১৮৯৩)।

(খ) ঐ, পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত, (কলিকাতা, ১৮৯০)।

২১২। নারদ: 'সঙ্গীতমকরন্দ',—পণ্ডিত মঙ্গল রামকৃষ্ণ তেলাঙ্-সংপাদিত (বরোদা সং, ১৯২০)।

২১৩। নারদ: 'চত্বারিংশচ্ছতরাগনিরূপণম্' (আর্যভূষণ প্রেস, ১৮৩৬)।

২১৪। নারদ: 'পঞ্চমসারসংহিতা' (—এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, পুঁথি, নং ৫০৪০)।

২১৫। 'পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ'—(কলিকাতা, ১৮৬৯-৭৪)।

২১৬। প্রজ্ঞানানন্দ, স্বামী: (ক) 'রাগ ও রূপ' (কলিকাতা, ১৩৫৫ সাল)।

(খ) সঙ্গীতের বিচিত্র প্রবন্ধ—('সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা', [ইং ১৯৩৭—৫২]; মেসার্স আর বি. দাস কোং প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা)।

২১৭। প্রতিমা দেবী: 'নৃত্য' (বিশ্বভারতী সংস্করণ)।

২১৮। পালিত, হরিদাস: 'আদ্যের গম্ভীরা' (১৩১৯ সাল)।

২১৯। পার্শ্বদেব: 'সঙ্গীতসময়সার' (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ, ১৯২৫)।

২২০। পুষ্পর্ষি: (ক) 'সামপ্রাতিশাখ্য 'পুষ্পসূত্র' (অজাতশত্রু-প্রণীত টীকা-সমেত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সং, ১৯২৯)।

(খ) ঐ, সামগাচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত (কলিকাতা, ১৮৯০)।

২২১। 'বংশব্রাহ্মণম্' (বঙ্গানুবাদসহ)—পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত (কলিকাতা, সংবৎ ১৯৪৯)।

২২২। বসু, নির্মলকুমার: 'কণারকের বিবরণ' (১৩৩৩ সাল)।

২২৩। বাগ্‌চি, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র: 'ভারত ও মধ্যএশিয়া' (১৯৩৬)।

২২৪। 'বায়ুপুরাণ'—(ক) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন-সংপাদিত (বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৭ সাল)।

(খ) ঐ, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, বোম্বাই।

২২৫। বাল্মীকি, মহর্ষি: 'রামায়ণ'—বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পানসীকর-সংপাদিত, (বোম্বাই ১৯০৯)।

২২৬। বিবেকানন্দ, স্বামী : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (উদ্বোধন সং)।

২২৭। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ'—বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, (বোম্বাই, ইং ১৯১১)।

২২৮। 'বৃহদারণ্যক উপনিষৎ'—(ক) পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ অনূদিত ও সংপাদিত (কলিকাতা)।

(খ) ঐ, ইংরেজী অনুবাদ, স্বামী মাধবানন্দ-অনূদিত (অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৪১)।

২২৯। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'—(ক) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন-সংপাদিত (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

(খ) ঐ, পুণা সংস্করণ।

২৩০। বেদানন্দ, স্বামী : 'ভারত ও চীনের সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ' ('বিশ্ববাণী' পত্রিকা, 'অভেদানন্দ-স্মৃতিসংখ্যা', আশ্বিন, ১৩৫৬ সাল)।

২৩১। 'ভক্তিরত্নাকর'—গৌড়ীয় মিশন সংস্করণ (কলিকাতা)।

২৩২। ভরত : (ক) 'নাট্যশাস্ত্র'—কাশী সংস্কৃত সিরিজ, নং ৬০ (ইং ১৯২৯)।

(খ) ঐ, কাব্যমালা সংস্করণ, নং ৪২, (বোম্বাই ১৮৯৪)।

(গ) ঐ, অভিনবগুপ্ত-কৃত টীকা সহিত (বরোদা ওরিয়েন্টল্ সিরিজ, ১ম-২য় ভাগ, বরোদা)।

২৩৩। ভাতখণ্ডে, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ : 'শ্রীমল্লক্ষ্যসঙ্গীতম্' (ইং ১৯৩৪)।

২৩৪। মতঙ্গ : 'বৃহদ্দেশী'—মঙ্গল রামকৃষ্ণ তেলাঙ্-সংপাদিত, (ত্রিবান্দ্রম্ সংস্করণ, ১৯২৮)।

২৩৫। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ'—(ক) পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন-সংপাদিত (কলিকাতা, বঙ্গবাসী সং)।

(খ) ঐ, পুণা সংস্করণ।

(গ) ঐ, মহেশচন্দ্র পাল-সংকলিত (কলিকাতা, ১৮১২ শকাব্দ)।

২৩৬। মিশ্র, পণ্ডিত দামোদর : 'সঙ্গীতদর্পণ' (কলিকাতা)।

২৩৭। 'মেঘদূতম্'—অধ্যাপক কাশীনাথ বাপু-পাঠক সংপাদিত (পুণা সং)।

২৩৮। 'যজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্'—আপস্তম্ব মুনি-রচিত (বঙ্গানুবাদসহ)—সামগাচার্য সত্যব্রত-সামশ্রমী-সংপাদিত (কলিকাতা, সংবৎ ১৯৪৮)।

২৩৯। রাজা রঘুনাথ : 'সঙ্গীতসুধা' (মিউজিক একাডেমী, মাদ্রাজ, ১৯৪০)।

২৪০। রায়, ডাঃ নীহাররঞ্জন : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (২য় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৫৮ সাল)।

২৪১। রায়চৌধুরী, বীরেন্দ্রকিশোর : 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান' (কলিকাতা, ১৩৪৬ সাল)।

২৪২। শার্ঙ্গদেব : (ক) 'সঙ্গীতরত্নাকর', কালিনাথের টীকাযুক্ত, (আনন্দাশ্রম প্রেস সং, ১৮১৮), ১ম ও ২য় ভাগ।

(খ) ঐ, সিংহভূপাল ও কালিনাথের টীকাযুক্ত (আডেয়ার সং, মাদ্রাজ)।

(গ) ঐ, সিংহভূপালের টীকাযুক্ত, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ-সংপাদিত, স্বরাধ্যায় মাত্র (কলিকাতা)।

২৪৩। 'শিক্ষাসংগ্রহঃ'—(কাশী, সংস্কৃত সিরিজ, ইং ১৮৯৩)।

২৪৪। 'শুক্লযজুর্বেদকাণ্বসংহিতা'—পণ্ডিত মাধব শাস্ত্রী-সংপাদিত (চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, কাশী, সংবৎ ১৯৬৫)।

২৪৫। 'শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যম্'—মহর্ষি কাত্যায়ন-প্রণীত ও উবট-কৃত ভাষ্যসহিত—পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য-সংপাদিত (কলিকাতা, ১৮৯৩)।

২৪৬। 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা' (আর বি. দাস এণ্ড সন্স, ৮-সি, লাল বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

২৪৭। 'সামবিধানব্রাহ্মণ' (বঙ্গানুবাদসহ)—পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত (কলিকাতা, ইং ১৮৬৫)।

২৪৮। 'সামসূচী'—পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী-সংপাদিত (কলিকাতা)।

২৪৯। সামশ্রমী, পণ্ডিত সত্যব্রত : 'সামবেদসংহিতা', (কলিকাতা)।

২৫০। সেন, রাধামোহন : 'সঙ্গীততরঙ্গ' (কলিকাতা)।

২৫১। সোমনাথ : (ক) 'রাগবিবোধ' (আডেয়ার সং, ইং ১৯৪৫)।

(খ) ঐ, (লাহোর সংস্করণ)।

(গ) ঐ, (ইংরেজী সংস্করণ)—এম. এস. রাম-স্বামী আয়ার-অনূদিত (ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ)।

২৫২। 'হরিবংশ' (মহাভারত)—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন (বঙ্গবাসী সংস্করণ, কলিকাতা)।

শব্দসূচী

রাগ ও রূপ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

'রাগ ও রূপ' সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রিকার অভিমত :

1. THE NATION, Sunday, July 3, 1949 :

"The vital nature of life and music is just the same, observed Rabindranath. Music as an expression of life in its social interaction evolves, develops and marching with life, as it advances and changes with time and environment. The Sanyasi-scholar author of this treatises under review, has kept in view this vital nature of music throughout his researches. In this learned discourse in the history and nature of Indian classical music the author has approached the problem with the throughness of a scientist, truthfulness of a historian and the ardour and warmth of an artist.

The history of Indian music the author maintains is inter-woven with the broader history of Indian culture, still music was not merely a form of intellectual or cultural activity of the people, it was in fact, a part and a medium of spiritual endeavour, a form of *Sadhana* to ancient Indians.

Indian music is purely Indian. The flow of Indian music from the prevedic age, Swamiji maintains, is still undisturbed. Foreign influence of Indian Music is but megre. The mixture of Persian melody with our classical tune during the Mughal age was neither deep nor extensive. Its aphere was limited to the parts of Northern India alone. The East and particularly the South remained absolutely unaffected and maintained the purest classical traditions.

One of the most redeeming feature of this book is its scientific outlook. The Sanyasi-author like a true historian is free from the bigottedness and dogmatism of the classicalists. He does not condemn the post-classical and even modern aspects and trends as 'diviations' but hails them as

'developments' and branching out of our naitonal genius in the ever broadening field of music.

The imagery of Raga—Raginies is an unique feature of Indian artistic genius. The book contains a number of rich paintings drawn variously from the Rajput sources and from the mighty brush of artists like Nandalal.

The book we are sure, will prove to be of immense value to advance students of Indian music."

২। **যুগান্তর** (১৩৫৬ সাল) : "ইহাতে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। প্রসংগক্রমে গ্রন্থকার অধিকাংশ প্রামাণ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব বিষয়ের রহস্য ভেদ করিয়াছেন। পুস্তকের প্রত্যেকটী পাতাই তাঁহার অশেষ পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের সাক্ষী। প্রাচীন শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁহারা ভারতীয় সংগীতের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপকারে আসিবে। অর্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায়-লিখিত সুন্দর ভূমিকা এই গ্রন্থের গৌরব বর্ধন করিয়াছে। ভূমিকায় সংগীতজ্ঞগণ অনেক অনুসন্ধানের বস্তুর সন্ধান পাইবেন। এই শ্রেণীর পুস্তকের রচয়িতা সংগীতপ্রেমিক তথা ভারতীয় সংস্কৃতির দরদী-মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন। দুই এক স্থলে গ্রন্থকারের উক্তির সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। * * * স্বামিজী বহুকাল যাবৎ সংগীতের উৎপত্তি নিয়া আলোচনা করিতেছেন এবং ঐ বিষয়ে তিনি বাংলার গুণীমহলে সুপরিচিত। তাঁহার স্বার্থহীন প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার উক্তিগুলি এদেশের সংগীতজ্ঞগণ শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণ করেন। গ্রন্থের বহুস্থানে তিনি বৈজ্ঞানিক মীমাংসার প্রতি আনুগত্যও জানাইয়াছেন। * * যাহা হউক এই গ্রন্থের নানা অংশে ও বহু সংখ্যক পরিশিষ্টে এবং বিশেষ করিয়া ভূমিকায় ভারতীয় সংগীতের গবেষকগণ যে যথেষ্ট মালমশলার সন্ধান পাইবেন এ'বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পুস্তকের ত্রুটী-বিচ্যুতির কথা ভুলিয়া গিয়া সংগীত-রসিকগণকে ইহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে বলি।"

—**শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী** (সংগীতশাস্ত্রী)।

৩। **দীপালী** (শ্রাবণ, ১৩৫৬) : "রাগ ও রূপ" ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মৌলিক চিন্তাধারা নিয়ে রচিত। ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের

উপর ভিত্তি ক'রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'রাগ-রাগিণী'-দের বিশ্লেষণ করেছেন ও বৈদিক যুগ থেকে আজ-পর্যন্ত তাদের ক্রমবিকাশের একটী সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার চেষ্টা করেছেন বইটীতে।

আমাদের দেশে—বিশেষতঃ সঙ্গীতক্ষেত্রে এরূপ প্রচেষ্টা এই প্রথম ও সম্পূর্ণরূপে নূতন। বৈদেশিক নিস্পেষণে কৃষ্টীয় অবনতির সাথে-সাথে আমরা হোয়ে উঠেছি একান্তভাবে গতানুগতিকপন্থী। কি সামাজিক, কি শিল্প, কি ব্যবহারিক জীবনে এর ব্যতিক্রম বড় একটা দেখা যায় না। যেখানে কোন কিছু নূতন চেষ্টা দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার ভিত্তি হয় নিতান্ত ফাঁকা জিনিসের উপর এবং শেষ পর্যন্ত নেহাতই হাল্কা কিছু হোয়ে দাঁড়ায়। আমাদের জানবার আগ্রহ ও অনুসন্ধানের স্পৃহা দিনে দিনে এত কমে এসেছে যে, সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, যাঁরা যে বিষয় নিয়ে চর্চা করেন তাঁরাও সে বিষয়ে গভীরভাবে অনুশীলন বা বিশদভাবে জানবার চেষ্টা বড় একটা করেন না। পাশ্চাত্যে এই রকম প্রচেষ্টার নিদর্শন কিন্তু বিরল নয়। আমাদের ঐতিহ্য নিয়েই ওদেশে প্রভূত গবেষণার পরিচয় আমরা শুধু একাধিক বার পাইনি, আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ইতিহাস আমরা শুনছি তাঁদেরই মুখ থেকে। এমন কি সময় সময় তাঁরা "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চাপানো সত্বেও তার প্রতিবাদে অক্ষম দেশবাসী আমরা সেটাই মেনে নিয়েছি নীরবে। এ'জন্যই স্বামিজীর এই প্রচেষ্টায় সঙ্গীতবিদ্যার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আশান্বিতা হয়েছি এবং ততোধিক আশান্বিতা হবো—যদি দেখি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে এই গ্রন্থ বাঙ্গলার সুধীসমাজে।

ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে বা তাকে অবিকৃত রাখবার জন্যই যে কেবল এই ধরণের অনুসন্ধান ও আলোচনা প্রয়োজন তা নয়, তাকে নবরূপে রূপায়িত করতে কিংবা তাকে পরিপুষ্ট করতে হোলেও সর্বাগ্রে প্রয়োজন এইভাবে তার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা। কারণ, বিকাশ ও উৎপত্তির তথ্যটী না জানলে কোন বিষয়েরই যথাযথ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান হোতে পারে না; সে' ক্ষেত্রে উন্নতিও সম্ভবপর নয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ'কথাও স্বীকার করতে হয় যে, ঠিক-ঠিকভাবে এই সমস্ত প্রাচীন তথ্য আবিষ্কার করা বা তা অবগত হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান অবস্থায় সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে তা জানা একেবারেই সাধ্যাতীত। সামান্য কিছু

আবিষ্কার কারাও সহজসাধ্য নয়। কিন্তু যতটুকু জানা সম্ভব তার মূল্যও নিতান্ত কম নয়। এদিক থেকে স্বামিজীর অবদানকে মহামূল্য কেন—অমূল্য বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। পাশ্চাত্যে যে গ্রন্থগুলি সঙ্গীতের ইতিহাস বোলে প্রচলিত সেগুলি কিন্তু কেবল উৎপত্তি ও সঙ্গীত প্রচলনের সন-তারিখের নথিমাত্র হোয়ে পড়েছে। উচ্চস্তরের শিল্পের—বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের এ' ধরণের ইতিহাসের সার্থকতা অপর দিক্ থেকে থাকলেও তার বিকাশের পক্ষে বিশেষ আছে বোলে মনে হয় না এবং তাকে অসম্পূর্ণ বল্‌লেও ভুল হবে না। প্রকৃত ইতিহাস তাকেই বলা যাবে যাতে পাওয়া যাবে তার বিকাশ ও পরিপুষ্টির মূলতথ্যটী। সঙ্গীতের প্রভাব আমাদের জীবনে অত্যন্ত বেশী, তা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সঙ্গীতের স্থান ভারতবর্ষে এত উর্দ্ধে যে, সঙ্গীত-সাধককে এদেশে আধ্যাত্মিক সাধকের সমান আসন দেওয়া হয়। সঙ্গীতচর্চা এখানে শুধু কলা হিসাবে করা হয় না; সাধক সঙ্গীত-সাধনার মধ্য দিয়েই সাধনা করেন ঈশ্বর বা ব্রহ্মের, আবার তাঁর সাধনলব্ধ অনুভূতিও ব্যক্ত করেন সঙ্গীতে। ভারতীয় সঙ্গীতকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখা যায় যে, ঐ লক্ষ্য অনুযায়ী গঠিত হয়েছে তার অবয়ব। শ্রোতার মন-প্রাণের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার ক'রে সঙ্গীতের ঐ বিচিত্র অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার জন্যই নির্দ্ধারিত হয়েছে বিশেষ সময় বা ক্ষণ-বিশেষ রাগ-রাগিণীদের ব্যবহারের জন্য। এ'জন্যই সৃষ্টি হ'য়েছে রাগ-রাগিণীদের ধ্যানরূপ। গায়ক যাতে সমস্তক্ষণ 'রাগ-রাগিণী'-দের অন্তর্নিহিত ভাবটী উপলব্ধি কর্‌তে পারেন এবং সেই ভাবটীকে জাগ্রত রেখে স্বর-বিস্তারে সক্ষম হোতে পারেন, সেই জন্যই ধ্যানরূপের প্রচলন সঙ্গীতে। এর মধ্যে রয়েছে গভীর মনোবৈজ্ঞানিকী দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিভাগকরণে অনুসৃত হয়েছে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তা কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূত নয়, এটী বেশ উপলব্ধি করা যায়। যেমন অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আলোচনা-প্রসঙ্গে 'হরিণী-মুগ্ধ-কর বীণাবাদিনী' তোড়ীর ধ্যানের উল্লেখ ক'রে হরিণের সঙ্গীতপ্রীতিকে প্রাণীতাত্ত্বিক সত্য (zoological fact) বলেছেন। এটী আরো স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় ভৈরবরাগের গম্ভীর ভাব ও তার ধ্যানের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে। সুতরাং আর যে দেশেই চলুক না কেন, আমাদের দেশে (ভারতে) সঙ্গীতের ইতিহাস কেবলমাত্র সন-তারিখের সমষ্টি হোলে চলবে না। সভ্যতা-

বিকাশের সাথে-সাথে সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে স্বর ও সঙ্গীত কোন্ রূপে বিকশিত হ'য়েছে, সাধনাপদ্ধতি কিভাবে বিস্তারলাভ করেছে প্রভৃতি তথ্যগুলির অনুসন্ধান ও আলোচনাই আমাদের সঙ্গীত-ইতিহাসের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন। "রাগ ও রূপ"-এ গ্রন্থকার ঐ বিষয়ে সচেতন থেকে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তিনি যথোপযুক্ত শাস্ত্র ও প্রমাণপঞ্জির ওপর নির্ভর ক'রে ঋগ্বৈদিক যুগ থেকে আজ-পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে রাগের বিকাশ বা পরিণতির বিবরণ দিয়েছেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল—এ' সত্য প্রমাণিত হয়েছে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার খননের পর। সে' যুগে যে কেবল সাধারণভাবে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল এমন নয়, তখনকার সঙ্গীত বেশ উন্নত ধরণের এবং তাতে সাত স্বরের প্রচলন ছিল—এ' খবর জানিয়ে দেয় সাতটী পর্দাযুক্ত বাঁশী, যা আবিষ্কৃত হয়েছে সুপ্রাচীন মহেঞ্জোদড়ো থেকে।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাথে সাথে ভারতের অমূল্য সম্পদ সঙ্গীত যে তার নিজস্ব, বৈদেশিক আমদানি নয়, বরং সভ্যতার জন্মভূমি ভারতবর্ষই বিশ্বসঙ্গীতের উৎস ও জন্মদাত্রী—এ' কথা প্রতিপাদন করেছেন স্বামিজী সুস্পষ্ট-ভাবে ঐতিহাসিক নজির দেখিয়ে। আরব তার সঙ্গীতের প্রথম উপাদান সংগ্রহ করেছে ভারতবর্ষ থেকে। আরবীয় ও পারসিক প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতে যথেষ্ট থাকৃলেও তার মূল উপাদান সম্পূর্ণ নিজস্ব, এ' সত্য প্রমাণ করেছেন গ্রন্থকার তাঁর অকাট্য যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় "রাগ ও রূপ"-এর পাতায়। আলেকজান্দ্রিয়ায় বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ভিতর দিয়ে রচিত হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগসূত্র। ফলে ভারত ও তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সৃষ্টিও হয় যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু সংস্কৃতির দিক্ থেকে ভারত অন্য দেশের চেয়ে অনেক উন্নত থাকাতে তার প্রভাবই বিশেষ ক'রে প্রতিফলিত হয় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলির ওপর। ঐ কেন্দ্রের মধ্য দিয়েই আরব, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশগুলি গ্রহণ করেছিল ভারতের ভাবধারা ও সঙ্গে-সঙ্গে অনুশীলন করেছিল সঙ্গীতে সাত স্বরের ব্যবহার। এ'প্রসঙ্গে আলোচনা করৃতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন: ভারতীয় সঙ্গীত বহু উন্নত ধরণের এবং পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে যথেষ্ট সংস্রব থাকা সত্ত্বেও চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গীত অত্যন্ত অনুন্নত। বাস্তবিকই বিচার ক'রে দেখলে দেখা যায় যে,

জাপানের মত দেশ, যা কর্ম-জীবনে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও আদর্শ গ্রহণ করেছে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে, আধ্যাত্মিক জীবনে সেই জাপানই গুরু বোলে মেনেছে ভারতবর্ষকে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সে একান্তভাবেই শরণাপন্ন হয়েছে ভারতভূমির। অত ঘনিষ্ঠভাবে পাশ্চাত্য সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও স্বভাবসৌন্দর্যপ্রিয় জাপানী সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়নি এবং সে' বিষয়ে তারা একপ্রকার অনুন্নতই। এ'কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। এ'থেকে এটুকু অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, সঙ্গীত পাশ্চাত্য সভ্যতার দান নয়। কোন দেশের সংস্পর্শে আসার ফলস্বরূপ যেমন ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশসাধন হয়নি, সঙ্গীতেও তেমনি। বরং নানাদেশের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও ভারত আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন নিজের মূল বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, সঙ্গীতে তেমনই সে বজায় রেখেছে নিজের বিশেষত্ব, আর সেই জন্যই তার সাঙ্গীতিক বিকাশ এত স্বতন্ত্র ধরণের। অপরাপর দেশগুলি মূল উপাদান এদেশ থেকে গ্রহণ করলেও সাংস্কৃতিক প্রভাব ও রুচি অনুযায়ী সঙ্গীতকে নিজের নিজের ছাঁচে ঢেলে নেওয়াতেই তাদের সঙ্গীত হোয়ে উঠেছে ভিন্ন প্রকৃতির। পাশ্চাত্য অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত জাপান ধর্মে ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় শিক্ষা গ্রহণ করলেও সঙ্গীতকে এত মর্যাদা দিতে পারেনি, সেখানে সে ভারতের শিক্ষা গ্রহণ করেনি, আর সে'জন্যই বোধহয় তার সঙ্গীতের বিকাশ আজও হয়নি পূর্ণরূপে। যদিও এ' স্থানে গ্রন্থকারের আলোচনা বিস্তৃত নয়, তবুও যতটুকু বিচার তিনি করেছেন তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।

আগেই বলা হয়েছে—রাগ-রাগিণীদের বিশ্লেষণপূর্ণ ক্রমবিকাশ দেখানোই গ্রন্থখানির প্রধান উদ্দেশ্য। স্বামিজী হনুমন্মত অনুযায়ী ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর আলোচনা করেছেন। তবে ঐ মতের কোন বই বা পাণ্ডুলিপি এ'পর্যন্ত পাওয়া গেছে বোলে শোনা যায়নি। কাজেই গ্রন্থকার নানা গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে যতটুকু ঐ মতের উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি পেয়েছেন তাই সংগ্রহ করেছেন। তিনি নিজেই পুনঃ পুনঃ এ' কথা স্বীকার করেছেন ও স্বর্গীয় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর-সম্পাদিত "সঙ্গীতদর্পণ", স্বর্গীয় রাধামোহন সেন প্রণীত "সঙ্গীততরঙ্গ", ব্যাস-সঙ্কলিত "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম" প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করেছেন, যা থেকে তিনি চয়ন করেছেন ঐ মতাবলী। হনুমন্মতের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হোলে সঙ্গীতে যুগপরিবর্তন সাধিত হবে—এই মত প্রকাশ

করেছেন লক্ষ্ণৌ মরিস্ কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণরতন ঝন্‌কার। কাজেই দুষ্প্রাপ্য সেই অমূল্য মতের আলোচনা ও অনুশীলন করার জন্ম আমরা সঙ্গীতামোদীদের' পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে।

বৈদিক সমাজে রাগের প্রচলন ছিল কিনা জানি না, তবে স্বামিজীর আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে নারদীশিক্ষায় রাগ বা গ্রামরাগ-এর উল্লেখ আছে। তখনকার সমাজে ঐ রাগের প্রচলন না থাকলে তাদের উল্লেখ পাওয়া যেত না নিশ্চয়। জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগের প্রচলন হয়েছে। তার উল্লেখ আছে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। মোটকথা এ'থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষা ও প্রতিশাখ্যের যুগেই ভারতবর্ষীয় সমাজে 'রাগ'-রূপের বিশেষভাবে প্রচলন ছিল। অবশ্য অধুনা প্রচলিত তথা 'সঙ্গীতরত্নাকর' প্রণেতা শার্ঙ্গদেব ও এমন কি পার্শ্বদেবের সঙ্গীতসময়সারে প্রচলিত রাগের অনুশীলন তখনকার সমাজে ছিল না। বর্তমান রাগমালার প্রচলন 'বৃহদ্দেশী', 'মকরন্দ', 'সঙ্গীতসময়সার' ও 'রত্নাকর' গ্রন্থগুলিতেই দেখা যায়। সম্ভবতঃ বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গই বর্তমান ধারার রাগের প্রচলন করেন; কিন্তু সঙ্গীতরত্নাকরেই অধুনা-প্রচলিত রাগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাগের ক্রমবিকাশ ও সৃষ্টির আলোচনা-প্রসঙ্গে রাগবিবোধকার সোমনাথ, দর্পণকার দামোদর, রাগনিরূপণকার নারদ প্রভৃতির সময়ে রাগরূপের উন্নত ও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় বোলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন।

রাগ-রাগিণীদের স্ত্রী-পুরুষ বিভাগের কাল সঠিকভাবে জানা সম্ভবপর নয়। গ্রন্থকার সে' বিষয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচনা করেছেন ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যতদূর সম্ভব বিচার ক'রে তাদের বিভাগের কাল মোটামুটিভাবে নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে পার্শ্বদেবের পরে শার্ঙ্গদেবকেই (খ্রী° ১৩শ শতাব্দী) তিনি প্রথম স্ত্রীবাচক ও পুংবাচক শব্দের উল্লেখকারী বলেছেন। তাঁর মতে, রাগগুলির ধ্যানরূপের প্রচলন হয় সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর সমাজে। তিনি বিভিন্ন মত অনুসরণ ক'রে শিব ও শক্তি হোতে ছয় রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। স্বামিজী শিবের পঞ্চমুখকে অগ্নির পাঁচটী শিখা এবং শিব বা রুদ্রকে নাদরূপী 'শব্দব্রহ্ম' বলেছেন। শেষে তিনি অগ্নি ও

দেবীকে কামকলা 'কুণ্ডলিনী' বলেছেন, আবার কুণ্ডলিনীই মানুষের মনের অবচেতন স্তর বোলে সমস্ত রাগ-রাগিণীর উৎপত্তির উৎস মানুষের মন তথা কল্পনা—এইভাবে নির্দেশ ক'রে গ্রন্থকার উপসংহার করেছেন তাঁর "রাগ ও রূপ"-এর 'পরিচয়' অধ্যায়ের।

বইখানিতে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীর পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার তাদের ধ্যান, বাদী, সম্বাদী ও কোন্ কোন্ রাগের সংমিশ্রণে কোন্ কোন্ রাগের উৎপত্তি, আরোহণ অবরোহণ স্থায়ী ও অন্তরায় স্বরবিস্তারের ধারা প্রভৃতির যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। এখানে কিন্তু আমরা আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা কামনা করি। এই সঙ্গে যদি তিনি প্রত্যেক রাগের অন্ততঃ একটা ক'রে গান ও তাদের স্বরলিপি উদ্ধৃত ক'রে দিতেন তা'হলে রাগ-রাগিণীদের রূপ আরো স্পষ্ট হোত (অবশ্য এ' ত্রুটী তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর গ্রন্থের পরিচিতিতে) এবং তাদের সম্পূর্ণ পরিচয়-লাভের সুযোগ পাঠকের হোত। রাগ-রাগিণীর যে পরিচয় স্বামিজী দিয়েছেন তা কেবলমাত্র ঐ রাগ যাঁরা আয়ত্ত করেছেন তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরাই তা থেকে ঐ সমস্ত রাগের ঔপপত্তিক পরিচয় যথাযথভাবে উপলব্ধি কর্‌তে সক্ষম হবেন ও বিশুদ্ধভাবে তাদের ব্যবহার কর্‌তে সমর্থ হবেন। কিন্তু যাঁরা যে রাগে পুরোপুরি অনভিজ্ঞ তাঁদের পক্ষে কেবলমাত্র আরোহণ-অবরোহণ ও বিস্তারের ঐটুকু নির্দেশ থেকে রাগটীর পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর নয়। কারণ সম্পূর্ণরূপে স্বরবিস্তারের পদ্ধতি ও রাগের বিশেষ গতি সম্বন্ধে অবগত না হওয়া পর্যন্ত কোন রাগের স্পষ্ট রূপটী গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। যদিও একটী মাত্র স্বরলিপি বা গান থেকে কোন রাগকেই ঠিকমত আয়ত্ত করা যায় না, তবুও তাদের সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং তাদের ঠিক ঠিক পরিচয় লাভ করা যায়। রাগ-রাগিণীর কুড়ি-বাইশখানি দুষ্প্রাপ্য ছবি বইখানিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। অনেক ছবির সঙ্গেই ধ্যানের বেশ মিল আছে। ছবিগুলির ভাব ও মাধুর্য বর্ণনাতীত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী।

শেষকালে ছ'টী পরিশিষ্টে যথাক্রমে "বৈদিক-সঙ্গীত বা সামগান", "মার্গসঙ্গীত বৈদিক কিনা", "বৈদিক ও দেশী সঙ্গীতে স্বর" ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। "বৈদিক সঙ্গীত বা সামগান"-শীর্ষক প্রথম পরিশিষ্টে স্বামিজী সামগানের বিভাগ, তাতে স্বরের ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য

ও ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অধ্যাপক কালাণ্ড, ডাঃ আর্নল্ড, এ. বাকে, পপ্‌লে, স্ট্রাঙ্গয়েজ ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রাচীন যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, দত্তিল, ভরত, মকরন্দকার নারদ, শার্ঙ্গদেব, সোমনাথ, অহোবল, রাজা রঘুনাথ, পণ্ডিত দামোদর, শ্রীনিবাস, বেঙ্কটমুখী, পুণ্ডরীক বিট্ঠল প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি, এন এস. রামচন্দ্র, রামস্বামী আয়ার-প্রমুখ আধুনিক সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতবাদগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

"মার্গসঙ্গীত বৈদিক কিনা" এই পর্যায়ে দ্বিতীয় পরিশিষ্টে স্বামিজী মার্গসঙ্গীত বল্‌তে কোন্ পর্যায়ের সঙ্গীত বোঝায় তাই আলোচনা করেছেন। তিনি "মার্গ ও ক্ল্যাসিক্যাল (classical) সঙ্গীত একই শ্রেণীর"—বহুজনসমর্থিত এই মতবাদটী খণ্ডন করেছেন। মার্গসঙ্গীতের উৎস, প্রকৃতি প্রভৃতির বিশ্লেষণ ও ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ করেছেন। এ'স্থলে তিনি বলেছেন : ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীত যে ঠিক একই শ্রেণীর নয় এ'কথা ঐতিহাসিক গবেষক-মাত্রে একবাক্যে স্বীকার করবেন। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগুলিও আমাদের এই পার্থক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও স্বরবিস্তার, শ্রুতিমাধুর্য, বাদী-সম্বাদীর মর্যাদাদান, অলঙ্কার, মূর্ছনা প্রভৃতি উভয় অভিজাত সঙ্গীতেরই অবদান, তবুও সাত স্বরে লীলায়িত মার্গসঙ্গীত আলাপাদিনিবদ্ধ, রাগবিবেকসম্বন্ধ ও নিয়মযুক্ত হোলেও তাকে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন হবে না। মার্গসঙ্গীতের ভাবধারা নিছক আর্য-পরিবেশের নিদর্শন ও মাধুর্যে ভরপুর, আর ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতে ভারতীয় আদর্শ থাকলেও তাতে মোগল ও পারস্য প্রভাবই বেশী। এই ভাবে তিনি বিভিন্ন মতবাদকে বিশ্লেষণ ক'রে ও প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে নজির উদ্ধৃত ক'রে ক্ল্যাসিক্যাল ও মার্গসঙ্গীতকে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিপাদন করেছেন। মার্গসঙ্গীতের উৎস চার বেদ এবং তা সামগানের মত বৈদিক বোলেই তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তৃতীয় পরিশিষ্টে তিনি "বৈদিক ও দেশী-সঙ্গীতে স্বর" এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। চতুর্থ পরিশিষ্টের আলোচ্য বিষয় "সাতস্বরের জন্মকথা"। আদিস্বর হিসাবে তিনি 'মধ্যম'-কেই গণ্য করেছেন ও বিভিন্ন মতাবলীর উল্লেখ

ক'রে নিজের যুক্তিকে দৃঢ় করেছেন। সাতটী স্বরের বিকাশ ও প্রচলনের বিশেষ আলোচনা রয়েছে এই পরিশিষ্টে।

"রাগ-রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্রের উদ্দেশ্য কি?"—পঞ্চম পরিশিষ্টের এই আলোচনায় গ্রন্থকার রাগ-রাগিণীদের সূক্ষ্ম-অনুভূতিকে অপেক্ষাকৃত স্থূল-প্রত্যক্ষে পর্যাবসানের চেষ্টাতেই তাঁদের চাক্ষুষ চিত্রের প্রবর্তন বল্‌তে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়—"মানুষ বাস্তবতাকে চায় উপাসনা করতে। জড়েই তার আনন্দ, সূক্ষ্মকে নিয়ে সে কেবল তৃপ্ত থাকতে পারে না," "মূর্তি-কল্পনার পিছনে মনোবৈজ্ঞানিকী ধারাই থাকে প্রবল," "ভাব ও রস তাতে প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে" প্রভৃতি। তিনি শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটী স্থায়ী রস ও তাদের বিভিন্ন ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য অনেকে যে 'শান্ত'-কে নবম রস বোলে গণ্য করেন—এ'কথা উল্লেখ কর্‌তেও তিনি বিস্মৃত হ'ন নি। তাঁর মতে, স্বর অনুযায়ী রসের ও ভাবের সঞ্চার হয়, আবার ভাব অনুযায়ী স্বরের গতিরও সৃষ্টি হয়। চিত্রে যেমন গতি ও ছন্দের বৈশিষ্ট্যাতে রসের প্রকাশ হয়, সঙ্গীতেও তেমনি। রূপের মধ্য দিয়েই অরূপের সাধনা করেন সাধক, 'রাগ-রূপ' তাই সাধকের সাধনার ও তাঁর মুক্তিপথের সহায়ক। স্বামিজী তাই বলেছেন: 'চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ'।

ষষ্ঠ পরিশিষ্টে তিনি "হিন্দুস্থানী ও দক্ষিণী ঠাট" সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সপ্তম পরিশিষ্টে "হিন্দি ভাষায় রচিত কতকগুলি রাগ-রাগিণীর ধ্যান" উদ্ধৃত করা হয়েছে। অষ্টম পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে "গ্রন্থসূচী", এ'ছাড়া "প্রমাণপঞ্জী" ও "স্বরলিপি-পরিচয়" নিয়ে সমাপ্ত হয়েছে গ্রন্থখানি।

গ্রন্থখানিতে অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু-অঙ্কিত রসের চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় আর্য-সঙ্গীতে অনার্য সভ্যতার দান, রাগ-রাগিণীদের চাক্ষুষ চিত্রের উপাদান ও উৎস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ক'রে বইখানির মর্যাদা ও গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছেন।

বইখানি ঔপপত্তিক আলোচনা হিসাবে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। আমাদের দেশে যতখানি জোর দেওয়া হয় কার্যকরী বা ব্যবহারিক (practical)

অংশের ওপর, ঠিক ততখানি অনাদর করা হয় ঔপপত্তিক (theoretical) অংশকে। কিন্তু বিচারের মাপকাঠিতে উভয়ের মূল্যই সমান প্রত্যেক বিষয় বা বিদ্যার পরিপূর্ণ গঠনের পক্ষে। উভয়ের সম্মিলন ছাড়া কোন বিদ্যার পূর্ণ বিকাশ হোতে পারে না। তাই সঙ্গীতের দিক্ দিয়ে ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকেরই পূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত বোলে মনে হয়, নয়তো সঙ্গীত হোয়ে উঠবে একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন। যদিও একথা ঠিক যে, প্রকৃত শিল্পীর পক্ষে শিল্পসৃষ্টির কোন বাঁধাধরা নিয়মকানুন থাকতে পারে না, তবুও ঔপপত্তিক জ্ঞান না থাকলে সার্থক সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়, এ'কথাও অস্বীকার করা চলে না। ব্যবহারিক জ্ঞানের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হোলে ঔপপত্তিক জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। ঐ জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে সাধারণতঃ সঙ্গীতে অভ্রান্ত-ভাবে স্বরবিস্তার করা যায় না। এ'জন্য আজ সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হোতেও চলেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হবে শিল্পীদের এ' বিষয়ে সচেতন ক'রে তোলা।

নব নব সুরসৃষ্টির একটা নূতন খেয়াল আজকাল বাঙলার শিল্পীবৃন্দের অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, যার ঝোঁকে অনেকেই এমন সব 'রাগ'-এর সৃষ্টি ক'রে চলেছেন যাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং যাদের রূপটাও যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয় না। যে রাগ প্রচলিত রয়েছে বহুদিন থেকে তাই আয়ত্ত করেছেন ক'জন জানি না। অপ্রচলিত রাগের সংখ্যার তো কথাই নেই, তার উপর এই বৈচিত্রহীন সুর-সৃষ্টির খেয়ালের কি অর্থ হয় তা সত্যিই বোঝা যায় না। অবশ্য প্রতিভা বা নবনবউন্মেষশালিনী বুদ্ধির অবদানকে আমরা চিরদিনই স্বীকার করি, কিন্তু তাই বোলে নাম ও প্রতিযোগিতার মোহে আচ্ছন্ন হোয়ে শিল্পীরা যদি ভুলে যান যে, শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য 'চমক লাগানো', 'বাহবা কেনা' বা 'বাহাদুরী লাভ' করা নয়, তাহলে উন্নতির আশা হবে সুদূরপরাহত। উপভোগকারীকে অনুপ্রেরণা যোগানো, তাঁকে তৃপ্তি ও আনন্দদানই শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। আপন অনুভূতিকে অপরের মাঝে সঞ্চারণ করবার চেষ্টাতেই শিল্পের জন্ম। শিল্পের অর্থই সৃষ্টি, কাজেই সার্থক সৃষ্টি করতে না পারলে সার্থক শিল্পী হওয়া যায় না। শিল্পীরা যদি একটু ভেবে দেখেন যে, পুরাতন বা অপ্রচলিতকে বাদ দিয়ে কেবলই নূতন রাগ সৃষ্টি ক'রে কতটুকু অনুপ্রেরণা দানে সক্ষম হয়েছেন—কতটুকু আনন্দ সৃষ্টি করতে পেরেছেন

তাঁরা শ্রোতাদের প্রাণে, তাহলে বোধ হয় তাঁদের এই অলঙ্কৃত খেয়াল আর জাগবে না। প্রাচীন ও অপ্রচলিত রাগের অনুশীলনকে অব্যাহত এবং ভারতীয় সঙ্গীত তথা রাগবিশেষের বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে নূতন নূতন রূপ-সৃষ্টির অপক্ষপাতী আমরা মোটেই নই, যদি তাতে থাকে বিশেষত্ব। মোটকথা শিল্পী ও সঙ্গীতগুণীদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ এই যে, তাঁরা সকল দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় সঙ্গীতের চরম-বিকাশ-সাধনে সচেষ্ট হোন। স্বামিজীর বইখানি এদিক থেকে বিশেষ সহায়ক বোলে মনে হয়, আর সে'জন্যই তার সমাদর কামনা করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সঙ্গীতকে উচ্চশিক্ষার তালিকাভুক্ত করতে মনস্থ করেছেন বোলে শোনা যাচ্ছে। এই সঙ্গীতশিক্ষার ব্যাপারে আমাদের বাঙ্গলাদেশ কিন্তু অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে শুধু সঙ্গীতশিক্ষার্থীদেরই নয়, অধ্যাপকদেরও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অথচ বাঙ্গলায় বহু প্রতিভাশালী শিক্ষার্থীর অভাব না থাকাতেও শিক্ষার যথেষ্ট সুব্যবস্থার অভাবেই বাঙ্গলার শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীতক্ষেত্রে অপরাপর প্রদেশের শিল্পীদের তুলনায় বিশেষ উন্নতিলাভ করতে পারছেন না,—এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হোতে পারে!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা যে মহৎ, সে' বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যতঃ তাঁদের তৎপরতার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু প্রবেশিকা সঙ্গীতের নামে যে সামান্য শিক্ষা দান করা হয় তা থেকে এটাই বার বার মনে হয় যে, সঙ্গীতশিক্ষা-ব্যাপারে তাঁরা মোটেই যত্নবান নন্। তাঁরা নিশ্চয় ঐটুকু শিক্ষাদানকে বাঙ্গলার পক্ষে যথেষ্ট মনে করেন না, তবুও তাঁদের এই উপেক্ষার কারণ কি তা আজও অজ্ঞাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের এ' বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রবেশিকার মত সমস্ত উচ্চ শ্রেণীতেই (সমস্ত কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) সঙ্গীতের শিক্ষা ও আলোচনা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেজন্যই স্বামিজীর এই বইখানিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করার আমরা পক্ষপাতী। কারণ শুধু বাঙ্গালা ভাষায় কেন, অন্যান্য ভাষাতেও এ' ধরণের বই আর দেখেছি বোলে মনে হয় না। এ' বিষয়ে কর্তৃপক্ষদের কাছে বার বার আবেদন জানিয়ে আমাদের প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করছি।"

—শ্রীমীরা মিত্র

৪। **আনন্দবাজার-পত্রিকা (ফাল্গুন, ১৩৫৬ সাল)** : "প্রাচীন পদ্ধতি ও নবীন পদ্ধতি উভয়ের পরিচয়, সামঞ্জস্য এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের আলোচনার মধ্য দিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের ও রাগ-রাগিণীর স্বরূপ এই গ্রন্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভূমিকায় প্রখ্যাত শিল্পরসিক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং আলোচনা করিয়া বিষয়টীকে সহজগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাগ-রাগিণীর উদ্ভব ও রূপের কথা তাঁহার আলোচনাতে তো আছেই, তাহা ছাড়া ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি কি সে বিষয়েও তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। মূল গ্রন্থের 'পূর্বাভাসে' গ্রন্থকার নিজেও এই বিষয়, বিশেষতঃ ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ ও বৈচিত্র্যের ঐতিহাসিক দিকটা আলোচনা করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের প্রথম অংশে 'রাগ', 'জাতি' ও গ্রামের' পরিচয় এবং তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ও প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে রাগ-রাগিণীর প্রকৃতি বিচার এবং তৎসম্বন্ধে পুরাতন ও নবীন মতবাদসমূহ আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় অংশে সঙ্গীতের প্রচলিত চারিটি মত—ব্রহ্মার মত, ভরতের মত, হনুমন্ মতনুসারে রাগ-রাগিণীদের ধ্যান, স্বরূপ ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের পরিশিষ্ট-সংখ্যা ৮টি। তাহার মধ্যে প্রথম পাঁচটিতে বৈদিক সঙ্গীতের স্বর, মার্গ-সঙ্গীতের স্বরূপ, বৈদিক ও দেশী সঙ্গীতের স্বর, সাতস্বরের জন্মকথা ও রাগিণীর চিত্র যথাক্রমে আলোচিত হইয়াছে। শেষ তিনটি পরিশিষ্টে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটি ঠাট, সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর ধ্যান এবং প্রাচীন গ্রন্থশাস্ত্রের গ্রন্থকারগণের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সর্বশেষে প্রদত্ত প্রমাণ-পঞ্জীটি সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনাকারিগণের প্রভূত সহায়তা করিবে।

গ্রন্থখানির মধ্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য ও অধিকার সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

—**শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য** (সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা)।

৫। **পশ্চিমবঙ্গ-পত্রিকা (আশ্বিন, ১৩৫৬ সাল)** : 'রাগ ও রূপ' পুস্তকখানি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা হইয়াছে। এইরূপ উচ্চাঙ্গের পুস্তক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, চটকদারী কথার বুনানীতে পাঠকদের সম্মোহিত করিয়া রাখা। অধিকাংশ তথাকথিত গবেষণামূলক পুস্তকগুলিতে মৌলিক উপাদানের

একান্ত অভাব দেখা যায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের পুস্তকখানি সেই শ্রেণীর নয়। আলোচনা যেমন বিস্তৃত ও তুলনামূলক, মৌলিক উপাদান তেমনি অসংখ্য। মোটের উপর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ রচনা অতীব সাবলীল। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ এই পুস্তকটিতে দেখানো হইয়াছে। তাঁহার গবেষণা নূতন ধরণের, সঙ্গীত-শাস্ত্রের রহস্যের ও তত্ত্বের উপর তিনি অভিনব আলোকপাত করিয়াছেন। সকল দিক দিয়া এইরূপ জ্ঞানগর্ভ ও সুন্দর আলোচনা দাক্ষিণাত্যের পুণ্ডরীক বিঠ্‌লের পরে এ' পর্যন্ত আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সুদীর্ঘ বাইশ পাতাব্যাপি ভূমিকায় একস্থলে লিখিতেছেন—'ভারতীয় সংস্কৃতির জগতের একটি শ্রেষ্ঠ মন্দিরের দ্বার তিনি (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) খুলিয়া দিয়াছেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞানের সমগ্র সবল ও সচল শক্তি দিয়া। সত্য সত্যই বাংলা ভাষায় লিখিত এই বই সঙ্গীত-সাহিত্য-জগতে এক অপূর্ব অবদান। আমরা সূক্ষ্মদর্শী ও সুপণ্ডিত গ্রন্থকারকে তাঁহার এই আয়াস ও সফল সাধনার জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি'।

গ্রন্থখানিতে বারটি অধ্যায় দিয়াছেন। তা ছাড়া গোড়াকার দিকে গ্রন্থকার ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী 'পূর্বাভাস' দিয়াছেন। বইটিতে রাগের রূপ ও বিবর্তনটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। * * * বইখানিকে সমস্ত সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী এবং জ্ঞান-পিপাসুর সংগ্রহ করা উচিত। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এই বইখানি থাকা উচিত এবং আমরা আশা করি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতের অপরিহার্য পুস্তক হিসাবে বইখানিকে মনোনীত করিবেন।"